ছোটোদের রবীন্দ্ররচনাবলী | ১

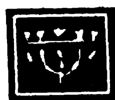
ছোটোদের রবীন্দ্র রচনাবলী

১

সম্পাদকমণ্ডলী :

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনীষা



প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০০
প্রচ্ছদ : গৌতম আচার্য

সত্য ভট্টাচার্য কর্তৃক মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ
৪/৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩ থেকে প্রকাশিত

ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্‌স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ৭০০০৩২ থেকে মুদ্রিত

শিশু কিশোর আকাদেমির নিবেদন

এমন একটা সময় ছিল যখন ছোটোদের কাছে রবীন্দ্রনাথ বলতে পাঠ্যপুস্তকের কবিতা ও গল্পগুলিই ছিল একমাত্র সম্বল। ভাগ্যবান কেউ হাতে পেয়ে যেতেন আস্ত 'সঞ্চয়িতা'। রবীন্দ্ররচনাবলীর শতবার্ষিকী সংস্করণ প্রকাশের পরে কতিপয় অতি সৌভাগ্যবান শিশু ও কিশোর সুযোগ পেয়েছিল সেই বইয়ের পৃষ্ঠা ওল্টাতে। বিশ্ব ভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশও কারও কারও কাছে প্রাপ্তিবিশেষ।

কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্র রচনাবলীতে কোনও সময়ই ছোটোদের তেমন প্রবেশাধিকার ছিল না, আজও নেই কেন না তাদের হাতে পড়লে বইটি হয়তো অক্ষত থাকবে না এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেন বড়োরা।

রবীন্দ্রনাথের দেড়শো বছরের জন্মদিনে শিশু কিশোর আকাদেমি নানা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ছাড়াও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ছোটোদের কাছে রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দিতে। ছোটোদের জন্য তাঁর যাবতীয় সৃষ্টি দুই মলাটের মধ্যে মুড়ে তাদের হাতে তুলে দেওয়াই হবে তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার। সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে আকাদেমির পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করে তাঁদের কাছে অনুরোধ করা হবে এই মহান কর্মকাণ্ড রূপায়িত করতে।

বেশ কয়েকটি সভায় বহু আলোচনার পর সম্পাদকমণ্ডলী রবীন্দ্ররচনার যে-তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন, সেই রচনাগুলি একত্রিত করতে গিয়ে আবিষ্কৃত হল এক নতুন রবীন্দ্রনাথের। ছোটোদের জন্যও তাঁর যে বিপুল রচনাসম্ভার তা একটি বা দুটি খণ্ডেও সংকুলান করা যাচ্ছে না।

সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে গিয়ে আমরা নতুনভাবে পড়লাম রবীন্দ্রনাথকে। বড়োদের লেখার পাশাপাশি তিনি ছোটোদের জন্যও কত ভেবেছেন, লিখেছেন কত বিচিত্র ধরনের গল্প-উপন্যাস-কবিতা-নাটক-নৃত্যনাট্য-প্রবন্ধ তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। রবীন্দ্রনাথের অজস্র রচনার মধ্যে ছোটোদের রচনাগুলি নির্বাচিত করার পর সেগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে খুবই আয়াসসাধ্যভাবে। শান্তিনিকেতন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে 'আটটি গল্প' এর পাণ্ডুলিপি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে 'বিসর্জন' এর সেই অনুলিপিটি যা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সংশোধন করেছিলেন ছোটোদের অভিনয়ের উপযোগী করে তুলতে। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি লেখাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে 'মডার্ন রিভিয়ু'-এর ১৯১৯ সালের সংখ্যাগুলি থেকে।

সম্পাদকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি উল্লেখ করতেই হয় কবি ও গবেষক দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। তিনি অসুস্থ শরীরেও অশেষ পরিশ্রম করে যেভাবে এই রচনাবলীর

পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দিয়েছেন ও প্রুফ সংশোধন করেছেন তার তুলনা নেই। বিশিষ্ট কবি ও রবীন্দ্র-বিষেষজ্ঞ শঙ্খ ঘোষের সঙ্গেও এ বিষয়ে আলোচনা করেছি যাতে সংকলনটি হয়ে ওঠে সর্ব অর্থেই ছোটোদের উপযোগী। আকাদেমির সভাপতি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পরামর্শও গ্রহণ করেছি নানা সময়। তা সত্ত্বেও যদি কোনও ভুল থেকে থাকে তার দায়িত্ব আমাদের।

শিশু ও কিশোরদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ও সার্ধশতবর্ষের সময়সীমার মধ্যেই প্রকাশ করা হবে এই ভাবনায় খুব দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছি আমরা। এই সংকলনটি যাদের কথা ভেবে প্রকাশ করা সেই ছোটোদের পছন্দ হলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আমাদের প্রস্তাবটি সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদন করে দিয়েছেন তাও এক বড়ো প্রাপ্তি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি রবীন্দ্রজন্মসার্ধশতবর্ষ কমিটিকে। এই সংকলন প্রকাশের অর্থ তাঁদের কাছ থেকে না-পাওয়া গেলে ঠিক সময়ে প্রকাশ করা যেত না বইটি। আমাদের প্রকাশনা বিভাগ দিবারাত্র পরিশ্রম করে যেভাবে এই বইটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ করেছে তা প্রশংসনীয়।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
সচিব

প্রকাশনা পরিচালকের কলমে

শৈশবের প্রথম প্রকৃতি-পাঠ তাঁর হাত ধরে শেখা। কৈশোরের প্রথম স্বপ্নও তিনিই দেখান। যৌবনে উদ্দীপিত করেন বলিষ্ঠ চেতনায়, বাঙালি তথা ভারতবাসীর জীবনবোধ গড়ে ওঠে তাঁর আদর্শে—তিনি রবীন্দ্রনাথ, ছোটোদের প্রিয় রবিঠাকুর।

উনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধের এক নতুন অভিমুখ সৃষ্টি হয় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে। বিদেশি শাসনের নির্মম নিষ্পেষণে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষ তখন দিশাহারা, সাহিত্য সংস্কৃতির জগতেও চলছে শাসকের কশাঘাত, ছাপাখানাগুলোর উপর চলছে নজরদারি এইরকম এক দুঃসময়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের এই সুসন্তান তুফান তুললেন তাঁর কলমে, জোয়ার আনলেন বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির মরা গাঙে। সেই ধারা বুকে নিয়ে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির গঙ্গা হয়ে উঠল পুনর্যৌবনা, তার প্রবাহ একীভূত হল বিশ্বসাগরের বুকে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারাজীবনে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, সংগীত, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য প্রভৃতি, যার মধ্যে বেশ কিছু লেখা তিনি লিখেছিলেন শিশু-কিশোরদের উপযোগী করে। আবার তাঁর এমন কিছু লেখা আছে যা সরাসরি শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা না হলেও তারা পড়তে পারে নিজেদের সমৃদ্ধ করার জন্য। এই সমস্ত লেখাকে এই প্রথম এক মলাটের ভিতর নিয়ে আসার উদ্যোগ নিল শিশু-কিশোর আকাদেমি যাতে করে ছোটোরা আরও আপন করে নিতে পারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, আরও বেশি করে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায় তাঁর সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে।

আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্ররচনাবলী, কিন্তু শুধুমাত্র শিশু-কিশোরদের কথা ভেবে, তাদের উপযোগী রবীন্দ্ররচনার সংকলন বলা যেতে পারে এই প্রথম প্রকাশিত হল শিশু-কিশোর আকাদেমির উদ্যোগে আর তাই এই বই প্রকাশ করতে গিয়ে আমাদের হতে হয়েছে অনেক বেশি দায়িত্বশীল। লেখা নির্বাচন ও পরিমার্জনে সম্পাদকমণ্ডলী উজাড় করে দিয়েছেন তাঁদের সমস্ত নিষ্ঠা। প্রধান সম্পাদক দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন সংযোজন বিয়োজনের কাজে। অধ্যাপক পবিত্র সরকার, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবনীতা দেব সেন ও সুমিতা চক্রবর্তী সযত্নে সহায়তা করেছেন বইয়ের রূপরেখা নির্মাণে। মূল্যবান পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দান করে ভরসা জুগিয়েছেন বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক শঙ্খ ঘোষ এবং আকাদেমির সভাপতি বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এই সমস্ত গুণী মানুষের অকৃপণ সহযোগিতায় এই গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হল। আমরা কৃতজ্ঞ এঁদের প্রত্যেকের কাছে।

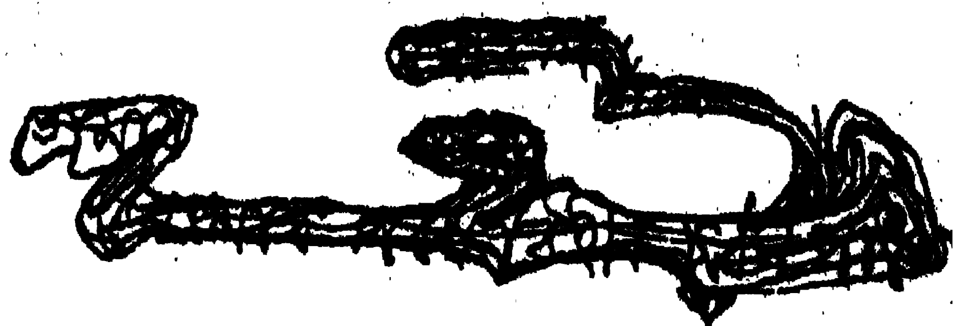
যাবতীয় প্রুফ সংশোধন ও পরিমার্জনের কাছে সহায়তা করেছেন দেবাশিস বসু। আকাদেমির কর্মী মধুসূদন মণ্ডলের আন্তরিক শ্রম জড়িয়ে রয়েছে সমগ্র প্রকল্প জুড়ে। কলকাতা ও শহরতলির বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীরা পরম যত্নে করেছেন অলংকরণের কাজ। বিশিষ্ট চিত্রকর সুব্রত চৌধুরী অতি যত্নে নির্মাণ করেছেন প্রচ্ছদ। সামগ্রিক বিন্যাসের দায়িত্ব হাসিমুখে কাঁধে তুলে নিয়েছেন বিশিষ্ট শিল্পী প্রণবেশ মাইতি। এঁদের প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাই 'দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস'-এর সমস্ত কর্মীকে নিরলস সহযোগিতার জন্য।

সবশেষে সকৃতজ্ঞ চিত্তে উল্লেখ করি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয়ের নাম, যাঁর ঐকান্তিক উদ্যোগে সফল করে তোলা গেল এই গ্রন্থ পরিকল্পনা।

বাংলা ও বাংলার বাইরে থাকা শিশু-কিশোর পাঠকরা এই বই পড়ে রবীন্দ্ররচনা সম্পর্কে আরও আগ্রহী হবে, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবধন্য তাদের হৃদয় হয়ে উঠবে নির্মল ও পবিত্র এই প্রত্যয় রাখি।

ড. শর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশনা পরিচালক

সূচি



নদী

ওরে তোরা কি জানিস কেউ
জলে কেন ওঠে এত ঢেউ।
ওরা দিবস রজনী নাচে,
তাহা শিখেছে কাহার কাছে।
শোন্ চলচল্ ছলছল্
সদাই গাহিয়া চলেছে জল।
ওরা কারে ডাকে বাহু তুলে,
ওরা কার কোলে ব'সে দুলে
সদা হেসে করে লুটোপুটি,
চলে কোন্‌খানে ছুটোছুটি।
ওরা সকলের মন তুষি
আছে আপনার মনে খুশি।।



আমি বসে বসে তাই ভাবি
নদী কোথা হতে এল নাবি।
কোথায় পাহাড় সে কোন্‌খানে,
তাহার নাম কি কেহই জানে?
কেহ যেতে পারে তার কাছে?
সেথায় মানুষ কি কেউ আছে?

সেথা নাহি তরু, নাহি ঘাস,
নাহি পশুপাখিদের বাস।
সেথা শবদ কিছু না শুনি—
পাহাড় বসে আছে মহামুনি,
তাহার মাথার উপরে শুধু
সাদা বরফ করিছে ধূধূ।
সেথা রাশি রাশি মেঘ যত
থাকে ঘরের ছেলের মতো।

শুধু হিমের মতন হাওয়া
সেথায় করে সদা আসা-যাওয়া।
শুধু সারা রাত তারাগুলি
তারে চেয়ে দেখে আঁখি খুলি।
শুধু ভোরের কিরণ এসে
তারে মুকুট পরায় হেসে।।

সেই নীল আকাশের পায়ে
সেথা কোমল মেঘের গায়ে
সেথা সাদা বরফের বুকে
নদী ঘুমায় স্বপনসুখে।
কবে মুখে তার রোদ লেগে
নদী আপনি উঠিল জেগে—
কবে একদা রোদের বেলা
তাহার মনে পড়ে গেল খেলা।

সেথায় একা ছিল দিন-রাতি,
কেহই ছিল না খেলার সাথি।
সেথায় কথা নাহি কারো ঘরে,
সেথায় গান কেহ নাহি করে।
তাই ঝুরুঝুরু ঝিরিঝিরি
নদী বাহিরিল ধীরি ধীরি।
মনে ভাবিল, যা আছে ভবে
সবই দেখিয়া লইতে হবে।।

নীচে পাহাড়ের বুক জুড়ে
গাছ উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে।
তারা বুড়ো বুড়ো তরু যত,
তাদের বয়স কে জান কত!
তাদের খোপে খোপে গাঁঠে গাঁঠে
পাখি বাসা বাঁধে কুটো কাঠে!
তারা ডাল তুলে কালো কালো
আড়াল করেছে রবির আলো।
তাদের শাখায় জটার মতো
ঝুলে পড়েছে শ্যাওলা যত।
তারা মিলায়ে মিলায়ে কাঁধ
যেন পেতেছে আঁধার-ফাঁদ।
তাদের তলে তলে নিরিবিলি
নদী হেসে চলে খিলিখিলি।
তারে কে পারে রাখিতে ধরে,
সে যে ছুটোছুটি যায় সরে।
সে যে সদা খেলে লুকোচুরি,
তাহার পায়ে পায়ে বাজে নুড়ি।
পথে শিলা আছে রাশি রাশি,
তাহা ঠেলে চলে হাসি হাসি।

পাহাড় যদি থাকে পথ জুড়ে
নদী হেসে যায় বেঁকেচুরে।
সেথায় বাস করে শিঙ-তোলা
যত বুনো ছাগ দাড়ি-ঝোলা।
সেথায় হরিণ রোঁয়ায় ভরা
তারা কারেও দেয় না ধরা।
সেথায় মানুষ নূতনতরো,
তাদের শরীর কঠিন বড়ো।
তাদের চোখদুটো নয় সোজা,
তাদের কথা নাহি যায় বোঝা।
তারা পাহাড়ের ছেলে মেয়ে
সদাই কাজ করে গান গেয়ে।

তারা সারা দিনমান খেটে
আনে বোঝা-ভরা কাঠ কেটে।
তারা চড়িয়া শিখর-'পরে
বনের হরিণ শিকার করে।।

নদী যত আগে আগে চলে
ততই সাথি জোটে দলে দলে।
তারা তারি মতো, ঘর হতে
সবাই বাহির হয়েছে পথে।
পায়ে ঠুনুঠুনু বাজে নুড়ি,
যেন বাজিতেছে মল চুড়ি।

গায়ে আলো করে ঝিকিঝিক্,
যেন পরেছে হীরার চিক্।
মুখে কলকল কত ভাষে
এত কথা কোথা হতে আসে!
শেষে সখীতে সখীতে মেলি
হেসে গায়ে গায়ে পড়ে হেলি।
শেষে কোলাকুলি কলরবে
তারা এক হয়ে যায় সবে।

তখন কলকল ছুটে জল,
কাঁপে টলমল ধরাতল—
কোথাও নীচে পড়ে ঝরঝর
পাথর কেঁপে ওঠে থরথর—

শিলা খান খান যায় টুটে,
নদী চলে পথ কেটে-কুটে।
ধারে গাছগুলো বড়ো বড়ো
তারা হয়ে পড়ে পড়ো-পড়ো,
কত বড়ো পাথরের চাপ
জলে খ'সে পড়ে ঝুপ ঝাপ।

তখন মাটি-গোলা ঘোলা জলে
ফেনা ভেসে যায় দলে দলে।

জলে পাক ঘুরে ঘুরে ওঠে
যেন পাগলের মতো ছোটে

শেষে পাহাড় ছাড়িয়া এসে
নদী পড়ে বাহিরের দেশে।
হেথা যেখানে চাহিয়া দেখে
চোখে সকলি নূতন ঠেকে।
হেথা চারি দিকে খোলা মাঠ,
হেথা সমতল পথ ঘাট।

কোথাও চাষিরা করিছে চাষ
কোথাও গোরুতে খেতেছে ঘাস।
কোথাও বৃহৎ অশথ গাছে
পাখি শিস দিয়ে দিয়ে নাচে,
কোথাও রাখাল-ছেলের দলে
খেলা করিছে গাছের তলে,
কোথাও নিকটে গ্রামের মাঝে
লোকে ফিরিছে নানান কাজে।

কোথাও বাধা কিছু নাহি পথে,
নদী চলেছে আপন মতে।
পথে বরষার জলধারা
আসে চারি দিক হতে তারা।

নদী দেখিতে দেখিতে বাড়ে,
এখন কে রাখে ধরিয়া তারে।।

তাহার দুই কূলে উঠে ঘাস,
সেথায় যতেক বকের বাস।

সেথা মহিষের দল থাকে,
তারা লুটায় নদীর পাঁকে।
যত বুনো বরা সেথা ফেরে,
তারা দাঁত দিয়ে মাটি চেরে।
সেথা শেয়াল লুকায়ে থাকে,
রাতে 'হুয়া হুয়া' ক'রে ডাকে।
দেখে এইমতো কত দেশ
কেবা গনিয়া করিবে শেষ।

কোথাও কেবল বালির ডাঙা,
কোথাও মাটিগুলো রাঙা-রাঙা।
কোথাও ধারে ধারে উঠে বেত,
কোথাও দু ধারে গমের খেত।

কোথাও ছোটোখাটো গ্রামখানি,
কোথাও মাথা তোলে রাজধানী—
সেথায় নবাবের বড়ো কোঠা,
তারি পাথরের থাম মোটা,
তারি ঘাটের সোপান যত
জলে নামিয়াছে শত শত।
কোথাও সাদা পাথরের পুলে
নদী বাঁধিয়াছে দুই কূলে।

কোথাও লোহার সাঁকোয় গাড়ি
চলে ধকো ধকো ডাক ছাড়ি।

নদী এইমতো অবশেষে
এল নরম মাটির দেশে।
হেথা যেথায় মোদের বাড়ি
নদী আসিল দুয়ারে তারি।
হেথায় নদী নালা বিল খালে
দেশ ঘিরেছে জলের জালে।
কত মেয়েরা নাহিছে ঘাটে,

কত ছেলেরা সাঁতার কাটে,
কত জেলেরা ফেলিছে জাল,
কত মাঝিরা ধরেছে হাল,
সুখে সারিগান গায় দাঁড়ি—
কত খেয়াতরী দেয় পাড়ি।।

কোথাও পুরাতন শিবালয়
তীরে সারি সারি জেগে রয়,
সেথায় দু-বেলা সকাল-সাঁঝে
পূজার কাঁসর ঘণ্টা বাজে।
কত জটাধারী ছাইমাখা
ঘাটে বসে আছে যেন আঁকা।
তীরে কোথাও বসেছে হাট,
নৌকো ভরিয়া রয়েছে ঘাট।

মাঠে কলাই সরিষা ধান,
তাহার কে করিবে পরিমাণ!
কোথাও নিবিড় আখের বনে
শালিখ চরিছে আপন-মনে।।

কোথাও ধুধূ করে বালুচর,
সেথায় গাঙশালিকের ঘর।

সেথায় কাছিম বালির তলে
আপন ডিম পেড়ে আসে চলে
সেথায় শীতকালে বুনো হাঁস
কত ঝাঁকে ঝাঁকে করে বাস।
সেথায় দলে দলে চখাচখী
করে সারাদিন বকাবকি।
সেথায় কাদাখোঁচা তীরে তীরে
কাদায় খোঁচা দিয়ে দিয়ে ফিরে
কোথাও ধানের খেতের ধারে
ঘন কলাবন বাঁশঝাড়ে

ঘন আম-কাঁঠালের বনে
গ্রাম দেখা যায় এক কোণে।

সেথা আছে ধান গোলা-ভরা
সেথা খড়গুলা রাশ-করা,
সেথা গোয়ালেতে গোরু বাঁধা
কত কালো পাটকিলে সাদা।
কোথাও কলুদের কুঁড়েখানি,
সেথায় ক্যাঁকোঁ ক'রে ঘোরে ঘানি
কোথাও কুমারের ঘরে চাক
দেয় সারাদিন ধ'রে পাক।
মুদি দোকানেতে সারা খন
ব'সে পড়িতেছে রামায়ণ।
কোথাও বসি পাঠশালা-ঘরে
যত ছেলেরা চেঁচিয়ে পড়ে,
বড়ো বেতখানি লয়ে কোলে
ঘুমে গুরুমহাশয় ঢোলে।
হোথায় এঁকেবেঁকে ভেঙেচুরে
গ্রামের পথ গেছে বহু দূরে।
সেথায় বোঝাই গোরুর গাড়ি
ধীরে চলিয়াছে ডাক ছাড়ি।
রোগা গ্রামের কুকুরগুলো
ক্ষুধায় শুঁকিয়া বেড়ায় ধুলো।।

যেদিন পুরনিমা রাতি আসে
চাঁদ আকাশ জুড়িয়া হাসে—
বনে ও পারে আঁধার কালো,
জলে ঝিকিমিকি করে আলো,
বালি চিকিচিকি করে চরে,
ছায়া ঝোপে বসি থাকে ডরে।
সবাই ঘুমায় কুটিরতলে,
তরী একটিও নাহি চলে।
গাছে পাতাটিও নাহি নড়ে,

জলে ঢেউ নাহি ওঠে পড়ে।
কভু ঘুম যদি যায় ছুটে
কোকিল কুহু কুহু গেয়ে উঠে,
কভু ও পারে চরের পাখি
রাতে স্বপনে উঠিছে ডাকি।।

নদী চলেছে ডাহিনে বামে,
কভু কোথাও সে নাহি থামে
হেথায় গহন গভীর বন—
তীরে নাহি লোক, নাহি জন।
শুধু কুমির নদীর ধারে
সুখে রোদ পোহাইছে পাড়ে।
বাঘ ফিরিতেছে ঝোপেঝাপে
ঘাড়ে পড়ে আসি এক লাফে।
কোথাও দেখা যায় চিতাবাঘ
তাহার গায়ে চাকা চাকা দাগ,
রাতে চুপি চুপি আসি ঘাটে
জল চকো চকো করি চাটে।

হেথায় যখন জোয়ার ছোটে
নদী ফুলিয়ে ফুলিয়ে ওঠে।
তখন কানায় কানায় জল—
কত ভেসে আসে ফুল ফল,
ঢেউ হেসে উঠে খলখল,
তরী করি উঠে টলমল।

নদী অজগরসম ফুলে
গিলে খেতে চায় দুই কূলে।
আবার ক্রমে আসে ভাঁটা প'ড়ে
তখন জল যায় সরে সরে,
তখন নদী রোগা হয়ে আসে,
কাদা দেখা দেয় দুই পাশে,

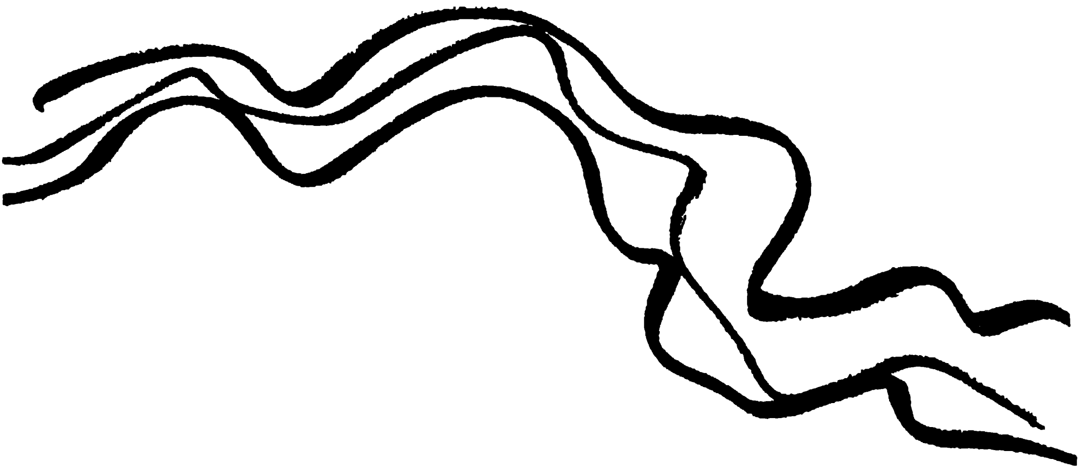
বেরোয় ঘাটের সোপান যত
যেন বুকের হাড়ের মতো।।

নদী চলে যায় যত দূরে
ততই জল উঠে পূরে পূরে।
শেষে দেখা নাহি যায় কূল,
চোখে দিক হয়ে যায় ভুল।
নীল হয়ে আসে জলধারা,
মুখে লাগে যেন নুন-পারা।
ক্রমে নীচে নাহি পাই তল,
ক্রমে আকাশে মিশায় জল,
ডাঙা কোন্‌খানে পড়ে রয়—
শুধু জলে জলে জলময়।।

ওরে একি শুনি কোলাহল,
হেরি একি ঘননীল জল।
ওই বুঝি রে সাগর হোথা—
উহার কিনারা কে জানে কোথা
ওই লাখো লাখো ঢেউ উঠে
সদাই মরিতেছে মাথা কুটে।
ওঠে সাদা সাদা ফেনা যত
যেন বিষম রাগের মতো।
জল গরজি গরজি ধায়,
যেন আকাশ কাড়িতে চায়।
বায়ু কোথা হতে আসে ছুটে,
ঢেউয়ে হাহা ক'রে পড়ে লুটে।
যেন পাঠশালা-ছাড়া ছেলে
ছুটে লাফায়ে বেড়ায় খেলে।
হেথা যত দূর-পানে চাই
কোথাও কিছু নাই কিছু নাই—
শুধু আকাশ বাতাস জল,
শুধুই কলকল কোলাহল,

শুধু ফেনা আর শুধু ঢেউ—
আর নাহি কিছু, নাহি কেউ।।

হেথায় ফুরাইল সব দেশ,
নদীর ভ্রমণ হইল শেষ।
হেথা সারা দিন সারা বেলা
তাহার ফুরাবে না আর খেলা।
তাহার সারা দিন নাচ গান
কভু হবে নাকো অবসান।
এখন কোথাও হবে না যেতে,
সাগর নিল তারে বুক পেতে।
তারে নীল বিছানায় থুয়ে
তাহার কাদামাটি দিবে ধুয়ে।
তারে ফেনার কাপড়ে ঢেকে,
তারে ঢেউয়ের দোলায় রেখে,
তার কানে কানে গেয়ে সুর
তার শ্রম করি দিবে দূর।
নদী চিরদিন চিরনিশি
রবে অতল আদরে মিশি।।



ছবি | *প্রণবেশ মাইতি*

শিশু

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা
অন্তহীন গগনতল
মাথার 'পরে অচঞ্চল,
ফেনিল ওই সুনীল জল
নাচিছে সারা বেলা।
উঠিছে তটে কী কোলাহল—
ছেলেরা করে মেলা।

বালুকা দিয়ে বাঁধিছে ঘর,
ঝিনুক নিয়ে খেলা।
বিপুল নীল সলিল-'পরি
ভাসায় তারা খেলার তরী
আপন হাতে হেলায় গড়ি
পাতায় গাঁথা ভেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে খেলা।।
জানে না তারা সাঁতার দেওয়া,
জানে না জাল ফেলা।
ডুবারি ডুবে মুকুতা চেয়ে,
বণিক ধায় তরণী বেয়ে—
ছেলেরা নুড়ি কুড়ায়ে পেয়ে
সাজায় বসি ঢেলা।
রতন ধন খোঁজে না তারা,
জানে না জাল ফেলা।
ফেনিয়ে উঠে সাগর হাসে,
হাসে সাগর-বেলা।

ভীষণ ঢেউ শিশুর কানে
রচিছে গাথা তরল তানে,
দোলনা ধরি যেমন গানে,
জননী দেয় ঠেলা।
সাগর খেলে শিশুর সাথে,
হাসে সাগর-বেলা।।

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
ঝঞ্ঝা ফিরে গগনতলে,
তরণী ডুবে সুদূর জলে,
মরণদূত উড়িয়া চলে—
ছেলেরা করে খেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
শিশুর মহামেলা।।

[আলমোড়া
৬ ভাদ্র ১৩১০]

জন্মকথা

খোকা মাকে শুধায় ডেকে—
'এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।'
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে—
ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।।
ছিলি আমার পুতুল-খেলায়,
প্রভাতে শিবপূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি।
তুই আমার ঠাকুরের সনে
ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি।।
আমার চিরকালের আশায়,
আমার সকল ভালোবাসায়,

আমার মায়ের দিদিমায়ের পরানে—
পুরানো এই মোদের ঘরে
গৃহদেবীর কোলের 'পরে
কত কাল যে লুকিয়ে ছিলি কে জানে।

যৌবনেতে যখন হিয়া
উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া
তুই ছিলি সৌরভের মতো মিলায়ে,
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে
জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে।।
সব দেবতার আদারের ধন
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী—
তুই জগতের স্বপ্ন হতে
এসেছিস আনন্দস্রোতে
নূতন হয়ে আমার বুকে বিলসি।।

নির্নিমেষে তোমায় হেরে
তোর রহস্য বুঝি নে রে,
সবার ছিলি আমার হলি কেমনে।
ওই দেহে এই দেহ চুমি
মায়ের খোকা হয়ে তুমি
মধুর হেসে দেখা দিলে ভুবনে।।
হারাই হারাই ভয়ে গো তাই
বুকে চেপে রাখতে যে চাই,
কেঁদে মরি একটু সরে দাঁড়ালে।
জানি নে কোন্ মায়ায় ফেঁদে
বিশ্বের ধন রাখব বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহু দুটির আড়ালে।।'

[আলমোড়া
৩২ শ্রাবণ ১৩১০]

খেলা

তোমার কটি-তটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া!
কোমল গায়ে দিল পরায়ে
রঙিন আঙিয়া!
বিহান বেলা আঙিনাতলে
এসেছ তুমি কী খেলাছলে,
চরণ দুটি চলিতে ছুটি
পড়িছে ভাঙিয়া।
তোমার কটি-তটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া।।

কিসের সুখে সহাস মুখে
নাচিছ বাছনি,
দুয়ার-পাশে জননী হাসে
হেরিয়া নাচনি।
তাথেই-থেই তালির সাথে
কাঁকন বাজে মায়ের হাতে,
রাখাল-বেশে ধরেছ হেসে
বেণুর পাঁচনি।
কিসের সুখে সহাস মুখে
নাচিছ বাছনি।।

ভিখারী ওরে, অমন ক'রে
শরম ভুলিয়া
মাগিস কিবা মায়ের গ্রীবা
আঁকড়ি ঝুলিয়া।
ওরে রে লোভী, ভুবনখানি
গগন হতে উপাড়ি আনি

ভরিয়া দুটি ললিত মুঠি
দিব কি তুলিয়া।
কী চাস ওরে, অমন ক'রে
শরম ভুলিয়া।।

নিখিল শোনে আকুল-মনে
নূপুর-বাজনা।
তপন শশী হেরিছে বসি
তোমার সাজনা।
ঘুমাও যবে মায়ের বুকে
আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে,
জাগিলে পরে প্রভাত করে
নয়ন-মাজনা।
নিখিল শোনে আকুল-মনে
নূপুর-বাজনা।।
ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি
নয়ন-ঢুলানী,
গায়ের 'পরে কোমল করে
পরশ-বুলানী।
মায়ের প্রাণে তোমারি লাগি
জগৎ-মাতা রয়েছে জাগি,
ভুবন-মাঝে নিয়ত রাজে
ভুবন-ভুলানী।
ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি
নয়ন-ঢুলানী।।

[আলমোড়া
৫ শ্রাবণ ১৩১০]

খোকা

খোকার চোখে যে ঘুম আসে
সকল তাপ-নাশা—
জান কি কেউ কোথা হতে যে
করে সে যাওয়া-আসা।
শুনেছি রূপকথার গাঁয়ে
জোনাকি-জ্বলা বনের ছায়ে
দুলিছে দুটি পারুল কুঁড়ি
তাহারি মাঝে বাসা—
সেখান হতে খোকার চোখে
করে সে যাওয়া-আসা

খোকার ঠোঁটে যে হাসিখানি
চমকে ঘুমঘোরে—
কোন্ দেশে যে জনম তার
কে কবে তাহা মোরে।
শুনেছি কোন্ শরৎ-মেঘে
শিশু-শশীর কিরণ লেগে
সে হাসিরুচি জনমি ছিল
শিশিরশুচি ভোরে—
খোকার ঠোঁটে যে হাসিখানি
চমকে ঘুমঘোরে।।

খোকার গায়ে মিলিয়ে আছে
যে কচি কোমলতা—
জান কি সে যে এতটা কাল
লুকিয়ে ছিল কোথা।

মা যবে ছিল কিশোরী মেয়ে
করুণ তারি পরান ছেয়ে
মাধুরীরূপে মুরছি ছিল,
কহে নি কোনো কথা—
খোকার গায়ে মিলিয়ে আছে
যে কচি কোমলতা।।

আশিস আসি পরশ করে
খোকারে ঘিরে ঘিরে—
জান কি কেহ কোথা হতে সে
বরষে তার শিরে।
ফাগুনে নব মলয়শ্বাসে,
শ্রাবণে নব নীপের বাসে,
আশিনে নব ধান্যদলে,
আষাঢ়ে নব নীরে—
আশিস আসি পরশ করে
খোকারে ঘিরে ঘিরে।।

এই-যে খোকা তরুণতনু
নতুন মেলে আঁখি—
ইহার ভার কে লবে আজি
তোমরা জান তা কি?
হিরণময়-কিরণ-ঝোলা
যাঁহার এই ভুবন-দোলা
তপন-শশী-তারার কোলে
দেবেন এরে রাখি—
এই-যে খোকা তরুণতনু
নতুন মেলে আঁখি।।

[আলমোড়া
শ্রাবণ ১৩১০]

ঘুমচোরা

কে নিল খোকার ঘুম হরিয়া।
মা তখন জল নিতে ও পাড়ার দিঘিটিতে
গিয়েছিল ঘট কাঁখে করিয়া।—
তখন রোদের বেলা সবাই ছেড়েছে খেলা,
ও পারে নীরব চখা-চখীরা,
শালিখ থেমেছে ঝোপে, শুধু পায়রার খোপে
বকাবকি করে সখা-সখীরা;
তখন রাখাল ছেলে পাঁচনি ধুলায়ফেলে
ঘুমিয়ে পড়েছে বটতলাতে।
বাঁশ-বাগানের ছায়ে এক মনে এক পায়ে
খাড়া হয়ে আছে বক জলাতে।
সেই ফাঁকে ঘুমচোর ঘরেতে পশিয়া মোর
ঘুম নিয়ে উড়ে গেল গগনে—
মা এসে অবাক রয়, দেখে খোকা ঘর-ময়
হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে সঘনে।

আমার খোকার ঘুম নিল কে।
যেথা পাই সেই চোরে বাঁধিয়া আনিব ধরে,
সে লোক লুকাবে কোথা ত্রিলোকে।
যাব সে গুহার ছায়ে কালো পাথরের গায়ে
কুলু কুলু বহে যেথা ঝরনা।
যাব সে বকুলবনে নিরিবিলি যে বিজনে
ঘুঘুরা করিছে ঘর-করনা।
যেখানে সে বুড়া বট নামায়ে দিয়েছে জট,
ঝিল্লি ডাকিছে দিনে দুপুরে,

যেখানে বনের কাছে বনদেবতারা নাচে
চাঁদিনিতে রুনুঝুনু নূপুরে,
যাব আমি ভরা সাঁঝে সেই বেণুবনমাঝে
আলো যেথা রোজ জ্বালে জোনাকি—
শুধাব মিনতি করে, 'আমাদের ঘুমচোরে
তোমাদের আছে জানা-শোনা কি?'

কে নিল খোকার ঘুম চুরায়ে।
কোনোমতে দেখা তার পাই যদি একবার
লই তবে সাধ মোর পুরায়ে।
দেখি তার বাসা খুঁজি কোথা ঘুম করে পুঁজি
চোরা ধন রাখে কোন্ আড়ালে।
সব লুটি লব তার, ভাবিতে হবে না আর
খোকার চোখের ঘুম হারালে।
ডানা দুটি বেঁধে তারে নিয়ে যাব নদীপারে,
সেখানে সে ব'সে এক কোণেতে
জলে শরকাঠি ফেলে মিছে মাছ-ধরা খেলে
দিন কাটাইবে কাশবনেতে
যখন সাঁঝের বেলা ভাঙিবে হাটের মেলা,
ছেলেরা মায়ের কোল ভরিবে,
সারা রাত টিটি-পাখি টিট্‌কারি দিবে ডাকি—
'ঘুমচোরা, কার ঘুম হরিবে।'

অপযশ

বাছা রে, তোর চক্ষে কেন জল
কে তোরে যে কী বলেছে
আমায় খুলে বল্।
লিখতে গিয়ে হাতে মুখে
মেখেছ সব কালি,

নোংরা ব'লে তাই দিয়েছে গালি?
ছি ছি, উচিত এ কি।
পূর্ণশশী মাখে মসী
নোংরা বলুক দেখি।।

বাছা রে, তোর সবাই ধরে দোষ।
আমি দেখি সকল-তাতে
এদের অসন্তোষ।
খেলতে গিয়ে কাপড়খানা
ছিঁড়েখুঁড়ে এলে
তাই কি বলে লক্ষ্মীছাড়া ছেলে?
ছি ছি, কেমন ধারা?
ছেঁড়া মেঘে প্রভাত হাসে,
সে কি লক্ষ্মীছাড়া।।

কান দিয়ো না তোমায় কে কী বলে।
তোমার নামে অপবাদ যে
ক্রমেই বেড়ে চলে।
মিষ্টি তুমি ভালোবাস,
তাই কি ঘরে পরে
লোভী ব'লে তোমার নিন্দে করে!
ছি ছি, হবে কী।
তোমায় যারা ভালোবাসে
তারা তবে কী।।

বিচার

আমার খোকার কত যে দোষ
সে-সব আমি জানি,
লোকের কাছে মানি বা নাই মানি
দুষ্টামি তার পারি কিম্বা
নারি থামাতে,

ভালোমন্দ বোঝাপড়া
তাতে আমাতে।
বাহির হতে তুমি তারে
যেম্‌নি কর দুষী
যত তোমার খুশি,
সে বিচারে আমার কী বা হয়।
খোকা ব'লেই ভালোবাসি,
ভালো ব'লেই নয়।।

খোকা আমার কতখানি
সে কি তোমরা বোঝ।
তোমরা শুধু দোষ গুণ তার খোঁজ।
আমি তারে শাসন করি
বুকেতে বেঁধে,
আমি তারে কাঁদাই যে গো
আপনি কেঁদে।
বিচার করি, শাসন করি,
করি তারে দুষী,
আমার যাহা খুশি।
তোমার শাসন আমরা মানি নে গো।
শাসন করা তারেই সাজে
সোহাগ করে যে গো।।

চাতুরী

আমার খোকা করে গো যদি মনে
এখনি উড়ে পারে যে যেতে
পারিজাতের বনে।
যায় না সে কি সাধে।
মায়ের বুকে মাথাটি থুয়ে
সে ভালোবাসে থাকিতে শুয়ে

মায়ের মুখ না দেখে যদি
পরান তার কাঁদে।।

আমার খোকা সকল কথা জানে।
কিন্তু তার এমন ভাষা
কে বোঝে তার মানে।
মৌন থাকে সাধে?
মায়ের মুখে মায়ের কথা
শিখিতে তার কী আকুলতা,
তাকায় তাই বোবার মতো
মায়ের মুখচাঁদে।।

খোকার ছিল রতনমণি কত—
তবু সে এল কোলের 'পরে
ভিখারীটির মতো।
এমন দশা সাধে?
দীনের মতো করিয়া ভান
কাড়িতে চাহে মায়ের প্রাণ,
তাই সে এল বসনহীন
সন্ন্যাসীর ছাঁদে।।

খোকা যে ছিল বাঁধন-বাধা-হারা—
যেখানে জাগে নূতন চাঁদ,
ঘুমায় শুকতারা।
ধরা সে দিল সাধে?
অমিয়মাখা কোমল বুকে
হারাতে চায় অসীম সুখে,
মুকতি চেয়ে বাঁধন মিঠা
মায়ের মায়াফাঁদে।।

আমার খোকা কাঁদিতে জানিত না;
হাসির দেশে করিত শুধু

সুখের আলোচনা।
কাঁদিতে চাহে সাধে?
মধুমুখের হাসিটি দিয়া
টানে সে বটে মায়ের হিয়া,
কান্না দিয়ে ব্যথার ফাঁসে
দ্বিগুণ বলে বাঁধে।।

[আলমোড়া
৭ শ্রাবণ ১৩১০]

নির্লিপ্ত

বাছা রে মোর বাছা,
ধূলির 'পরে হরষভরে
লইয়া তৃণগাছা
আপন-মনে খেলিছ কোণে,
কাটিছে সারা বেলা।
হাসি গো দেখে এ ধূলি মেখে
এ তৃণ লয়ে খেলা।।

আমি যে কাজে রত,
লইয়া খাতা ঘুরাই মাথা
হিসাব কষি কত,
আঁকের সারি হতেছে ভারী,
কাটিয়া যায় বেলা—
ভাবিছ দেখি, মিথ্যা একি
সময় নিয়ে খেলা।।

বাছা রে মোর বাছা,
খেলিতে ধূলি গিয়েছি ভুলি
লইয়ে তৃণগাছা।

কোথায় গেলে খেলেনা মেলে
ভাবিয়া কাটে বেলা,
বেড়াই খুঁজি করিতে পুঁজি
সোনারুপার ঢেলা।।

যা পাও চারি দিকে
তাহাই ধরি তুলিছ গড়ি
মনের সুখটিকে।

না পাই যারে চাহিয়া তারে
আমার কাটে বেলা,
আশাতীতেরই আশায় ফিরি
ভাসাই মোর ভেলা।।

কেন মধুর

রঙিন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে
তখন বুঝি রে বাছা, কেন যে প্রাতে
এত রঙ খেলে মেঘে, জলে রঙ ওঠে জেগে,
কেন এত রঙ লেগে ফুলের পাতে—
রাঙা খেলা দেখি যবে ও রাঙা হাতে।।

গান গেয়ে তোরে আমি নাচাই যবে
আপন হৃদয়-মাঝে বুঝি রে তবে
পাতায় পাতায় বনে ধ্বনি এত কী কারণে,
ঢেউ বহে নিজ মনে তরলরবে—
বুঝি তা তোমারে গান শুনাই যবে।।

যখন নবনী দিই লোলুপ করে,
হাতে মুখে মেখেচুকে বেড়াও ঘরে,

তখন বুঝিতে পারি স্বাদু কেন নদীবারি,
ফল মধুরসে ভারী কিসের তরে—
যখন নবনী দিই লোলুপ করে।।

যখন চুমিয়ে তোর বদনখানি
হাসিটি ফুটায়ে তুলি তখনি জানি
আকাশ কিসের সুখে আলো দেয় মোর মুখে,
বায়ু দিয়ে যায় বুকে অমৃত আনি—
বুঝি তা চুমিলে তোর বদনখানি।।

খোকার রাজ্য

খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে
আমি যদি পারি বাসা নিতে
তবে আমি একবার
জগতের পানে তার
চেয়ে দেখি বসি সে নিভৃতে।

তার রবি শশী তারা
জানি নে কেমনধারা
সভা করে আকাশের তলে,
আমার খোকার সাথে
গোপনে দিবসে রাতে
শুনেছি তাদের কথা চলে।

শুনেছি আকাশ তারে
নামিয়া মাঠের পারে
লোভায় রঙিন ধনু হাতে,
আসি শালবন-'পরে

মেঘেরা মন্ত্রণা করে
খেলা করিবারে তার সাথে।

যারা আমাদের কাছে
নীরব গম্ভীর আছে,
আশার অতীত যারা সবে,
খোকারে তাহারা এসে
ধরা দিতে চায় হেসে
কত রঙে কত কলরবে।।

খোকার মনের ঠিক মাঝখান ঘেঁষে
যে পথ গিয়েছে সৃষ্টিশেষে
সকল উদ্দেশ-হারা
সকল ভূগোল-ছাড়া
অপরূপ অসম্ভব দেশে—

যেথা আসে রাত্রিদিন
সর্ব-ইতিহাস-হীন
রাজার রাজত্ব হতে হাওয়া,
তারি যদি এক ধারে
পাই আমি বসিবারে,
দেখি কারা করে আসা-যাওয়া।

তাহারা অদ্ভুত লোক,
নাই কারো দুঃখ শোক,
নেই তারা কোনো কর্মে কাজে,

চলিয়াছে চিরদিন
খোকাদের গল্পলোক-মাঝে।।

সেথা ফুল গাছপালা
নাগকন্যা রাজবালা

মানুষ রাক্ষস পশু পাখি
যাহা খুশি তাই করে,
সত্যেরে কিছু না ডরে,
সংশয়েরে দিয়ে যায় ফাঁকি।

ভিতরে ও বাহিরে

খোকা থাকে জগৎ-মায়ের
অন্তঃপুরে—
তাই সে শোনে কত যে গান
কতই সুরে।
নানান রঙে রাঙিয়ে দিয়ে
আকাশ পাতাল
মা রচেছেন খোকার খেলা-
ঘরের চাতাল।
তিনি হাসেন, যখন তরু-
লতার দলে
খোকার কাছে পাতা নেড়ে
প্রলাপ বলে।
সকল নিয়ম উড়িয়ে দিয়ে
সূর্য শশী
খোকার সাথে হাসে, যেন
এক-বয়সী।
সত্যবুড়ো নানা রঙের
মুখোশ প'রে
শিশুর সনে শিশুর মতো
গল্প করে।
চরাচরের সকল কর্ম
ক'রে হেলা

মা যে আসেন খোকার সঙ্গে
করতে খেলা।
খোকার জন্যে করেন সৃষ্টি
যা ইচ্ছে তাই—
কোনো নিয়ম কোনো বাধা-
বিপত্তি নাই।
বোবাদেরও কথা বলান
খোকার কানে,
অসাড়কেও জাগিয়ে তোলেন
চেতন প্রাণে।
খোকার তরে গল্প রচে
বর্ষা শরৎ,
খেলার গৃহ হয়ে ওঠে
বিশ্বজগৎ।
খোকা তারি মাঝখানেতে
বেড়ায় ঘুরে,
খোকা থাকে জগৎ-মায়ের
অন্তঃপুরে।।

আমরা থাকি জগৎ-পিতার
বিদ্যালয়ে—
উঠেছে ঘর পাথর-গাঁথা
দেয়াল লয়ে।
জ্যোতিষশাস্ত্র-মতে চলে
সূর্য শশী
নিয়ম থাকে বাগিয়ে লয়ে
রশারশি।
এম্‌নি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে
বৃক্ষ লতা
যেন তারা বোঝেই নাকো
কোনোই কথা।
চাঁপার ডালে চাঁপা ফোটে
এম্‌নি ভানে

যেন তারা সাত ভায়েরে
কেউ না জানে।
মেঘেরা চায় এম্‌নিতরো
অবোধ ভাবে
যেন তারা জানেই নাকো
কোথায় যাবে।
ভাঙা পুতুল গড়ায় ভুঁয়ে
সকল বেলা,
যেন তারা কেবল শুধু
মাটির ঢেলা।
দিঘি থাকে নীরব হয়ে
দিবারাত্র,
নাগকন্যের কথা যেন
গল্পমাত্র।
সুখদুঃখ এম্‌নি বুকে
চেপে রহে
যেন তারা কিছুমাত্র
গল্প নহে।
যেমন আছে তেম্‌নি থাকে
যে যাহা তাই,
আর যে কিছু হবে এমন
ক্ষমতা নাই।
বিশ্বগুরুমশায় থাকেন
কঠিন হয়ে,
আমরা থাকি জগৎ-পিতার
বিদ্যালয়ে।।

প্রশ্ন

মা গো, আমায় ছুটি দিতে বল্,
সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা।
এখন আমি তোমার ঘরে ব'সে

করব শুধু পড়া-পড়া খেলা।
তুমি বলছ দুপুর এখন সবে,
না-হয় যেন সত্যি হল তাই।
একদিনও কি দুপুরবেলা হলে
বিকেল হল মনে করতে নাই?
আমি তো বেশ ভাবতে পারি মনে—
সুয্যি ডুবে গেছে মাঠের শেষে,
বাগ্‌দি-বুড়ি চুব্‌ড়ি ভরে নিয়ে
শাক তুলেছে পুকুর-ধারে এসে।
আঁধার হল মাদার-গাছের তলা,
কালি হয়ে এল দিঘির জল,
হাটের থেকে সবাই এল ফিরে,
মাঠের থেকে এল চাষীর দল।
মনে কর্‌-না উঠল সাঁঝের তারা,
মনে কর্‌-না সন্ধে হল যেন।
রাতের বেলা দুপুর যদি হয়
দুপুর বেলা রাত হবে না কেন।

সমব্যথী

যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম কুকুর-ছানা
তবে পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিতে যাই ভাতে
তুমি করতে আমায় মানা?
সত্যি করে বল্‌,
আমায় করিস নে মা, ছল—
বলতে আমায় 'দূর দূর দূর!
কোথা থেকে এল এই কুকুর'?
যা মা, তবে যা মা,
আমায় কোলের থেকে নামা।

আমি খাব না তোর হাতে,
আমি খাব না তোর পাতে।।
যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম তোমায় টিয়ে
তবে পাছে যাই, মা, উড়ে
আমায় রাখতে শিকল দিয়ে?
সত্যি ক'রে বল্,
আমায় করিস নে মা, ছল—
বলতে আমায় 'হতভাগা পাখি,
শিকল কেটে দিতে চায় রে ফাঁকি'?
তবে নামিয়ে দে মা,
আমায় ভালোবাসিস নে মা।
আমি রব না তোর কোলে,
আমি বনেই যাব চলে।।

বিচিত্র সাধ

আমি যখন পাঠশালাতে যাই
আমাদের এই বাড়ির গলি দিয়ে,
দশটা বেলায় রোজ দেখতে পাই
ফেরিওলা যাচ্ছে ফেরি নিয়ে।
'চুড়ি চা—ই, চুড়ি চাই' সে হাঁকে,
চীনের পুতুল ঝুড়িতে তার থাকে,
যায় সে চলে যে পথে তার খুশি,
যখন খুশি খায় সে বাড়ি গিয়ে।
দশটা বাজে, সাড়ে দশটা বাজে.
নাইকো তাড়া হয় বা পাছে দেরি।
ইচ্ছে করে সেলেট ফেলে দিয়ে
অম্‌নি করে বেড়াই নিয়ে ফেরি।।

আমি যখন হাতে মেখে কালি
ঘরে ফিরি, সাড়ে চারটে বাজে,

কোদাল নিয়ে মাটি কোপায় মালী
বাবুদের ওই ফুল-বাগানের মাঝে।
কেউ তো তারে মানা নাহি করে
কোদাল পাছে পড়ে পায়ের 'পরে।
গায়ে মাথায় লাগছে কত ধুলো,
কেউ তো এসে বকে না তার কাজে।
মা তারে তো পরায় না সাফ জামা,
ধুয়ে দিতে চায় না ধুলোবালি।
ইচ্ছে করে, আমি হতেম যদি
বাবুদের ওই ফুল-বাগানের মালী।।

একটু বেশি রাত না হতে হতে
মা আমারে ঘুম পাড়াতে চায়,
জানলা দিয়ে দেখি চেয়ে পথে
পাগড়ি প'রে পাহারওলা যায়।
আঁধার গলি, লোক বেশি না চলে,
গ্যাসের আলো মিট্‌মিটিয়ে জ্বলে,
লণ্ঠনটি ঝুলিয়ে নিয়ে হাতে
দাঁড়িয়ে থাকে বাড়ির দরোজায়।
রাত হয়ে যায় দশটা-এগারোটা,
কেউ তো কিছু বলে না তার লাগি।
ইচ্ছে করে পাহারওলা হয়ে
গলির ধারে আপন মনে জাগি।।

মাস্টার-বাবু

আমি আজ কানাই মাস্টার,
পোড়ো মোর বেড়াল-ছানাটি।
আমি ওকে মারি নে মা বেত,
মিছিমিছি বসি নিয়ে কাঠি।

রোজ রোজ দেরি করে আসে,
পড়াতে দেয় না ও তো মন,
ডান পা তুলিয়ে তোলে হাই
যত আমি বলি 'শোন্ শোন্'।
দিনরাত খেলা খেলা খেলা,
লেখায় পড়ায় ভারি হেলা।
আমি বলি 'চ ছ জ ঝ ঞ',
ও কেবল বলে 'মিয়োঁ মিয়োঁ'।।

প্রথম ভাগের পাতা খুলে
আমি ওরে বোঝাই মা, কত—
চুরি করে খাস নে কখনো,
ভালো হোস গোপালের মতো।
যত বলি সব হয় মিছে,
কথা যদি একটিও শোনে—
মাছ যদি দেখেছে কোথাও
কিছুই থাকে না আর মনে।
চড়াই পাখির দেখা পেলে
ছুটে যায় সব পড়া ফেলে।
যত বলি 'চ ছ জ ঝ ঞ',
দুষ্টুমি করে বলে 'মিয়োঁ'।।

আমি ওরে বলি বার বার,
'পড়ার সময় তুমি পোড়ো,
তার পরে ছুটি হয়ে গেলে
খেলার সময় খেলা কোরো।'
ভালোমানুষের মতো থাকে,
আড়ে আড়ে চায় মুখপানে,
এম্‌নি সে ভান করে যেন
যা বলি বুঝেছে তার মানে।
একটু সুযোগ বোঝে যেই
কোথা যায় আর দেখা নেই।

আমি বলি 'চ ছ জ ঝ ঞ',
ও কেবল বলে 'মিয়োঁ মিয়োঁ'

[আলমোড়া
১৬ শ্রাবণ ১৩১০]

বিজ্ঞ

খুকি তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা,
খুকি তোমার ভারি ছেলেমানুষ।
ও ভেবেছে তারা উঠছে বুঝি
আমরা যখন উড়িয়েছিলেম ফানুস।

আমি যখন খাওয়া-খাওয়া খেলি
খেলার থালে সাজিয়ে নিয়ে নুড়ি,
ও ভাবে বা সত্যি খেতে হবে—
মুঠো ক'রে মুখে দেয় মা, পুরি'।

সাম্‌নেতে ওর শিশুশিক্ষা খুলে
যদি বলি 'খুকি, পড়া করো'
দু হাত দিয়ে পাতা ছিঁড়তে বসে—
তোমার খুকির পড়া কেমনতরো
আমি যদি মুখে কাপড় দিয়ে
আস্তে আস্তে আসি গুড়িগুড়ি
তোমার খুকি অম্‌নি কেঁদে ওঠে,
ও ভাবে বা এল জুজুবুড়ি।

আমি যদি রাগ ক'রে কখনো
মাথা নেড়ে চোখ রাঙিয়ে বকি
তোমার খুকি খিল্‌খিলিয়ে হাসে।
খেলা করছি মনে করে ও কি?

সবাই জানে বাবা বিদেশ গেছে,
তবু যদি বলি 'আসছে বাবা'
তাড়াতাড়ি চার দিকেতে চায়,
তোমার খুকি এম্‌নি বোকা হাবা

ধোবা এলে পড়াই যখন আমি
টেনে নিয়ে তাদের বাচ্ছা গাধা
আমি বলি 'আমি গুরুমশাই',
ও আমাকে চেঁচিয়ে ডাকে 'দাদা'।

তোমার খুকি চাঁদ ধরতে চায়,
গণেশকে ও বলে যে মা, গানুশ।
তোমার খুকি কিচ্ছু বোঝে না মা,
তোমার খুকি ভারি ছেলেমানুষ।

[আলমোড়া
১৮ শ্রাবণ ১৩১০]

ব্যাকুল

অমন করে আছিস কেন মা গো,
খোকারে তোর কোলে নিবি না গো?
পা ছড়িয়ে ঘরের কোণে
কী যে ভাবিস আপন-মনে,
এখনো তোর হয় নি তো চুল বাঁধা।



বৃষ্টিতে যায় মাথা ভিজে,
জানলা খুলে দেখিস কী যে,
কাপড়ে যে লাগবে ধুলোকাদা।।
ওই তো গেল চারটে বেজে
ছুটি হল ইস্কুলে যে—
দাদা আসবে মনে নেইকো সিটি!
বেলা অম্‌নি গেল বয়ে,
কেন আছিস অমন হয়ে—
আজকে বুঝি পাস নি বাবার চিঠি?
পেয়াদাটা ঝুলির থেকে
সবার চিঠি গেল রেখে—
বাবার চিঠি রোজ কেন সে দেয় না?
পড়বে বলে আপনি রাখে,
যায় সে চলে ঝুলি কাঁখে—
পেয়াদাটা ভারি দুষ্টু স্যায়না।।
মা গো মা, তুই আমার কথা শোন—
ভাবিস নে, মা, অমন সারা ক্ষণ।
কালকে যখন হাটের বারে
বাজার করতে যাবে পারে
কাগজ কলম আনতে বলিস ঝিকে।
দেখো ভুল করব না কোনো,
ক খ থেকে মূর্ধন্য ণ
বাবার চিঠি আমিই দেব লিখে।।
কেন মা, তুই হাসিস কেন।
বাবার মতো আমি যেন
অমন ভালো লিখতে পারি নেকো?
লাইন কেটে মোটা মোটা
বড়ো বড়ো গোটা গোটা
লিখব যখন তখন তুমি দেখো।
চিঠি লেখা হলে পরে
বাবার মতো বুদ্ধি ক'রে
ভাবছ দেব ঝুলির মধ্যে ফেলে?

কক্‌খনো না, আপনি নিয়ে
যাব তোমায় পড়িয়ে দিয়ে—
ভালো চিঠি দেয় না ওরা পেলে।

[আলমোড়া
২৩ শ্রাবণ ১৩১০]

ছোটোবড়ো

এখনো তো বড়ো হই নি আমি,
ছোটো আছি ছেলেমানুষ ব'লে।
দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হব
বড়ো হয়ে বাবার মতো হলে।
দাদা তখন পড়তে যদি না চায়,
পাখির ছানা পোষে কেবল খাঁচায়,
তখন তারে এম্‌নি বকে দেব!
বলব, 'তুমি চুপটি ক'রে পড়ো।'
বলব, 'তুমি ভারি দুষ্টু ছেলে'—
যখন হব বাবার মতো বড়ো।
তখন নিয়ে দাদার খাঁচাখানা
ভালো ভালো পুষব পাখির ছানা।
সাড়ে দশটা যখন যাবে বেজে
নাবার জন্যে করব না তো তাড়া।
ছাতা একটা ঘাড়ে ক'রে নিয়ে
চটি পায়ে বেড়িয়ে আসব পাড়া।
গুরুমশায় দাওয়ায় এলে পরে
চৌকি এনে দিতে বলব ঘরে;

তিনি যদি বলেন, 'সেলেট কোথা—
দেরি হচ্ছে, বসে পড়া করো'
আমি বলব, 'খোকা তো আর নেই,
হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো।'
গুরুমশায় শুনে তখন কবে,
'বাবুমশায়, আসি এখন তবে।'
খেলা করতে নিয়ে যেতে মাঠে
ভুলু যখন আসবে বিকেল বেলা
আমি তাকে ধমক দিয়ে কব,
'কাজ করছি, গোল কোরো না মেলা।'
রথের দিনে খুব যদি ভিড় হয়
একলা যাব, করব না তো ভয়;
মামা যদি বলেন ছুটে এসে
'হারিয়ে যাবে, আমার কোলে চড়ো'
বলব আমি, 'দেখছ না কি মামা,
হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো।'
দেখে দেখে মামা বলবে, 'তাই তো,
খোকা আমার সে খোকা আর নাই তো।'

আমি যেদিন প্রথম বড়ো হব
মা সেদিনে গঙ্গাস্নানের পরে
আসবে যখন খিড়কি-দুয়োর দিয়ে
ভাববে, 'কেন গোল শুনি নে ঘরে।'
তখন আমি চাবি খুলতে শিখে
যত ইচ্ছে টাকা দিচ্ছি ঝিকে,
মা দেখে তাই বলবে তাড়াতাড়ি,
'খোকা, তোমার খেলা কেমনতরো!'
আমি বলব, 'মাইনে দিচ্ছি আমি,
হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো।
ফুরোয় যদি টাকা, ফুরোয় খাবার,
যত চাই মা, এনে দেব আবার।'

আশ্বিনেতে পুজোর ছুটি হবে,
মেলা বসবে গাজনতলার হাটে,
বাবার নৌকো কত দূরের থেকে
লাগবে এসে বাবুগঞ্জের ঘাটে।
বাবা মনে ভাববে সোজাসুজি
খোকা তেমনি খোকাই আছে বুঝি—
ছোটো ছোটো রঙিন জামা জুতো
কিনে এনে বলবে আমায় 'পরো'।
আমি বলব, 'দাদা পরুক এসে,
আমি এখন তোমার মতো বড়ো।
দেখছ না কি যে ছোটো মাপ জামার
পরতে গেলে আঁট হবে যে আমার।'

[আলমোড়া
২৮ শ্রাবণ ১৩১০]

সমালোচক

বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে
কিছুই বোঝা যায় না লেখেন কী যে!
সেদিন পড়ে শোনাচ্ছিলেন তোরে,
বুঝেছিলি?—বল্ মা, সত্যি ক'রে।
এমন লেখায় তবে
বল্ দেখি কী হবে।।
তোর মুখে মা যেমন কথা শুনি
তেমন কেন লেখেন নাকো উনি
ঠাকুরমা কি বাবাকে কক্খনো
রাজার কথা শোনায় নিকো কোনো?

সে-সব কথাগুলি
গেছেন বুঝি ভুলি?

স্নান করতে বেলা হল দেখে
তুমি কেবল যাও মা, ডেকে ডেকে—
খাবার নিয়ে তুমি বসেই থাকো,
সে কথা তাঁর মনেই থাকে নাকো।
করেন সারা বেলা
লেখা-লেখা খেলা।।
বাবার ঘরে আমি খেলতে গেলে
তুমি আমায় বল 'দুষ্টু ছেলে'!
বকো আমায় গোল করলে পরে,
'দেখছিস নে লিখছে বাবা ঘরে!'
বল্‌ তো, সত্যি বল্‌,
লিখে কী হয় ফল।।

আমি যখন বাবার খাতা টেনে
লিখি বসে দোয়াত কলম এনে—
ক খ গ ঘ ঙ হ্‌ য ব র,
আমার বেলা কেন মা, রাগ কর!
বাবা যখন লেখে
কথা কও না দেখে।।
বড়ো বড়ো রুল-কাটা কাগজ
নষ্ট বাবা করেন না কি রোজ?
আমি যদি নৌকো করতে চাই
অম্‌নি বল 'নষ্ট করতে নাই'
সাদা কাগজ কালো
করলে বুঝি ভালো?

বীরপুরুষ

মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চ'ড়ে
দরজাদুটো একটুকু ফাঁক ক'রে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে।।
সন্ধে হল, সূর্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়াদিঘির মাঠে।
ধূ ধূ করে যে দিক-পানে চাই,
কোনোখানে জনমানব নাই—
তুমি যেন আপন মনে তাই
ভয় পেয়েছ; ভাবছ, 'এলেম কোথা!'
আমি বলছি, 'ভয় কোরো না মা গো,
ওই দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা।'

চোর-কাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে,
মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে।
গোরু বাছুর নেইকো কোনোখানে,
সন্ধে হতেই গেছে গাঁয়ের পানে—
আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে,
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।
তুমি যেন বললে আমায় ডেকে,
'দিঘির ধারে ওই যে কিসের আলো!'

এমন সময় 'হাঁরে রে-রে-রে-রে'
ওই যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে।
তুমি ভয়ে পালকিতে এক কোণে
ঠাকুর দেব্‌তা স্মরণ করছ মনে,
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পালকি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো।
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে,
'আমি আছি, ভয় কেন মা করো!'

হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল,
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল।
আমি বলি, 'দাঁড়া, খবরদার!
এক পা কাছে আসিস যদি আর—
এই চেয়ে দেখ্‌ আমার তলোয়ার,
টুকরো করে দেব তোদের সেরে।'
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠল, 'হাঁরে রে-রে রে-রে'।।

তুমি বললে, 'যাস নে খোকা ওরে।'
আমি বলি, 'দেখো-না চুপ ক'রে।'
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদর মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে—
কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।।

এত লোকের সঙ্গে লড়াই ক'রে
ভাবছ খোকা গেলই বুঝি ম'রে।
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বলছি এসে 'লড়াই গেছে থেমে।'
তুমি শুনে পালকি থেকে নেমে

চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে—
বলছ, 'ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল!
কী দুর্দশাই হত তা না হলে।'
রোজ কত কী ঘটে যাহা-তাহা—
এমন কেন সত্যি হয় না আহা।
ঠিক যেন এক গল্প হত তবে,
শুনত যারা অবাক হত সবে—
দাদা বলত, 'কেমন ক'রে হবে,
খোকার গায়ে এত কি জোর আছে।'
পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে,
'ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে।'

রাজার বাড়ি

আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সে তো!
সে বাড়ি কি থাকত যদি লোকে জানতে পেত।
রুপো দিয়ে দেয়াল গাঁথা, সোনা দিয়ে ছাত,
থাকে থাকে সিঁড়ি ওঠে সাদা হাতির দাঁত।
সাত-মহলা কোঠায় সেথা থাকেন সুয়োরানী,
সাত রাজার ধন মানিক-গাঁথা গলার মালাখানি।
আমার রাজার বাড়ি কোথায় শোন্ মা, কানে কানে—
ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে যেইখানে।।

রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা সাত সাগরের পারে,
আমি ছাড়া আর কেহ তো পায় না খুঁজে তারে।
দু হাতে তার কাঁকন দুটি, দুই কানে দুই দুল,
খাটের থেকে মাটির 'পরে লুটিয়ে পড়ে চুল।
ঘুম ভেঙে তার যাবে যখন সোনার কাঠি ছুঁয়ে

হাসিতে তার মানিকগুলি পড়বে ঝ'রে ভুঁয়ে।
রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা শোন্ মা, কানে কানে—
ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে যেইখানে।।
তোমরা যখন ঘাটে চলো স্নানের বেলা হলে
আমি তখন চুপি চুপি যাই সে ছাদে চলে।
পাঁচিল বেয়ে ছায়াখানি পড়ে মা, যেই কোণে
সেইখানেতে পা ছড়িয়ে বসি আপন-মনে।
সঙ্গে শুধু নিয়ে আসি মিনি বেড়ালটাকে,
সেও জানে নাপিত ভায়া কোন্‌খানেতে থাকে।
জানিস নাপিতপাড়া কোথায়? শোন্ মা, কানে কানে—
ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে যেইখানে।।

মাঝি

আমার যেতে ইচ্ছে করে
নদীটির ওই পারে—
যেথায় ধারে ধারে
বাঁশের খোঁটায় ডিঙি নৌকো
বাঁধা সারে সারে।
কৃষাণেরা পার হয়ে যায়
লাঙল কাঁধে ফেলে,
জাল টেনে নেয় জেলে,
গোরু মহিষ সাঁৎরে নিয়ে
যায় রাখালের ছেলে।
সন্ধে হলে যেখান থেকে
সবাই ফেরে ঘরে,
শুধু রাতদুপরে
শেয়ালগুলো ডেকে ওঠে
ঝাউডাঙাটার 'পরে।

মা, যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।।
শুনেছি ওর ভিতর দিকে
আছে জলার মতো।
বর্ষা হলে গত
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে সেথায়
চখাচখী যত।
তারি ধারে ঘন হয়ে
জন্মেছে সব শর,
মানিক-জোড়ের ঘর,
কাদাখোঁচা পায়ের চিহ্ন
আঁকে পাঁকের 'পর।
সন্ধ্যা হলে কত দিন মা,
দাঁড়িয়ে ছাদের কোণে
দেখেছি একমনে—
চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ে
সাদা কাশের বনে।
মা, যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।।

এ-পার ও-পার দুই পারেতেই
যাব নৌকো বেয়ে।
যত ছেলেমেয়ে
স্নানের ঘাটে থেকে আমায়
দেখবে চেয়ে চেয়ে।
সূর্য যখন উঠবে মাথায়,
অনেক বেলা হলে,
আসব তখন চলে
'বড়ো খিদে পেয়েছে গো
খেতে দাও মা' বলে।

আবার আমি আসব ফিরে
আঁধার হলে সাঁঝে
তোমার ঘরের মাঝে
বাবার মতো যাব না মা,
বিদেশে কোন্ কাজে।
মা, যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।।

[আলমোড়া
১৫ শ্রাবণ ১৩১০]

নৌকাযাত্রা

মধু মাঝির ওই যে নৌকোখানা
বাঁধা আছে রাজগঞ্জের ঘাটে—
কারো কোনো কাজে লাগছে না তো,
বোঝাই করা আছে কেবল পাটে।
আমায় যদি দেয় তারা নৌকাটি
আমি তবে একশোটা দাঁড় আঁটি,
পাল তুলে দিই চারটে পাঁচটা ছটা—
মিথ্যে ঘুরে বেড়াই নাকো হাটে,
আমি কেবল যাই একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।।

তখন তুমি কেঁদো না মা, যেন
ব'সে ব'সে একলা ঘরের কোণে
আমি তো মা, যাচ্ছি নেকো চ'লে
রামের মতো চোদ্দ বছর বনে।

আমি যাব রাজপুত্তুর হয়ে
নৌকো-ভরা সোনা মানিক বয়ে,
আশুকে আর শ্যামকে নেব সাথে—
আমরা শুধু যাব মা তিন জনে।
আমি কেবল যাব একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।।

ভোরের বেলা দেব নৌকো ছেড়ে,
দেখতে দেখতে কোথায় যাব ভেসে
দুপুরবেলা তুমি পুকুর-ঘাটে,
আমরা তখন নতুন রাজার দেশে।
পেরিয়ে যাব তির্‌পুর্নির ঘাট,
পেরিয়ে যাব তেপান্তরের মাঠ,
ফিরে আসতে সন্ধে হয়ে যাবে—
গল্প বলব তোমার কোলে এসে।
আমি কেবল যাব একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।।

ছুটির দিনে

ওই দেখো মা, আকাশ ছেয়ে
মিলিয়ে এল আলো,
আজকে আমার ছুটোছুটি
লাগল না আর ভালো।
ঘন্টা বেজে গেল কখন
অনেক হল বেলা—
তোমায় মনে পড়ে গেল,
ফেলে এলেম খেলা।

আজকে আমার ছুটি, আমার
শনিবারের ছুটি—
কাজ যা আছে সব রেখে আয়,
মা তোর পায়ে লুটি।
দ্বারের কাছে এইখানে বোস,
এই হেথা চৌকাঠ—
বল্ আমারে কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।।

ওই দেখো মা, বর্ষা এল
ঘনঘটায় ঘিরে,
বিজুলি ধায় এঁকেবেঁকে
আকাশ চিরে চিরে।
দেব্‌তা যখন ডেকে ওঠে,
থর্‌থরিয়ে কেঁপে
ভয় করতেই ভালোবাসি
তোমায় বুকে চেপে।
ঝুপ্‌ঝুপিয়ে বৃষ্টি যখন
বাঁশের বনে পড়ে
কথা শুনতে ভালোবাসি
ব'সে কোণের ঘরে।
ওই দেখো মা, জানলা দিয়ে
আসে জলের ছাঁট—
বল্ গো আমায় কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।।

কোন্ সাগরের তীরে মা গো,
কোন্ পাহাড়ের পারে,
কোন্ রাজাদের দেশে মা গো,
কোন্ নদীটির ধারে।
কোনোখানে আল বাঁধা তার
নাই ডাইনে বাঁয়ে?

পথ দিয়ে তার সন্ধেবেলায়
পৌঁছে না কেউ গাঁয়ে?
সারা দিন কি ধূ ধূ করে
শুকনো ঘাসের জমি।
একটি গাছে থাকে শুধু
ব্যাঙ্গমা-বেঙ্গমি?
সেখান দিয়ে কাঠকুড়ুনি
যায় না নিয়ে কাঠ?
বল্ গো আমায় কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।।
এম্‌নিতরো মেঘ করেছে
সারা আকাশ ব্যেপে,
রাজপুত্তুর যাচ্ছে মাঠে
একলা ঘোড়ায় চেপে।
গজমোতির মালাটি তার
বুকের 'পরে নাচে—
রাজকন্যা কোথায় আছে
খোঁজ পেলে কার কাছে?
মেঘে যখন ঝিলিক মারে
আকাশের এক কোণে
দুয়োরানী-মায়ের কথা
পড়ে না তার মনে?
দুখিনী মা গোয়ালঘরে
দিচ্ছে এখন ঝাঁট—
রাজপুত্তুর চলে যে কোন্
তেপান্তরের মাঠ।।

ওই দেখো মা, গাঁয়ের পথে
লোক নেইকো মোটে,
রাখাল-ছেলে সকাল ক'রে
ফিরেছে আজ গোঠে।
আজকে দেখো রাত হয়েছে
দিন না যেতে যেতে,

কৃষাণেরা বসে আছে
দাওয়ায় মাদুর পেতে।
আজকে আমি নুকিয়েছি মা,
পুঁথিপত্তর যত—
পড়ার কথা আজ বোলো না
যখন বাবার মতো
বড়ো হব, তখন আমি
পড়ব প্রথম পাঠ—
আজ বলো মা, কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।।

[আলমোড়া
১৩ শ্রাবণ ১৩১০]

বনবাস

বাবা যদি রামের মতো
পাঠায় আমায় বনে,
যেতে আমি পারি নে কি
তুমি ভাবছ মনে?
চোদ্দ বছর ক'দিনে হয়
জানি নে মা, ঠিক—
দণ্ডক-বন আছে কোথায়
ওই মাঠে কোন্ দিক।
কিন্তু আমি পারি যেতে
ভয় করি নে তাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।।
বনের মধ্যে গাছের ছায়ায়
বেঁধে নিতেম ঘর—
সামনে দিয়ে বইত নদী,

পড়ত বালির চর।
ছোটো একটি থাকত ডিঙি
পারে যেতেম বেয়ে—
হরিণ চ'রে বেড়ায় সেথা,
কাছে আসত ধেয়ে।
গাছের পাতা খাইয়ে দিতেম
আমি নিজের হাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।।

কত যে গাছ ছেয়ে থাকত
কত রকম ফুলে,
মালা গেঁথে প'রে নিতেম
জড়িয়ে মাথার চুলে।
নানা রঙের ফলগুলি সব
ভুঁয়ে পড়ত পেকে,
ঝুড়ি ভ'রে ভ'রে এনে
ঘরে দিতেম রেখে।
খিদে পেলে দুই ভায়েতে
খেতেম পদ্মপাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।।

রোদের বেলায় অশথ-তলায়
ঘাসের 'পরে আসি
রাখাল-ছেলের মতো কেবল
বাজাই বসে বাঁশি।
ডালের 'পরে ময়ূর থাকে,
পেখম পড়ে ঝুলে—
কাঠবিড়ালি ছুটে বেড়ায়
ন্যাজটি পিঠে তুলে।
কখন আমি ঘুমিয়ে যেতেম

দুপুরবেলার তাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।।

সন্ধেবেলায় কুড়িয়ে আনি
শুকোনো ডালপালা,
বনের ধারে বসে থাকি
আগুন হলে জ্বালা।
পাখিরা সব বাসায় ফেরে,
দূরে শেয়াল ডাকে—
সন্ধেতারা দেখা যে যায়
ডালের ফাঁকে ফাঁকে।
মায়ের কথা মনে করি
বসে আঁধার রাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।।
ঠাকুরদাদার মতো বনে
আছেন ঋষি মুনি,
তাঁদের পায়ে প্রণাম ক'রে
গল্প অনেক শুনি।
রাক্ষসেরে ভয় করি নে,
আছে গুহক মিতা—
রাবণ আমার কী করবে মা,
নেই তো আমার সীতা
হনুমানকে যত্ন ক'রে
খাওয়াই দুধে ভাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।।

মা গো, আমায় দে-না কেন
একটি ছোটো ভাই—
দুইজনেতে মিলে আমরা
বনে চলে যাই।

আমাকে মা, শিখিয়ে দিবি
রাম-যাত্রার গান—
মাথায় বেঁধে দিবি চুড়ো,
হাতে ধনুক-বাণ।
চিত্রকূটের পাহাড়ে যাই
এম্‌নি বরষাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

জ্যোতিষশাস্ত্র

আমি শুধু বলেছিলেম—
‘কদম গাছের ডালে
পূর্ণিমা চাঁদ আট্‌কা পড়ে
যখন সন্ধেকালে
তখন কি কেউ তারে
ধরে আনতে পারে!’
শুনে দাদা হেসে কেন
বললে আমায়, ‘খোকা,
তোর মতো আর দেখি নাইকো বোকা।
চাঁদ যে থাকে অনেক দূরে,
কেমন করে ছুঁই।’
আমি বলি, ‘দাদা, তুমি
জান না কিচ্ছুই।
মা আমাদের হাসে যখন
ওই জানলার ফাঁকে
তখন তুমি বলবে কি, মা
অনেক দূরে থাকে!’
তবু দাদা বলে আমায়, ‘খোকা,
তোর মতো আর দেখি নাই তো বোকা।’

দাদা বলে, 'পাবি কোথায়
অত বড়ো ফাঁদ!'
আমি বলি, 'কেন দাদা,
ওই তো ছোটো চাঁদ,
দুটি মুঠোয় ওরে
আনতে পারি ধরে।'
শুনে দাদা হেসে কেন
বললে আমায়, 'খোকা,
তোর মতো আর দেখি নাই তো বোকা।
চাঁদ যদি এই কাছে আসত
দেখতে কত বড়ো।'
আমি বলি, 'কী তুমি ছাই
ইস্কুলে যে পড়ো!
মা আমাদের চুমো খেতে
মাথা করে নিচু,
তখন কি মার মুখটি দেখায়
মস্ত বড়ো কিছু।'
তবু দাদা বলে আমায়, 'খোকা,
তোর মতো আর দেখি নাই তো বোকা।'

বৈজ্ঞানিক

যেম্‌নি মা গো, গুরু গুরু
মেঘের পেলে সাড়া
যেম্‌নি এল আষাঢ় মাসে
বৃষ্টিজলের ধারা,
পুবে হাওয়া মাঠ পেরিয়ে
যেম্‌নি পড়ল আসি
বাঁশ-বাগানে সোঁ সোঁ ক'রে

বাজিয়ে দিয়ে বাঁশি,
অম্‌নি দেখ্‌ মা, চেয়ে—
সকল মাটি ছেয়ে
কোথা থেকে উঠল যে ফুল
এত রাশি রাশি।।

তুই যে ভাবিস ওরা কেবল
অম্‌নি যেন ফুল,
আমার মনে হয় মা, তোদের
সেটা ভারি ভুল।
ওরা সব ইস্‌কুলের ছেলে,
পুঁথিপত্র কাঁখে—
মাটির নীচে ওরা ওদের
পাঠশালাতে থাকে।
ওরা পড়া করে
দুয়োর-বন্ধ ঘরে,
খেলতে চাইলে গুরুমশায়
দাঁড় করিয়ে রাখে।।

বোশেখ জষ্ঠি মাসকে ওরা
দুপুর বেলা কয়,
আষাঢ় হলে আঁধার ক'রে
বিকেল ওদের হয়।
ডালপালারা শব্দ করে
ঘন বনের মাঝে,
মেঘের ডাকে তখন ওদের
সাড়ে চারটে বাজে।
অমনি ছুটি পেয়ে
আসে সবাই ধেয়ে,
হলদে রাঙা সবুজ সাদা
কত রকম সাজে।।
জানিস মা গো, ওদের যেন
আকাশেতেই বাড়ি,

রাত্রে যেথায় তারাগুলি
দাঁড়ায় সারি সারি।
দেখিস নে মা? বাগান ছেয়ে
ব্যস্ত ওরা কত!
বুঝতে পারিস কেন ওদের
তাড়াতাড়ি অত?
জানিস কি কার কাছে
হাত বাড়িয়ে আছে।
মা কি ওদের নেইকো ভাবিস
আমার মায়ের মতো

মাতৃবৎসল

মেঘের মধ্যে মা গো, যারা থাকে
তারা আমায় ডাকে আমায় ডাকে।
বলে, 'আমরা কেবল করি খেলা
সকাল থেকে দুপুর সন্ধেবেলা।
সোনার খেলা খেলি আমরা ভোরে,
রুপোর খেলা খেলি চাঁদকে ধ'রে।'
আমি বলি, 'যাব কেমন ক'রে?'
তারা বলে, 'এসো মাঠের শেষে।
সেইখানেতে দাঁড়াবে হাত তুলে,
আমরা তোমায় নেব মেঘের দেশে।'
আমি বলি, 'মা যে আমার ঘরে
বসে আছে চেয়ে আমার তরে,
তারে ছেড়ে থাকব কেমন করে?'
শুনে তারা হেসে যায় মা, ভেসে।
তার চেয়ে মা, আমি হব মেঘ,
তুমি যেন হবে আমার চাঁদ—
দু হাত দিয়ে ফেলব তোমায় ঢেকে,
আকাশ হবে এই আমাদের ছাদ।।

ঢেউয়ের মধ্যে, মা গো, যারা থাকে
তারা আমায় ডাকে আমায় ডাকে।
বলে,'আমরা কেবল করি গান
সকাল থেকে সকল দিনমান।'
তারা বলে, 'কেন্ দেশে যে ভাই,
আমরা চলি ঠিকানা তার নাই।'
আমি বলি, 'কেমন করে যাই!'
তারা বলে, 'এসো ঘাটের শেষে।
সেইখানেতে দাঁড়াবে চোখ বুজে,
আমরা তোমায় নেব ঢেউয়ের দেশে।'
আমি বলি, 'মা যে চেয়ে থাকে,
সন্ধে হলে নাম ধরে মোর ডাকে,
কেমন করে ছেড়ে থাকব তাকে।'
শুনে তারা হেসে যায় মা, ভেসে।
তার চেয়ে মা, আমি হব ঢেউ,
তুমি হবে অনেক দূরের দেশ—
লুটিয়ে আমি পড়ব তোমার কোলে,
কেউ আমাদের পাবে না উদ্দেশ।।

লুকোচুরি

আমি যদি দুষ্টুমি করে
চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি
ভোরের বেলা মা গো, ডালের 'পরে
কচি পাতায় করি লুটোপুটি,

তবে তুমি আমার কাছে হারো,
তখন কি মা, চিনতে আমায় পারো।
তুমি ডাকো, 'খোকা, কোথায় ওরে।'
আমি শুধু হাসি চুপটি ক'রে।।

যখন তুমি থাকবে যে-কাজ নিয়ে
সবই আমি দেখব নয়ন মেলে—
স্নানটি ক'রে চাঁপার তলা দিয়ে
আসবে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে।
এখান দিয়ে পুজোর ঘরে যাবে,
দূরের থেকে ফুলের গন্ধ পাবে—
তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে
তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে।।
দুপুরবেলা মহাভারত হাতে
বসবে তুমি সবার খাওয়া হলে,
গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে
পড়বে এসে তোমার পিঠে কোলে।
আমি আমার ছোট্ট ছায়াখানি
দোলাব তোর বইয়ের 'পরে আনি—
তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে
তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে।।

সন্ধেবেলায় প্রদীপখানি জ্বেলে
যখন তুমি যাবে গোয়াল-ঘরে
তখন আমি ফুলের খেলা খেলে
টুপ্ করে মা, পড়ব ভুঁয়ে ঝরে।
আবার আমি তোমার খোকা হব,
'গল্প বলো' তোমায় গিয়ে কব।
তুমি বলবে, 'দুষ্টু, ছিলি কোথা?'
আমি বলব, 'বলব না সে কথা।'

দুঃখহারী

মনে করো, তুমি থাকবে ঘরে,
আমি যেন যাব দেশান্তরে।
ঘাটে আমার বাঁধা আছে তরী,
জিনিসপত্র নিয়েছি সব ভরি—
ভালো করে দেখ্ তো মনে করি
কী এনে মা, দেব তোমার তরে।।

চাস কি মা, তুই এত এত সোনা—
সোনার দেশে করব আনাগোনা।
সোনামতী নদীতীরের কাছে
সোনার ফসল মাঠে ফ'লে আছে,
সোনার চাঁপা ফোটে সেথায় গাছে—
না কুড়িয়ে আমি তো ফিরব না।।
পরতে কি চাস মুক্তো গেঁথে হারে—
জাহাজ বেয়ে যাব সাগর-পারে।
সেখানে, মা, সকালবেলা হলে
ফুলের 'পরে মুক্তোগুলি দোলে—
টুপ্‌টুপিয়ে পড়ে ঘাসের কোলে—
যত পারি আনব ভারে ভারে।।
দাদার জন্যে আনব মেঘে ওড়া
পক্ষিরাজের বাচ্ছা দুটি ঘোড়া।
বাবার জন্যে আনব আমি তুলি
কনক-লতার চারা অনেকগুলি—
তোর তরে মা, দেব কৌটা খুলি
সাত-রাজার-ধন মানিক একটি জোড়া

[আলমোড়া
৩০? শ্রাবণ ১৩১০]

বিদায়

তবে আমি যাই গো তবে যাই।
ভোরের বেলা শূন্য কোলে
ডাকবি যখন খোকা ব'লে
বলব আমি, 'নাই সে খোকা নাই।'
মা গো, যাই।।

হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে
যাব মা, তোর বুকে বয়ে—
ধরতে আমায় পারবি নে তো হাতে।
জলের মধ্যে হব মা, ঢেউ—
জানতে আমায় পারবে না কেউ—
স্নানের বেলা খেলব তোমার সাথে।।
বাদলা যখন পড়বে ঝরে
রাতে শুয়ে ভাববি মোরে,
ঝর্‌ঝরানি গান গাব ওই বনে।
জানলা দিয়ে মেঘের থেকে
চমক মেরে যাব দেখে—
আমার হাসি পড়বে কি তোর মনে।।

খোকার লাগি তুমি মা গো,
অনেক রাতে যদি জাগ
তারা হয়ে বলব তোমায় 'ঘুমো'।
তুই ঘুমিয়ে পড়লে পরে
জ্যোৎস্না হয়ে ঢুকব ঘরে,
চোখে তোমার খেয়ে যাব চুমো।।

স্বপন হয়ে আঁখির ফাঁকে
দেখতে আমি আসব মাকে,

যাব তোমার ঘুমের মধ্যিখানে।
জেগে তুমি মিথ্যে আশে
হাত বুলিয়ে দেখবে পাশে,
মিলিয়ে যাব কোথায় কে তা জানে।।

পুজোর সময় যত ছেলে
আঙিনায় বেড়াবে খেলে,
বলবে 'খোকা নেই রে ঘরের মাঝে'।
আমি তখন বাঁশির সুরে
আকাশ বেয়ে ঘুরে ঘুরে
তোমার সাথে ফিরব সকল কাজে।।

পুজোর কাপড় হাতে ক'রে
মাসি যদি শুধায় তোরে
'খোকা তোমার কোথায় গেল চলে।'
বলিস, 'খোকা সে কি হারায়,
আছে আমার চোখের তারায়,
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে।'

[আলমোড়া
৩১ শ্রাবণ ১৩১০]

নবীন অতিথি

গান

ওহে নবীন অতিথি,
তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন।
যুগে যুগে কোথা তুমি ছিলে সংগোপন।
যতনে কত কী আনি
বেঁধেছিনু গৃহখানি,
হেথা কে তোমারে বলো করেছিল নিমন্ত্রণ

কত আশা ভালোবাসা গভীর হৃদয়তলে
ঢেকে রেখেছিনু বুকে কত হাসি অশ্রুজলে।
একটি না কহি বাণী
তুমি এলে মহারানী—
কেমনে গোপনে মনে করিলে হে পদার্পণ।।

অস্তসখী

রজনী একাদশী পোহায় ধীরে ধীরে,
রঙিন মেঘমালা উষারে বাঁধে ঘিরে।
আকাশে ক্ষীণ শশী আড়ালে যেতে চায়,
দাঁড়ায়ে মাঝখানে কিনারা নাহি পায়।।

এ-হেন কালে যেন মায়ের পানে মেয়ে
রয়েছে শুকতারা চাঁদের মুখে চেয়ে।
কে তুমি মরি, মরি, একটুখানি প্রাণ—
এনেছে কী না জানি করিতে ওরে দান।।
মহিমা যত ছিল উদয়-বেলাকার
যতেক সুখসাথী এখনি যাবে যার,
পুরানো সব গেল— নূতন তুমি একা
বিদায়কালে তারে হাসিয়া দিলে দেখা।

ও চাঁদ যামিনীর হাসির অবশেষ,
ও শুধু অতীতের সুখের স্মৃতিলেশ,
তারারা দ্রুতপদে কোথায় গেছে সরে-
পারে নি সাথে যেতে, পিছিয়ে আছে পড়ে
তাদেরি পানে ও যে নয়ন ছিল মেলি,
তাদেরি পথে ও যে চরণ ছিল ফেলি,
এমন সময়ে কে ডাকিলে পিছু-পানে
একটি আলোকেরই একটু মৃদু গানে।।

গভীর রজনীর   রিক্ত ভিখারীকে
ভোরের বেলাকার   কী লিপি দিলে লিখে
সোনার-আভা-মাখা   কী নব আশাখানি
শিশিরজলে ধুয়ে   তাহারে দিলে আনি।।
অস্ত-উদয়ের   মাঝেতে তুমি এসে
প্রাচীন নবীনেরে   টানিছ ভালোবেসে—
বধূ ও বর-রূপে   করিলে এক-হিয়া
করুণ কিরণের   গ্রন্থি বাঁধি দিয়া।।

[আলমোড়া
১ ভাদ্র ? ১৩১০]

পরিচয়

একটি মেয়ে আছে জানি,
পল্লীটি তার দখলে।
সবাই তারি পুজো জোগায়,
লক্ষ্মী বলে সকলে।
আমি কিন্তু বলি তোমায়,
কথায় যদি মন দেহ,
খুব যে উনি লক্ষ্মী মেয়ে—
আছে আমার সন্দেহ।
ভোরের বেলা আঁধার থাকে,
ঘুম যে কোথা ছোটে ওর,
বিছানাতে হুলুস্থুলু
কলরবের চোটে ওর।
খিল্‌খিলিয়ে হাসে শুধু
পাড়াসুদ্ধ জাগিয়ে,

আড়ি করে পালাতে যায়
মায়ের কোলে না গিয়ে।।

হাত বাড়িয়ে মুখে সে চায়,
আমি তখন নাচারই—
কাঁধের 'পরে তুলে তারে
করে বেড়াই পাচারি।
মনের মতো বহন পেয়ে
ভারি মনের খুশিতে
মারে আমায় মোটা মোটা
নরম নরম ঘুষিতে।
আমি ব্যস্ত হয়ে বলি,
'একটু রোসো রোসো মা!'
মুঠো করে ধরতে আসে
আমার চোখের চশমা।
আমার সঙ্গে কলভাষায়
করে কতই কলহ।
তুমুল কাণ্ড! তোমরা তারে
শিষ্ট আচার বলহ?

তবু তো তার সঙ্গে আমার
বিবাদ করা সাজে না।
সে নইলে যে তেমন ক'রে
ঘরের বাঁশি বাজে না।
সে না হলে সকালবেলায়
এত কুসুম ফুটবে কি।
সে না হলে সন্ধেবেলায়
সন্ধেতারা উঠবে কি।
একটি দণ্ড ঘরে আমার
না যদি রয় দুরন্ত
কোনোমতে হয় না তবে
বুকের শূন্য পূরণ তো।

দুষ্টুমি তার দখিন হাওয়া
সুখের তুফান-জাগানে,
দোলা দিয়ে যায় গো আমার
হৃদয়ের ফুল-বাগানে।।

নাম যদি তার জিগেস কর
সেই আছে এক ভাবনা,
কোন নামে যে দিই পরিচয়
সে তো ভেবেই পাব না!
নামের খবর কে রাখে ওর,
ডাকি ওরে যা খুশি—
দুষ্টু বল, দস্যি বল,
পোড়ারমুখী, রাক্ষুসী।
বাপ-মায়ে যে নাম দিয়েছে
বাপ-মায়েরই থাক্ সে নয়,
ছিষ্টি খুঁজে মিষ্টি নামটি
তুলে রাখুন বাক্সে নয়।

একজনেতে নাম রাখবে
কখন অন্নপ্রাশনে,
বিশ্বসুদ্ধ সে নাম নেবে—
ভারি বিষম শাসন এ।
নিজের মনের মতো সবাই
করুন কেন নামকরণ—
বাবা ডাকুন চন্দ্রকুমার,
খুড়ো ডাকুন রামচরণ।
ঘরের মেয়ে তার কি সাজে
সঙস্কৃত নামটা ওই—
এতে কারো দাম বাড়ে না
অভিধানের দামটা বই।
আমি বাপু ডেকেই বসি
যেটাই মুখে আসুক-না—

যারে ডাকি সেই তো বোঝে,
আর সকলে হাসুক-না।
একটি ছোটো মানুষ তাহার
একশো রকম রঙ্গ তো-
এমন লোককে একটি নামেই
ডাকা কি হয় সংগত।।

বিচ্ছেদ

বাগানে ওই দুটো গাছে
ফুল ফুটেছে কত যে,
ফুলের গন্ধে মনে পড়ে
ছিল ফুলের মতো যে।
ফুল যে দিত ফুলের সঙ্গে
আপন সুধা মাখায়ে,
সকাল হত সকাল বেলায়
যাহার পানে তাকায়ে,
সেই আমাদের ঘরের মেয়ে
সে গেছে আজ প্রবাসে,
নিয়ে গেছে এখান থেকে
সকাল বেলার শোভা সে।
একটুখানি মেয়ে আমার
কত যুগের পুণ্য যে,
একটুখানি সরে গেছে
কতখানিই শূন্য যে।।

বিষ্টি পড়ে টুপুর টুপুর,
মেঘ করেছে আকাশে,
উষার রাঙা মুখখানি আজ
কেমন যেন ফ্যাকাশে!
বাড়িতে যে কেউ কোথা নেই,
দুয়োরগুলো ভেজানো—
ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াই
ঘরে আছে কে যেন।
ময়নাটি ওই চুপটি করে
ঝিমোচ্ছে সেই খাঁচাতে,
ভুলে গেছে নেচে নেচে
পুচ্ছটি তার নাচাতে।
ঘরের কোণে আপন-মনে
শূন্য প'ড়ে বিছানা,
কার তরে সে কেঁদে মরে—
সে কল্পনা মিছা না।
বইগুলো সব ছড়িয়ে আছে,
নাম লেখা তায় কার গো—
এম্‌নি তারা রবে কি হায়,
খুলবে না কেউ আর গো?
এটা আছে সেটা আছে,
অভাব কিছু নেই তো—
স্মরণ ক'রে দেয় রে যারে
থাকে নাকো সেই তো।।

উপহার

স্নেহ-উপহার এনে দিতে চাই,
কী যে দেব তাই ভাবনা—
যত দিতে সাধ করি মনে মনে
খুঁজে-পেতে সে তো পাব না

আমার যা ছিল ফাঁকি দিয়ে নিতে
সবাই করেছে একতা,
বাকি যে এখন আছে কত ধন
না তোলাই ভালো সে কথা।
সোনা-রুপো আর হীরে-জহরত
পোঁতা ছিল সবই মাটিতে,
জহরি যে যত সন্ধান পেয়ে
নে গেছে যে যার বাটীতে।
টাকাকড়ি মেলা আছে টাকশালে,
নিতে গেলে পড়ি বিপদে।
বসনভূষণ আছে সিন্দুকে,
পাহারাও আছে ফি পদে।।

এ যে সংসারে আছি মোরা সবে
এ বড়ো বিষম দেশ রে।
ফাঁকিফুঁকি দিয়ে দূরে চ'লে গিয়ে
ভুলে গিয়ে সব শেষ রে।
ভয়ে ভয়ে তাই স্মরণচিহ্ন
যে যাহারে পারে দেয় যে।
তাও কত থাকে, কত ভেঙে যায়,
কত মিছে হয় ব্যয় যে।
স্নেহ যদি কাছে রেখে যাওয়া যেত,
চোখে যদি দেখা যেত রে,
কতগুলো তবে জিনিসপত্র
বল্ দেখি দিত কে তোরে।
তাই ভাবি মনে কী ধন আমার
দিয়ে যাব তোরে নুকিয়ে—
খুশি হবি তুই, খুশি হব আমি,
বাস্, সব যাবে চুকিয়ে।।

কিছু দিয়ে-থুয়ে চিরদিন-তরে
কিনে রেখে দেব মন তোর–

এমন আমার মন্ত্রণা নেই,
জানি নে'ও হেন মন্তর।
নবীন জীবন, বহুদূর পথ
পড়ে আছে তোর সুমুখে—
স্নেহরস মোরা যেটুকু যা দিই
পিয়ে নিস এক চুমুকে।
সাথীদলে জুটে চলে যাস ছুটে
নব আশে নব পিয়াসে—
যদি ভুলে যাস, সময় না পাস,
কী যায় তাহাতে কী আসে।
মনে রাখিবার চির-অবকাশ
থাকে আমাদেরই বয়সে,
বাহিরেতে যার না পাই নাগাল
অন্তরে জেগে রয় সে।।

পাষাণের বাধা ঠেলেঠুলে নদী
আপনার মনে সিধে সে
কলগান গেয়ে দুই তীর বেয়ে
যায় চলে দেশ-বিদেশে—
যার কোল হতে ঝরনার স্রোতে
এসেছে আদরে গলিয়া
তারে ছেড়ে দূরে যায় দিনে দিনে
অজানা সাগরে চলিয়া।
অচল শিখর ছোটো নদীটিরে
চিরদিন রাখে স্মরণে—
যত দূরে যায় স্নেহধারা তার
সাথে যায় দ্রুত চরণে।
তেমনি তুমিও থাক না'ই থাক,
মনে কর মনে কর না,
পিছে পিছে তব চলিবে ঝরিয়া
আমার আশিস-ঝরনা।।

পূজার সাজ

আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি,
পূজার সময় এল কাছে।
মধু বিধু দুই ভাই ছুটাছুটি করে তাই
আনন্দে দু-হাত তুলি নাচে।

পিতা বসি ছিল দ্বারে দুজনে শুধালো তারে,
'কী পোশাক আনিয়াছ কিনে।'
পিতা কহে, 'আছে আছে তোদের মায়ের কাছে,
দেখিতে পাইবি ঠিক দিনে।'

সবুর সহে না আর— জননীরে বার বার
কহে, 'মা গো, ধরি তোর পায়ে,
বাবা আমাদের তরে কী কিনে এনেছে ঘরে
একবার দে-না মা, দেখায়ে।'
ব্যস্ত দেখি হাসিয়া মা দুখানি ছিটের জামা
দেখাইল করিয়া আদর।
মধু কহে, 'আর নেই'? মা কহিল, 'আছে এই
একজোড়া ধুতি ও চাদর।'

রাগিয়া আগুন ছেলে— কাপড় ধুলায় ফেলে
কাঁদিয়া কহিল, 'চাহি না মা!
রায়বাবুদের গুপি পেয়েছে জরির টুপি,
ফুলকাটা সাটিনের জামা।'

মা কহিল, 'মধু, ছি ছি, কেন কাঁদ মিছামিছি!
গরিব যে তোমাদের বাপ।
এবার হয় নি ধান, কত গেছে লোকসান,
পেয়েছেন কত দুঃখতাপ।

তবু দেখো বহু ক্লেশে তোমাদের ভালোবেসে
সাধ্যমতো এনেছেন কিনে—
সে জিনিস অনাদরে ফেলিলি ধূলির 'পরে,
এই শিক্ষা হল এত দিনে!'

বিধু বলে, 'এ কাপড় পছন্দ হয়েছে মোর,
এই জামা পরাস আমারে।'
মধু শুনে আরো রেগে ঘর ছেড়ে দ্রুত বেগে
গেল রায়বাবুদের দ্বারে।

সেথা মেলা লোক জড়ো; রায়বাবু ব্যস্ত বড়ো
দালান সাজাতে গেছে রাত।
মধু যবে এক কোণে দাঁড়াইল ম্লানমনে
চোখে তাঁর পড়িল হঠাৎ।

কাছে ডাকি স্নেহভরে কহেন করুণ স্বরে
তারে দুই বাহুতে বাঁধিয়া,
'কী রে মধু, হয়েছে কী, তোরে যে শুকনো দেখি।'
শুনি মধু উঠিল কাঁদিয়া—

কহিল, 'আমার তরে বাবা আনিয়াছে ঘরে
শুধু এক ছিটের কাপড়।'
শুনি রায়-মহাশয় হাসিয়া মধুরে কয়,
'সেজন্য ভাবনা কিবা তোর!'

ছেলেরে ডাকিয়া চুপি কহিলেন, 'ওরে গুপি,
তোর জামা দে তুই মধুকে।'
গুপির সে জামা পেয়ে মধু ঘরে যায় ধেয়ে,
হাসি আর নাহি ধরে মুখে।

বুক ফুলাইয়া চলে, সবারে ডাকিয়া বলে,
'দেখো কাকা, দেখো চেয়ে মামা—

ওই আমাদের বিধু ছিট পরিয়াছে শুধু,
মোর গায়ে সাটিনের জামা।'
মা শুনি কহেন আসি লাজে অশ্রুজলে ভাসি
কপালে করিয়া করাঘাত—
'হই দুঃখী হই দীন কাহারো রাখি না ঋণ,
কারো কাছে পাতি নাই হাত।

তুমি আমাদেরই ছেলে ভিক্ষা লয়ে অবহেলে
অহংকার কর ধেয়ে ধেয়ে!
ছেঁড়া ধুতি আপনার ঢের বেশি দাম তার
ভিক্ষা-করা সাটিনের চেয়ে।

আয় বিধু, আয় বুকে, চুমো খাই চাঁদমুখে—
তোর সাজ সব চেয়ে ভালো।
দরিদ্র ছেলের দেহে দরিদ্র বাপের স্নেহে
ছিটের জামাটি করে আলো।'

কাগজের নৌকা

ছুটি হলে রোজ ভাসাই জলে
কাগজ-নৌকাখানি।
লিখে রাখি তাতে আপনার নাম,
লিখি আমাদের বাড়ি কোন্ গ্রাম
বড়ো বড়ো ক'রে মোটা অক্ষরে
যতনে লাইন টানি।
যদি সে নৌকা আর-কোনো দেশে
আর-কারো হাতে পড়ে গিয়ে শেষে

আমার লিখন পড়িয়া তখন
বুঝিবে সে অনুমানি
কার কাছ হতে ভেসে এল স্রোতে
কাগজ-নৌকাখানি।।

আমার নৌকা সাজাই যতনে
শিউলি বকুলে ভরি।
বাড়ির বাগানে গাছের তলায়
ছেয়ে থাকে ফুল সকালবেলায়,
শিশিরের জল করে ঝলমল
প্রভাতের আলো পড়ি।
সেই কুসুমের অতি ছোটো বোঝা
কোন্ দিক-পানে চলে যায় সোজা,
বেলাশেষে যদি পার হয়ে নদী
ঠেকে কোনোখানে যেয়ে—
প্রভাতের ফুল সাঁঝে পাবে কূল
কাগজের তরী বেয়ে।।

আমার নৌকা ভাসাইয়া জলে
চেয়ে থাকি বসি তীরে।
ছোটো ছোটো ঢেউ উঠে আর পড়ে,
রবির কিরণে ঝিকিমিকি করে,
আকাশেতে পাখি চলে যায় ডাকি,
বায়ু বহে ধীরে ধীরে।
গগনের তলে মেঘ ভাসে কত
আমারি সে ছোটো নৌকার মতো—
কে ভাসালে তায়, কোথা ভেসে যায়,
কোন্ দেশে গিয়ে লাগে।
ওই মেঘ আর তরণী আমার
কে যাবে কাহার আগে।।

বেলা হলে শেষে বাড়ি থেকে এসে
নিয়ে যায় মোরে টানি।

আমি ঘরে ফিরি, থাকি কোণে মিশি,
যেথা কাটে দিন সেথা কাটে নিশি,
কোথা কোন্ গাঁয় ভেসে চলে যায়
আমার নৌকাখানি।
কোন্ পথে যাবে কিছু নাই জানা,
কেহ তারে কভু নাহি করে মানা,
ধ'রে নাহি রাখে, ফিরে নাহি ডাকে—
ধায় নব নব দেশে।
কাগজের তরী, তারি 'পরে চড়ি
মন যায় ভেসে ভেসে।।

রাত হয়ে আসে, শুই বিছানায়,
মুখ ঢাকি দুই হাতে—
চোখ বুজে ভাবি এমন আঁধার,
কালি দিয়ে ঢালা নদীর দু-ধার—
তারি মাঝখানে কোথায় কে জানে
নৌকা চলেছে রাতে।
আকাশের তারা মিটি মিটি করে,
শিয়াল ডাকিছে প্রহরে প্রহরে,
তরীখানি বুঝি ঘর খুঁজি খুঁজি
তীরে তীরে ফিরে ভাসি।
ঘুম লয়ে সাথে চড়েছে তাহাতে
ঘুমপাড়ানিয়া মাসি।।

শীতের বিদায়

বসন্ত বালক মুখভরা হাসিটি,
বাতাস ব'য়ে ওড়ে চুল।
শীত চলে যায়, মারে তার গায়
মোটা মোটা গোটা ফুল

আঁচল ভ'রে গেছে শত ফুলের মেলা,
গোলাপ ছুঁড়ে মারে টগর চাঁপা বেলা,
শীত বলে, 'ভাই, এ কেমন খেলা,
        যাবার বেলা হল, আসি।'
বসন্ত হাসিয়ে বসন ধ'রে টানে,
পাগল করে দেয় কুহু কুহু গানে,
ফুলের গন্ধ নিয়ে প্রাণের 'পরে হানে,
        হাসির 'পরে হানে হাসি।
ওড়ে ফুলের রেণু, ফুলের পরিমল,
ফুলের পাপড়ি উড়ে করে যে বিকল
কুসুমিত শাখা, বনপথ ঢাকা,
        ফুলের 'পরে পড়ে ফুল।
দক্ষিণে বাতাসে ওড়ে শীতের বেশ,
উড়ে উড়ে পড়ে শীতের শুভ্র কেশ;
কোন্ পথে যাবে না পায় উদ্দেশ,
        হয়ে যায় দিক ভুল।।
বসন্ত বালক হেসেই কুটিকুটি,
টলমল করে রাঙা চরণ দুটি,
গান গেয়ে পিছে ধায় ছুটি ছুটি,
        বনে লুটোপুটি যায়।
নদী তালি দেয় শত হাত তুলি,
বলাবলি করে ডালপালাগুলি,
লতায় লতায় হেসে কোলাকুলি—
        অঙ্গুলি তুলি চায়।
রঙ্গ দেখে হাসে মল্লিকা মালতী,
আশেপাশে হাসে কতই জাতী যূথী,
মুখে বসন দিয়ে হাসে লজ্জাবতী
        বনফুল-বধূগুলি।
কত পাখি ডাকে, কত পাখি গায়,
কিচিমিচিকিচি কত উড়ে যায়,
এ পাশে ও পাশে মাথাটি হেলায়,
        নাচে পুচ্ছখানি তুলি।
শীত চলে যায়, ফিরে ফিরে চায়;

মনে মনে ভাবে 'এ কেমন বিদায়'—
হাসির জ্বালায় কাঁদিয়ে পালায়,
ফুল-ঘায় হার মানে।
শুকনো পাতা তার সঙ্গে উড়ে যায়,
উত্তরে বাতাস করে হায় হায়;
আপাদমস্তক ঢেকে কুয়াশায়
শীত গেল কোন্‌খানে।।

ফুলের ইতিহাস

বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল
প্রথম মেলিল আঁখি তার,
প্রথম হেরিল চারি ধার।।

মধুকর গান গেয়ে বলে,
'মধু কই, মধু দাও দাও।'
হরষে হৃদয় ফেটে গিয়ে
ফুল বলে, 'এই লও লও।'
বায়ু আসি কহে কানে কানে,
'ফুলবালা, পরিমল দাও।'
আনন্দে কাঁদিয়া কহে ফুল,
'যাহা আছে সব লয়ে যাও।'

তরুতলে চ্যুতবৃন্ত মালতীর ফুল
মুদিয়া আসিছে আঁখি তাব,
চাহিয়া দেখিল চারি ধার।।

মধুকর কাছে এসে বলে,
'মধু কই, মধু চাই চাই।'
ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া
ফুল বলে 'কিছু নাই নাই।'

'ফুলবালা, পরিমল দাও'
বায়ু আসি কহিতেছে কাছে।
মলিন বদন ফিরাইয়া
ফুল বলে, 'আর কী বা আছে।'

আকুল আহ্বান

সন্ধে হল, গৃহ অন্ধকার—
মা গো, হেথায় প্রদীপ জ্বলে না।
একে একে সবাই ঘরে এল,
আমায় যে মা, 'মা' কেউ বলে না।
সময় হল, বেঁধে দেব চুল,
পরিয়ে দেব রাঙা কাপড়খানি।
সাঁঝের তারা সাঁঝের গগনে—
কোথায় গেল রানী আমার রানী।।

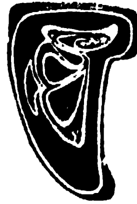
রাত্রি হল, আঁধার করে আসে,
ঘরে ঘরে প্রদীপ নিবে যায়।
আমার ঘরে ঘুম নেইকো শুধু—
শূন্য শেজ শূন্য-পানে চায়।
কোথায় দুটি নয়ন ঘুমে-ভরা,
নেতিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ে–
শ্রান্ত দেহ ঢুলে পড়ে, তবু
মায়ের তরে আছে বুঝি চেয়ে

আঁধার রাতে চলে গেলি তুই,
আঁধার রাতে চুপিচুপি আয়।
কেউ তো তোরে দেখতে পাবে না,

তারা শুধু তারার পানে চায়।
এ জগৎ কঠিন— কঠিন—
কঠিন, শুধু মায়ের প্রাণ ছাড়া—
সেইখানে তুই আয় মা ফিরে আয়—
এত ডাকি, দিবি নে কি সাড়া।।

ফুলের দিনে সে যে চলে গেল,
ফুল-ফোটা সে দেখে গেল না।
ফুলে ফুলে ভরে গেল বন,
একটি সে তো পরতে পেল না।
ফুল যে ফোটে, ফুল যে ঝরে যায়—
ফুল নিয়ে যে আর-সকলে পরে,
ফিরে এসে সে যদি দাঁড়ায়
একটিও যে রইবে না তার তরে।।

খেলত যারা তারা খেলতে গেছে,
হাসত যারা তারা আজও হাসে।
তার তরে তো কেহই বসে নেই,
মা যে কেবল রয়েছে তার আশে।
হায় রে বিধি, সব কি ব্যর্থ হবে—
ব্যর্থ হবে মায়ের ভালোবাসা?
কত জনের কত আশা পুরে,
ব্যর্থ হবে মার প্রাণেরই আশা?



ছবি | অনুপ রায়

কথা ও কাহিনী

কথা

প্রতিনিধি

অ্যাকওয়ার্থ সাহেব কয়েকটি মারাঠি গাথার যে ইংরাজি অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই ভূমিকা হইতে বর্ণিত ঘটনা গৃহীত। শিবাজির গেরুয়া পতাকা 'ভগোয়া ঝেণ্ডা' নামে খ্যাত।

বসিয়া প্রভাতকালে সেতারার দুর্গভালে
শিবাজি হেরিলা এক দিন—
রামদাস, গুরু তাঁর ভিক্ষা মাগি দ্বার দ্বার
ফিরিছেন যেন অন্নহীন।
ভাবিলা, এ কী এ কাণ্ড! গুরুজির ভিক্ষাভাণ্ড—
ঘরে যাঁর নাই দৈন্যলেশ!
সব যাঁর হস্তগত, রাজ্যেশ্বর পদানত,
তাঁরও নাই বাসনার শেষ!
এ কেবল দিনে রাত্রে জল ঢেলে ফুটা পাত্রে
বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে।
কহিলা, দেখিতে হবে কতখানি দিলে তবে
ভিক্ষাঝুলি ভরে একেবারে।
তখনি লেখনী আনি কী লিখি দিলা কী জানি,
বালাজিরে কহিলা ডাকায়ে—
"গুরু যবে ভিক্ষা-আশে আসিবেন দুর্গপাশে
এই লিপি দিয়ো তাঁর পায়ে।"

গুরু চলেছেন গেয়ে, সম্মুখে চলেছে ধেয়ে
কত পান্থ কত অশ্বরথ—
"হে ভবেশ, হে শংকর, সবারে দিয়েছ ঘর,
আমারে দিয়েছ শুধু পথ।

অন্নপূর্ণা মা আমার লয়েছে বিশ্বের ভার
সুখে আছে সর্ব চরাচর—
মোরে তুমি, হে ভিখারী, মার কাছ হতে কাড়ি
করেছ আপন অনুচর।"

সমাপন করি গান সারিয়া মধ্যাহ্নস্নান
দুর্গদ্বারে আসিলা যখন
বালাজি নমিয়া তাঁরে দাঁড়াইল এক ধারে
পদমূলে রাখিয়া লিখন।
গুরু কৌতূহলভরে তুলিয়া লইলা করে,
পড়িয়া দেখিলা পত্রখানি—
বন্দি তাঁর পাদপদ্ম শিবাজি সঁপিছে অদ্য
তাঁরে নিজ রাজ্য-রাজধানী।

পরদিনে রামদাস গেলেন রাজার পাশ;
কহিলেন, "পুত্র, কহো শুনি,
রাজ্য যদি মোরে দেবে কী কাজে লাগিবে এবে-
কোন্ গুণ আছে তব গুণী।"
"তোমারি দাসত্বে প্রাণ আনন্দে করিব দান"
শিবাজি কহিলা নমি তাঁরে।
গুরু কহে, "এই ঝুলি লহো তবে স্কন্ধে তুলি,
চলো আজি ভিক্ষা করিবারে।"

শিবাজি গুরুর সাথে ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে
ফিরিলেন পুরদ্বারে-দ্বারে।
নৃপে হেরি ছেলে মেয়ে ভয়ে ঘরে যায় ধেয়ে,
ডেকে আনে পিতারে মাতারে।
অতুল ঐশ্বর্যে রত তাঁর ভিখারীর ব্রত,
এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা।
ভিক্ষা দেয় লজ্জাভরে, হস্ত কাঁপে থরোথরে;
ভাবে, ইহা মহতের লীলা।

দুর্গে দ্বিপ্রহর বাজে, ক্ষান্ত দিয়া কর্ম-কাজে
বিশ্রাম করিছে পুরবাসী।
একতারে দিয়ে তান রামদাস গাহে গান
আনন্দে নয়নজলে ভাসি—
“ওহে ত্রিভুবনপতি, বুঝি না তোমার মতি,
কিছুই অভাব তব নাহি—
হৃদয়ে হৃদয়ে তবুভিক্ষা মাগি ফির, প্রভু,
সবার সর্বস্বধন চাহি।”

অবশেষে দিবসান্তে নগরের একপ্রান্তে
নদীকূলে সন্ধ্যাস্নান সারি—
ভিক্ষা-অন্ন রাঁধি সুখে গুরু কিছু দিলা মুখে,
প্রসাদ পাইল শিষ্য তাঁরি।
রাজা তবে কহে হাসি, “নৃপতির গর্ব নাশি
করিয়াছ পথের ভিক্ষুক ;
প্রস্তুত রয়েছে দাস— আরো কিবা অভিলাষ,
গুরু-কাছে লব গুরু দুখ।”

গুরু কহে, “তবে শোন্, করিলি কঠিন পণ,
অনুরূপ নিতে হবে ভার—
এই আমি দিনু কয়ে মোর নামে মোর হয়ে
রাজ্য তুমি লহো পুনর্বার।
তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি,
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন;
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম,
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।
বৎস, তবে এই লহো মোর আশীর্বাদ-সহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস;
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো।”
কহিলেন গুরু রামদাস।
নৃপশিষ্য নতশিরে বসি রহে নদীতীরে,
চিন্তারাশি ঘনায় ললাটে।

থামিল রাখাল-বেণু, গোঠে ফিরে গেল ধেনু,
পরপারে সূর্য গেল পাটে।

পূরবীতে ধরি তান একমনে রচি গান
গাহিতে লাগিল রামদাস—
"আমারে রাজার সাজে বসায়ে সংসার-মাঝে
কে তুমি আড়ালে কর বাস।
হে রাজা, রেখেছি আনি তোমারি পাদুকাখানি,
আমি থাকি পাদপীঠতলে।
সন্ধ্যা হয়ে এল ওই, আর কত বসে রই,
তব রাজ্যে তুমি এসো চলে।"

৬ কার্তিক ১৩০৪

মস্তকবিক্রয়

মহাবস্তুবদান

কোশলনৃপতির তুলনা নাই,
জগৎ জুড়ি যশোগাথা।
ক্ষীণের তিনি সদা শরণ-ঠাঁই,
দীনের তিনি পিতামাতা।

সে কথা কাশীরাজ শুনিতে পেয়ে
জ্বলিয়া মরি অভিমানে—
"আমার প্রজাগণ আমার চেয়ে
তাহারে বড়ো করি মানে!
আমার হতে যার আসন নীচে
তাহার দান হল বেশি!
ধর্ম দয়া মায়া সকলি মিছে,
এ শুধু তার রেষারেষি।"

কহিলা, "সেনাপতি, ধরো কৃপাণ,
সৈন্য করো সব জড়ো।
আমার চেয়ে হবে পুণ্যবান,
স্পর্ধা বাড়িয়াছে বড়ো!"
চলিলা কাশীরাজ যুদ্ধসাজে—
কোশলরাজ হারি রণে
রাজ্য ছাড়ি দিয়া ক্ষুব্ধলাজে
পলায়ে গেল দূর বনে।
কাশীর রাজা হাসি কহে তখন
আপন সভাসদ-মাঝে,
"ক্ষমতা আছে যার রাখিতে ধন
তারেই দাতা হওয়া সাজে।"
সকলে কাঁদি বলে, "দারুণ রাহু
এমন চাঁদেরেও হানে!
লক্ষ্মী খোঁজে শুধু বলীর বাহু
চাহে না ধর্মের পানে!"
"আমরা হইলাম পিতৃহারা"
কাঁদিয়া কহে দশ দিক—
"সকল জগতের বন্ধু যাঁরা
তাঁদের শত্রুরে ধিক্।"
শুনিয়া কাশীরাজ উঠিল রাগি—
"নগরে কেন এত শোক!
আমি তো আছি, তবু কাহার লাগি
কাঁদিয়া মরে যত লোক!
আমার বাহুবলে হারিয়া তবু
আমারে করিবে সে জয়!
অরির শেষ নাহি রাখিবে কভু,
শাস্ত্রে এই মতো কয়।
মন্ত্রী, রটি দাও নগর-মাঝে,
ঘোষণা করো চারি ধারে—
যে ধরি আনি দিবে কোশলরাজে
কনকশত দিব তারে।"
ফিরিয়া রাজদূত সকল বাটী

রটনা করে দিন রাত—
যে শোনে আঁখি মুদি রসনা কাটি
শিহরি কানে দেয় হাত।

রাজ্যহীন রাজা গহনে ফিরে
মলিনচীর দীনবেশে—
পথিক একজন অশ্রুনীরে
একদা শুধাইল এসে—
"কোথা গো বনবাসী, বনের শেষ-
কোশলে যাব কোন্ মুখে।"
শুনিয়া রাজা কহে, "অভাগা দেশ,
সেথায় যাবে কোন্ দুখে।"
পথিক কহে, "আমি বণিক্‌জাতি,
ডুবিয়া গেছে মোর তরী।
এখন দ্বারে দ্বারে হস্ত পাতি
কেমনে রব প্রাণ ধরি!
করুণাপারাবার কোশলপতি,
শুনেছি নাম চারি ধারে—
অনাথনাথ তিনি দীনের গতি,
চলেছে দীন তাঁরি দ্বারে।"
শুনিয়া নৃপসুত ঈষৎ হেসে
রুধিলা নয়নের বারি,
নীরবে ক্ষণকাল ভাবিয়া শেষে
কহিলা নিশ্বাস ছাড়ি—
"পান্থ, যেথা তব বাসনা পুরে
দেখায়ে দিব তারি পথ।
এসেছ বহু দুখে অনেক দূরে,
সিদ্ধ হবে মনোরথ।"

বসিয়া কাশীরাজ সভার মাঝে;
দাঁড়ালো জটাধারী এসে।
"হেথায় আগমন কিসের কাজে"
নৃপতি শুধাইল হেসে।

"কোশলরাজ আমি, বনভবন"
কহিলা বনবাসী ধীরে—
"আমার ধরা পেলে যা দিবে পণ
দেহো তা মোর সাথিটিরে।'
উঠিল চমকিয়া সভার লোকে,
নীরব হল গৃহতল—
বর্ম-আবরিত দ্বারীর চোখে
অশ্রু করে ছলছল্।
মৌন রহি রাজা ক্ষণেক-তরে
হাসিয়া কহে, "ওহে বন্দী,
মরিয়া হবে জয়ী আমার 'পরে
এমনি করিয়াছ ফন্দি!
তোমার সে আশায় হানিব বাজ,
জিনিব আজিকার রণে—
রাজ্য ফিরি দিব হে মহারাজ,
হৃদয় দিব তারি সনে।"

জীর্ণ-চীর-পরা বনবাসীরে
বসালো নৃপ রাজাসনে,
মুকুট তুলি দিল মলিন শিরে—
'ধন্য' কহে পুরজনে।

২১ কার্তিক ১৩০৪

পূজারিনী

অবদানশতক

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা
পাদনখকণা তাঁর।
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদকাননে

তাহারি উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ,
শিল্পশোভার সার।

সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি
রাজবধূ রাজবালা
আসিতেন ফুল সাজায়ে ডালায়,
স্তূপপদমূলে সোনার থালায়
আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে
কনকপ্রদীপমালা।

অজাতশত্রু রাজা হল যবে
পিতার আসনে আসি
পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হতে,
সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে
বৌদ্ধশাস্ত্ররাশি।

কহিলা ডাকিয়া অজাতশত্রু
রাজপুরনারী সবে—
"বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার,
এই ক'টি কথা জেনো মনে সার—
ভুলিলে বিপদ হবে!"

সেদিন শারদ-দিবা-অবসান—
শ্রীমতী নামে সে দাসী
পুণ্যশীতল সলিলে নাহিয়া
পুষ্পপ্রদীপ থালায় বাহিয়া
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া
নীরবে দাঁড়ালো আসি।

শিহরি সভয়ে মহিষী কহিলা,
“এ কথা নাহি কি মনে,
অজাতশত্রু করেছে রটনা,
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্যরচনা
শূলের উপরে মরিবে সে জনা
অথবা নির্বাসনে।”

সেথা হতে ফিরি গেল চলি ধীরে
বধূ অমিতার ঘরে।
সমুখে রাখিয়া স্বর্ণমুকুর
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,
আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর
সীমন্তসীমা-’পরে।

শ্রীমতীরে হেরি বাঁকি গেল রেখা,
কাঁপি গেল তার হাত—
কহিল, “অবোধ, কী সাহস-বলে
এনেছিস পূজা, এখনি যা চলে—
কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তা হলে
বিষম বিপদপাত।”
অস্তরবির রশ্মি-আভায়
খোলা জানালার ধারে
কুমারী শুক্লা বসি একাকিনী
পড়িতে নিরত কাব্যকাহিনী;
চমকি উঠিল শুনি কিংকিণী,
চাহিয়া দেখিল দ্বারে।

শ্রীমতীরে হেরি পুঁথি রাখি ভূমে
দ্রুতপদে গেল কাছে।
কহে সাবধানে তার কানে কানে—
“রাজার আদেশ আজি কে না জানে,
এমন করে কি মরণের পানে
ছুটিয়া চলিতে আছে!”

দ্বার হতে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী
লইয়া অর্ঘ্যথালি।
"হে পুরবাসিনী" সবে ডাকি কয়-
"হয়েছে প্রভুর পূজার সময়।"
শুনি ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়,
কেহ দেয় তারে গালি।

দিবসের শেষ আলোক মিলালো
নগরসৌধ-'পরে।
পথ জনহীন আঁধারে বিলীন,
কলকোলাহল হয়ে এল ক্ষীণ,
আরতিঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন
রাজদেবালয়-ঘরে।

শারদ নিশির স্বচ্ছ তিমিরে
তারা অগণ্য জ্বলে।
সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
"মন্ত্রণাসভা হল সমাধান"
দ্বারী ফুকারিয়া বলে।

এমন সময়ে হেরিলা চমকি
প্রাসাদে প্রহরী যত—
রা'জার বিজন কাননমাঝারে
স্তূপপদমূলে গহন আঁধারে
জ্বলিতেছে কেন যেন সারে সারে
প্রদীপমালার মতো!

মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক
তখনি ছুটিয়া আসি

শুধালো, "কে তুই ওরে দুর্মতি,
মরিবার তরে করিস আরতি।"
মধুর কণ্ঠে শুনিল, "শ্রীমতী,
আমি বুদ্ধের দাসী।"

সে দিন শুভ্র পাষাণফলকে
পড়িল রক্তলিখা।
সে দিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদকাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ আরতির শিখা।

১৮ আশ্বিন ১৩০৬

মূল্যপ্রাপ্তি

অবদানশতক

অঘ্রানে শীতের রাতে নিষ্ঠুর শিশিরঘাতে
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া;
সুদাস মালীর ঘরেকাননের সরোবরে
একটি ফুটেছে কী করিয়া।
তুলি লয়ে বেচিবারে গেল সে প্রাসাদদ্বারে,
মাগিল রাজার দরশন—
হেনকালে হেরি ফুল আনন্দে পুলকাকুল
পথিক কহিল একজন,
"অকালের পদ্ম তব আমি এটি কিনি লব,
কত মূল্য লইবে ইহার।
বুদ্ধ ভগবান আজএসেছেন পুরমাঝ,
তাঁর পায়ে দিব উপহার।"
মালী কহে, "এক মাষা স্বর্ণ পাব মনে আশা।"
পথিক চাহিল তাহা দিতে—

হেনকালে সমারোহে বহু পূজা-অর্ঘ্য ব'হে
নৃপতি বাহিরে আচম্বিতে।
রাজেন্দ্র প্রসেনজিৎ উচ্চারি মঙ্গলগীত
চলেছেন বুদ্ধ-দরশনে—
হেরি অকালের ফুল শুধালেন, "কত মূল?
কিনি দিব প্রভুর চরণে।"
মালী কহে, "হে রাজন্, স্বর্ণমাষা দিয়ে পণ
কিনিছেন এই মহাশয়!"
"দশ মাষা দিব আমি" কহিলা ধরণীস্বামী,
"বিশ মাষা দিব" পান্থ কয়।
দোঁহে কহে "দেহো দেহো", হার নাহি মানে কেহ;
মূল্য বেড়ে ওঠে ক্রমাগত।
মালী ভাবে, যাঁর তরে এ দোঁহে বিবাদ করে
তাঁরে দিলে আরো পাব কত।
কহিল সে করজোড়ে, "দয়া ক'রে ক্ষমো মোরে,
এ ফুল বেচিতে নাহি মন।"
এত বলি ছুটিল সে যেথা রয়েছেন বসে
বুদ্ধদেব উজলি কানন।

বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন-প্রশান্ত-মনে
নিরঞ্জন আনন্দমুরতি।
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে, স্ফুরিছে অধর-'পরে
করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি।
সুদাস রহিল চাহি, নয়নে নিমেষ নাহি
মুখে তার বাক্য নাহি সরে—
সহসা ভূতলে পড়ি পদ্মটি রাখিল ধরি
প্রভুর চরণপদ্ম-'পরে।
বরষি অমৃতরাশি বুদ্ধ শুধালেন হাসি,
"কহো বৎস, কী তব প্রার্থনা।"
ব্যাকুল সুদাস কহে, "প্রভু, আর কিছু নহে,
চরণের ধূলি এক কণা।"

২৬ আশ্বিন ১৩০৬

নগরলক্ষ্মী

কল্পদ্রুমাবদান

দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে
জাগিয়া উঠিল হাহারবে
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে শুধালেন জনে জনে,
"ক্ষুধিতেরে অন্নদান-সেবা
তোমরা লইবে বলো কেবা।"

শুনি তাহা রত্নাকর শেঠ
করিয়া রহিল মাথা হেঁট।
কহিল সে কর জুড়ি, "ক্ষুধার্ত বিশাল পুরী,
এর ক্ষুধা মিটাইব আমি—
এমন ক্ষমতা নাই স্বামী!"

কহিল সামন্ত জয়সেন,
"যে আদেশ প্রভু করিছেন
তাহা লইতাম শিরে যদি মোর বুক চিরে
রক্ত দিলে হ'ত কোনো কাজ—
মোর ঘরে অন্ন কোথা আজ।"

নিঃশ্বাসিয়া কহে ধর্মপাল
"কী কব, এমন দগ্ধ ভাল—
আমার সোনার খেত শুষিছে অজন্মা-প্রেত
রাজকর জোগানো কঠিন।
হয়েছি অক্ষম দীনহীন।"
রহে সবে মুখে মুখে চাহি,
কাহারো উত্তর কিছু নাহি।

নির্বাক্ সে সভাঘরে ব্যথিত নগরী-'পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারাসম রহে ফুটি।
তখন উঠিল ধীরে ধীরে
রক্তভাল লাজনম্রশিরে
অনাথপিণ্ডদসুতা, বেদনায় অশ্রুপ্লুতা,
বুদ্ধের চরণরেণু লয়ে
মধুকণ্ঠে কহিল বিনয়ে—

"ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া
তব আজ্ঞা লইল বহিয়া।
কাঁদে যারা খাদ্যহারা আমার সন্তান তারা,
নগরীরে অন্ন বিলাবার
আমি আজি লইলাম ভার।"

বিস্ময় মানিল সবে শুনি—
"ভিক্ষুকন্যা তুমি যে ভিক্ষুণী,
কোন্ অহংকারে মাতি লইলে মস্তক পাতি
এ-হেন কঠিন গুরু কাজ।
কী আছে তোমার কহো আজ।"

কহিল সে নমি সবা-কাছে,
"শুধু এই ভিক্ষাপাত্র আছে।
আমি দীনহীন মেয়ে অক্ষম সবার চেয়ে,
তাই তোমাদের পাব দয়া—
প্রভু-আজ্ঞা হইবে বিজয়া।

"আমার ভাণ্ডার আছে ভ'রে
তোমা-সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে,
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা—
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।"

২৭ আশ্বিন ১৩০৬

স্পর্শমণি

ভক্তমাল

নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে
জপিছেন নাম,
হেনকালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে
করিল প্রণাম।
শুধালেন সনাতন, "কোথা হতে আগমন,
কী নাম ঠাকুর।"
বিপ্র কহে, "কিবা কব, পেয়েছি দর্শন তব
ভ্রমি বহু দূর।
জীবন আমার নাম, মানকরে মোর ধাম,
জিলা বর্ধমানে;
এত বড়ো ভাগ্যহত দীনহীন মোর মতো
নাই কোনোখানে।
জমিজমা আছে কিছু, করে আছি মাথা নিচু,
অল্পস্বল্প পাই।
ক্রিয়াকর্ম-যজ্ঞযাগে বহু খ্যাতি ছিল আগে,
আজ কিছু নাই।
আপন উন্নতি লাগি শিব-কাছে বর মাগি
করি আরাধনা—
একদিন নিশিভোরে স্বপ্নে দেব কন মোরে
'পুরিবে প্রার্থনা—
যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর
ধরো দুটি পায়;
তাঁরে পিতা বলি মেনো, তাঁরি হাতে আছে জেনো
ধনের উপায়।' "

শুনি কথা সনাতন ভাবিয়া আকুল হন,
'কী আছে আমার।
যাহা ছিল সে সকলি ফেলিয়া এসেছি চলি,
ভিক্ষামাত্র সার।'
সহসা বিস্মৃতি ছুটে, সাধু ফুকারিয়া উঠে,
"ঠিক বটে ঠিক!
একদিন নদীতটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে
পরশমানিক।
যদি কভু লাগে দানে সেই ভেবে ওইখানে
পুঁতেছি বালুতে;
নিয়ে যাও হে ঠাকুর, দুঃখ তব হবে দূর
ছুঁতে নাহি ছুঁতে।"

বিপ্র তাড়াতাড়ি আসি খুঁড়িয়া বালুকারাশি
পাইল সে মণি;
লোহার মাদুলি দুটি সোনা হয়ে উঠে ফুটি
ছুঁইল যেমনি।
ব্রাহ্মণ বালুর 'পরে বিস্ময়ে বসিয়া পড়ে—
ভাবে নিজে নিজে।
যমুনা কল্লোলগানে চিন্তিতের কানে কানে
কহে কত কী যে।

নদীপারে রক্তচ্ছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি
গেল অস্তাচলে;
তখন ব্রাহ্মণ উঠে সাধুর চরণে লুটে
কহে অশ্রুজলে,
"যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মানো না মণি
তাহারি খানিক
মাগি আমি নতশিরে" এত বলি নদীনীরে
ফেলিল মানিক।

২৯ আশ্বিন ১৩০৬

বন্দী বীর

পঞ্চনদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠেছে শিখ—
নির্ম্মম নির্ভীক।
হাজার কণ্ঠে "গুরুজির জয়"
ধ্বনিয়া তুলেছে দিক।
নূতন জাগিয়া শিখ
নূতন উষার সূর্য্যের পানে
চাহিল নির্নিমিখ।

"অলখ নিরঞ্জন"—
মহারব উঠে বন্ধন টুটে
করে ভয়ভঞ্জন।
বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে
অসি বাজে ঝন্‌ঝন্‌।
পঞ্জাব আজি গরজি উঠিল,
"অলখ নিরঞ্জন।"

এসেছে সে এক দিন—
লক্ষ পরানে শঙ্কা না জানে,
না রাখে কাহারো ঋণ।
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য,
চিত্ত ভাবনাহীন।
পঞ্চনদীর ঘিরি দশ তীর
এসেছে সে এক দিন।

দিল্লি-প্রাসাদকূটে
হোথা বার বার বাদশাজাদার
তন্দ্রা যেতেছে ছুটে—
কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে,
নিবিড় নিশীথ টুটে
কাদের মশালে আকাশের ভালে
আগুন উঠেছে ফুটে!

পঞ্চনদীর তীরে
ভক্তদেহের রক্তলহরী
মুক্ত হইল কি রে!
লক্ষ বক্ষ চিরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী-সমান
ছুটে যেন নিজ নীড়ে।
বীরগণ জননীরে
রক্ততিলক ললাটে পরালো
পঞ্চনদীর তীরে।

মোগল-শিখের রণে
মরণ-আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি
দুই জনা দুই জনে;
দংশনক্ষত শ্যেনবিহঙ্গ
যুঝে ভুজঙ্গ-সনে
সেদিন কঠিন রণে
"জয় গুরুজির" হাঁকে শিখ বীর
সুগভীর নিঃস্বনে।
মত্ত মোগল রক্তপাগল
"দীন্ দীন্" গরজনে।

গুরুদাসপুর গড়ে
বন্দা যখন বন্দী হইল

তুরানি সেনার করে,
সিংহের মতো শৃঙ্খলগত
বাঁধি লয়ে গেল ধরে
দিল্লি-নগর-'পরে।
বন্দা সমরে বন্দী হইল
গুরুদাসপুর গড়ে।

সম্মুখে চলে মোগল-সৈন্য
উড়ায়ে পথের ধূলি,
ছিন্ন শিখের মুণ্ড লইয়া
বর্শাফলকে তুলি।
শিখ সাত শত চলে পশ্চাতে,
বাজে শৃঙ্খলগুলি।
রাজপথ-'পরে লোক নাহি ধরে,
বাতায়ন যায় খুলি।
শিখ গরজয় "গুরুজির জয়"
পরানের ভয় ভুলি।
মোগলে ও শিখে উড়ালো আজিকে
দিল্লিপথের ধূলি।

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি,
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি।
দিন গেলে প্রাতে ঘাতকের হাতে
বন্দীরা সারি সারি
"জয় গুরুজির" কহি শত বীর
শত শির দেয় ডারি।

সপ্তাহকালে সাত শত প্রাণ
নিঃশেষ হয়ে গেলে
বন্দার কোলে কাজি দিল তুলি
বন্দার এক ছেলে—

কহিল, 'ইহারে বধিতে হইবে
নিজ হাতে অবহেলে।"
দিল তার কোলে ফেলে–
কিশোর কুমার, বাঁধা বাহু তার,
বন্দার এক ছেলে।
কিছু না কহিল বাণী,
বন্দা সুধীরে ছোটো ছেলেটিরে
লইল বক্ষে টানি।
ক্ষণকাল-তরে মাথার উপরে
রাখে দক্ষিণপাণি,
শুধু একবার চুম্বিল তার
রাঙা উষ্ণীষখানি,
তার পরে ধীরে কটিবাস হতে
ছুরিকা খসায়ে আনি
বালকের মুখ চাহি
"গুরুজির জয়" কানে কানে কয়-
"রে পুত্র, ভয় নাহি।"

নবীন বদনে অভয় কিরণ
জ্বলি উঠে উৎসাহি—
কিশোরকণ্ঠে কাঁপে সভাতল,
বালক উঠিল গাহি—
"গুরুজির জয়, কিছু নাহি ভয়"
বন্দার মুখ চাহি।

বন্দা তখন বামবাহুপাশ
জড়াইল তার গলে,
দক্ষিণকরে ছেলের বক্ষে
ছুরি বসাইল বলে—
"গুরুজির জয়" কহিয়া বালক
লুটালো ধরণীতলে।

সভা হল নিস্তব্ধ।
বন্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক
সাঁড়াশি করিয়া দগ্ধ।
স্থির হয়ে বীর মরিল, না করি
একটি কাতর শব্দ;
দর্শকজন মুদিল নয়ন,
সভা হল নিস্তব্ধ।

৩০ আশ্বিন ১৩০৬

মানী

আরঙজেব ভারত যবে
করিতেছিল খান্‌খান্‌
মারবপতি কহিলা আসি,
"করহ, প্রভু, অবধান—
গোপন রাতে অচলগড়ে
নহর যাঁরে এনেছে ধরে
বন্দী তিনি আমার ঘরে
সিরোহিপতি সুরতান।
কী অভিলাষ তাঁহার 'পরে,
আদেশ মোরে করো দান

শুনিয়া কহে আরঙজেব,
"কী কথা শুনি অদ্‌ভুত।
এত দিনে কি পড়িল ধরা
অশনি-ভরা বিদ্যুৎ!
পাহাড়ি লয়ে কয়েক শত
পাহাড়ে বনে ফিরিতে রত,

মরুভূমির মরীচিমত
স্বাধীন ছিল রাজপুত।
দেখিতে চাহি—আনিতে তারে
পাঠাও কোনো রাজদূত।'

মাড়োয়ারাজ যশোবন্ত
কহিলা তবে জোড়কর,
"ক্ষত্রকুলসিংহশিশু
লয়েছে আজি মোর ঘর—
বাদশা তাঁরে দেখিতে চান
বচন আগে করুন দান
কিছুতে কোনো অসম্মান
হবে না কভু তাঁর 'পর।
সভায় তবে আপনি তাঁরে
আনিব করি সমাদর।"

আরঙজেব কহিলা হাসি,
"কেমন কথা কহ আজ,
প্রবীণ তুমি প্রবল বীর
মাড়োয়াপতি মহারাজ।
তোমার মুখে এমন বাণী
শুনিয়া মনে শরম মানি,
মানীর মান করিব হানি—
মানীরে শোভে হেন কাজ।
কহিনু আমি, চিন্তা নাহি,
আনহ তাঁরে সভা-মাঝ।"

সিরোহিপতি সভায় আসে
মাড়োয়ারাজে লয়ে সাথ,
উচ্চ শির উচ্চে রাখি
সমুখে করে আঁখিপাত।
কহিল সবে বজ্রনাদে
"সেলাম করো বাদশাজাদে"—

হেলিয়া যশোবন্ত-কাঁধে
কহিলা ধীরে নরনাথ,
"গুরুজনের চরণ ছাড়া
করি নে কারে প্রণিপাত।"

কহিলা রোষে রক্ত-আঁখি
বাদশাহের অনুচর,
"শিখাতে পারি কেমনে মাথা
লুটিয়া পড়ে ভূমি-'পর।"
হাসিয়া কহে সিরোহিপতি,
"এমন যেন না হয় মতি
ভয়েতে কারে করিব নতি—
জানি নে কভু ভয়-ডর!"
এতেক বলি দাঁড়ালো রাজ
কৃপাণ-'পরে করি ভর।

বাদশা ধরি সরতানেরে
বসায়ে নিল নিজ'-পাশ।
কহিলা, "বীর, ভারত-মাঝে
কী দেশ-'পরে তব আশ।"
কহিলা রাজা, "অচলগড়
দেশের সেরা জগৎ-'পর।"
সভার মাঝে পরস্পর
নীরবে উঠে পরিহাস।
বাদশা কহে, "অচল হয়ে
অচলগড়ে করো বাস।"

১ কার্তিক ১৩০৬

প্রার্থনাতীত দান

শিখের পক্ষে বেণীচ্ছেদন ধর্মপরিত্যাগের ন্যায় দূষণীয়

পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল
বন্দী শিখের দল—
সুহিদ্‌গঞ্জে রক্তবরন
হইল ধরণীতল।

নবাব কহিল, ‘‘শুন তরুসিং,
তোমারে ক্ষমিতে চাই।’’
তরুসিং কহে, ‘‘মোরে কেন তব
এত অবহেলা ভাই!’’
নবাব কহিল, ‘‘মহাবীর তুমি,
তোমারে না করি ক্রোধ—
বেণীটি কাটিয়া দিয়ে যাও মোরে
এই শুধু অনুরোধ।’’
তরুসিং কহে, ‘‘করুণা তোমার
হৃদয়ে রহিল গাঁথা—
যা চেয়েছ তার কিছু বেশি দিব,
বেণীর সঙ্গে মাথা।’’

২ কার্তিক ১৩০৬

রাজবিচার

রাজস্থান

বিপ্র কহে, ‘‘রমণী মোর
আছিল যেই ঘরে,
নিশীথে সেথা পশিল চোর
ধর্মনাশ-তরে।

বেঁধেছি তারে, এখন কহো
চোরে কী দিব সাজা।"
"মৃত্যু" শুধু কহিলা তারে
রতনরাও রাজা।

ছুটিয়া আসি কহিল দূত,
"চোর সে যুবরাজ—
বিপ্র তাঁরে ধরেছে রাতে,
কাটিল প্রাতে আজ
ব্রাহ্মণেরে এনেছি ধরে,
কী তারে দিব সাজা।"
"মুক্তি দাও" কহিলা শুধু
রতনরাও রাজা।

৪ কার্তিক ১৩০৬

গুরু গোবিন্দ

"বন্ধু, তোমরা ফিরে যাও ঘরে,
এখনো সময় নয়"—
নিশি-অবসান, যমুনার তীর,
ছোটো গিরিমালা বন সুগভীর;
গুরু গোবিন্দ কহিলা ডাকিয়া
অনুচর গুটিছয়।

"যাও রামদাস, যাও গো লেহারি,
সাহু ফিরে যাও তুমি।
দেখায়ো না লোভ, ডাকিয়ো না মোরে
ঝাঁপায়ে পড়িতে কর্মসাগরে,
এখনো পড়িয়া থাক্ বহু দূরে
জীবনরঙ্গভূমি।

ফিরায়েছি মুখ, রুধিয়াছি কান,
লুকায়েছি বনমাঝে।
সুদূরে মানবসাগর অগাধ,
চিরক্রন্দিত ঊর্মিনিনাদ—
হেথায় বিজনে রয়েছি মগন
আপন গোপন কাজে।

মানবের প্রাণ ডাকে যেন মোরে
সেই লোকালয় হতে।
সুপ্ত নিশীথে জেগে উঠে তাই
চমকিয়া উঠে বলি 'যাই যাই',
প্রাণ মন দেহ ফেলে দিতে চাই
প্রবল মানবস্রোতে।

তোমাদের হেরি চিত চঞ্চল,
উদ্দাম ধায় মন।
রক্ত-অনল শত শিখা মেলি
সর্প-সমান করি উঠে কেলি,
গঞ্জনা দেয় তরবারি যেন
কোষমাঝে ঝন্ ঝন্।

হায়, সেকি সুখ, এ গহন ত্যজি
হাতে লয়ে জয়তূরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে—
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে,
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।

তুরঙ্গসম অন্ধ নিয়তি—
বন্ধন করি তায়
রশ্মি পাকড়ি আপনার করে
বিঘ্ন বিপদ লঙ্ঘন ক'রে
আপনার পথে ছুটাই তাহারে
প্রতিকূল ঘটনায়।

সমুখে যে আসে সরে যায় কেহ,
পড়ে যায় কেহ ভূমে।
দ্বিধা হয়ে বাধা হতেছে ভিন্ন,
পিছে পড়ে থাকে চরণচিহ্ন,
আকাশের আঁখি করিছে খিন্ন
প্রলয়বহ্নিধূমে।

শতবার করে মৃত্যু ডিঙায়ে
পড়ি জীবনের পারে।
প্রান্তগগনে তারা অনিমিখ
নিশীথতিমিরে দেখাইছে দিক,
লোকের প্রবাহ ফেনায়ে ফেনায়ে
গরজিছে দুই ধারে।

কভু অমানিশা নীরব নিবিড়,
কভু বা প্রখর দিন।
কভু বা আকাশে চারি-দিক-ময়
বজ্র লুকায়ে মেঘ জড়ো হয়—
কভু বা ঝটিকা মাথার উপরে
ভেঙে পড়ে দয়াহীন।

'আয় আয় আয়' ডাকিতেছি সবে,
আসিতেছে সবে ছুটে।
বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্বার,
ভেঙে বাহিরায় সব পরিবার,
সুখসম্পদ-মায়ামমতার
বন্ধন যায় টুটে।

সিন্ধু মাঝারে মিশিছে যেমন
পঞ্চনদীর জল—
আহ্বান শুনে কে কারে থামায়,
ভক্তহৃদয় মিলিছে আমায়,
পঞ্জাব জুড়ি উঠিছে জাগিয়া
উন্মাদ কোলাহল।

কোথা যাবি ভীরু, গহনে গোপনে
পশিছে কণ্ঠ মোর।
প্রভাতে শুনিয়া 'আয় আয় আয়'
কাজের লোকেরা কাজ ভুলে যায়,
নিশীথে শুনিয়া 'আয় তোরা আয়'
ভেঙে যায় ঘুমঘোর।

যত আগে চলি বেড়ে যায় লোক,
ভরে যায় ঘাট বাট।
ভুলে যায় সবে জাতি-অভিমান,
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ,
এক হয়ে যায় মান অপমান
ব্রাহ্মণ আর জাঠ।

থাক্ ভাই, থাক্, কেন এ স্বপন—
এখনো সময় নয়।
এখনো একাকী দীর্ঘ রজনী
জাগিতে হইবে পল গণি গণি
অনিমেষ চোখে পূর্বগগনে
দেখিতে অরুণোদয়।

এখনো বিহার কল্পজগতে,
অরণ্য রাজধানী—
এখনো কেবল নীরব ভাবনা,
কর্মবিহীন বিজন সাধনা,
দিবানিশি শুধু ব'সে ব'সে শোনা
আপন মর্মবাণী।

একা ফিরি তাই যমুনার তীরে,
দুর্গমগিরিমাঝে।
মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে,
মিশাতেছি গান নদীকলরোলে,

মন আপনার মনে,
যোগ্য হতেছি কাজে।

এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ,
আরো কতদিন হবে—
চারি দিক হতে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ,
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে।

কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—
'পেয়েছি আমার শেষ।
তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে—
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।

'নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
নাহি আর আগুপিছু।
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ,
নাই তার কাছে জীবন মরণ
নাই নাই আর কিছু।'

হৃদয়ের মাঝে পেতেছি শুনিতে
দৈববাণীর মতো—
'উঠিয়া দাঁড়াও আপন আলোতে,
ওই চেয়ে দেখো কত দূর হতে
তোমার কাছেতে ধরা দিবে ব'লে
আসে লোক কত শত।

'ওই শোনো শোনো কল্লোলধ্বনি
ছুটে হৃদয়ের ধারা।

স্থির থাকো তুমি, থাকো তুমি জাগি
প্রদীপের মতো আলস তেয়াগি—
এ নিশীথমাঝে তুমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তারা।'

ওই চেয়ে দেখো দিগন্ত-পানে
ঘনঘোর ঘটা অতি।
আসিতেছে ঝড় মরণেরে লয়ে,
তাই বসে বসে হৃদয়-আলয়ে
জ্বালাতেছি আলো—নিবিবে না ঝড়ে,
দিবে অনন্ত জ্যোতি।

যাও তবে সাহু, যাও রামদাস,
ফিরে যাও সখাগণ।
এসো দেখি সবে যাবার সময়—
বলো দেখি সবে 'গুরুজির জয়',
দুই হাত তুলি বলো 'জয় জয়
অলখ নিরঞ্জন'!"

২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫

শেষ শিক্ষা

একদিন শিখগুরু গোবিন্দ নির্জনে
একাকী ভাবিতেছিলা আপনার মনে
আপন জীবনকথা—যে সংকল্পলেখা
অখণ্ড সম্পূর্ণ রূপে দিয়েছিল দেখা
যৌবনের স্বর্ণপটে, যে আশা একদা
ভারত গ্রাসিয়াছিল, সে আজি শতধা,
সে আজি সংকীর্ণ শীর্ণ সংশয়সংকুল,
সে আজি সংকটমগ্ন। তবে একি ভুল

তবে কি জীবন ব্যর্থ।—দারুণ দ্বিধায়
শ্রান্তদেহে ক্ষুব্ধচিত্তে আঁধার সন্ধ্যায়
গোবিন্দ ভাবিতেছিল; হেনকালে এসে
পাঠান কহিল তাঁরে, "যাব চলি দেশে,
ঘোড়া যে কিনেছ তুমি দেহো তার দাম।"
কহিল গোবিন্দ গুরু, "শেখজি, সেলাম।
মূল্য কালি পাবে, আজি ফিরে যাও ভাই!"
পাঠান কহিল রোষে, "মূল্য আজই চাই।"
এত বলি জোর করি ধরি তাঁর হাত
"চোর" বলি দিল গালি। শুনি অকস্মাৎ
গোবিন্দ বিজুলি-বেগে খুলি নিল অসি,
পলকে সে পাঠানের মুণ্ড গেল খসি;
রক্তে ভেসে গেল ভূমি। হেরি নিজ কাজ
মাথা নাড়ি কহে গুরু, "বুঝিলাম আজ,
আমার সময় গেছে। পাপ তরবার
লঙ্ঘন করিল আজি লক্ষ্য আপনার
নিরর্থক রক্তপাতে। এ বাহুর 'পরে
বিশ্বাস ঘুচিয়া গেল চিরকালতরে।
ধুয়ে মুছে যেতে হবে এ পাপ, এ লাজ—
আজ হতে জীবনের এই শেষ কাজ।"

পুত্র ছিল পাঠানের বয়স নবীন,
গোবিন্দ লইল তারে ডাকি। রাত্রিদিন
পালিতে লাগিল তারে সন্তানের মতো
চোখে চোখে। শাস্ত্র আর শস্ত্রবিদ্যা যত
আপনি শিখালো তারে। ছেলেটির সাথে
বৃদ্ধ সেই বীরগুরু সন্ধ্যায় প্রভাতে
খেলিত ছেলের মতো। ভক্তগণ দেখি
গুরুরে কহিল আসি, "একি প্রভু, একি!
আমাদের শঙ্কা লাগে। ব্যাঘ্রশাবকেরে
যত যত্ন কর তার স্বভাব কি ফেরে।
যখন সে বড়ো হবে তখন নখর,
গুরুদেব, মনে রেখো হবে যে প্রখর।"

গুরু কহে, "তাই চাই, বাঘের বাচ্ছারে
বাঘ না করিনু যদি কী শিখানু তারে।"

বালক যুবক হল গোবিন্দের হাতে
দেখিতে দেখিতে। ছায়া-হেন ফিরে সাথে,
পুত্র-হেন করে তাঁর সেবা। ভালোবাসে
প্রাণের মতন, সদা জেগে থাকে পাশে
ডান হস্ত যেন। যুদ্ধে হয়ে গেছে গত
শিখগুরু গোবিন্দের পুত্র ছিল যত—
আজি তাঁর প্রৌঢ়কালে পাঠান-তনয়
জুড়িয়া বসিল আসি শূন্য সে হৃদয়
গুরুজির। বাজে-পোড়া বটের কোটরে
বাহির হইতে বাজ পড়ি বায়ুভরে
বৃক্ষ হয়ে বেড়ে বেড়ে কবে ওঠে ঠেলি,
বৃদ্ধ বটে ঢেকে ফেলে ডালপালা মেলি।

একদা পাঠান কহে নমি গুরু-পায়,
"শিক্ষা মোর সারা হল চরণকৃপায়,
এখন আদেশ পেলে নিজভুজবলে
উপার্জন করি গিয়া রাজসৈন্যদলে।"
গোবিন্দ কহিলা তার পিঠে হাত রাখি,
"আছে তব পৌরুষের এক শিক্ষা বাকি।"
পরদিন বেলা গেলে গোবিন্দ একাকী
বাহিরিলা; পাঠানেরে কহিলেন ডাকি,
"অস্ত্র হাতে এসো মোর সাথে।" ভক্তদল
"সঙ্গে যাব, সঙ্গে যাব" করে কোলাহল।
গুরু কন, "যাও সবে ফিরে।"

দুই জনে,
কথা নাই, ধীরগতি চলিলেন বনে
নদীতীরে। পাথর-ছড়ানো উপকূলে
বরষার জলধারা সহস্র আঙুলে
কেটে গেছে রক্তবর্ণ মাটি। সারি সারি

উঠেছে বিশাল শাল, তলায় তাহারি
ঠেলাঠেলি ভিড় করে শিশু তরুদল
আকাশের অংশ পেতে। নদী হাঁটুজল,
ফটিকের মতো স্বচ্ছ, চলে এক ধারে
গেরুয়া বালির কিনারায়। নদীপারে
ইশারা করিল গুরু, পাঠান দাঁড়ালো।
নিবে-আসা দিবসের দগ্ধ-রাঙা আলো
বাদুড়ের পাখা-সম দীর্ঘ ছায়া জুড়ি,
পশ্চিমপ্রান্তর-পারে চলেছিল উড়ি
নিঃশব্দ আকাশে। গুরু কহিলা পাঠানে,
"মামুদ, হেথায় এসো, খোঁড়ো এইখানে।'
উঠিল সে বালু খুঁড়ি একদণ্ড শিলা
অঙ্কিত লোহিত রাগে। গোবিন্দ কহিলা,
"পাষাণে এই-যে রাঙা দাগ, এ তোমার
আপন বাপের রক্ত। এইখানে তার
মুণ্ড ফেলেছিনু কেটে, না শুধিয়া ঋণ,
না দিয়া সময়। আজ আসিয়াছে দিন,
রে পাঠান, পিতার সুপুত্র হও যদি
খোলো তরবার, পিতৃঘাতকেরে বধি
উষ্ণরক্ত-উপহারে করিবে তর্পণ
তৃষাতুর প্রেতাত্মার।"

বাঘের মতন

হুংকারিয়া লম্ফ দিয়া রক্তনেত্রে বীর
পড়িল গুরুর 'পরে—গুরু রহে স্থির
কাঠের মূর্তির মতো। ফেলি অস্ত্রখান
তখনি চরণে তাঁর পড়িল পাঠান;
কহিল, "হে গুরুদেব, লয়ে শয়তানে
কোরো না এমনতরো খেলা। ধর্ম জানে
ভুলেছিনু পিতৃরক্তপাত ; একাধারে
পিতা গুরু বন্ধু ব'লে জেনেছি তোমারে
এত দিন। ছেয়ে থাক্ মনে সেই স্নেহ,
ঢাকা প'ড়ে হিংসা যাক ম'রে। প্রভু, দেহো

পদধূলি।"—এত বলি বনের বাহিরে
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল; না চাহিল ফিরে,
না থামিল একবার। দুটি বিন্দু জল
ভিজাইল গোবিন্দের নয়নযুগল।

পাঠান সেদিন হতে থাকে দূরে দূরে।
নিরালা শয়নঘরে জাগাতে গুরুরে
দেখা নাহি দেয় ভোরবেলা। গৃহদ্বারে
অস্ত্র হাতে নাহি থাকে রাতে। নদীপারে
গুরু-সাথে মৃগয়ায় নাহি যায় একা।
নির্জনে ডাকিলে গুরু দেয় না সে দেখা।

একদিন আরম্ভিলা শতরঞ্চ-খেলা
গোবিন্দ পাঠান-সাথে। শেষ হল বেলা
না জানিতে কেহ। হার মানি বারে বারে
মাতিছে মামুদ। সন্ধ্যা হয়, রাত্রি বাড়ে।
সঙ্গীরা যে যার ঘরে চলে গেল ফিরে।
ঝাঁ ঝাঁ করে রাতি। একমনে হেঁট-শিরে
পাঠান ভাবিছে খেলা। কখন্ হঠাৎ
চতুরঙ্গ বল ছুঁড়ি করিল আঘাত
মামুদের শিরে গুরু; কহে অট্টহাসি,
"পিতৃঘাতকের সাথে খেলা করে আসি
এমন যে কাপুরুষ, জয় হবে তার?"
তখনি বিদ্যুৎ-হেন ছুরি খরধার
খাপ হতে খুলি লয়ে গোবিন্দের বুকে
পাঠান বিঁধিয়া দিল। গুরু হাসিমুখে
কহিলেন, "এত দিনে হল তোর বোধ
কী করিয়া অন্যায়ের লয় প্রতিশোধ।
শেষ শিক্ষা দিয়ে গেনু—আজি শেষবার
আশীর্বাদ করি তোরে হে পুত্র আমার!"

৬ কার্তিক ১৩০৬

নকল গড়

রাজস্থান

"জলস্পর্শ করব না আর"
　　চিতোর-রানার পণ
"বুঁদির কেল্লা মাটির 'পরে
　　থাকবে যতক্ষণ।"
"কী প্রতিজ্ঞা হায় মহারাজ,
মানুষের যা অসাধ্য কাজ
কেমন করে সাধবে তা আজ"
　　কহেন মন্ত্রীগণ।
কহেন রাজা, "সাধ্য না হয়
　　সাধব আমার পণ।"

বুঁদির কেল্লা চিতোর হতে
　　যোজন-তিনেক দূর।
সেথায় হারাবংশী সবাই
　　মহা মহা শূর।
হামু রাজা দিচ্ছে থানা,
ভয় কারে কয় নাইকো জানা—
তাহার সদ্য প্রমাণ রানা
　　পেয়েছেন প্রচুর।
হারাবংশীর কেল্লা বুঁদি
　　যোজন-তিনেক দূর।
মন্ত্রী কহে যুক্তি করি,
　　"আজকে সারা রাতি
মাটি দিয়ে বুঁদির মতো
　　নকল কেল্লা পাতি।

রাজা এসে আপন করে
দিবেন ভেঙে ধূলির 'পরে,
নইলে শুধু কথার তরে
　　হবেন আত্মঘাতী!"
মন্ত্রী দিল চিতোর-মাঝে
　　নকল কেল্লা পাতি।

কুম্ভ ছিল রানার ভৃত্য
　　হারাবংশী বীর—
হরিণ মেরে আসছে ফিরে,
　　স্কন্ধে ধনু তীর।
খবর পেয়ে কহে, "কে রে
নকল বুঁদি কেল্লা মেরে
হারাবংশী রাজপুতেরে
　　করবে নতশির।
নকল বুঁদি রাখব আমি
　　হারাবংশী বীর।"

মাটির কেল্লা ভাঙতে আসেন
　　রানা মহারাজ।
"দূরে রহো" কহে কুম্ভ—
　　গর্জে যেন বাজ।
"বুঁদির নামে করবে খেলা,
সইব না সে অবহেলা—
নকল গড়ের মাটির ঢেলা
　　রাখব আমি আজ।"
কহে কুম্ভ, "দূরে রহো
　　রানা মহারাজ!"
ভূমির 'পরে জানু পাতি
　　তুলি ধনুঃশর
একা কুম্ভ রক্ষা করে
　　নকল বুঁদিগড়।
রানার সেনা ঘিরি তারে

মুণ্ড কাটে তরবারে—
খেলাগড়ের সিংহদ্বারে
পড়ল ভূমি-'পর,
রক্তে তাহার ধন্য হল
নকল বুঁদিগড়।

৭ কার্তিক ১৩০৬

বিচারক

পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন-প্রণীত চরিতমালা হইতে গৃহীত। অ্যাক্‌ওয়ার্থ্‌ সাহেব প্রণীত Ballads of the Marathas নামক গ্রন্থে, রঘুনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণ রাওয়ের হত্যা সম্বন্ধে প্রচলিত মারাঠি গাথার ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

পুণ্য নগরে রঘুনাথ রাও—
পেশোয়া-নৃপতি বংশ—
রাজাসনে উঠি কহিলেন বীর,
"হরণ করিব ভার পৃথিবীর,
মৈসুর-পতি হৈদরালির
দর্প করিব ধ্বংস।"

দেখিতে দেখিতে পুরিয়া উঠিল
সেনানী আশি সহস্র।
নানা দিকে দিকে, নানা পথে পথে,
মারাঠার যত গিরিদরী হতে
বীরগণ যেন শ্রাবণের স্রোতে
ছুটিয়া আসে অজস্র।
উড়িল গগনে বিজয়পতাকা
ধ্বনির শতেক শঙ্খ।
হুলুরব করে অঙ্গনা সবে,
মারাঠা-নগরী কাঁপিল গরবে,
রহিয়া রহিয়া প্রলয়-আরবে
বাজে ভৈরবডঙ্ক।

ধুলার আড়ালে ধ্বজ-অরণ্যে
        লুকালো প্রভাতসূর্য।
রক্ত অশ্বে রঘুনাথ চলে,
আকাশ বধির জয়কোলাহলে—
সহসা যেন কী মন্ত্রের বলে
        থেমে গেল রণতূর্য।

সহসা কাহার চরণে ভূপতি
        জানালো পরম দৈন্য!
সমরোন্মাদে ছুটিতে ছুটিতে
সহসা নিমেষে কার ইঙ্গিতে
সিংহদুয়ারে থামিল চকিতে
        আশি সহস্র সৈন্য।

ব্রাহ্মণ আসি দাঁড়ালো সমুখে
        ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী।
দুই বাহু তাঁর তুলিয়া উধাও
কহিলেন ডাকি, "রঘুনাথ রাও,
নগর ছাড়িয়া কোথা চলে যাও
        না লয়ে পাপের শাস্তি।"

নীরব হইল জয়কোলাহল,
        নীরব সমরবাদ্য।
"প্রভু, কেন আজি" কহে রঘুনাথ-
"অসময়ে পথ রুধিলে হঠাৎ,
চলেছি করিতে যবননিপাত
        জোগাতে যমের খাদ্য।"

কহিলা শাস্ত্রী, "বধিয়াছ তুমি
        আপন ভ্রাতার পুত্রে।
বিচার তাহার না হয় য'দিন
ততকাল তুমি নহ তো স্বাধীন,
বন্দী রয়েছ অমোঘ কঠিন
        ন্যায়ের বিধানসূত্রে।"

বুঝিয়া উঠিলা রঘুনাথ রাও,
কহিলা করিয়া হাস্য—
"নৃপতি কাহারও বাঁধন না মানে
চলেছি দীপ্ত মুক্ত কৃপাণে,
শুনিতে আসি নি পথমাঝখানে
ন্যায়বিধানের ভাষ্য।"

কহিলা শাস্ত্রী, "রঘুনাথ রাও,
যাও করো গিয়ে যুদ্ধ।
আমিও দণ্ড ছাড়িনু এবার,
ফিরিয়া চলিনু গ্রামে আপনার,
বিচারশালার খেলাঘরে আর
না রহিব অবরুদ্ধ।"

বাজিল শঙ্খ, বাজিল ডঙ্ক,
সেনানী ধাইল ক্ষিপ্র।
ছাড়ি দয়া গেলা গৌরবপদ,
দূরে ফেলি দিলা সব সম্পদ,
গ্রামের কুটিরে চলি গেলা ফিরে
দীন দরিদ্র বিপ্র।

৩ অগ্রহায়ণ ১৩০৬

পণরক্ষা

"মারাঠা দস্যু আসিছে রে ওই—
করো করো সবে সাজ"
আজমীর গড়ে কহিলা হাঁকিয়া
দুর্গেশ দুমরাজ।

বেলা দু-পহরে যে যাহার ঘরে
সেঁকিছে জোয়ারি রুটি,
দুর্গতোরণে নাকাড়া বাজিতে
বাহিরে আসিল ছুটি।
প্রাকারে চড়িয়া দেখিল চাহিয়া
দক্ষিণে বহু দূরে
আকাশ জুড়িয়া উড়িয়াছে ধূলা
মারাঠি অশ্বখুরে।
"মারাঠার যত পতঙ্গপাল
কৃপাণ-অনলে আজ
ঝাঁপ দিয়া পড়ি ফিরে নাকো যেন"
গর্জিলা দুমরাজ।

মাড়োয়ার হতে দূত আসি বলে,
"বৃথা এ সৈন্যসাজ।
হেরো এ প্রভুর আদেশপত্র
দুর্গেশ দুমরাজ।
সিন্দে আসিছে, সঙ্গে তাঁহার
ফিরিঙ্গি সেনাপতি—
সাদরে তাঁদের ছাড়িবে দুর্গ
আজ্ঞা তোমার প্রতি।
বিজয়লক্ষ্মী হয়েছে বিমুখ
বিজয়সিংহ-'পরে—
বিনা সংগ্রামে আজমীর গড়
দিবে মারাঠার করে।"
"প্রভুর আদেশে বীরের ধর্মে
বিরোধ বাধিল আজ"
নিশ্বাস ফেলি কহিলা কাতরে
দুর্গেশ দুমরাজ।

মাড়োয়ার-দূত করিল ঘোষণা
"ছাড়ো ছাড়ো রণসাজ।"

রহিল পাষাণ-মুরতি-সমান
দুর্গেশ দুমরাজ।
বেলা যায় যায়, ধূধূ করে মাঠ,
দূরে দূরে চরে ধেনু—
তরুতলছায়ে সকরুণ রবে
বাজে রাখালের বেণু।
'আজমীর গড় দিলা যবে মোরে
পণ করিলাম মনে,
প্রভুর দুর্গ শত্রুর করে
ছাড়িব না এ জীবনে
প্রভুর আদেশে সে সত্য হায়
ভাঙতে হবে কি আজ।'
এতেক ভাবিয়া ফেলে নিশ্বাস
দুর্গেশ দুমরাজ।

রাজপুত সেনা সরোষে শরমে
ছাড়িল সমরসাজ;
নীরবে দাঁড়ায়ে রহিল তোরণে
দুর্গেশ দুমরাজ।
গেরুয়া-বসনা সন্ধ্যা নামিল
পশ্চিম-মাঠ-পারে;
মারাঠি সৈন্য ধুলা উড়াইয়া
থামিল দুর্গদ্বারে।
"দুয়ারের কাছে কে ওই শয়ান।
ওঠো ওঠো খোলো দ্বার"-
নাহি শোনে কেহ, প্রাণহীন দেহ
সাড়া নাহি দিল আর।
প্রভুর কর্মে বীরের ধর্মে
বিরোধ মিটাতে আজ
দুর্গদুয়ারে ত্যজিয়াছে প্রাণ
দুর্গেশ দুমরাজ।

অগ্রহায়ণ ১৩০৬

গানভঙ্গ

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি,
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর সাতটি যেন পোষা পাখি;
শাণিত তরবারি গলাটি যেন নাচিয়া ফিরে দশ দিকে—
কখন কোথা যায় না পাই দিশা, বিজুলি-হেন ঝিকিমিকি।
আপনি গড়ি তোলে বিপদজাল, আপনি কাটি দেয় তাহা;
সভার লোকে শুনে অবাক মানে, সঘনে বলে 'বাহা বাহা'।

কেবল বুড়া রাজা প্রতাপরায় কাঠের মতো বসি আছে;
বরজলাল ছাড়া কাহারো গান ভালো না লাগে তার কাছে।
বালক-বেলা হতে তাহারি গীতে দিল সে এত কাল যাপি—
বাদল-দিনে কত মেঘের গান, হোলির দিনে কত কাফি।
গেয়েছে আগমনী শরৎপ্রাতে, গেয়েছে বিজয়ার গান—
হৃদয় উছসিয়া অশ্রুজলে ভাসিয়া গেছে দুনয়ান।
যখনি মিলিয়াছে বন্ধুজনে সভার গৃহ গেছে পুরে,
গেয়েছে গোকুলের গোয়াল-গাথা ভূপালি মুলতানি সুরে।
ঘরেতে বার বার এসেছে কত বিবাহ-উৎসব-রাতি—
পরেছে দাসদাসী লোহিত বাস, জ্বলেছে শত শত বাতি,
বসেছে নববর সলাজ মুখে পরিয়া মণি-আভরণ,
করিছে পরিহাস কানের কাছে সমবয়সী প্রিয়জন,
সামনে বসি তার বরজলাল ধরেছে সাহানার সুর—
সে-সব দিন আর সে-সব গান হৃদয়ে আছে পরিপূর।
সে ছাড়া কারও গান শুনিলে তাই মর্মে গিয়ে নাহি লাগে
অতীত প্রাণ যেন মন্ত্রবলে নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে।
প্রতাপরায় তাই দেখিছে শুধু কাশীর বৃথা মাথা-নাড়া—
সুরের পরে সুর ফিরিয়া যায়, হৃদয়ে নাহি পায় সাড়া।

থামিল গান যবে ক্ষণেক-তরে বিরাম মাগে কাশীনাথ;
বরজলাল-পানে প্রতাপরায় হাসিয়া করে আঁখিপাত।

কানের কাছে তার রাখিয়া মুখ
কহিল, "ওস্তাদ জি,
গানের মতো গান শুনায়ে দাও,
এরে কি গান বলে, ছি!
এ যেন পাখি লয়ে বিবিধ ছলে,
শিকারী বিড়ালের খেলা।
সে কালে গান ছিল, এ কালে হায়
গানের বড়ো অবহেলা।"

বরজলাল বুড়া শুক্লকেশ,
শুভ্র উষ্ণীষ শিরে,
মিনতি করি সবে সভার মাঝে
আসন নিল ধীরে ধীরে।
শিরা-বাহির-করা শীর্ণ করে
তুলিয়া নিল তানপুর,
ধরিল নতশিরে নয়ন মুদি
ইমন-কল্যাণ সুর।
কাঁপিয়া ক্ষীণ স্বর মরিয়া যায়
বৃহৎ সভাগৃহ-কোণে,
ক্ষুদ্র পাখি যথা ঝড়ের মাঝে
উড়িতে নারে প্রাণপণে।
বসিয়া বামপাশে প্রতাপরায়,
দিতেছে শত উৎসাহ—
"আহাহা বাহা বাহা" কহিছে কানে,
"গলা ছাড়িয়া গান গাহ।"
সভার লোকে সবে অন্যমনা,
কেহ বা কানাকানি করে.
কেহ বা তোলে হাই, কেহ বা ঢোলে,
কেহ বা চ'লে যায় ঘরে।
"ওরে রে আয় লয়ে তামাকু পান"
ভৃত্যে ডাকি কেহ কয়।
সঘনে পাখা নাড়ি কেহ বা বলে,
"গরম আজি অতিশয়।"
করিছে আনাগোনা ব্যস্ত লোক,
ক্ষণেক নাহি রহে চুপ।
নীরব ছিল সভা, ক্রমশ সেথা
শব্দ উঠে শতরূপ।

বুড়ার গান তাহে ডুবিয়া যায়
তুফান-মাছে ক্ষীণ তরী—
কেবল দেখা যায় তানপুরায়
আঙুল কাঁপে থরথরি।
হৃদয়ে যেথা হতে গানের সুর
উছসি উঠে নিজসুখে
হেলার কলরব শিলার মতো
চাপে সে উৎসের মুখে—
কোথায় গান আর কোথায় প্রাণ
দু দিকে ধায় দুই জনে,
তবুও রাখিবারে প্রভুর মান
বরজ গায় প্রাণপণে।
গনের এক পদ মনের ভ্রমে
হারায়ে গেল কী করিয়া,
আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গাহে—
লইতে চাহে শুধরিয়া।
আবার ভুলে যায়, পড়ে না মনে,
শরমে মস্তক নাড়ি
আবার শুরু হতে ধরিল গান—
আবার ভুলি দিল ছাড়ি।
দ্বিগুণ থরথরি কাঁপিছে হাত,
স্মরণ করে গুরুদেবে।
কণ্ঠ কাঁপিতেছে কাতরে, যেন
বাতাসে দীপ নেবে-নেবে।

গানের পদ তবে ছাড়িয়া দিয়া
রাখিল সুরটুকু ধরি,
সহসা হাহারবে উঠিল কাঁদি
গাহিতে গিয়া হা-হা করি।

কোথায় দূরে গেল সুরের খেলা,
কোথায় তাল গেল ভাসি,
গানের সুতা ছিঁড়ি পড়িল খসি,
অশ্রু-মুকুতার রাশি।
কোলের সখী তানপুরার 'পরে
রাখিল লজ্জিত মাথা—
ভুলিল শেখা গান, পড়িল মনে
বাল্যক্রন্দনগাথা।
নয়ন ছলছল, প্রতাপরায়
কর বুলায় তার দেহে—
"আইস হেথা হতে আমরা যাই"
কহিল সকরুণ স্নেহে।
শতেক-দীপ-জ্বালা নয়ন-ভরা
ছাড়ি সে উৎসবঘর
বাহিরে গেল দুটি প্রাচীন সখা
ধরিয়া দুঁহু দোঁহা-কর।

বরজ করজোড়ে কহিল, "প্রভু,
মোদের সভা হল ভঙ্গ।
এখন আসিয়াছে নূতন লোক,
ধরায় নব নব রঙ্গ।
জগতে আমাদের বিজন সভা
কেবল তুমি আর আমি—
সেথায় আনিয়ো না নূতন শ্রোতা,
মিনতি তব পদে স্বামী।
একাকী গায়কের নহে তো গান,
মিলিতে হবে দুই জনে—
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা,
আরেক জন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ,
তবে সে কলতান উঠে—
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে,
তবে সে মর্মর ফুটে।
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি
যুগল মিলিয়াছে আগে—
যেখানে প্রেম নাই, বোবার সভা,
সেখানে গান নাহি জাগে।"

বোট। শিলাইদহ
২৪ আষাঢ় ১২৯৯

পুরাতন ভৃত্য

ভূতের মতন চেহারা যেমন,
নির্বোধ অতি ঘোর—
যা-কিছু হারায় গিন্নি বলেন,
"কেষ্টা বেটাই চোর।"

উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে।
যত পায় বেত না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে।
বড়ো প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ চীৎকার করি "কেষ্টা"—
যত করি তাড়া নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা।
তিনখানা দিলে একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে;
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা করে আনে.
যেখানে সেখানে দিবসে দুপুরে নিদ্রাটি আছে সাধা;
মহাকলরবে গালি দেই যবে "পাজি হতভাগা গাধা"—
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে, দেখে জ্বলে যায় পিত্ত।
তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার— বড়ো পুরাতন ভৃত্য।

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষমূর্তি বলে, "আর পারি নাকো,
রহিল তোমার এ ঘর-দুয়ার, কেষ্টারে লয়ে থাকো।
না মানে শাসন বসন বাসন অশন আসন যত
কোথায় কী গেল, শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মতো।
গেলে সে বাজার সারা দিনে আর দেখা পাওয়া তার ভার—
করিলে চেষ্টা কেষ্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলে না আর!"
শুনে মহা রেগে ছুটে যাই বেগে, আনি তার টিকি ধরে;
বলি তারে, 'পাজি, বেরো তুই আজই, দূর করে দিনু তোরে।"
ধীরে চলে যায়, ভাবি গেল দায়; পরদিনে উঠে দেখি,
হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি—
প্রসন্ন মুখ, নাহি কোনো দুখ, অতি অকাতর চিত্ত।
ছাড়ালে না ছাড়ে, কী করিব তারে— মোর পুরাতন ভৃত্য!

সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা করিয়া দালালগিরি।
করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি।
পরিবার তায় সাথে যেতে চায়, বুঝায়ে বলিনু তারে—
পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে।
লয়ে রশারশি করি কষাকষি পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধি
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে গৃহিণী কহিল কাঁদি,
"পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে নিয়ে কষ্ট অনেক পাবে।"

আমি কহিলাম, "আরে রাম রাম!
নিবারণ সাথে যাবে।"
রেলগাড়ি ধায়; হেরিলাম হায়
নামিয়া বর্ধমানে—
কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত,
তামাক সাজিয়া আনে!
স্পর্ধা তাহার হেনমতে আর
কত বা সহিব নিত্য!
যত তারে দুষি তবু হনু খুশি
হেরি পুরাতন ভৃত্য!

নামিনু শ্রীধামে—দক্ষিণে বামে
পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা
করিল কণ্ঠাগত।
জন-ছয়-সাতে মিলি এক-সাথে
পরম বন্ধুভাবে
করিলাম বাসা; মনে হল আশা,
আরামে দিবস যাবে।
কোথা ব্রজবালা কোথা বনমালা,
কোথা বনমালী হরি!
কোথা হা হন্ত, চিরবসন্ত!
আমি বসন্তে মরি।
বন্ধু যে যত স্বপ্নের মতো
বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ;
আমি একা ঘরে, ব্যাধি-খরশরে
ভরিল সকল অঙ্গ।
ডাকি নিশিদিন সকরুণ ক্ষীণ,
"কেষ্ট আয় রে কাছে।
এত দিনে শেষে আসিয়া বিদেশে
প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে।"
হেরি তার মুখ ভরে ওঠে বুক,
সে যেন পরম বিত্ত—
নিশিদিন ধরে দাঁড়ায়ে শিয়রে
মোর পুরাতন ভৃত্য।

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল,
শিরে দেয় মোর হাত;
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম,
মুখে নাই তার ভাত।
বলে বার বার, "কর্তা, তোমার
কোনো ভয় নাই, শুন—
যাবে দেশে ফিরে, মাঠাকুরানীরে
দেখিতে পাইবে পুন।"
লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম;
তাহারে ধরিল জ্বরে;
নিল সে আমার কালব্যাধিভার
আপনার দেহ-'পরে।
হয়ে জ্ঞানহীন কাটিল দু দিন,
বন্ধ হইল নাড়ী;
এতবার তারে গেনু ছাড়াবারে,
এত দিনে গেল ছাড়ি।
বহুদিন পরে আপনার ঘরে
ফিরিনু সারিয়া তীর্থ;
আজ সাথে নেই চিরসাথি সেই
মোর পুরাতন ভৃত্য।

১২ ফাল্গুন ১৩০১

দুই বিঘা জমি

শুধু বিঘে-দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবই গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, "বুঝেছ উপেন? এ জমি লইব কিনে।"
কহিলাম আমি, "তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই।
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো জোর মরিবার মতো ঠাঁই।"
শুনি রাজা কহে, "বাপু, জান তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা—
ওটা দিতে হবে।" কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজলচক্ষে, "করুন রক্ষে গরিবের ভিটেখানি!
সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া!
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!"
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে;
কহিলেন শেষে ক্রুর হাসি হেসে, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে।"

পরে মাস-দেড়ে ভিটেমাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রি সকলি বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি!
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
মনে ভাবিলাম, মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু বিঘার পরিবর্তে।
সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য—
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য।
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি,
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে সেই দুই বিঘা জমি।
হাটে মাঠে বাটে এইমত কাটে বছর পনেরো-ষোলো,
একদিন শেষে ফিরিবার দেশে বড়োই বাসনা হল।

নমোনমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি—
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।

অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি—
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ—
স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল, নিশীথশীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু, বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে—
"মা" বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।
দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে,
কুমোরের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি রথতলা করি বামে—
রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে।

বিদীর্ণ-হিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারি দিকে চেয়ে দেখি;
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে সেই আমগাছ, একি !
বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালক-কালের কথা।
সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম—
অতি ভোরে উঠি তাড়তাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম;
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন—
ভাবিলাম, হায়, আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন।
সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে;
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।
ভাবিলাম মনে, বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা—
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা।

হেনকালে হায় যমদূত প্রায় কোথা হতে এল মালী,
ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।
কহিলাম তবে, "আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব—
দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব।"
চিনিল না মোরে, নিয়ে গেল ধরে কাঁধে তুলি লাঠিগাছ;
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ-সাথে ধরিতেছিলেন মাছ।
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, "মারিয়া করিব খুন।"
বাবু যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ।
আমি কহিলাম, "শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয়।"

বাবু কহে হেসে, "বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।"
আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে!
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

দেবতার গ্রাস

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে
মৈত্রমহাশয় যাবে সাগরসঙ্গমে
তীর্থস্নান লাগি। সঙ্গীদল গেল জুটি
কত বালবৃদ্ধ নরনারী; নৌকা দুটি
প্রস্তুত হইল ঘাটে।

পুণ্যলোভাতুর
মোক্ষদা কহিল আসি, "হে দাদাঠাকুর
আমি তব হব সাথি।" বিধবা যুবতী—
দুখানি করুণ আঁখি মানে না যুকতি,
কেবল মিনতি করে—অনুরোধ তার
এড়ানো কঠিন বড়ো। "স্থান কোথা আর"
মৈত্র কহিলেন তারে। "পায়ে ধরি তব"
বিধবা কহিল কাঁদি, "স্থান করি লব
কোনোমতে একধারে।" ভিজে গেল মন,
তবু দ্বিধাভরে তারে শুধালো ব্রাহ্মণ,
"নাবালক ছেলেটির কী করিবে তবে।"
উত্তর করিল নারী, "রাখাল? সে রবে
আপন মাসির কাছে। তার জন্ম-পরে
বহু দিন ভুগেছিনু সূতিকার জ্বরে,
বাঁচিব ছিল না আশা; অন্নদা তখন
আপন শিশুর সাথে দিয়ে তারে স্তন
মানুষ করেছে যত্নে—সেই হতে ছেলে

মাসির আদরে আছে মার কোল ফেলে।
দুরন্ত মানে না কারে, করিলে শাসন
মাসি আসি অশ্রুজলে ভরিয়া নয়ন
কোলে তারে টেনে লয়। সে থাকিবে সুখে
মার চেয়ে আপনার মাসিমার বুকে।"

সম্মত হইল বিপ্র। মোক্ষদা সত্বর
প্রস্তুত হইল বাঁধি জিনিস-পত্তর,
প্রণমিয়া গুরুজনে, সখীদলবলে
ভাসাইয়া বিদায়ের শোক-অশ্রুজলে।
ঘাটে আসি দেখে সেথা আগে-ভাগে ছুটি
রাখাল বসিয়া আছে তরী-'পরে উঠি
নিশ্চিন্ত নীরবে। "তুই হেথা কেন ওরে"
মা শুধালো। সে কহিল, "যাইব সাগরে।"
"যাইবি সাগরে! আরে, ওরে দস্যু ছেলে,
নেমে আয়।" পুনরায় দৃঢ় চক্ষু মেলে
সে কহিল দুটি কথা, "যাইব সাগরে।"
যত তার বাহু ধরি টানাটানি করে
রহিল সে তরণী আঁকড়ি। অবশেষে
ব্রাহ্মণ করুণ স্নেহে কহিলেন হেসে,
"থাক্ থাক্, সঙ্গে যাক।" মা রাগিয়া বলে,
"চল্, তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে।"
যেমনি সে কথা গেল আপনার কানে
অমনি মায়ের বক্ষ অনুতাপবাণে
বিঁধিয়া কাঁদিয়া উঠে। মুদিয়া নয়ন
"নারায়ণ নারায়ণ" করিল স্মরণ—
পুত্রে নিল কোলে তুলি, তার সর্বদেহে
করুণ কল্যাণহস্ত বুলাইল স্নেহে।
মৈত্র তারে ডাকি ধীরে চুপি চুপি কয়,
"ছি ছি ছি, এমন কথা বলিবার নয়।"

রাখাল যাইবে সাথে স্থির হ'ল কথা—
অন্নদা লোকের মুখে শুনি সে বারতা

ছুটে আসি বলে, "বাছা, কোথা যাবি ওরে!"
রাখাল কহিল হাসি, "চলিনু সাগরে।
আবার ফিরিব মাসি!" পাগলের প্রায়
অন্নদা কহিল ডাকি, "ঠাকুরমশায়,
বড়ো যে দুরন্ত ছেলে রাখাল আমার,
কে তাহারে সামালিবে! জন্ম হতে তার
মাসি ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকে নি কোথাও;
কোথা এরে নিয়ে যাবে, ফিরে দিয়ে যাও।"
রাখাল কহিল, "মাসি, যাইব সাগরে,
আবার ফিরিব আমি।" বিপ্র স্নেহভরে
কহিলেন, "যতক্ষণ আমি আছি ভাই,
তোমার রাখাল লাগি কোনো ভয় নাই।
এমন শীতের দিন শান্ত নদীনদ,
অনেক যাত্রীর মেলা, পথের বিপদ
কিছু নাই; যাতায়াতে মাস-দুই কাল—
তোমারে ফিরায়ে দিব তোমার রাখাল।"

শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি নৌকা দিল ছাড়ি,
দাঁড়ায়ে রহিল ঘাটে যত কুলনারী
অশ্রুচোখে। হেমন্তের প্রভাতশিশিরে
ছলছল করে গ্রাম চূর্ণীনদীতীরে।

যাত্রীদল ফিরে আসে, সাঙ্গ হল মেলা।
তরণী তীরেতে বাঁধা অপরাহ্ণবেলা
জোয়ারের আশে। কৌতূহল-অবসান
কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ
মাসির কোলের লাগি। জল শুধু জল,
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।
মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর
খল জল ছল-ভরা; তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের, লালায়িত মুখ।

হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমূক,
অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন,
সর্ব-উপদ্রবসহা আনন্দভবন
শ্যামলকোমলা, যেথা যে-কেহই থাকে
অদৃশ্য দু বাহু মেলি টানিছ তাহাকে
অহরহ, অয়ি মুগ্ধে, কী বিপুল টানে
দিগন্তবিস্তৃত তব শান্ত বক্ষ-পানে।

চঞ্চল বালক আসি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
অধীর উৎসুক কণ্ঠে শুধায় ব্রাহ্মণে,
"ঠাকুর, কখন আজি আসিবে জোয়ার।"

সহসা স্তিমিত জলে আবেগসঞ্চার
দুই কূল চেতাইল আশার সংবাদে।
ফিরিল তরীর মুখ, মৃদু আর্তনাদে
কাছিতে পড়িল টান, কলশব্দগীতে
সিন্ধুর বিজয়রথ পশিল নদীতে—
আসিল জোয়ার। মাঝি দেবতারে স্মরি
ত্বরিত উত্তরমুখে খুলে দিল তরী।
রাখাল শুধায় আসি ব্রাহ্মণের কাছে,
"দেশে পঁহুছিতে আর কত দিন আছে।"

সূর্য অস্ত না যাইতে, ক্রোশ দুই ছেড়ে
উত্তর-বায়ুর বেগ ক্রমে ওঠে বেড়ে!
রূপনারানের মুখে পড়ি বালুচর
সংকীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমর
জোয়ারের স্রোতে আর উত্তরসমীরে
উত্তাল উদ্দাম। "তরণী ভিড়াও তীরে"
উচ্চকণ্ঠে বারম্বার কহে যাত্রীদল।
কোথা তীর। চারি দিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্র নৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে, আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে। এক দিকে যায় দেখা

অতিদূর তীরপ্রান্তে নীল বনরেখা,
অন্য দিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিবাশি
প্রশান্ত সূর্যাস্ত-পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধত বিদ্রোহভরে। নাহি মানে হাল,
ঘুরে টলমল তরী অশান্ত মাতাল
মূঢ়সম! তীব্রশীতপবনের সনে
মিশিয়া ত্রাসের হিম নরনারীগণে
কাঁপাইছে থরহরি। কেহ হতবাক্‌,
কেহ বা ক্রন্দন করে ছাড়ি ঊর্ধ্বডাক
ডাকি আত্মজনে। মৈত্র শুষ্ক পাংশুমুখে
চক্ষু মুদি করে জপ। জননীর বুকে
রাখাল লুকায়ে মুখ কাঁপিছে নীরবে।
তখন বিপন্ন মাঝি ডাকি কহে সবে,
"বাবারে দিয়েছে ফাঁকি তোমাদের কেউ,
যা মেনেছে দেয় নাই, তাই এত ঢেউ—
অসময়ে এ তুফান। শুন এই বেলা—
করহ মানত রক্ষা, করিয়ো না খেলা
ক্রুদ্ধ দেবতার সনে।" যার যত ছিল
অর্থ বস্ত্র যাহা-কিছু জলে ফেলি দিল
না করি বিচার। তবু, তখনি পলকে
তরীতে উঠিল জল দারুণ ঝলকে।
মাঝি কহে পুনর্বার, "দেবতার ধন
কে যায় ফিরায়ে লয়ে এই বেলা শোন্‌।
ব্রাহ্মণ সহসা উঠি কহিলা তখনি
মোক্ষদারে লক্ষ্য করি, "এই সে রমণী
দেবতারে সঁপি দিয়া আপনার ছেলে
চুরি করে নিয়ে যায়।" "দাও তারে ফেলে"
এক বাক্যে গর্জি উঠে তরাসে নিষ্ঠুর
যাত্রী সবে। কহে নারী, "হে দাদাঠাকুর,
রক্ষা করো, রক্ষা করো।" দুই দৃঢ় করে
রাখালেরে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরে।
ভর্ৎসিয়া গর্জিয়া উঠি কহিলা ব্রাহ্মণ,
"আমি তোর রক্ষাকর্তা! রোষে নিশ্চেতন

মা হয়ে আপন পুত্র দিলি দেবতারে—
শেষকালে আমি রক্ষা করিব তাহারে!
শোধ্ দেবতার ঋণ; সত্য ভঙ্গ ক'রে
এতগুলি প্রাণী তুই ডুবাবি সাগরে!"
মোক্ষদা কহিল, "অতি মূর্খ নারী আমি,
কী বলেছি রোষবশে—ওগো অন্তর্যামী,
সেই সত্য হল! সে যে মিথ্যা কত দূর
তখনি শুনে কি তুমি বোঝ নি ঠাকুর।
শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা,
শোন নি কি জননীর অন্তরের কথা!"

বলিতে বলিতে যত মিলি মাঝি-দাঁড়ি
বল করি রাখালেরে নিল ছিঁড়ি কাড়ি
মার বক্ষ হতে। মৈত্র মুদি দুই আঁখি
ফিরায়ে রহিল মুখ কানে হাত ঢাকি
দন্তে দন্ত চাপি বলে। কে তাঁরে সহসা
মর্মে মর্মে আঘাতিল বিদ্যুতের কশা—
দংশিল বৃশ্চিকদংশ। "মাসি! মাসি! মাসি!"
বিন্ধিল বহ্নির শলা রুদ্ধ কর্ণে আসি
নিরুপায় অনাথের অন্তিমের ডাক।
চীৎকারি উঠিল বিপ্র, "রাখ্ রাখ্ রাখ্!"
চকিতে হেরিল চাহি মূর্ছি আছে পড়ে
মোক্ষদা চরণে তাঁর। মুহূর্তের তরে
ফুটন্ত তরঙ্গ-মাঝে মেলি আর্ত চোখ
"মাসি" বলি ফুকারিয়া মিলালো বালক
অনন্ততিমিরতলে; শুধু ক্ষীণ মুঠি
বারেক ব্যাকুল বলে ঊর্ধ্ব-পানে উঠি
আকাশে আশ্রয় খুঁজি ডুবিল হতাশে।
"ফিরায়ে আনিব তোরে" কহি ঊর্ধ্বশ্বাসে
ব্রাহ্মণ মুহূর্তমাঝে ঝাঁপ দিল জলে—
আর উঠিল না। সূর্য গেল অস্তাচলে।

১৩ কার্তিক ১৩০৪

নিষ্ফল উপহার

নিম্নে আবর্তিয়া ছুটে যমুনার জল—
দুই তীরে গিরিতট, উচ্চ শিলাতল!
সংকীর্ণ গুহার পথে মূর্ছি জলধার
উন্মত্ত প্রলাপে ওঠে গর্জি অনিবার।

এলায়ে জটিল বক্র নির্ঝরের বেণী
নীলাভ দিগন্তে ধায় নীল গিরিশ্রেণী।
স্থির তাহা, নিশিদিন তবু যেন চলে—
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।

মাঝে মাঝে শাল তাল রয়েছে দাঁড়ায়ে,
মেঘেরে ডাকিছে গিরি ইঙ্গিত বাড়ায়ে।
তৃণহীন সুকঠিন শতদীর্ণ ধরা,
রৌদ্রবর্ণ বনফুলে কাঁটাগাছ ভরা।

দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরায়ে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে গিরি আপনার ছায়ে—
পথশূন্য, জনশূন্য, সাড়া-শব্দ-হীন।
ডুবে রবি যেমন সে ডুবে প্রতিদিন।

রঘুনাথ হেথা আসি যবে উত্তরিলা
শিখগুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা।
রঘু কহিলেন নমি চরণে তাঁহার,
"দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার।"
বাহু বাড়াইয়া গুরু শুধায়ে কুশল
আশিসিলা মাথায় পরশি করতল।
কনকে মাণিক্যে গাঁথা বলয় দুখানি
গুরুপদে দিলা রঘু জুড়ি দুই পাণি।
ভূমিতল হতে বালা লইলেন তুলে,
দেখিতে লাগিলা প্রভু ঘুরায়ে অঙ্গুলে।

হীরকের সূচীমুখ শতবার ঘুরি
হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি।

ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিলা রাখি,
আবার সে পুঁথি-'পরে নিবেশিলা আঁখি।
সহসা একটি বালা শিলাতল হতে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে।

"আহা আহা" চীৎকার করি রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু হাত।
আগ্রহে সমস্ত তার প্রাণময় কায়
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায়।

বারেকের তরে গুরু না তুলিলা মুখ,
নিভৃত অন্তরে তাঁর জাগে পাঠসুখ।
কালো জল কটাক্ষিয়া চলে ঘুরি ঘুরি,
যেন সে ছলনা-ভরা সুগভীর চুরি।

দিবালোক চলে গেল দিবসের পিছু,
যমুনা উতলা করি না মিলিল কিছু।
সিক্ত বস্ত্রে, রিক্ত হাতে, শ্রান্ত নতশিরে
রঘুনাথ গুরু-কাছে আসিলেন ফিরে।

"এখনো উঠাতে পারি" করজোড়ে যাচে,
"যদি দেখাইয়া দাও কোনখানে আছে।"
দ্বিতীয় কঙ্কণখানি ছুঁড়ি দিয়া জলে
গুরু কহিলেন, "আছে ওই নদীতলে।"

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫

দীনদান

নিবেদিল রাজভৃত্য, "মহারাজ, বহু অনুনয়ে
সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তোমার সোনার দেবালয়ে

না লয়ে আশ্রয় আজি পথপ্রান্তে তরুচ্ছায়াতলে
করিছেন নামসংকীর্তন। ভক্তবৃন্দ দলে দলে
ঘেরি তাঁরে দরদর-উদ্‌বেলিত আনন্দধারায়
ধৌত ধন্য করিছেন ধরণীর ধূলি। শূন্যপ্রায়
দেবাঙ্গন; ভৃঙ্গ যথা স্বর্ণময় মধুভাণ্ড ফেলি
সহসা কমলগন্ধে মত্ত হয়ে দ্রুত পক্ষ মেলি
ছুটে যায় গুঞ্জরিয়া উন্মীলিত পদ্ম-উপবনে
উন্মুখ পিপাসা-ভরে, সেইমত নরনারীগণে
সোনার দেউল পানে না তাকায়ে চলিয়াছে ছুটি
যেথায় পথের প্রান্তে ভক্তের হৃদয়পদ্ম ফুটি
বিতরিছে স্বর্গের সৌরভ। রত্নবেদিকার 'পরে
একা দেব রিক্ত দেবালয়ে।"

শুনি রাজা ক্ষোভভরে
সিংহাসন হতে নামি গেলা চলি যেথা তরুচ্ছায়ে
সাধু বসি তৃণাসনে; কহিলেন নমি তাঁর পায়ে,
"হেরো, প্রভু, স্বর্ণ-শীর্ষ নৃপতিনির্মিত নিকেতন
অভ্রভেদী দেবালয়—তারে কেন করিয়া বর্জন
দেবতার স্তবগান গাহিতেছ পথপ্রান্তে বসে।"
"সে মন্দিরে দেব নাই" কহে সাধু।

রাজা কহে রোষে,
"দেব নাই! হে সন্ন্যাসী, নাস্তিকের মতো কথা কহ।
রত্নসিংহাসন-'পরে দীপিতেছে রতনবিগ্রহ—
শূন্য তাহা?"

"শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূর্ণ" সাধু কহে—
"আপনায় স্থাপিয়াছ, জগতের দেবতারে নহে।"
ভ্রূ কুঞ্চিয়া কহে রাজা, "বিংশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া
রচিয়াছি অনিন্দিত যে মন্দির অম্বর ভেদিয়া,
পূজামন্ত্রে নিবেদিয়া দেবতারে করিয়াছি দান,
তুমি কহ সে মন্দিরে দেবতার নাই কোনো স্থান!"

শান্তমুখে কহে সাধু, "যে বৎসর বহ্নিদাহে দীন
বিংশতি সহস্র প্রজা গৃহহীন অন্নবস্ত্রহীন
দাঁড়াইল দ্বারে তব, কেঁদে গেল ব্যর্থ প্রার্থনায়
অরণ্যে, গুহার গর্ভে, পথপ্রান্তে তরুর ছায়ায়,
অশ্বত্থবিদীর্ণ জীর্ণ মন্দিরপ্রাঙ্গণে, সে বৎসর
বিংশ লক্ষ মুদ্রা দিয়া রচি তব স্বর্ণদৃপ্ত ঘর
দেবতারে সমর্পিলে! সেদিন কহিলা ভগবান,
'আমার অনাদি ঘরে অগণ্য আলোক দীপ্যমান
অনন্তনীলিমামাঝে; মোর ঘরে ভিত্তি চিরন্তন
সত্য, শান্তি, দয়া, প্রেম। দীনশক্তি যে ক্ষুদ্র কৃপণ
নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে
সে আমারে গৃহ করে দান!' চলি গেলা সেই ক্ষণে
পথপ্রান্তে তরুতলে দীনসাথে দীনের আশ্রয়।
অগাধ সমুদ্র-মাঝে স্ফীত ফেন যথা শূন্যময়
তেমনি পরম শূন্য তোমার মন্দির বিশ্বতলে
স্বর্ণ আর দর্পের বুদ্‌বুদ।"

রাজা জ্বলি রোষানলে
কহিলেন, "রে ভণ্ড পামর, মোর রাজ্য ত্যাগ ক'রে
এ মুহূর্তে চলি যাও।"
সন্ন্যাসী কহিলা শান্ত স্বরে,
"ভক্তবৎসলেরে তুমি যেথায় পাঠালে নির্বাসনে
সেইখানে, মহারাজ, নির্বাসিত করো ভক্তজনে।"

২০ শ্রাবণ ১৩০৭

বিসর্জন

দুইটি কোলের ছেলে গেছে পর পর
বয়স না হতে হতে পুরা দু বছর।
এবার ছেলেটি তার জন্মিল যখন
স্বামীরেও হারালো মল্লিকা। বন্ধুজন
বুঝাইল— পূর্বজন্মে ছিল বহু পাপ,
এ জনমে তাই হেন দারুণ সন্তাপ।
শোকানলদগ্ধ নারী একান্ত বিনয়ে
অজ্ঞাত জন্মের পাপ শিরে বহি লয়ে
প্রায়শ্চিত্তে দিল মন। মন্দিরে মন্দিরে
যেথা সেথা গ্রামে গ্রামে পূজা দিয়া ফিরে।
ব্রতধ্যান-উপবাসে আহ্নিকে তর্পণে
কাটে দিন ধূপে দীপে নৈবেদ্যে চন্দনে,
পূজাগৃহে; কেশে বাঁধি রাখিল মাদুলি
কুড়াইয়া শত ব্রাহ্মণের পদধূলি;
শুনে রামায়ণকথা; সন্ন্যাসী-সাধুরে
ঘরে আনি আশীর্বাদ করায় শিশুরে।
বিশ্বমাঝে আপনারে রাখি সর্ব-নীচে
সবার প্রসন্ন দৃষ্টি অভাগী মাগিছে
আপন সন্তান-লাগি; সূর্য চন্দ্র হতে
পশু পক্ষী পতঙ্গ অবধি— কোনোমতে
কেহ পাছে কোনো অপরাধ লয় মনে,
পাছে কেহ করে ক্ষোভ, অজানা কারণে
পাছে কারো লাগে ব্যথা, সকলের কাছে
আকুল বেদনা-ভরে দীন হয়ে আছে।

যখন বছর-দেড় বয়স শিশুর—
যকৃতের ঘটিল বিকার; জ্বরাতুর

দেহখানি শীর্ণ হয়ে আসে। দেবালয়ে
মানিল মানত মাতা, পদামৃত লয়ে
করাইল পান, হরিসংকীর্তন-গানে
কাঁপিল প্রাঙ্গণ। ব্যাধি শান্তি নাহি মানে।
কাঁদিয়া শুধালো নারী, "ব্রাহ্মণঠাকুর,
এত দুঃখে তবু পাপ নাহি হল দূর!
দিনরাত্রি দেবতার মেনেছি দোহাই,
দিয়েছি এত যে পূজা, তবু রক্ষা নাই!
তবু কি নেবেন তারা আমার বাছারে!
এত ক্ষুধা দেবতার! এত ভারে ভারে
নৈবেদ্য দিলাম খেতে বেচিয়া গহনা,
সর্বস্ব খাওয়ানু তবু ক্ষুধা মিটিল না।"
ব্রাহ্মণ কহিল, "বাছা, এ যে ঘোর কলি।
অনেক করেছ বটে, তবু এও বলি—
আজকাল তেমন কি ভক্তি আছে কারো?
সত্যযুগে যা পারিত তা কি আজ পারো?
দানবীর কর্ণ-কাছে ধর্ম যবে এসে
পুত্রেরে চাহিল খেতে ব্রাহ্মণের বেশে,
নিজ হস্তে সন্তানে কাটিল; তখনি সে
শিশুরে ফিরিয়া পেল চক্ষের নিমেষে।
শিবিরাজা শ্যেনরূপী ইন্দ্রের মুখেতে
আপন বুকের মাংস কাটি দিল খেতে—
পাইল অক্ষয় দেহ। নিষ্ঠা এরে বলে।
তেমন কি এ কালেতে আছে ভূমণ্ডলে।
মনে আছে ছেলেবেলা গল্প শুনিয়াছি
মার কাছে—তাঁদের গ্রামের কাছাকাছি
ছিল এক বন্ধ্যা নারী, না পাইয়া পথ
প্রথম গর্ভের ছেলে করিল মানত
মা-গঙ্গার কাছে। শেষে পুত্রজন্ম-পরে,
অভাগী বিধবা হল; গেল সে সাগরে,
কহিল সে নিষ্ঠাভরে মা-গঙ্গারে ডেকে,
'মা, তোমারি কোলে আমি দিলাম ছেলেকে—
এ মোর প্রথম পুত্র, শেষ পুত্র এই,

এ জন্মের তরে আর পুত্র-আশা নেই।'
যেমন জলেতে ফেলা, মাতা ভাগীরথী
মকরবাহিনী-রূপে হয়ে মূর্তিমতী
শিশু লয়ে আপনার পদ্মকরতলে
মার কোলে সমর্পিল।— নিষ্ঠা এরে বলে।"
মল্লিকা ফিরিয়া এল নতশির ক'রে,
আপনারে ধিক্কারিল, "এত দিন ধরে
বৃথা ব্রত করিলাম, বৃথা দেবার্চনা—
নিষ্ঠাহীনা পাপিষ্ঠারে ফল মিলিল না।"

ঘরে ফিরে এসে দেখে শিশু অচেতন
জ্বরাবেশে; অঙ্গ যেন অগ্নির মতন।
ঔষধ গিলাতে যায় যত বার বার
পড়ে যায়—কণ্ঠ দিয়া নামিল না আর।
দন্তে দন্তে গেল আঁটি। বৈদ্য শির নাড়ি
ধীরে ধীরে চলি গেল রোগীগৃহ ছাড়ি।
সন্ধ্যার আঁধারে শূন্য বিধবার ঘরে
একটি মলিন দীপ শয়নশিয়রে,
একা শোকাতুরা নারী। শিশু একবার
জ্যোতিহীন আঁখি মেলি যেন চারি ধার
খুঁজিল কাহারে। নারী কাঁদিল কাতর—
"ও মানিক, ওরে সোনা, এই-যে মা তোর,
এই-যে মায়ের কোল, ভয় কী রে বাপ।"
বক্ষে তারে চাপি ধরি তার জ্বরতাপ
চাহিল কাড়িয়া নিতে অঙ্গে আপনার
প্রাণপণে। সহসা বাতাসে গৃহদ্বার
খুলে গেল; ক্ষীণ দীপ নিবিল তখনি;
সহসা বাহির হতে কলকলধ্বনি
পশিল গৃহের মাঝে। চমকিল নারী,
দাঁড়ায়ে উঠিল বেগে শয্যাতল ছাড়ি;
কহিল, "মায়ের ডাক ওই শোনা যায়—
ও মোর দুঃখীর ধন, পেয়েছি উপায়—
তোর মার কোল চেয়ে সুশীতল কোল
আছে ওরে বাছা।"

জাগিয়াছে কলরোল
অদূরে জাহ্নবীজলে, এসেছে জোয়ার
পূর্ণিমায়। শিশুর তাপিত দেহভার
বক্ষে লয়ে মাতা, গেল শূন্য ঘাট-পানে।
কহিল, "মা, মার ব্যথা যদি বাজে প্রাণে
তবে এ শিশুর তাপ দে গো মা, জুড়ায়ে।
একমাত্র ধন মোর দিনু তোর পায়ে
একমনে।" এত বলি সমর্পিল জলে
অচেতন শিশুটিরে লয়ে করতলে
চক্ষু মুদি। বহুক্ষণ আঁখি মেলিল না।
ধ্যানে নিরখিল বসি, মকরবাহনা
জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি ক্ষুদ্র শিশুটিরে
কোলে করে এসেছেন, রাখি তার শিরে
একটি পদ্মের দল। হাসিমুখে ছেলে
অনিন্দিত কান্তি ধরি দেবী-কোল ফেলে
মার কোলে আসিবারে বাড়ায়েছে কর।
কহে দেবী, "রে দুঃখিনী, এই তুই ধর্,
তোর ধন তোরে দিনু।" রোমাঞ্চিতকায়
নয়ন মেলিয়া কহে, "কই মা... কোথায়!"...
পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে বিহ্বলা জননী;
গঙ্গা বহি চলি যায় করি কলধ্বনি।
চীৎকারি উঠিল নারী, "দিবি নে ফিরায়ে!"
মর্মরিল বনভূমি দক্ষিণের বায়ে।

২৪ আশ্বিন ১৩০৬

জুতা-আবিষ্কার

কহিলা হবু, "শুন গো গোবুরায়,
কালিকে আমি ভেবেছি সারা রাত্র-
মলিন ধুলা লাগিবে কেন পায়
ধরণীমাঝে চরণ ফেলা মাত্র।

তোমরা শুধু বেতন লহ্ বাঁটি,
রাজার কাজে কিছুই নাহি দৃষ্টি।
আমার মাটি লাগায় মোরে মাটি,
রাজ্যে মোর এ কী এ অনাসৃষ্টি।
শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার,
নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর।"
শুনিয়া গোবু ভাবিয়া হল খুন,
দারুণ ত্রাসে ঘর্ম বহে গাত্রে।
পণ্ডিতের হইল মুখ চুন,
পাত্রদের নিদ্রা নাহি রাত্রে।
রান্নাঘরে নাহিকো চড়ে হাঁড়ি,
কান্নাকাটি পড়িল বাড়ি-মধ্যে,
অশ্রুজলে ভাসায়ে পাকা দাড়ি
কহিলা গোবু হবুর পাদপদ্মে—
"যদি না ধুলা লাগিবে তব পায়ে
পায়ের ধুলা পাইব কী উপায়ে।"

শুনিয়া রাজা ভাবিল দুলি দুলি;
কহিল শেষে, "কথাটা বটে সত্য।
কিন্তু আগে বিদায় করো ধূলি,
ভাবিয়ো পরে পদধূলির তত্ত্ব।
ধুলা-অভাবে না পেলে পদধুলা
তোমরা সবে মাহিনা খাও মিথ্যে,
কেন বা তবে পুষিনু এতগুলা
উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক ভৃত্যে।
আগের কাজ আগে তো তুমি সারো,
পরের কথা ভাবিয়ো পরে আরো।

আঁধার দেখে রাজার কথা শুনি,
যতন-ভরে আনিল তবে মন্ত্রী
যেখানে যত আছিল জ্ঞানী গুণী—
দেশে বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী।

বসিল সবে চশমা চোখে আঁটি,
ফুরায়ে গেল উনিশ-পিপে নস্য।
অনেক ভেবে কহিল, "গেলে মাটি
ধরায় তবে কোথায় হবে শস্য।"
কহিল রাজা, "তাই যদি না হবে
পণ্ডিতেরা রয়েছ কেন তবে।"
সকলে মিলি যুক্তি করি শেষে
কিনিল ঝাঁটা সাড়ে-সতেরো লক্ষ,
ঝাঁটের চোটে পথের ধুলা এসে
ভরিয়া দিল রাজার মুখ বক্ষ।
ধুলায় কেহ মেলিতে নারে চোখ
ধুলার মেঘে পড়িল ঢাকা সূর্য;
ধুলার বেগে কাশিয়া মরে লোক,
ধুলার মাঝে নগর হল উহ্য।
কহিল রাজা, "করিতে ধুলা দূর
জগৎ হল ধুলায় ভরপুর।"

তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে ঝাঁক
মশক কাঁখে একুশ লাখ ভিস্তি।
পুকুরে বিলে রহিল শুধু পাঁক,
নদীর জলে নাহিকো চলে কিস্তি।
জলের জীব মরিল জল বিনা,
ডাঙার প্রাণী সাঁতার করে চেষ্টা।
পাঁকের তলে মজিল বেচা-কিনা,
সর্দিজ্বরে উজাড় হল দেশটা।
কহিল রাজা, "এমনি সব গাধা,
ধুলারে মারি করিয়া দিল কাদা।"

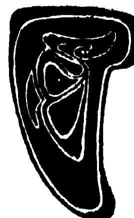
আবার সবে ডাকিল পরামর্শে;
বসিল পুন যতেক গুণবন্ত—
ঘুরিয়া মাথা হেরিল চোখে সর্ষে
ধুলার হায় নাহিকো পায় অন্ত।

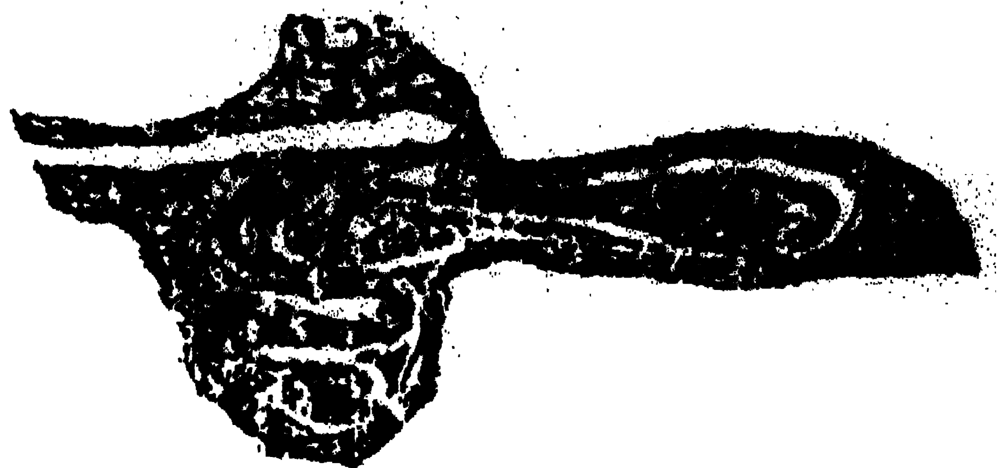
কহিল, "মহী মাদুর দিয়ে ঢাকো,
ফরাশ পাতি করিব ধুলা বন্ধ।"
কহিল কেহ, "রাজারে ঘরে রাখো,
কোথাও যেন না থাকে কোনো রন্ধ্র।
ধুলার মাঝে না যদি দেন পা
তা হলে পায়ে ধুলা তো লাগে না।"

কহিল রাজা, "সে কথা বড়ো খাঁটি,
কিন্তু মোর হতেছে মনে সন্ধ—
মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি
দিবস রাতি রহিলে আমি বন্ধ।"
কহিল সবে, "চামারে তবে ডাকি
চর্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী।
ধূলির মহী ঝুলির মাঝে ঢাকি
মহীপতির রহিবে মহাকীর্তি।"
কহিল সবে, "হবে সে অবহেলে,
যোগ্যমত চামার যদি মেলে।"
রাজার চর ধাইল হেথা হোথা,
ছুটিল সবে ছাড়িয়া সব কর্ম।
যোগ্যমত চামার নাহি কোথা,
না মিলে তত উচিতমত চর্ম।
তখন ধীরে চামার কুলপতি
কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ,
"বলিতে পারি করিলে অনুমতি
সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।
নিজের দুটি চরণ ঢাকো তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।"
কহিলা রাজা, "এত কি হবে সিধে,
ভাবিয়া ম'ল সকল দেশসুদ্ধ।"

মন্ত্রী কহে, "বেটারে শূল বিঁধে
        কারার মাঝে করিয়া রাখো রুদ্ধ।"
রাজার পদ চর্ম-আবরণে
        ঢাকিল বুড়া বসিয়া পদোপান্তে—
মন্ত্রী কহে, "আমারো ছিল মনে,
        কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে
সেদিন হতে চলিল জুতো পরা—
        বাঁচিল গোবু, রক্ষা পেল ধরা।

১৩০৪





বাল্মীকি প্রতিভা

প্রথম দৃশ্য

অরণ্য

বনদেবীগণ

সহে না, সহে না, কাঁদে পরান।
সাধের অরণ্য হল শ্মশান।।
দস্যুদলে আসি শান্তি করে নাশ,
ত্রাসে সকল দিশ কম্পমান।
আকুল কানন, কাঁদে সমীরণ,
চকিত মৃগ, পাখি গাহে না গান।।
শ্যামল তৃণদল শোণিতে ভাসিল,
কাতর রোদনরবে ফাটে পাষাণ।
দেবী দুর্গে, চাহো, ত্রাহি এ বনে—
রাখো অধীনী জনে, করো শান্তি দান।

[প্রস্থান

প্রথম দস্যুর প্রবেশ

আঃ বেঁচেছি এখন।
শর্মা ও দিকে আর নন।
গোলেমালে ফাঁকতালে পালিয়েছি কেমন।
লাঠালাঠি কাটাকাটি ভাবতে লাগে দাঁতকপাটি,
তাই মানটা রেখে প্রাণটা নিয়ে সট্‌কেছি কেমন—
আহা সট্‌কেছি কেমন।

আসুক তারা আসুক আগে, দুনোদুনি নেব ভাগে,
স্যাঙ্গামিতে আমার কাছে দেখব কে কেমন।
শুধু মুখের জোরে, গলার চোটে, লুট-করা ধন নেব লুটে,
শুধু দুলিয়ে ভুঁড়ি বাজিয়ে তুড়ি করব সর্‌গরম।
আহা করব সর্‌গরম।

লুটের দ্রব্য লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ

এনেছি মোরা এনেছি মোরা রাশি রাশি লুটের ভার।
করেছি ছারখার— সব করেছি ছারখার—
কত গ্রাম পল্লী লুটেপুটে করেছি একাকার।।

প্রথম দস্যু। আজকে তবে মিলে সবে করব লুটের ভাগ—
এ-সব আনতে কত লণ্ডভণ্ড করনু যজ্ঞ-যাগ।

দ্বিতীয় দস্যু। কাজের বেলায় উনি কোথা যে ভাগেন,
ভাগের বেলায় আসেন আগে আরে দাদা।

প্রথম দস্যু। এত বড়ো আস্পর্ধা তোদের, মোরে নিয়ে এ কি হাসি-তামাশা
এখনি মুণ্ড করিব খণ্ড, খবরদার রে খবরদার।

দ্বিতীয় দস্যু। হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়ো, এ কী ব্যাপার!
আজি বুঝি বা বিশ্ব করবে নস্য, এম্‌নি যে আকার।

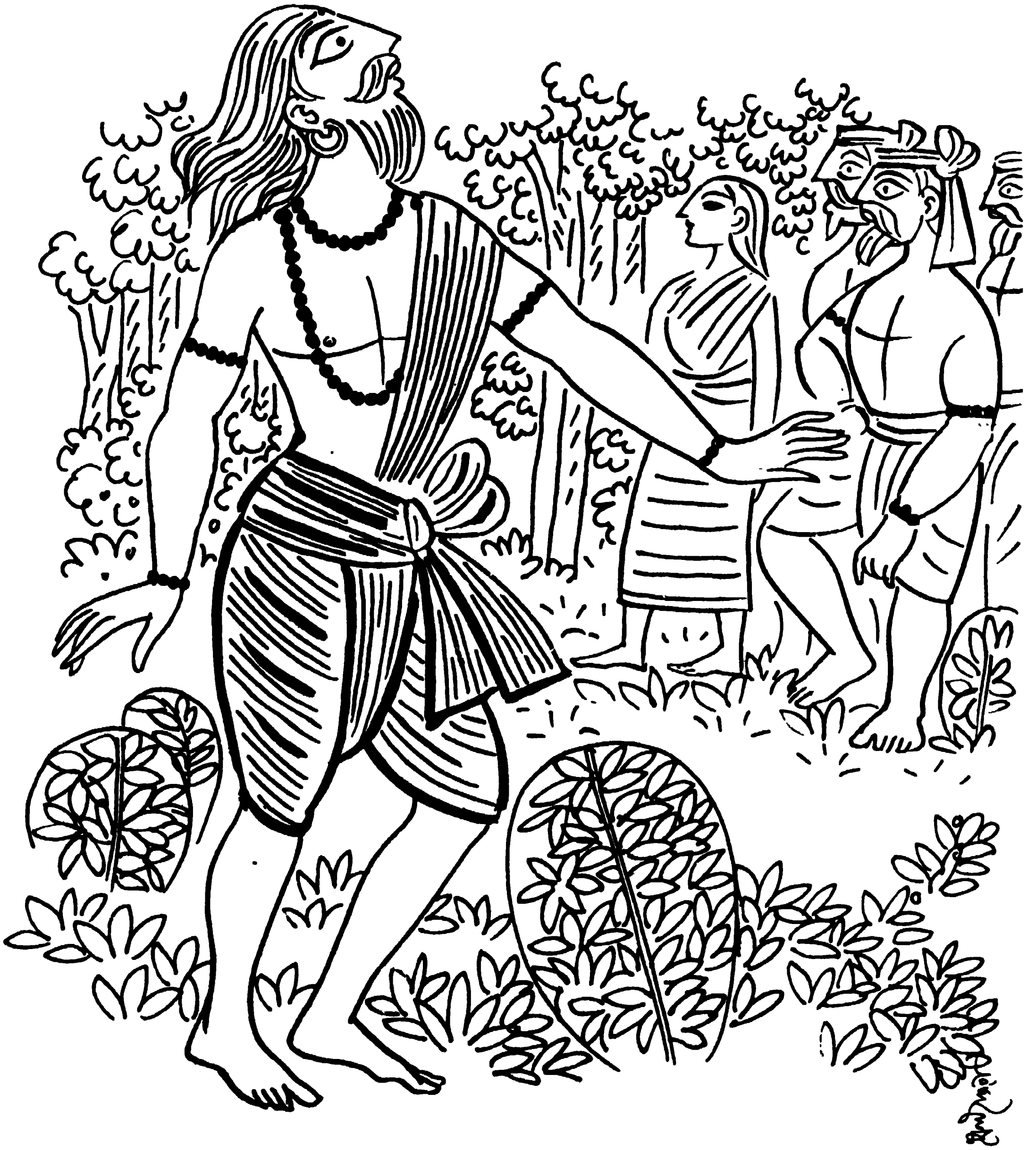
তৃতীয় দস্যু। এম্‌নি যোদ্ধা উনি, পিঠেতেই দাগ—
তলোয়ারে মরিচা, মুখেতেই রাগ।

প্রথম দস্যু। আর যে এ-সব সহে না প্রাণে—
নাহি কি তোদের প্রাণের মায়া?
দারুণ রাগে কাঁপিছে অঙ্গ—
কোথা রে লাঠি, কোথা রে ঢাল।

সকলে। হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়ো, এ কী ব্যাপার।
আজি বুঝি বা বিশ্ব করবে নস্য, এম্‌নি যে আকার।

বাল্মীকির প্রবেশ

সকলে। এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে।
না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে।
কে বা রাজা, কার রাজ্য, মোরা কী জানি!



প্রতি জনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী।
রাজা প্রজা উঁচু নিচু কিছু না গণি।
ত্রিভুবন-মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়-
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়।

বাল্মীকির প্রতি

প্রথম দস্যু। এখন করব কী বল্।
সকলে। এখন করব কী বল্।
প্রথম দস্যু। হে রাজা, হাজির রয়েছে দল।
সকলে। বল্ রাজা, করব কী বল্, এখন করব কী বল্।
প্রথম দস্যু। পেলে মুখেরই কথা, আনি যমেরই মাথা।
করে দিই রসাতল।
সকলে। করে দিই রসাতল।
সকলে। হো রাজা, হাজির রয়েছে দল।
বল্ রাজা, করব কী বল্, এখন করব কী বল্।
বাল্মীকি। শোন্ তোরা তবে শোন্।
অমানিশা আজিকে, পূজা দেব কালীকে।
ত্বরা করি যা তবে, সবে মিলি যা তোরা—
বলি নিয়ে আয়।

[বাল্মীকির প্রস্থান

সকলে। ত্রিভুবন-মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়,
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়।

—

তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়—
তবে ঢাল্ সুরা, ঢাল্ সুরা, ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্।
দয়া মায়া কোন্ ছার, ছারখার হোক।
কে বা কাঁদে কার তরে, হাঃ হাঃ হাঃ।
তবে আন্ তলোয়ার, আন্ আন্ তলোয়ার,
তবে আন্ বরশা, আন্ আন্ দেখি ঢাল্।
প্রথম দস্যু। আগে পেটে কিছু ঢাল্, পরে পিঠে নিবি ঢাল।
হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ

উঠিয়া

সকলে। কালী কালী বলো রে আজ—
বলো হো, হো হো, বলো হো, হো হো, বলো হো।
নামের জোরে সাধিব কাজ—
বলো হো হো হো, বলো হো, বলো হো!
ওই ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গ-মাঝারে
ওই লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে,
ওই লট্ট-পট্ট-কেশ অট্ট অট্ট হাসে রে—
হাহা হাহাহা হাহাহা!
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়!
জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়!
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়!
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়!

[গমনোদ্যম

একটি বালিকার প্রবেশ

বালিকা। ওই মেঘ করে বুঝি গগনে।
আঁধার ছাইল, রজনী আইল,
ঘরে ফিরে যাব কেমনে।।
চরণ অবশ হায়, শ্রান্ত ক্লান্ত কায়
সারা দিবস বনভ্রমণে।
ঘরে ফিরে যাব কেমনে।।

এ কী এ ঘোর বন!—এনু কোথায়!
পথ যে জানি না, মোরে দেখায়ে দে-না।
কী করি এ আঁধার রাতে। কী হবে মোর হায়।।
ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে গগনে,
চকিত চপলা চমকে সঘনে,
একেলা বালিকা— তরাসে কাঁপে কায়।।
বালিকার প্রতি
প্রথম দস্যু। পথ ভুলেছিস সত্যি বটে? সিধে রাস্তা দেখতে চাস?

এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেব   সুখে থাকবি বারো মাস

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ।

প্রথমের প্রতি

দ্বিতীয় দস্যু। কেমন হে ভাই!   কেমন সে ঠাঁই?

প্রথম দস্যু। মন্দ নহে বড়ো--

একদিন না একদিন সবাই সেথায় হব জড়ো।

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ।

তৃতীয় দস্যু। আয় সাথে আয়, রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিই গে তবে—

আর তা হলে রাস্তা ভুলে ঘুরতে নাহি হবে।

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ।

[সকলের প্রস্থান

বনদেবীগণের প্রবেশ

মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায়।
আহা, ঐ করুণ চোখে ও কাহার পানে চায়।।
বাঁধা কঠিন পাশে,   অঙ্গ কাঁপে ত্রাসে,
আঁখি জলে ভাসে— এ কী দশা হায়।
এ বনে কে আছে,   যাব কার কাছে—
কে ওরে বাঁচায়।।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্যে কালীপ্রতিমা

বাল্মীকি স্তবে আসীন

বাল্মীকি। রাঙাপদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা।
আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তারা।।
সুরনর থরহর—ব্রহ্মাণ্ড-বিপ্লব করো,
রণরঙ্গে মাতো মা গো, ঘোরা উন্মাদিনী-পারা।।
ঝলসিয়ে দিশি দিশি ঘুরাও তড়িত অসি,

ছুটাও শোণিতস্রোত, ভাসাও বিপুল ধরা।
উরো কালী কপালিনী, মহাকালসীমন্তিনী,
লহো জবাপুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাৎপরা।।

বালিকাকে লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যুগণ। দেখো হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা
বড়ো সরেস পেয়েছি বলি সরেস—
এমন সরেস মছ্‌লি রাজা, জালে না পড়ে ধরা।
দেরি কেন ঠাকুর, সেরে ফেলো ত্বরা!

বাল্মীকি। নিয়ে আয় কৃপাণ রয়েছে তৃষিতা শ্যামা মা,
শোণিত পিয়াও—যা ত্বরায়।।
লোল জিহ্বা লকলকে, তড়িৎ খেলে চোখে,
করিয়ে খণ্ড দিক দিগন্ত ঘোর দন্ত ভায়।।

বালিকা। কী দোষে বাঁধিলে আমায়, আনিলে কোথায়।
পথহারা একাকিনী বনে অসহায়—
রাখো রাখো রাখো, বাঁচাও আমায়।
দয়া করো অনাথারে— কে আমার আছে—
বন্ধনে কাতরতনু মরি যে ব্যথায়।

নেপথ্যে

বনদেবী। দয়া করো অনাথারে, দয়া করো গো—
বন্ধনে কাতর তনু জর্জর ব্যথায়।

বাল্মীকি। এ কেমন হল মন আমার।
কী ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পারি নে।
পাষাণ হৃদয়ও গলিল কেন রে।
কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে!
কী মায়া এ জানে গো, পাষাণের বাঁধ এ যে টুটিল,
সব ভেসে গেল গো, সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে।।

প্রথম দস্যু। আরে, কী এত ভাবনা কিছু তো বুঝি না।

দ্বিতীয় দস্যু। সময় বয়ে যায় যে।

তৃতীয় দস্যু। কখন্ এনেছি মোরা, এখনো তো হল না।
চতুর্থ দস্যু। এ কেমন রীতি তব, বাহ্ রে।
বাল্মীকি। না না হবে না, এ বলি হবে না—
অন্য বলির তরে যা রে যা।
প্রথম দস্যু। অন্য বলি এ রাতে কোথা মোরা পাব!
দ্বিতীয় দস্যু। এ কেমন কথা কও, বাহ্ রে।
বাল্মীকি। শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ,
কৃপাণ খর্পর ফেলে দে দে।
বাঁধন কর্ ছিন্ন, মুক্ত কর্ এখনি রে।।

যথাদিষ্ট কৃত

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্য

বাল্মীকি। ব্যাকুল হয়ে বনে বনে
ভ্রমি একেলা শূন্যমনে।
কে পুরাবে মোর কাতর প্রাণ,
জুড়াবে হিয়া সুধাবরিষণে।

[প্রস্থান

দস্যুগণ বালিকাকে পুনর্বার ধরিয়া আনিয়া

দস্যুগণ। ছাড়ব না ভাই, ছাড়ব না ভাই, এমন শিকার ছাড়ব না।
হাতের কাছে অম্‌নি এল, অম্‌নি যাবে!
অম্‌নি যেতে দেবে কে রে।
রাজাটা খেপেছে রে, তার কথা আর মান্‌ব না।।
আজ রাতে ধুম হবে ভারি— নিয়ে আয় কারণবারি,
জ্বেলে দে মশালগুলো, মনের মতন পুজো দেব
নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে— রাজাটা খেপেছে রে,
তার কথা আর মান্‌ব না।।
প্রথম দস্যু। রাজা মহারাজা কে জানে, আমিই রাজাধিরাজ।
তুমি উজির, কোতোয়াল তুমি,
ওই ছোঁড়াগুলো বরকন্দাজ।।
যত সব কুঁড়ে আছে ঠাঁই জুড়ে,

কাজের বেলায় বুদ্ধি যায় উড়ে।
পা ধোবার জল নিয়ে আয় ঝট্,
কর্ তোরা সব যে যার কাজ।।

দ্বিতীয় দস্যু। আছে তোমার বিদ্যে-সাধ্যি জানা।
রাজত্ব করা, এ কি তামাশা পেয়েছ।

প্রথম দস্যু। জানিস না কেটা আমি!

দ্বিতীয় দস্যু। ঢের ঢের জানি— ঢের ঢের জানি—

প্রথম দস্যু। হাসিস নে, হাসিস নে মিছে, যা যা।
সব আপন কাজে যা যা, যা আপন কাজে।

দ্বিতীয় দস্যু। খুব তোমার লম্বাচওড়া কথা!
নিতান্ত দেখি তোমায় কৃতান্ত ডেকেছে।

তৃতীয় দস্যু। আঃ কাজ কী গোলমালে, নাহয় রাজাই সাজালে।
মরবার বেলায় মরবে ওটাই, আমরা সব থাকব ফাঁকতালে

প্রথম দস্যু। রাম রাম! হরি হরি! ওরা থাকতে আমি মরি!
তেমন তেমন দেখলে বাবা, ঢুকব আড়ালে।

সকলে। ওরে চল্ তবে শিগ্‌গিরি,
আনি পুজোর সামিগ্‌গিরি।
কথায় কথায় রাত পোহালো, এমনি কাজের ছিরি।

[প্রস্থান

বালিকা। হায় কী দশা হল আমার!
কোথা গো মা করুণাময়ী, অরণ্যে প্রাণ যায় গো!
মুহূর্তের তরে মা গো, দেখা দাও আমারে—
জনমের মতো বিদায়!

পূজার উপকরণ লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ
ও কালীপ্রতিমা ঘিরিয়া নৃত্য

এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী!
তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে, চমকে ধরণী।
ক্ষান্ত দে মা, শান্ত হ মা, সন্তানের মিনতি।
রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মুদি, ও মা ত্রিনয়নী।

বাল্মীকির প্রবেশ

বাল্মীকি। অহো! আস্পর্ধা একি তোদের নরাধম।
তোদের কারেও চাহি নে আর, আর, আর না রে—
দূর দূর দূর, আমারে আর ছুঁস নে,
এ-সব কাজ আর না, এ পাপ আর না,
আর না, আর না, ত্রাহি— সব ছাড়িনু।
প্রথম দস্যু। দীন হীন এ অধম আমি, কিছুই জানি নে রাজা।
এরাই তো যত বাধালে জঞ্জাল।
এত করে বোঝাই বোঝে না—
কী করি, দেখো বিচারি।
দ্বিতীয় দস্যু। বাঃ— এও তো বড়ো মজা, বাহবা!
যত কুয়ের গোড়া ওই তো, আরে বল্‌-না রে।
প্রথম দস্যু। দূর দূর দূর, নির্লজ্জ আর বকিস নে।
বাল্মীকি। তফাতে সব সরে যা। এ পাপ আর না,
আর না, আর না, ত্রাহি— সব ছাড়িনু।

[দস্যুগণের প্রস্থান

বাল্মীকি। আয় মা, আমার সাথে, কোনো ভয় নাহি আর।
কত দুঃখ পেলি বনে, আহা মা আমার!
নয়নে ঝরিছে বারি, এ কি মা সহিতে পারি—
কোমল কাতর তনু কাঁপিতেছে বার বার।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বনদেবীগণের প্রবেশ

রিম্‌ ঝিম্‌ ঘন ঘন রে বরষে।
গগনে ঘটঘটা, শিহরে তরুলতা,
ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে।
দিশি দিশি সচকিত, দামিনী চমকিত,
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে।

[প্রস্থান

বাল্মীকির প্রবেশ

কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই
　　কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে!
যাই দেখি শিকারেতে,　রহিব আমোদে মেতে
ভুলি সব জ্বালা বনে বনে ছুটিয়ে—
　　কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে!
আপনা ভুলিতে চাই, ভুলিব কেমনে—
　　কেমনে যাবে বেদনা!
ধরি ধনু আনি বাণ　গাহিব ব্যাধের গান,
　　দলবল লয়ে মাতিব—
　　　কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে।

শৃঙ্গধ্বনিপূর্বক দস্যুগণকে আহ্বান

দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যু। কেন রাজা, ডাকিস কেন, এসেছি সবে।
বুঝি আবার শ্যামা মায়ের পুজো হবে?
বাল্মীকি। শিকারে হবে যেতে, আয় রে সাথে।
প্রথম দস্যু। ওরে, রাজা কী বলছে শোন্।
সকলে। শিকারে চল্ তবে।
সবারে আন্ ডেকে যত দলবল সবে।

[বাল্মীকির প্রস্থান

এই বেলা সবে মিলে চলো হো, চলো হো।
ছুটে আয়, শিকারে কে রে যাবি আয়,
　　এমন রজনী বহে যায় যে!
ধনুর্বাণ বল্লম লয়ে হাতে আয় আয় আয় আয় রে।
বাজা শিঙগা ঘন ঘন,　শব্দে কাঁপিবে বন,
আকাশ ফেটে যাবে,　চমকিবে পশু পাখি সবে,
ছুটে যাবে কাননে কাননে চারি দিকে ঘিরে
যাব পিছে পিছে　　হো হো হো হো!

বাল্মীকির প্রবেশ

বাল্মীকি। গহনে গহনে যা রে তোরা, নিশি বহে যায় যে।
তন্ন তন্ন করি অরণ্য, করী বরাহ খোঁজ্ গে—
এই বেলা যা রে।
নিশাচর পশু সবে এখনি বাহির হবে,
ধনুর্বাণ নে রে হাতে, চল্ ত্বরা চল্।
জ্বালায়ে মশাল-আলো এই বেলা আয় রে।

[প্রস্থান

প্রথম দস্যু। চল্ চল্ ভাই, ত্বরা করে মোরা আগে যাই।
দ্বিতীয় দস্যু। প্রাণপণ খোঁজ্ এ বন, সে বন—
চল্ মোরা ক'জন ও দিকে যাই।
প্রথম দস্যু। না না ভাই, কাজ নাই।
হোথা কিছু নাই, কিছু নাই—
ওই ঝোপে যদি কিছু পাই।
দ্বিতীয় দস্যু। বরা বরা—
প্রথম দস্যু। আরে দাঁড়া দাঁড়া, অত ব্যস্ত হলে ফস্কাবে শিকার।
চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয় ওই অশথতলায়।
এবার ঠিকঠাক হয়ে সব থাক্—
সাবধান ধরো বাণ, সাবধান ছাড়ো বাণ,
গেল গেল ওই, পালায় পালায়, চল্ চল্।
ছোট্ রে পিছে, আয় রে ত্বরা যাই।

বনদেবীগণের প্রবেশ

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে
সাধের কাননে শান্তি নাশিতে!
মত্ত করী যত পদ্মবন দলে
বিমল সরোবর মন্থিয়া,
ঘুমন্ত বিহগে কেন বধে রে
সঘনে খর শর সন্ধিয়া।
তরাসে চমকিয়ে হরিণহরিণী
স্খলিত চরণে ছুটিছে—

স্খলিত চরণে ছুটিছে কাননে,
করুণ নয়নে চাহিছে।
আকুল সরসী, সারস-সারসী
শরবনে পশি কাঁদিছে
তিমির দিগ্ ভরি ঘোর যামিনী
বিপদ ঘন ছায়া ছাইয়া—
কী জানি কী হবে আজি এ নিশীথে,
তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া।

প্রথম দস্যুর প্রবেশ

প্রথম দস্যু। প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি রে, করবি এখন কী।
ওরে বরা, করবি এখন কী।
বাবা রে, আমি চুপ করে এই কচুবনে লুকিয়ে থাকি।
এই মরদের মুরোদখানা দেখেও কি রে ভড়কালি না?
বাহবা! শাবাশ তোরে, শাবাশ রে তোর ভরসা দেখি।

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আর-এক জন
দস্যুর প্রবেশ

অন্য দস্যু। বলব কী আর বলব খুড়ো— উঁ উঁ—
আমার যা হয়েছে বলি কার কাছে—
একটা বুনো ছাগল তেড়ে এসে মেরেছে ঢুঁ।
প্রথম দস্যু। তখন যে ভারি ছিল জারিজুরি,
এখন কেন করছ বাপু, উঁ উঁ উঁ—
কোন্‌খানে লেগেছে বাবা, দিই একটু ফুঁ।

দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যুগণ। সর্দার মশায় দেরি না সয়,
তোমার আশায় সবাই বসে।
শিকারেতে হবে যেতে,
মিহি কোমর বাঁধো কষে।
বনবাদাড় সব ঘেঁটে ঘুঁটে

আমরা মরি খেটে খুটে,
তুমি কেবল লুটে পুটে
পেট পোরাবে ঠেসে ঠুসে!

প্রথম দস্যু। কাজ কী খেয়ে, তোফা আছি—
আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি।
শিকার করতে যায় কে মরতে—
ঢুঁসিয়ে দেবে বরা-মোষে।
ঢুঁ খেয়ে তো পেট ভরে না—
সাধের পেটটি যাবে ফেঁসে।

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ও শিকারের
পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুনঃপ্রবেশ

বাল্মীকির দ্রুত প্রবেশ

বাল্মীকি। রাখ্ রাখ্ ফেল্ ধনু, ছাড়িস নে বাণ।
হরিণশাবক দুটি প্রাণভয়ে ধায় ছুটি,
চাহিতেছে ফিরে ফিরে করুণনয়ান।
কোনো দোষ করে নি তো, সুকুমার কলেবর—
কেমনে কোমল দেহে বিঁধিবি কঠিন শর।
থাক্ থাক্ ওরে থাক্, এ দারুণ খেলা রাখ্,
আজ হতে বিসর্জিনু এ ছার ধনুক বাণ।

[প্রস্থান

দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যুগণ। আর না, আর না, এখানে আর না—
আয় রে সকলে চলিয়া যাই।
ধনুক বাণ ফেলেছে রাজা,
এখানে কেমনে থাকিব ভাই!
চল চল চল এখনি যাই।

বাল্মীকির প্রবেশ

দস্যুগণ। তোর দশা রাজা, ভালো তো নয়—
রক্তপাতে পাস রে ভয়—
লাজে মোরা মরে যাই।
পাখিটি মারিলে কাঁদিয়া খুন,
না জানি কে তোরে করিল গুণ—
হেন কভু দেখি নাই।

[দস্যুগণের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

বাল্মীকি। জীবনের কিছু হল না হায়—
হল না গো হল না, হায় হায়।
গহনে গহনে কত আর ভ্রমিব নিরাশার এ আঁধারে।
শূন্য হৃদয় আর বহিতে যে পারি না,
পারি না গো, পারি না আর।
কী লয়ে এখন ধরিব জীবন, দিবসরজনী চলিয়া যায়—
দিবসরজনী চলিয়া যায়—
কত কী করিব বলি কত উঠে বাসনা,
কী করিব জানি না গো।
সহচর ছিল যারা ত্যেজিয়া গেল তারা। ধনুর্বাণ ত্যেজেছি,
কোনো আর নাহি কাজ—
'কী করি কী করি' বলি হা হা করি ভ্রমি গো—
কী করিব জানি না যে।

ব্যাধগণের প্রবেশ

প্রথম ব্যাধ। দেখ্ দেখ্, দুটো পাখি বসেছে গাছে।
দ্বিতীয় ব্যাধ। আয় দেখি চুপিচুপি আয় রে কাছে।
প্রথম ব্যাধ। আরে, ঝট্ করে এইবারে ছেড়ে দে রে বাণ।
দ্বিতীয় ব্যাধ। রোস্, রোস্, আগে আমি করি রে সন্ধান।
বাল্মীকি। থাম্ থাম্, কী করিবি বধি পাখিটির প্রাণ।
দুটিতে রয়েছে সুখে, মনের উল্লাসে গাহিতেছে গান।

প্রথম ব্যাধ। রাখো মিছে ও-সব কথা,
কাছে মোদের এস নাকো হেথা,
চাই নে ও-সব শাস্তর-কথা, সময় বহে যায় যে।
বাল্মীকি। শোনো শোনো, মিছে রোষ কোরো না।
ব্যাধ। থামো থামো ঠাকুর— এই ছাড়ি বাণ।

একটি ক্রৌঞ্চকে বধ

বাল্মীকি। মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।

কী বলিনু আমি! এ কী সুললিত বাণী রে!
কিছু না জানি কেমনে যে আমি প্রকাশিনু দেবভাষা,
এমন কথা কেমনে শিখিনু রে!
পুলকে পুরিল মনপ্রাণ, মধু বরষিল শ্রবণে,
এ কী! হৃদয়ে এ কী এ দেখি!
ঘোর অন্ধকার-মাঝে, এ কী জ্যোতি ভায়!
অবাক্! করুণা এ কার!

সরস্বতীর আবির্ভাব

বাল্মীকি। একি এ, এ কী এ, স্থিরচপলা!
কিরণে কিরণে হল সব দিক উজলা!
কী প্রতিমা দেখি এ— জোছনা মাখিয়ে
কে রেখেছে আঁকিয়ে আ মরি কমলপুতলা।

[ব্যাধগণের প্রস্থান

বনদেবীগণের প্রবেশ

বনদেবী। নমি নমি ভারতী, তব কমলচরণে।
পুণ্য হল বনভূমি, ধন্য হল প্রাণ।
বাল্মীকি। পূর্ণ হল বাসনা, দেবী কমলাসনা—
ধন্য হল দস্যুপতি, গলিল পাষাণ।
বনদেবী। কঠিন ধরাভূমি এ, কমলালয়া তুমি যে—

হৃদয়কমলে চরণকমল করো দান।
বাল্মীকি। তব কমলপরিমলে রাখো হৃদি ভরিয়ে—
চিরদিবস করিব তব চরণসুধা পান।

[দেবীগণের অন্তর্ধান

কালী-প্রতিমার প্রতি বাল্মীকি

শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা!
পাষাণের মেয়ে পাষাণী তুই, না বুঝে মা বলেছি মা!
এত দিন কী ছল করে তুই পাষাণ করে রেখেছিলি—
আজ আপন মায়ের দেখা পেয়ে নয়নজলে গলেছি মা!
কালো দেখে ভুলি নে আর, আলো দেখে ভুলেছে মন—
আমায় তুমি ছলেছিলে, এবার আমি তোমায় ছলেছি মা।
মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার মায়ের কোলে চলেছি মা।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বাল্মীকি। কোথা লুকাইলে?
সব আশা নিভিল, দশ দিশি অন্ধকার।
সবে গেছে চলে ত্যেজিয়ে আমারে,
তুমিও কি তেয়াগিলে।

লক্ষ্মীর আবির্ভাব

লক্ষ্মী। কেন গো আপন-মনে ভ্রমিছ বনে বনে,
সলিল দু নয়নে কিসের দুখে?
কমলা দিতেছি আসি রতন রাশি রাশি,
ফুটুক তবে হাসি মলিন মুখে।
কমলা যারে চায় বলো সে কী না পায়,
দুখের এ ধরায় থাকে সে সুখে।
ত্যেজিয়া কমলাসনে এসেছি এ ঘোর বনে,
আমারে শুভক্ষণে হেরো গো চোখে।
বাল্মীকি। কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা—
তুমি তো নহ সে দেবী, কমলাসনা,
কোরো না আমারে ছলনা।



কী এনেছ ধন মান! তাহা যে চাহে না প্রাণ।
দেবী গো, চাহি না, চাহি না, মণিময় ধূলিরাশি চাহি না—
তাহা লয়ে সুখী যারা হয় হোক, হয় হোক—
আমি দেবী, সে সুখ চাহি না।
যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এসো না, এসো না—
এসো না এ দীনজনকুটীরে।
যে বীণা শুনেছি কানে মন প্রাণ আছে ভোর—
আর কিছু চাহি না, চাহি না।

[লক্ষ্মীর অন্তর্ধান

[বাল্মীকির প্রস্থান।

বনদেবীগণের প্রবেশ

বাণী বীণাপাণি, করুণাময়ী!
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,
দরশ দিয়ে লুকালে কোথা দেবী অয়ি।
স্বপনসম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা—
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরমবেদনা!
তোমারে চাহি ফিরিছে হেরো কাননে কাননে ওই।

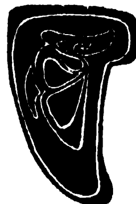
[বনদেবীগণের প্রস্থান

বাল্মীকির প্রবেশ
সরস্বতীর আবির্ভাব

বাল্মীকি। এই যে হেরি গো দেবী আমারই!
সব কবিতাময় জগত-চরাচর, সব শোভাময় নেহারি।
ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনকরবি উদিছে,
ছন্দে জগমণ্ডল চলিছে, জ্বলন্ত কবিতা তারকা সবে।
এ কবিতার মাঝারে, তুমি কে গো দেবী,
আলোকে আলো আঁধারি।
আজি মলয় আকুল বনে বনে এ কী এ গীত গাহিছে,
ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী, নব রাগরাগিণী উছাসিছে—
এ আনন্দে আজ গীত গাহে মোর হৃদয় সব অবারি।
তুমিই কি দেবী ভারতী! কৃপাগুণে অন্ধ আঁখি ফুটালে—
উষা আনিলে প্রাণের আঁধারে,

প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে।
তুমি ধন্য গো! রব চিরকাল চরণ ধরি তোমারি।

সরস্বতী। দীনহীন বালিকার সাজে এসেছিনু এ ঘোর বনমাঝে
গলাতে পাষাণ তোর মন—
কেন বৎস, শোন্ তাহা শোন্।
আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান।
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ।
যে রাগিণী শুনে তোর গলেছে কঠোর মন
সে রাগিণী তোরই কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ।
অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণতলে,
চারি দিকে দিক্‌-বধূ আকুল নয়নজলে।
মাথার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্র তারা,
অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা।
যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়
শত স্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগৎময়।
যেথায় হিমাদ্রি আছে সেথা তোর নাম রবে,
যেথায় জাহ্নবী বহে তোর কাব্যস্রোত ববে।
সে জাহ্নবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া
শ্মশান পবিত্র করি, মরুভূমি উর্বরিয়া।
মোর পদ্মাসনতলে রহিবে আসন তোর,
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর
বসি তোর পদতলে কবি-বালকেরা যত
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত।
এই নে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার—
যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার।



ছবি | প্রণব হাজরা

কালমৃগয়া

প্রথম দৃশ্য

তপোবন

ঋষিকুমারের প্রবেশ

বেলা যে চলে যায়, ডুবিল রবি।
ছায়ায় ঢেকেছে ঘন অটবী।
কোথা সে লীলা গেল কোথায়!
লীলা, লীলা, খেলাবি আয়!

লীলার প্রবেশ

লীলা। ও ভাই, দেখে যা,
কত ফুল তুলেছি।
ঋষিকুমার। তুই আয় রে কাছে আয়,
আমি তোরে সাজিয়ে দি।
তোর হাতে মৃণাল-বালা,
তোর কানে চাঁপার দুল,
তোর মাথায় বেলের সিঁথি,
তোর খোঁপায় বকুল ফুল।
লীলা। ও, দেখবি রে ভাই, আয় রে ছুটে,
মোদের বকুল গাছে
রাশি রাশি হাসির মতো
ফুল কত ফুটেছে।
কত গাছের তলায় ছড়াছড়ি
গড়াগড়ি যায়—

ও ভাই, সাবধানেতে আয় রে হেথা,
দিস্ নে দ'লে পায়।

লীলা। কাল সকালে উঠব মোরা।
যাব নদীর কূলে,
শিব গড়িয়ে করব পুজো,
আনব কুসুম তুলে।

ঋষিকুমার। মোরা ভোরের বেলা গাঁথব মালা,
দুলব সে দোলায়,
বাজিয়ে বাঁশি গান গাহিব
বকুলের তলায়।

লীলা। না ভাই, কাল সকালে মায়ের কাছে
নিয়ে যাব ধ'রে,
মা বলেছে ঋষির সাজে
সাজিয়ে দেবে তোরে।

ঋষিকুমার। সন্ধ্যা হয়ে এল যে ভাই,
এখন যাই ফিরে—
একলা আছেন অন্ধ পিতা
আঁধার কুটীরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন

বনদেবীগণ

প্রথম। সমুখেতে বহিছে তটিনী,
দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া,

দ্বিতীয়। বায়ু বহে পরিমল লুটিয়া।

তৃতীয়। সাঁঝের অধর হতে
ম্লান হাসি পড়িছে টুটিয়া

চতুর্থ। দিবস বিদায় চাহে,
সরযূ বিলাপ গাহে,
সায়াহ্নেরি রাঙা পায়ে
কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া।



সকলে। এসো সবে এসো, সখী,
মোরা হেথা ব'সে থাকি —
প্রথম। আকাশের পানে চেয়ে
জলদের খেলা দেখি!
সকলে। আঁখি-'পরে তারাগুলি
একে একে উঠিবে ফুটিয়া।
সকলে। ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে বহে কিবা মৃদু বায়,
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়!
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়,
কী জানি কিসেরি লাগি প্রাণ করে হায়-হায়!
প্রথম। নেহারো লো সহচরী,
কানন আঁধার করি
ওই দেখো বিভাবরী আসিছে।
দ্বিতীয়। দিগন্ত ছাইয়া
শ্যাম মেঘরাশি থরে থরে ভাসিছে।
তৃতীয়। আয় সখী, এই বেলা,
মাধবী মালতী বেলা
রাশি রাশি ফুটাইয়ে কানন করি আলা।
চতুর্থ। ওই দেখো নলিনী উথলিত সরসে
অফুট মুকুলমুখী মৃদু মৃদু হাসিছে।
সকলে। আসিবে ঋষিকুমার কুসুমচয়নে,
ফুটায়ে রাখিয়া দিব তারি তরে সযতনে।
নিচু নিচু শাখাতে ফোটে যেন ফুলগুলি,
কচি হাত বাড়াইয়ে পায় যেন কাছে!

তৃতীয় দৃশ্য

কুটীর

অন্ধ ঋষি ও ঋষিকুমার

বেদপাঠ

অন্তরিক্ষোদরঃ কোশো ভূমিবুধ্নো ন জীর্যতি দিশোহস্য স্রক্তয়োদ্যৌরস্যোত্তরং বিলং স এষ কোশোবসুধানস্তস্মিন্ বিশ্বমিদং শ্রিতম্।

তস্য প্রাচী দিগ্ জুহূর্নাম সহমানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞী নাম প্রতীচী সুভূতা নমোদীচী তাসাং বায়ুর্বৎসঃ স য এতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ ন পুত্র রোদং রোদিতি সোঽহমেতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ মা পুত্ররোদং রুদম্।।

অন্ধ ঋষি। জল এনে দে রে বাছা, তৃষিত কাতরে।
শুকায়েছে কণ্ঠ তালু, কথা নাহি সরে।

মেঘগর্জন

না না, কাজ নাই, যেয়ো না বাছা,
গভীরা রজনী ঘোর ঘন গরজে—
তুই যে এ অন্ধের নয়নতারা।
আর কে আমার আছে!
কেহ নাই—কেহ নাই—
তুই শুধু রয়েছিস হৃদয় জুড়ায়ে।
তোরেও কি হারাব বাছা রে—
সে তো প্রাণে সবে না!

ঋষিকুমার। আমা-তরে অকারণে ওগো পিতা, ভেবো না।
অদূরে সরযূ বহে—দূরে যাব না।
পথ যে সরল অতি,
চপলা দিতেছে জ্যোতি—
তবে কেন, পিতা, মিছে ভাবনা।
অদূরে সরযূ বহে, দূরে যাব না।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বন

বনদেবতা

সঘন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া,
স্তিমিত দশ দিশি,
স্তম্ভিত কানন,
সব চরাচর আকুল—
কী হবে কে জানে,

ঘোরা রজনী
দিক-ললনা ভয়বিভলা।
চমকে চমকে সহসা দিক উজলি
চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজলী
থরহর চরাচর পলকে ঝলকিয়ে।
ঘোর তিমির ছায় গগন মেদিনী।
গুরু গুরু নীরদগরজনে
স্তব্ধ আঁধার ঘুমাইছে—
সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ,
কড় কড় বাজ!

[প্রস্থান

বনদেবীগণের প্রবেশ

সকলে। ঝ্‌ম ঝম্‌ ঘন ঘন রে বরষে।
দ্বিতীয়। গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরু লতা—
তৃতীয়। ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে।
সকলে। দিশি দিশি সচকিত, দামিনী চমকিত,
প্রথম। চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে!
সকলে। আয় লো সজনী, সবে মিলে—
ঝর ঝর বারিধারা,
মৃদু মৃদু গুরু গুরু গর্জন—
এ বরষা-দিনে
হাতে হাতে ধরি ধরি
গাব মোরা লতিকা-দোলায় দুলে!
প্রথম। ফুটাব যতনে কেতকী কদম্ব অগণন,
দ্বিতীয়। মাখাব বরন ফুলে ফুলে।
তৃতীয়। পিয়াব নবীন সলিল, পিয়াসিত তরুলতা
চতুর্থ। লতিকা বাঁধিব গাছে তুলে।
প্রথম। বনেরে সাজায়ে দিব, গাঁথিব মুকুতাকণা
পল্লবশ্যামদুকূলে।
দ্বিতীয়। নাচিব, সখি, সবে নবঘন-উৎসবে
বিকচ বকুলতরু-মূলে!

ঋষিকুমারের প্রবেশ

ঋষিকুমার। কী ঘোর নিশীথ, নীরব ধরা,
পথ যে কোথায় দেখা নাহি যায়,
জড়ায়ে যায় চরণে লতাপাতা।
যাই, ত্বরা ক'রে যেতে হবে,
সরযূতটিনীতীরে—
কোথায় সে পথ।
ওই কলকল রব—
আহা, তৃষিত জনক মম,
যাই তবে যাই ত্বরা।
বনদেবীগণ। এই ঘোর আঁধার, কোথা রে যাস্!
ফিরিয়ে যা, তরাসে প্রাণ কাঁপে!
স্নেহের পুতুলি তুই,
কোথা যাবি একা এ নিশীথে,
কী জানি কী হবে, বনে হবি পথহারা!
ঋষিকুমার। না, কোরো না মানা, যাব ত্বরা।
পিতা আমার কাতর তৃষায়,
যেতেছি তাই সরযূনদীতীরে।
বনদেবীগণ। মানা না মানিলি, তবুও চলিলি,
কী জানি কী ঘটে!
অমঙ্গল হেন প্রাণে জাগে কেন—
থেকে থেকে যেন প্রাণ কেঁদে ওঠে!
রাখ্ রে কথা রাখ্, বারি আনা থাক্,
যা, ঘরে যা ছুটে!
অয়ি দিগঙ্গনে, রেখো গো যতনে
অভয় স্নেহছায়ায়!
অয়ি বিভাবরী, রাখো বুকে ধরি
ভয় অপহরি, রাখো এ জনায়!
এ যে শিশুমতি, বন ঘোর অতি—
এ যে একেলা অসহায়!

পঞ্চম দৃশ্য

শিকারীগণের প্রবেশ

বনে বনে সবে মিলে চলো হো! চলো হো!
ছুটে আয়, শিকারে কে রে যাবি আয়!
এমন রজনী বহে যায় রে!
ধনু বাণ বল্লম লয়ে হাতে
আয় আয় আয় আয় রে!
বাজা শিঙগা ঘন ঘন—
শব্দে কাঁপিবে বন,
আকাশ ফেটে যাবে,
চমকিবে পশু পাখি সবে,
ছুটে যাবে কাননে কাননে,
চারি দিক ঘিরে যাব পিছে পিছে,
হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ !

দশরথের প্রবেশ

শিকারীগণ। জয়তু জয় জয় রাজন্, বন্দি তোমারে
কে আছে তোমা-সমান।
ত্রিভুবন কাঁপে তোমার প্রতাপে!
তোমারে করি প্রণাম!

শিকারীদের প্রতি

দশরথ। গহনে গহনে যা রে তোরা—
নিশি ব'হে যায় যে!
তন্ন তন্ন করি অরণ্য
করী বরাহ খোঁজ গে!
এই বেলা যা রে।
নিশাচর পশু সবে
এখনি বাহির হবে—

ধনুর্বাণ নে রে হাতে, চল্ ত্বরা চল্।
জ্বালায়ে মশাল-আলো এই বেলা আয় রে!

[প্রস্থান

প্রথম শিকারী। চল্ চল্ ভাই,
ত্বরা ক'রে মোরা আগে যাই।
দ্বিতীয়। প্রাণপণ খোঁজ্ এ বন সে বন,
তৃতীয়। চল্ মোরা ক'জন ও দিকে যাই,
প্রথম। না না ভাই, কাজ নাই,
হোথা কিছু নাই—কিছু নাই—
ওই ঝোপে যদি কিছু পাই।
তৃতীয়। বরা! বরা!
প্রথম। আরে দাঁড়া দাঁড়া,
অত ব্যস্ত হলে ফস্কাবে শিকার!
চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয়,
অশথতলায়,
এবার ঠিক্ঠাক্ হয়ে সবে থাক্—
সাবধান, ধরো বাণ, সাবধান ছাড়ো বাণ।
দুই-তিন জন। গেল গেল ওই ওই পালায় পালায়,
চল্ চল্
ছোট্ রে পিছে, আয় রে ত্বরা যাই।

[প্রস্থান

বিদূষকের সভয়ে প্রবেশ

বিদূষক। প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি রে,
ওরে বরা, করবি এখন কী!
বাবা রে!
আ'মি চুপ ক'রে এই
আমড়াতলায় লুকিয়ে থাকি।
এই মরদের মুরোদখানা,
দেখেও কি রে ভড়্কালি না,
বাহ্‌বা, সাবাস্ তোরে
সাবাস্ রে তোর ভরসা দেখি।
গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে

ব্রাহ্মণীরে ঘরে ফেলে
কোথা এলেম এ ঘোর বনে!
মনে আশা ছিল মস্ত,
চলবে ভালো দক্ষিণ হস্ত,
হা রে রে পোড়া কপাল,
তাও যে দেখি কেবল ফাঁকি!

শিকারীগণের প্রবেশ

শিকারীগণ। ঠাকুরমশয়, দেরি না সয়,
তোমার আশায় সবাই ব'সে।
শিকারেতে হবে যেতে
মিহি কোমর বাঁধ ক'ষে!
বন-বাদাড় সব ঘেঁটেঘুঁটে
আমরা মরি খেটেখুটে,
তুমি কেবল লুটেপুটে
পেট পোরাবে ঠেসেঠুসে!
বিদূষক। কাজ কী খেয়ে, তোফা আছি,
আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি!
শিকার করতে যায় কে মরতে,
ঢুঁসিয়ে দেবে বরা মোষে!
ঢুঁ খেয়ে তো পেট ভরে না,
সাধের পেটটি যাবে ফেঁসে।

[হাসিতে হাসিতে শিকারীগণের প্রস্থান

বিদূষক। আঃ বেঁচেছি এখন।
শর্মা ও দিকে আর নন।
গোলেমালে ফাঁকতালে সট্‌কেছি কেমন
বাবা! দেখে বরা'র দাঁতের পাটি,
লেগেছিল দাঁতকপাটি,
পড়ল খ'সে হাতের লাঠি
কে জানে কখন।

চুলগুলা সব ঘাড়ে খাড়া,
চক্ষুদুটো মশাল-পারা,
গোঁ ভরে হেঁটমুখে তাড়া
কল্লে সে যখন,
রাস্তা দেখতে পাই নে চোখে,
পেটের মধ্যে হাত পা ঢোকে,
চুপ্‌সে গেল ফাঁপা ভুঁড়ি
শঙ্কাতে তখন।

[প্রস্থান

শিকার স্কন্ধে শিকারীগণের প্রবেশ

এনেছি মোরা এনেছি মোরা
রাশি রাশি শিকার।
করেছি ছারখার,
সব করেছি ছারখার।
বন-বাদাড় তোলপাড়,
করেছি রে উজাড়!

[গাইতে গাইতে প্রস্থান

বনদেবীদের প্রবেশ

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে,
সাধের কাননে শান্তি নাশিতে।
মত্ত করী যত পদ্মবন দলে
বিমল সরোবর মন্থিয়া,
ঘুমন্ত বিহগে কেন বধে রে
সঘনে খর শর সন্ধিয়া!
তরাসে চমকিয়ে হরিণ হরিণী
স্খলিত চরণে ছুটিছে!
স্খলিত চরণে ছুটিছে কাননে,
করুণনয়নে চাহিছে।
আকুল সরসী, সারস সারসী
শরবনে পশি কাঁদিছে।



তিমির দিগ্‌ভরি ঘোর যামিনী,
বিপদ-ঘন ছায়া ছাইয়া।
কী জানি কী হবে আজি এ নিশীথে,
তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া।

[প্রস্থান

দশরথের প্রবেশ

দশরথ। না জানি কোথা এলুম, এ যে ঘোর বন।
কোথা গেল সে করীশিশু, কোথা লুকাল।
একে তো জটিল বন, তাহে আঁধার ঘন।
যাক্‌ না যাবে সে কত দূর কত দূর—
যাব পিছে পিছে,
না না না না ও কী শুনি।
ওই সে সরযূতীরে করিছে সলিল পান,
শবদ শুনি যে ওই, এই তবে ছাড়ি বাণ।

নেপথ্যে বনদেবীগণ

হায় কী হল। হায় কী হল।

বাণাহত ঋষিকুমারের নিকট দশরথের গমন

দশরথ। কী করিনু হায়।
এ তো নয় রে করীশিশু। ঋষির তনয়।
নিঠুর প্রখর বাণে রুধিরে আপ্লুত কায়,
কার রে প্রাণের বাছা ধুলাতে লুটায়।
কী কুলগ্নে না জানি রে ধরিলাম বাণ,
কী মহাপাতকে কার বধিলাম প্রাণ।
দেবতা, অমৃতনীরে হারা-প্রাণ দাও ফিরে,
নিয়ে যাও মায়ের কোলে মায়ের বাছায়।

মুখে জলসিঞ্চন

ঋষিকুমার। কী দোষ করেছি তোমার,
কেন গো হানিলে বাণ!
একই বাণে বধিলে যে
দুটি অভাগার প্রাণ!
শিশু বনচারী আমি,
কিছুই নাহিকো জানি,
ফল মূল তুলে আনি,
করি সামবেদ গান!
জন্মান্ধ জনক মম
তৃষায় কাতর হয়ে
রয়েছেন পথ চেয়ে
কখন যাব বারি লয়ে।
মরণান্তে নিয়ে যেয়ো,
এ দেহ তাঁর কোলে দিয়ো,
দেখো দেখো, ভুলো নাকো,
কোরো তাঁরে বারি দান!
মার্জনা করিবেন পিতা—
তাঁর যে দয়ার প্রাণ!

মৃত্যু

ষষ্ঠ দৃশ্য

কুটীর

অন্ধ ঋষি

অন্ধ। আমার প্রাণ যে ব্যাকুল হয়েছে,
হা তাত, একবার আয় রে!
ঘোরা রজনী, একাকী,
কোথা রহিলে এ সময়ে!
প্রাণ যে চমকে মেঘগরজনে,
কী হবে কে জানে!

লীলার প্রবেশ

লীলা। বলো বলো পিতা, কোথা সে গিয়েছে!
কোথা সে ভাইটি মম, কোন্ কাননে,
কেন তাহারে নাহি হেরি!
খেলিবে সকালে আজ বলেছিল সে,
তবু কেন এখনো না এল।
বনে বনে ফিরি 'ভাই ভাই' করিয়ে,
কেন গো সাড়া পাই নে!

অন্ধ। কে জানে কোথা সে!
প্রহর গণিয়া গণিয়া বিরলে
তারি লাগি বসে আছি।
একা হেথা কুটীরদুয়ারে—
বাছা রে, এলি নে!
ত্বরা আয়, ত্বরা আয়, আয় রে—
জল আনিয়ে কাজ নাই,
তুই যে আমার পিপাসার জল!
কেন রে জাগিছে মনে ভয়!
কেন আজি তোরে,
হারাই হারাই মনে হয়!
কে জানে!

[লীলার প্রস্থান

মৃতদেহ লইয়া দশরথের প্রবেশ

অন্ধ। এতক্ষণে বুঝি এলি রে!
হৃদি-মাঝে আয় রে, বাছা রে!
কোথা ছিলি বনে, এ ঘোর রাতে,
এ দুর্যোগে, অন্ধ পিতারে ভুলি!
আছি সারা নিশি হায় রে
পথ চাহিয়ে, আছি তৃষায় কাতর,
দে মুখে বারি, কাছে আয় রে!

দশরথ। অজ্ঞানে করো হে ক্ষমা তাত, ধরি চরণে,
কেমনে কহিব, শিহরি আতঙ্কে!
আঁধারে সন্ধানি শর খরতর,
করী-ভ্রমে বধি তব পুত্রবর
গ্রহদোষে পড়েছি পাপপঙ্কে!

দশরথ-কর্তৃক ঋষির নিকটে ঋষিকুমারের মৃতদেহ স্থাপন

অন্ধ। কী বলিলে, কী শুনিলাম, এ কি কভু হয়!
এই যে জল আনিবারে, গেল সে সরযূতীরে,
কার সাধ্য বধে সে যে ঋষির তনয়!
সুকুমার শিশু সে যে, স্নেহের বাছা রে,
আছে কি নিষ্ঠুর কেহ, বধিবে যে তারে!
না না না, কোথা সে আছে, এনে দে আমার কাছে
সারা নিশি জেগে আছি, বিলম্ব না সয়!
এখনো যে নিরুত্তর, নাহি প্রাণে ভয়!
রে দুরাত্মা, কী করিলি—

অভিশাপ

পুত্রব্যসনজং দুঃখং যদেতন্মম সাংপ্রতম্।
এবং ত্বং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং হরিষ্যসি।।

দশরথ। ক্ষমা করো মোরে তাত,
আমি যে পাতকী ঘোর,
না জেনে হয়েছি দোষী,
মার্জনা নাহি কি মোর।
ও! সহে না যাতনা আর
শান্তি পাইব কোথায়,
তুমি কৃপা না করিলে
নাহি যে কোনো উপায়!
আমি দীন হীন অতি
ক্ষমো ক্ষমো কাতরে,
প্রভু হে, করহ ত্রাণ
এ পাপের পাথারে।

অন্ধ। আহা, কেমনে বধিল তোরে!
তুই যে স্নেহের পুতলি, সুকুমার শিশু ওরে!
বড়ো কি বেজেছে বুকে, বাছা রে,
কোলে আয়, কোলে আয় একবার,
ধুলাতে কেন লুটায়ে, রাখিব বুকে ক'রে!

কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে অবস্থান ও অবশেষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া
দশরথের প্রতি

শোক তাপ গেল দূরে,
মার্জনা করিনু তোরে!

পুত্রের প্রতি

যাও রে অনন্ত ধামে মোহ মায়া পাশরি
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে,
কেবলি আনন্দস্রোত চলিছে প্রবাহি!
যাও রে অনন্ত ধামে, অমৃত-নিকেতনে,
অমরগণ লইবে তোমা উদার-প্রাণে!
দেবঋষি, রাজঋষি, ব্রহ্মঋষি যে লোকে
ধ্যান ভরে গান করে এক তানে!
যাও রে অনন্তধামে, জ্যোতির্ময় আলয়ে,
শুভ্র সেই চিরবিমল পুণ্য কিরণে—
যায় যেথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান,
যাও বৎস, যাও সেই দেবসদনে!

যবনিকাপতন

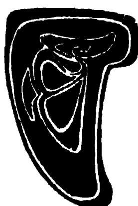
পুনরুত্থান

ঋষিকুমারের মৃতদেহ ঘেরিয়া বনদেবীদের গান

সকলি ফুরাল, স্বপন-প্রায়,
কোথা সে লুকাল, কোথা সে হায়।
কুসুমকানন হয়েছে ম্লান,

পাখিরা কেন রে গাহে না গান,
ও সব হেরি শূন্যময়—
কোথা সে হায়!
কাহার তরে আর ফুটিবে ফুল,
মাধবী মালতী কেঁদে আকুল!
সেই যে আসিত তুলিতে জল,
সেই যে আসিত পাড়িতে ফল,
ও সে আর আসিবে না-
কোথা সে হায়!

যবনিকাপতন



ছবি | অয়ন চট্টোপাধ্যায়

বিসর্জন

নাটকের পাত্রগণ

গোবিন্দমাণিক্য	ত্রিপুরার রাজা
নক্ষত্র রায়	গোবিন্দ্য মানিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
রঘুপতি	রাজপুরোহিত।
জয়সিংহ	রঘুপতির পালিত রাজপুত যুবক রাজমন্দিরের সেবক।
চাঁদপাল	দেওয়ান
নয়ন রায়	সেনাপতি
মন্ত্রী	
পৌরগণ	

প্রথম দৃশ্য

রাজসভা

সভাসদ্‌গণ

রাজা, রঘুপতি ও নক্ষত্র রায়ের প্রবেশ

সকলে। (উঠিয়া) জয় হ'ক মহারাজ!

রঘুপতি। রাজার ভাণ্ডারে
এসেছি বলির পশু সংগ্রহ করিতে।

গোবিন্দমাণিক্য। মন্দিরেতে জীব-বলি এ বৎসর হতে
হইল নিষেধ।

নয়ন রায়। বলি নিষেধ!

মন্ত্রী। নিষেধ!

নক্ষত্র রায়। তাই তো! বলি নিষেধ!

রঘুপতি। এ কি স্বপ্নে শুনি?

গোবিন্দমাণিক্য। স্বপ্নে নহে প্রভু! এত দিন স্বপ্নে ছিনু,
আজ জাগরণ! বালিকার মূর্তি ধরে
স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন
জীবরক্ত সহে না তাঁহার।

রঘুপতি। এত দিন
সহিল কী করে? সহস্র বৎসর ধরে
রক্ত করেছেন পান, আজি এ অরুচি!

গোবিন্দমাণিক্য। করেননি পান। মুখ ফিরাতেন দেবী
করিতে শোণিতপাত তোমরা যখন।

রঘুপতি। মহারাজ, কী করিছ ভালো করে ভেবে
দেখো। শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে।

গোবিন্দমাণিক্য। সকল শাস্ত্রের বড়ো দেবীর আদেশ।

রঘুপতি। একে ভ্রান্তি, তাতে অহংকার! অজ্ঞ নর,
তুমি শুধু শুনিয়াছ দেবীর আদেশ,
আমি শুনি নাই?

নক্ষত্র রায়। তাই তো, কী বলো মন্ত্রী,
এ বড়ো আশ্চর্য! ঠাকুর শোনেন নাই?

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী-আজ্ঞা নিত্য কাল ধ্বনিছে জগতে।
সেই তো বধিরতম যে জন সে বাণী
শুনেও শুনে না।

রঘুপতি। পাষণ্ড, নাস্তিক তুমি!

গোবিন্দমাণিক্য। ঠাকুর, সময় নষ্ট হয়। যাও এবে
মন্দিরের কাজে। প্রচার করিয়া দিয়ো
পথে যেতে যেতে, আমার ত্রিপুরারাজ্যে
যে করিবে জীবহত্যা জীবজননীর
পূজাচ্ছলে, তারে দিব নির্বাসনদণ্ড।

রঘুপতি। এই কি হইল স্থির?

গোবিন্দমাণিক্য। স্থির এই!

রঘুপতি। (উঠিয়া) তবে
উচ্ছন্ন! উচ্ছন্ন যাও!

চাঁদপাল। (ছুটিয়া আসিয়া)
হাঁ হাঁ! থামো! থামো!

গোবিন্দমাণিক্য। ব'সো চাঁদপাল। ঠাকুর বলিয়া যাও।
মনোব্যথা লঘু করে যাও নিজ কাজে।

রঘুপতি। তুমি কি ভেবেছ মনে ত্রিপুর-ঈশ্বরী
ত্রিপুরার প্রজা? প্রচারিবে তাঁর 'পরে
তোমার নিয়ম? হরণ করিবে তাঁর
বলি? হেন সাধ্য নাই তব! আমি আছি
মায়ের সেবক।

[প্রস্থান]

রাজার চিন্তা

নয়ন রায়। ভেবে দেখো মহারাজ,
যুগে যুগে যে পেয়েছে শতসহস্রের
ভক্তির সম্মতি, তাহারে করিতে নাশ
তোমার কী আছে অধিকার!



(সনিশ্বাসে)

গোবিন্দমাণিক্য। থাক তর্ক।
যাও মন্ত্রী, আদেশ প্রচার করো গিয়ে—
আজ হতে বন্ধ বলিদান।

[প্রস্থান]

মন্ত্রী। এ কী হল!

নক্ষত্র রায়। তাই তো হে মন্ত্রী, এ কী হল! শুনেছিনু
মগের মন্দিরে বলি নেই, অবশেষে
মগেতে হিন্দুতে ভেদ রহিল না কিছু।
কী বল হে চাঁদপাল, তুমি কেন চুপ?

দিকপাল। ভীরু আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, বুদ্ধি কিছু কম,
না বুঝে পালন করি রাজার আদেশ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দির

জয়সিংহ

রঘুপতির প্রবেশ

জয়সিংহ। (পা ধুইবার জল প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া) গুরুদেব।

রঘুপতি। যাও, যাও।

জয়সিংহ। আনিয়াছি জল।

রঘুপতি। থাক, রেখে দাও জল!

জয়সিংহ। বসন

রঘুপতি। কে চাহে
বসন!

জয়সিংহ। অপরাধ করেছি কি?

রঘুপতি। আবার!
কে নিয়েছে অপরাধ তব?—
ঘোর কলি।
এসেছে ঘনায়ে। বাহুবল রাহুসম
বজ্রতেজ গ্রাসিবারে চায় — সিংহাসন
তোলে শির যজ্ঞবেদী পরে। হায় হায়,
কলির দেবতা তোমরাও চাটুকর

সভাসদসম, নত শিরে রাজ-আজ্ঞা
বহিতেছ? চতুর্ভুজা, চারি হস্ত আছ
জোড় করি! বৈকুণ্ঠ কি আবার নিয়েছে
কেড়ে দৈত্যগণ? গিয়েছে দেবতা যত
রসাতলে? শুধু দানবে মানবে মিলে
বিশ্বের রাজত্ব দর্পে করিতেছে ভোগ?
দেবতা না যদি থাকে, ব্রাহ্মণ রয়েছে।
ব্রাহ্মণের রোষযজ্ঞে দণ্ড সিংহাসন
হবিকাষ্ঠ হবে।

(জয়সিংহের নিকট গিয়া সস্নেহে)
—বৎস, আজ করিয়াছি
রুক্ষ আচরণ তোমা পরে—চিত্ত বড়ো
ক্ষুব্ধ মোর।

জয়সিংহ। কী হয়েছে প্রভু।

রঘুপতি। কী হয়েছে?
শুধাও অপমানিত ত্রিপুরেশ্বরীরে।
এই মুখে কেমনে বলিব কী হয়েছে!

জয়সিংহ। কে করেছে অপমান!

রঘুপতি। গোবিন্দমাণিক্য।

জয়সিংহ। গোবিন্দমাণিক্য? প্রভু, কারে অপমান?

রঘুপতি। কারে? তুমি, আমি, সর্বশাস্ত্র, সর্বদেশ,
সর্বকাল, সর্বদেশকাল অধিষ্ঠাত্রী
মহাকালী, সকলেরে করে অপমান
ক্ষুদ্র সিংহাসনে বসি। মার পূজা-বলি
নিষেধিল স্পর্ধাভরে।

জয়সিংহ। গোবিন্দমাণিক্য!

রঘুপতি। হাঁগো, হাঁ, তোমার রাজা গোবিন্দমাণিক্য।
তোমার সকল শ্রেষ্ঠ — তোমার প্রাণের
অধীশ্বর। অকৃতজ্ঞ। পালন করিনু
এত যত্নে স্নেহে তোরে শিশুকাল হতে,
আমা চেয়ে প্রিয়তর আজ তোর কাছে
গোবিন্দমাণিক্য?

জয়সিংহ। প্রভু, পিতৃকোলে বসি
আকাশে বাড়ায় হাত ক্ষুদ্র মুগ্ধ শিশু
পূর্ণচন্দ্র-পানে — দেব, তুমি পিতা মোর,
পূর্ণশশী মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য!
কিন্তু এ কী বকিতেছি? কী কথা শুনিনু?
মায়ের পূজার বলি নিষেধ করেছে
রাজা? এ আদেশ কে মানিবে?

রঘুপতি। না মানিলে
নির্বাসন।

জয়সিংহ। মাতৃপূজাহীন রাজ্য হতে
নির্বাসনদণ্ড নহে। এ প্রাণ থাকিতে
অসম্পূর্ণ নাহি রবে জননীর পূজা।
যার পরে রয়েছে যে ভার, বল তার
আছে সে কাজের। করিবই মার পূজা
যদি সত্য মায়ের সেবক হই মোরা।
চলো প্রভু — বাজাই মায়ের ডঙ্কা, ডেকে
আনি পুরবাসিগণে। মন্দিরের দ্বার
খুলে দিই। — ওরে আয় তোরা, আয়, আয়,
অভয়ার পূজা হবে — নির্ভয়ে আয় রে
তোরা মায়ের সন্তান। আয় পুরবাসী।

[জয়সিংহ ও রঘুপতির প্রস্থান

পুরবাসীগণের প্রবেশ

অক্রুর। ওরে, আয় রে আয়।

সকলে। জয় মা।

হারু। আয় রে মায়ের সামনে বাহু তুলে নৃত্য করি।

রঘুপতি ও জয়সিংহের প্রবেশ

রঘুপতি। (সরোষে) দাঁড়া তোরা।

জয়সিংহ। (করজোড়ে) যেতে দাও প্রভু - প্রাণভয়ে ভীত এরা
বুদ্ধিহীন — আগে হতে রয়েছে মরিয়া।
আমি আছি মায়ের সৈনিক। এক দেহে
সহস্র সৈন্যের বল। অস্ত্র থাক পড়ে।
ভীরুদের যেতে দাও।

রঘুপতি। (স্বগত)
সে-কাল গিয়েছে।
অস্ত্র চাই, অস্ত্র চাই — শুধু ভক্তি নয়।
(প্রকাশ্যে)
জয়সিংহ, তবে বলি আনো, করি পূজা।
(বাহিরে বাদ্যোদ্যম)
জয়সিংহ। সৈন্য নহে প্রভু, আসিছে রানির পূজা।
(রানির অনুচর ও পুরবাসীগণের প্রবেশ)
সকলে। ওরে ভয় নেই - সৈন্য কোথায়? মার পূজা আসছে।
হারু। আমরা আছি খবর পেয়েছে, সৈন্যরা শীঘ্র এদিকে আসছে না।
কানু। ঠাকুর, রানিমা পুজো পাঠিয়েছেন।
রঘুপতি। জয়সিংহ, শীঘ্র পূজার আয়োজন করো।
[জয়সিংহের প্রস্থান
পুরবাসীগনের নৃত্যগীত। গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ
গোবিন্দমাণিক্য। চলে যাও হেথা হতে - নিয়ে যাও বলি!
রঘুপতি, শোন নাই আদেশ আমার?
রঘুপতি। শুনি নাই।
গোবিন্দমাণিক্য। তবে তুমি এ রাজ্যের নহ।
রঘুপতি। নহি আমি। আমি আছি যেথা, সেথা এলে
রাজদণ্ড খসে যায় রাজহস্ত হতে,
মুকুট ধূলায় পড়ে লুটে। কে আছিস,
আন মার পূজা।
বাদ্যোদ্যম
গোবিন্দমাণিক্য। চুপ কর!
(অনুচরের প্রতি)
কোথা আছে
সেনাপতি, ডেকে আন্। হায় রঘুপতি,
অবশেষে সৈন্য দিয়ে ঘিরিতে হইল
ধর্ম! লজ্জা হয় ডাকিতে সৈনিক দল,
বাহুবল দুর্বলতা করায় স্মরণ।
রঘুপতি। অবিশ্বাসী, সত্যই কি হয়েছে ধারণা
কলিযুগে ব্রম্ভতেজ গেছে — তাই এত
দুঃসাহস? যায় নাই। যে দীপ্ত অনল

জ্বলিছে অন্তরে, সে তোমার সিংহাসনে
নিশ্চয় লাগিবে। নতুবা এ মনানলে
ছাই করে পুড়াইব সব শাস্ত্র, সব
ব্রহ্মগর্ব, সমস্ত তেত্রিশ কোটি মিথ্যা।
আজ নহে মহারাজ, রাজ-অধিরাজ,
এই দিন মনে ক'রো আর এক দিন।

জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। আয়োজন
হয়েছে পূজার। প্রস্তুত রয়েছে বলি।

গোবিন্দমাণিক্য। বলি কার তরে?

জয়সিংহ। মহারাজ, তুমি হেথা!
তবে শোনো নিবেদন— একান্ত মিনতি
যুগল চরণতলে, প্রভু, ফিরে লও
তব গর্বিত আদেশ। মানব হইয়া
দাঁড়ায়ো না দেবীরে আচ্ছন্ন করি—

রঘুপতি। ধিক্।
জয়সিংহ, ওঠো, ওঠো। চরণে পতিত
কার কাছে? আমি যার গুরু, এ সংসারে
এই পদতলে তার একমাত্র স্থান।
মূঢ়, ফিরে দেখ্—গুরুর চরণ ধরে
ক্ষমা ভিক্ষা কর। রাজার আদেশ নিয়ে
করিব দেবীর পূজা,—করালকালিকা,
এত কি হয়েছে তোর অধঃপাত? থাক
পূজা, থাক বলি, — দেখিব রাজার দর্প
কত দিন থাকে। চলে এস জয়সিংহ।

[রঘুপতি ও জয়সিংহের প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্য। এ সংসারে বিনয় কোথায়? মহাদেবী,
যারা করে বিচরণ তব পদতলে
তারাও শেখেনি হায় কত ক্ষুদ্র তারা।
হরণ করিয়া লয়ে তোমার মহিমা
আপনার দেহে বহে, এত অহংকার।

[প্রস্থান



তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির

রঘুপতি, জয়সিংহ ও নক্ষত্র রায়

নক্ষত্র রায়। কী জন্য ডেকেছ গুরুদেব?

রঘুপতি। কাল রাত্রে
স্বপন দিয়েছে দেবী, তুমি হবে রাজা।

নক্ষত্র রায়। আমি হব রাজা! হা, হা! বল কী ঠাকুর।
রাজা হব? এ কথা নূতন শোনা গেল!

রঘুপতি। তুমি রাজা হবে।

নক্ষত্র রায়। বিশ্বাস না হয় মোর।

রঘুপতি। দেবীর স্বপন সত্য। রাজটিকা পাবে
তুমি, নাহিকো সন্দেহ।

নক্ষত্র রায়। নাহিকো সন্দেহ!
কিন্তু যদি নাই পাই?

রঘুপতি। আমার কথায়
অবিশ্বাস?

জয়সিংহ। অবিশ্বাস কিছুমাত্র নাই,
কিন্তু দৈবাতের কথা—যদি নাই হয়।

রঘুপতি। অন্যথা হবে না কভু।

নক্ষত্র রায়। অন্যথা হবে না?
দেখো প্রভু, কথা যেন ঠিক থাকে শেষে।
রাজা হয়ে মন্ত্রীটারে দেব দূর করে,
সর্বদাই দৃষ্টি তার রয়েছে পড়িয়া
আমা' পরে, যেন সে বাপের পিতামহ।
বড়ো ভয় করি তারে — বুঝেছ ঠাকুর?
তোমারে করিব মন্ত্রী।

রঘুপতি। মন্ত্রিত্বের পদে
পদাঘাত করি আমি।

নক্ষত্র রায়। আচ্ছা জয়সিংহ
মন্ত্রী হবে। কিন্তু হে ঠাকুর, সবই যদি
জানো তুমি, বলো দেখি কবে রাজা হব?

রঘুপতি। রাজরক্ত চান দেবী।

নক্ষত্র রায়। রাজরক্ত চান।

রঘুপতি। রাজরক্ত আগে আনো, পরে রাজা হবে।

নক্ষত্র রায়। পাব কোথা।

রঘুপতি। ঘরে আছে গোবিন্দমানিক্য
তাঁরি রক্ত চাই!

নক্ষত্র রায়। তাঁরি রক্ত চাই!

রঘুপতি। স্থির
হয়ে থাকো, জয়সিংহ, হয়ো না চঞ্চল।
—বুঝেছ কি? শোনো তবে, — গোপনে তাঁহারে
বধ করে, আনিবে সে তপ্ত রাজরক্ত
দেবীর চরণে।—
জয়সিংহ, স্থির যদি
না থাকিতে পার, চলে যাও অন্য ঠাঁই!
— বুঝেছ নক্ষত্র রায়, দেবীর আদেশ,
রাজরক্ত চাই — শ্রাবণের শেষ রাত্রে।
তোমরা রয়েছ দুই রাজভ্রাতা — জ্যেষ্ঠ
যদি অব্যাহতি পায় — তোমার শোণিত
আছে। তৃষিত হয়েছে যবে মহাকালী,
তখন সময় আর নাই বিচারের।

নক্ষত্র রায়। সর্বনাশ! হে ঠাকুর, কাজ কী রাজত্বে।
রাজরক্ত থাক রাজদেহে, আমি যাহা
আছি সেই ভালো।

রঘুপতি। মুক্তি নাই, মুক্তি নাই
কিছুতেই। রাজ রক্ত আনিতেই হবে।

নক্ষত্র রায়। বলে দাও, হে ঠাকুর, কী করিতে হবে।

রঘুপতি। প্রস্তুত হইয়া থাকো। যখন যা বলি
অবিলম্বে করিবে সাধন; কার্যসিদ্ধি
যত দিন নাহি হয়। বন্ধ রেখো মুখ।
এখন বিদায় হও।

নক্ষত্র রায়। হে মা কাত্যায়নী।

[প্রস্থান

জয়সিংহ। এ কী শুনিলাম। দয়াময়ী মাত, এ কী

কথা। তোর আজ্ঞা? ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা?
বিশ্বের জননী! গুরুদেব! হেন আজ্ঞা
মাতৃ-আজ্ঞা বলে করিলে প্রচার!

রঘুপতি। বন্ধ হ'ক বলিদান
তবে।

জয়সিংহ। হোক বন্ধ। না, না, গুরুদেব, তুমি—
জানো ভালোমন্দ। সরল ভক্তির বিধি
শাস্ত্রবিধি নহে। আপন আলোকে আঁখি
দেখিতে না পায়, আলোক আকাশ হতে
আসে। প্রভু ক্ষমা করো, ক্ষমা করো দাসে।
ক্ষমা করো স্পর্ধা মূঢ়তার। ক্ষমা করো
নিতান্ত বেদনাবশে উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ।
বলো প্রভু, সত্যই কি রাজরক্ত চান
মহাদেবী?

রঘুপতি। হায় বৎস, হায়! অবশেষে
অবিশ্বাস মোর প্রতি?

জয়সিংহ। অবিশ্বাস? কভু
নহে। তোমারে ছাড়িলে বিশ্বাস আমার
দাঁড়াবে কোথায়? বাসুকির শিরশ্চ্যুত
বসুধার মতো, শূন্য হতে শূন্যে পাবে
লোপ। রাজরক্ত চায় তবে মহামায়া,
সে রক্ত আনিব আমি। দিব না ঘটিতে
ভ্রাতৃহত্যা।

রঘুপতি। দেবতার আজ্ঞা পাপ নহে।

জয়সিংহ। পুণ্য তবে, আমিই সে করিব অর্জন।

রঘুপতি। সত্য করে বলি, বৎস তবে। তোরে আমি
ভালোবাসি প্রাণের অধিক — পালিয়াছি
শিশুকাল হতে তোরে, মায়ের অধিক
স্নেহে, তোরে আমি নারিব হারাতে।

জয়সিংহ। মোর
স্নেহে ঘটিতে দিব না পাপ, অভিশাপ
আনিব না এ স্নেহের' পরে।

রঘুপতি। ভালো ভালো
সে কথা হইবে পরে — কল্য হবে স্থির।

[উভয়ের প্রস্থান

চাঁদপাল ও গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

চাঁদ পাল। মহারাজ, সাবধানে থেকো। চারিদিকে
চক্ষুকর্ণ পেতে আছি, রাজ-ইষ্টানিষ্ট
কিছু না এড়ায় মোর কাছে। মহারাজ,
তব প্রাণহত্যা-তরে গুপ্ত আলোচনা
স্বকর্ণে শুনেছি।

গোবিন্দমাণিক্য। প্রাণহত্যা! কে করিবে?

চাঁদপাল। বলিতে সংকোচ মানি। ভয় হয় পাছে
সত্যকার ছুরি চেয়ে নিষ্ঠুর সংবাদ
অধিক আঘাত করে রাজার হৃদয়ে।

গোবিন্দমাণিক্য। অসংকোচে বলে যাও। রাজার হৃদয়
সতত প্রস্তুত থাকে আঘাত সহিতে।
কে করেছে হেন পরামর্শ?

চাঁদপাল। যুবরাজ
নক্ষত্র রায়।

গোবিন্দমাণিক্য। নক্ষত্র?

চাঁদপাল। স্বকর্ণে শুনেছি
মহারাজ, রঘুপতি যুবরাজ মিলে
গোপনে মন্দিরে বসে স্থির হয়ে গেছে
সব কথা।

গোবিন্দমাণিক্য। দুই দণ্ডে স্থির হয়ে গেল
আজন্মের বন্ধন টুটিতে! হায় বিধি!

চাঁদপাল। দেবতার কাছে তব রক্ত এনে দেবে—

গোবিন্দমাণিক্য। দেবতার কাছে! তবে আর নক্ষত্রের
নাই দোষ। জানিয়াছি, দেবতার নামে
মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ। ভয় নাই
যাও তুমি কাজে। সাবধানে রব আমি।

[চাঁদপালের প্রস্থান

রক্ত নহে, ফুল আনিয়াছি, মহাদেবী
ভক্তি শুধু, হিংসা নহে, বিভীষিকা নহে।
এ জগতে দুর্বলেরা বড়ো অসহায়
মা জননী, বাহুবল বড়োই নিষ্ঠুর,
স্বার্থ বড়ো ক্রূর, লোভ বড়ো নিদারুণ,
অজ্ঞান একান্ত অন্ধ, গর্ব চলে যায়
অকাতরে ক্ষুদ্রেরে দলিয়া পদতলে।
হেথা স্নেহ-প্রেম অতি ক্ষীণ বৃন্তে থাকে,
পলকে খসিয়া পড়ে স্বার্থের পরশে।
তুমিও জননী, যদি খড়্গ উঠাইলে,
মেলিলে রসনা, তবে সব অন্ধকার।
ভাই তাই ভাই নহে আর, পতি প্রতি
সতী বাম, বন্ধু শত্রু, শোণিতে পঙ্কিল
মানবের বাসগৃহ, হিংসা পুণ্য, দয়া
নির্বাসিত। আর নহে, আর নহে, ছাড়ো
ছদ্মবেশ। এখনো কি হয়নি সময়?
এখনো কি রহিবে প্রলয়-রূপ তব?
এই যে উঠিছে খড়্গ চারি দিক হতে
মোর শির লক্ষ্য করি', মাত ঃ একি তোরি
চারি ভুজ হতে? তা হবে! তবে তাই
হোক। বুঝি মোর রক্তপাতে হিংসানল
নিবে যাবে। ধরণীর সহিবে না এত
হিংসা। রাজ হত্যা! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!
সমস্ত প্রজার বুকে লাগিবে বেদনা,
সমস্ত ভায়ের প্রাণ উঠিবে কাঁদিয়া।
মোর রক্তে হিংসার ঘুচিবে মাতৃবেশ,
প্রকাশিবে রাক্ষসী-আকার। এই যদি
দয়ার বিধান তোর, তবে তাই হোক!

জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। বল্ চন্ডী, সত্যই কি রাজরক্ত চাই?
এই বেলা বল্ — বল্ নিজ মুখে, বল্
মানব-ভাষায়, বল্ শীঘ্র,—সত্যই কি
রাজরক্ত চাই?

নেপথ্যে। চাই

জয়সিংহ। তবে মহারাজ,
নাম লহ ইষ্টদেবতার। কাল তব
নিকটে এসেছে।

গোবিন্দমাণিক্য কী হয়েছে জয়সিংহ?

জয়সিংহ। শুনিলে না নিজকর্ণে? দেবীরে শুধানু
সত্যই কি রাজরক্ত চাই — দেবী নিজে
কহিলেন - 'চাই'।

গোবিন্দমাণিক্য দেবী নহে জয়সিংহ,
কহিলেন রঘুপতি অন্তরাল হতে,
পরিচিত স্বর।

জয়সিংহ। কহিলেন রঘুপতি।
অন্তরাল হতে? নহে নহে, আর নহে
কেবলই সংশয় হতে সংশয়ের মাঝে
নামিতে পারি নে আর। যখনি কূলের
কাছে আসি— কে মোরে ঠেলিয়া দেয় যেন
অতলের মাঝে! সে যে অবিশ্বাস-দৈত্য।
আর নহে! গুরু হোক, কিংবা দেবী হোক
একই কথা। [ছুরিকা উন্মোচন

(ছুরি ফেলিয়া) ফুল নে মা! নে মা! ফুল নে মা!
পায়ে ধরি, শুধু ফুল নিয়ে হোক তোর
পরিতোষ। আর রক্ত না মা, আর রক্ত
নয়। এত যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি
জবাফুল। পৃথিবীর মাতৃবক্ষ ফেটে
উঠিয়াছে ফুটে, সন্তানের রক্তপাতে,
ব্যথিত ধরার স্নেহবেদনার মতো।
নিতে হবে। এই তোর নিতে হবে। আমি
নাহি ডরি তোর রোষ। রক্ত নাহি দিব।
রাঙা' তোর আঁখি। তোল তোর খড়্গ। আন
তোর শ্মশানের দল। আমি নাহি ডরি।

[গোবিন্দমাণিক্যের প্রস্থান

এ কী হল হায়। দেবী গুরু যাহা ছিল
এক দন্ডে বিসর্জন দিনু — বিশ্বমাঝে
কিছু রহিল না আর

(রঘুপতির প্রবেশ)

রঘুপতি। সকল শুনেছি
আমি। সব পন্ড হল। কী করিলি, ওরে
অকৃতজ্ঞ।

জয়সিংহ। দণ্ড দাও প্রভু।

রঘুপতি। সব ভেঙে
দিলি। ব্রহ্মশাপ ফিরাইলি অর্ধপথ
হতে। লঙ্ঘিলি গুরুর বাক্য। ব্যর্থ করে
দিলি দেবীর আদেশ। আপন বুদ্ধিরে
করিলি সকল হতে বড়ো। আজন্মের
স্নেহ ঋণ শুধিলি এমনি করে।

জয়সিংহ। দণ্ড
দাও পিতা।

রঘুপতি। কোন্ দন্ড দিব?

জয়সিংহ। প্রাণদণ্ড।

রঘুপতি। নহে তার চেয়ে গুরুদণ্ড চাই। স্পর্শ
কর দেবীর চরণ।

জয়সিংহ। করিনু পরশ

রঘুপতি। বল্ তবে, আমি এনে দিব রাজরক্ত
শ্রাবণের শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।

জয়সিংহ। আমি এনে দিব রাজরক্ত, শ্রাবণের
শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।

রঘুপতি। চলে যাও।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির। বাহিরে ঝড়

রঘুপতি

রঘুপতি। এত দিনে, আজ বুঝি জাগিয়াছ দেবী!
ওই রোষ হুহুংকার! অভিশাপ হাঁকি



নগরের পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ
তিমিররূপিণী। —ওই বুঝি তোর
প্রলয়সঙ্গিনীগণ দারুণ ক্ষুধায়
প্রাণপণে নাড়া দেয় বিশ্বমহাতরু।
আজ মিটাইব তোর দীর্ঘ উপবাস।
ভক্তেরে সংশয়ে ফেলি এত দিন ছিলি
কোথা দেবী? তোর খড়গ তুই না তুলিলে
আমরা কি পারি? আজ কী আনন্দ তোর
চণ্ডীমূর্তি দেখে। সাহসে ভরেছে চিত্ত,
সংশয় গিয়েছে, হতমান নতশির
উঠেছে নূতন তেজে। ওই পদধ্বনি
শুনা যায়, ওই আসে তোর পূজা। জয়
মহাদেবী।
জয়সিংহ যদি নাই আসে। কভু নহে।
সত্যভঙ্গ কভু নাহি হবে তার। — জয়
মহাকালী সিদ্ধিদাত্রী, জয় ভয়ংকরী।
যদি বাধা পায় — যদি ধরা পড়ে শেষে—
যদি প্রাণ যায় তার প্রহরীর হাতে?
জয় মা অভয়া, জয় ভক্তের সহায়।
জয় মা জাগ্রত দেবী, জয় সর্বজয়া।
ভক্তবৎসলার যেন দুর্নাম না রটে
এ সংসারে, শত্রু পক্ষ নাহি হাসে যেন
নিঃশঙ্ক কৌতুকে। মাতৃ-অহংকার যদি
চূর্ণ হয় সন্তানের, মা বলিয়া তবে
কেহ ডাকিবে না তোরে। ওই পদধ্বনি।
জয়সিংহ বটে। জয় নৃমুণ্ডমালিনী,
পাষণ্ডদলনী মহাশক্তি।

জয় সিংহের দ্রুত প্রবেশ

জয় সিংহ

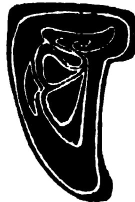
রাজরক্ত কই?

জয় সিংহ। আছে আছে। ছাড়ো মোরে।
নিজে আমি করি নিবেদন। রাজরক্ত
চাই তোর, দয়াময়ী, জগৎপালিনী

মাতা? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না
তৃষা? আমি রাজপুত, পূর্বপিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহবংশ— রাজরক্ত আছে দেহে।
এই রক্ত দিব।
এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা, এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর। রক্ততৃষাতুরা! [বক্ষে ছুরি বন্ধন

রঘুপতি। জয়সিংহ। জয়সিংহ। নির্দয়, নিষ্ঠুর।
এ কী সর্বনাশ করিলি রে? জয়সিংহ
অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, পিতৃমর্মঘাতী,
স্বেচ্ছাচারী! জয়সিংহ, কুলিশকঠিন!
ওরে জয়সিংহ মোর একমাত্র প্রাণ,
প্রাণাধিক, জীবন-মন্থন-করা ধন।
জয়সিংহ, বৎস মোর, হে গুরুবৎসল!
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাহি; অহংকার অভিমান
দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক! তুই আয়!

(প্রতিমার পদতলে মাথা রাখিয়া)
ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে



ছবি | *যুধাজিৎ সেনগুপ্ত*

হাস্যকৌতুক

হেঁয়ালি-নাট্য

ভূমিকা

সূর্যের আলো না হইলে গাছ ভালো করিয়া বাড়ে না, আমোদ-প্রমোদ না থাকিলে মানুষের মনও ভালো করিয়া বাড়িতে পারে না।

'আমোদ-প্রমোদ করো' এ কথা যে বলিতে হয় এই আশ্চর্য। কিন্তু আমাদের দেশে এ কথাও বলা আবশ্যক। আমরা হৃদয়-মনের সহিত আমোদ করিতে জানি না। আমাদের আমোদের মধ্যে প্রফুল্লতা নাই, উল্লাস নাই, উচ্ছ্বাস নাই। তাস পাশা দাবা পরনিন্দা ইহাতে হৃদয়ের বা শরীরের স্বাস্থ্য-সম্পাদন করে না। এ সকল নিতান্তই বুড়োমি, কুণোমি, কুঁড়েমি। দায়ে পড়িয়া, কাজে পড়িয়া, ভাবনায় পড়িয়া সময়ের প্রভাবে আমরা তো সহজেই বুড়ো হইয়া পড়িতেছি, এজন্য কাহাকেও অধিক আয়োজন করিতে হয় না। ইহার উপরেও যদি খেলার সময়, আমোদের সময়, আমরা ইচ্ছা করিয়া বুড়োমির চর্চা করি, তবে যৌবনকে গলা টিপিয়া বধ করা হয়। যতদিন যৌবন থাকে ততদিন উৎসাহ থাকে, প্রতি মুহূর্তে হৃদয় বাড়িতে থাকে, নূতন নূতন ভাব নূতন নূতন জ্ঞান সহজে গ্রহণ করিতে পারি—নূতন কাজ করিতে অনিচ্ছা বোধ হয় না। —বিশ্বসুদ্ধ লোক এবং অনুষ্ঠানের উপর অবিশ্বাস জন্মে না—আশা উদ্যমকে বিসর্জন দিয়া পরম বিজ্ঞ হইয়া তাম্রকূটের ধূম ও পরনিন্দা লইয়া দাওয়ায় বসিয়া একাধিপত্য করিতে ইচ্ছা যায় না। হৃদয়ের যৌবন চলিয়া গেলে হৃদয়ের বৃদ্ধি আর হয় না, শামুকের মতো জড়তার খোলার মধ্যে সংকুচিত হইয়া বাস করিতে হয়, আপনাকে এমনি মস্ত লোক বলিয়া বোধ হয় যে দাম্ভিক নিরুদ্যমে ফুলিয়া উঠিয়া শীতকালের ভেকটি হইয়া বসিয়া থাকি— আর-কোনো লোকের কোনো কাজ দেখিলে অত্যন্ত হাসি আসে।

বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ মাত্রকেই আমরা ছেলেমানুষি জ্ঞান করি—বিজ্ঞলোকের, কাজের লোকের পক্ষে সেগুলো নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা আমরা বুঝি না যে, যাহারা বাস্তবিক কাজ করিতে জানে তাহারাই আমোদ করিতে জানে। যাহারা কাজ করে না

তাহারা আমোদও করে না। ইংরাজেরা কাজ না করিয়া থাকিতে পারে না, আমোদ নহিলেও তাহাদের চলে না। ইংরাজেরা জ্ঞানে বৃদ্ধের মতো, কাজে যুবার মতো, খেলায় বালকের মতো। আসল কথা এই যে, বালকের মতো না খেলিলে যুবার মতো কাজ করা যায় না, যুবার মতো কাজ না করিলে বৃদ্ধের মতো জ্ঞান পাকিয়া উঠে না। ক্ষেত্রেই যেমন শস্য পাকিয়া থাকে, গোলাবাড়িতে পাকে না, তেমনি কার্যক্ষেত্রেই জ্ঞান পাকিয়া থাকে—জড়তার মধ্যে তাম্রকূটের ধোঁয়ায় পাকিয়া উঠে না। মানুষের মতো মানুষ হইতে গেলে বালক বৃদ্ধ যুবা এই তিনই হইতে হয়। কেবলই বৃদ্ধ হইতে গেলে বিনাশ পাইতে হয়, কেবলই বালক হইতে গেলে উন্নতি হয় না। আমরা বাঙালিরা যদি যথার্থ মহৎজাতি হইতে চাই তবে আমরা খেলাও করিব, কাজও করিব, চিন্তা করিব। আমরা প্রফুল্ল হইয়া খেলা করিব, উদ্যোগী হইয়া কাজ করিব ও গম্ভীর হইয়া চিন্তা করিব।

ইংরেজদের 'শারাড'-নামক একপ্রকার খেলা আছে, আমরা বাংলায় তাহাকে হেঁয়ালি-নাট্য বলিলাম। তাহার মর্মটা বলিয়া দিই। দুই-তিনজন লোকে ষড়যন্ত্র করিয়া এমন একটা কথা বাহির করিতে হইবে যাহা দুই-তিন ভাগে ভাঙিয়া ফেলা যাইতে পারে। প্রত্যেক ভাগের একটা অর্থ থাকা চাই। মনে করো 'পাগোল' শব্দ। এই শব্দকে পা এবং গোল এই দুই ভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগের একটা অর্থ পাওয়া যায়। তার পর উপস্থিতমত মুখে মুখে একটা নাটক বানাইয়া লইতে হইবে; সেই নাটকের মধ্যে কোনো স্থানে কথায় কথায় পা শব্দ এবং গোল শব্দ, এবং পাগল শব্দের সমস্তটা ব্যবহার করিতে হইবে, পরে শ্রোতারা আন্দাজ করিয়া বলিয়া দিবেন কোন্ শব্দ অবলম্বন করিয়া এই নাট্যাভিনয় করা হইল। না বলিতে পারিলে তাঁহাদের হার হইল।

আমরা নিম্নে হেঁয়ালি-নাট্যের একটা উদাহরণ দিতেছি। পাঁচজন কিম্বা চারজনে মিলিয়া এই হেঁয়ালি-নাট্য অভিনয় করিবেন, এবং বাকি সকলকে এই নাট্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন শব্দটা বাহির করিয়া দিতে হইবে।

জ্যৈষ্ঠ ১২৯২। 'বালক' পত্রে অতঃপর 'রোগের চিকিৎসা' নাটিকাটি মুদ্রিত।

এই ক্ষুদ্র কৌতুকনাট্যগুলি হেঁ য়া লি না ট্য নাম ধরিয়া 'বালক' ও 'ভারতী'তে বাহির হইয়াছিল। য়ুরোপে শারাড্ (charade)-নামক এক প্রকার নাট্যলেখা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়। ইহার মধ্যে হেঁয়ালি রক্ষা করিতে গিয়া লেখা সংকুচিত করিতে হইয়াছিল—আশা করি সেই হেঁয়ালির সন্ধান করিতে বর্তমান পাঠকগণ অনাবশ্যক কষ্ট স্বীকার করিবেন না। এই হেঁয়ালিনাট্যের কয়েকটি বিশেষভাবে বালকদিগকেই আমোদ দিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল।

ছাত্রের পরীক্ষা

ছাত্র শ্রীমধুসূদন। শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ মাস্টার পড়াইতেছেন

অভিভাবকের প্রবেশ

অভিভাবক। মধুসূদন পড়াশুনো কেমন করছে কালাচাঁদবাবু?

কালাচাঁদ। আজ্ঞে, মধুসূদন অত্যন্ত দুষ্ট বটে, কিন্তু পড়াশুনোয় খুব মজবুত। কখনো একবার বৈ দুবার বলে দিতে হয় না। যেটি আমি একবার পড়িয়ে দিয়েছি সেটি কখনো ভোলে না।

অভিভাবক। বটে! তা, আমি আজ একবার পরীক্ষা করে দেখব।

কালাচাঁদ। তা, দেখুন-না।

মধুসূদন। (স্বগত) কাল মাস্টারমশায় এমন মার মেরেছেন যে আজও পিঠ চচ্চড় করছে। আজ এর শোধ তুলব। ওঁকে আমি তাড়াব।

অভিভাবক। কেমন রে মোধো, পুরোনো পড়া সব মনে আছে তো?

মধুসূদন। মাস্টারমশায় যা বলে দিয়েছেন তা সব মনে আছে।

অভিভাবক। আচ্ছা, উদ্ভিদ্ কাকে বলে বল্ দেখি।

মধুসূদন। যা মাটি ফুঁড়ে ওঠে।

অভিভাবক। একটা উদাহরণ দে।

মধুসূদন। কেঁচো।

কালাচাঁদ। (চোখ রাঙাইয়া) অ্যাঁ! কী বললি!

অভিভাবক। বসুন মশায়, এখন কিছু বলবেন না।

মধুসূদনের প্রতি

তুমি তো পদ্যপাঠ পড়েছ; আচ্ছা, কাননে কী ফোটে বলো দেখি।

মধুসূদন। কাঁটা।

কালাচাঁদের বেত্র-আস্ফালন

কী মশায়, মারেন কেন? আমি কি মিথ্যে কথা বলছি?

অভিভাবক। আচ্ছা, সিরাজউদ্দৌলাকে কে কেটেছে? ইতিহাসে কী বলে?

মধুসূদন। পোকায়।

বেত্রাঘাত

আজ্ঞে, মিছিমিছি মার খেয়ে মরছি—শুধু সিরাজউদ্দৌলা কেন, সমস্ত ইতিহাসখানাই পোকায় কেটেছে! এই দেখুন।

প্রদর্শন। কালাচাঁদ মাস্টারের মাথা-চুলকায়ন

অভিভাবক। ব্যাকরণ মনে আছে?

মধুসূদন। আছে।

অভিভাবক। ‘কর্তা’ কী, তার একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও দেখি।

মধুসূদন। আজ্ঞে, কর্তা ও পাড়ার জয়-মুনশি।

অভিভাবক। কেন বলো দেখি।



মধুসূদন। তিনি ক্রিয়া-কর্ম নিয়ে থাকেন।

কালাচাঁদ। (সরোষে) তোমার মাথা!

পৃষ্ঠে বেত্র

মধুসূদন। (চমকিয়া) আজ্ঞে, মাথা নয়, ওটা পিঠ।

অভিভাবক। ষষ্ঠী-তৎপুরুষ কাকে বলে?

মধুসূদন। জানি নে।

কালাচাঁদবাবুর বেত্র-দর্শায়ন

মধুসূদন। ওটা বিলক্ষণ জানি—ওটা যষ্টি-তৎপুরুষ।

অভিভাবকের হাস্য এবং

কালাচাঁদবাবুর তদ্‌বিপরীত ভাব

অভিভাবক। অঙ্কশিক্ষা হয়েছে?

মধুসূদন। হয়েছে।

অভিভাবক। আচ্ছা, তোমাকে সাড়ে ছ'টা সন্দেশ দিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে যে, পাঁচ মিনিট সন্দেশ খেয়ে যতটা সন্দেশ বাকি থাকবে তোমার ছোটো ভাইকে দিতে হবে। একটা সন্দেশ খেতে তোমার দু'মিনিট লাগে, কটা সন্দেশ তুমি তোমার ভাইকে দেবে?

মধুসূদন। একটাও নয়।

কালাচাঁদ। কেমন করে!

মধুসূদন। সবগুলো খেয়ে ফেলব। দিতে পারব না।

অভিভাবক। আচ্ছা, একটা বটগাছ যদি প্রত্যহ সিকি ইঞ্চি করে উঁচু হয় তবে যে বট এ বৈশাখ মাসের পয়লা দশ ইঞ্চি ছিল ফিরে বৈশাখ মাসের পয়লা সে কতটা উঁচু হবে?

মধুসূদন। যদি সে গাছ বেঁকে যায় তা হলে ঠিক বলতে পারি নে, যদি বরাবর সিধে ওঠে তা হলে মেপে দেখলেই ঠাহর হবে, আর যদি ইতিমধ্যে শুকিয়ে যায় তা হলে তো কথাই নেই।

কালাচাঁদ। মার না খেলে তোমার বুদ্ধি খোলে না! লক্ষ্মীছাড়া, মেরে তোমার পিঠ লাল করব, তবে তুমি সিধে হবে।

মধুসূদন। আজ্ঞে, মারের চোটে খুব সিধে জিনিসও বেঁকে যায়।

অভিভাবক। কালাচাঁদবাবু, ওটা আপনার ভ্রম। মারপিট করে খুব অল্প কাজই হয়। কথা আছে, গাধাকে পিটোলে ঘোড়া হয় না, কিন্তু অনেক সময়ে ঘোড়াকে পিটোলে গাধা হয়ে যায়। অধিকাংশ ছেলে শিখতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ মাস্টার শেখাতে পারে না। কিন্তু মার খেয়ে মরে ছেলেটাই। আপনি আপনার বেত নিয়ে প্রস্থান করুন। দিনকতক মধুসূদনের পিঠ জুড়োক, তার পরে আমিই ওকে পড়াব।

মধুসূদন। (স্বগত) আঃ, বাঁচা গেল।

কালাচাঁদ। বাঁচা গেল মশায়! এ ছেলেকে পড়ানো মজুরের কর্ম, কেবলমাত্র ম্যানুয়েল লেবার। ত্রিশ দিন একটা ছেলেকে কুপিয়ে আমি পাঁচটি মাত্র টাকা পাই, সেই মেহনতে মাটি কোপাতে পারলে নিদেন দশটা টাকাও হয়।

শ্রাবণ ১২৯২

পেটে ও পিঠে

প্রথম দৃশ্য

বাড়ির সম্মুখে, পথে বসিয়া, পা ছড়াইয়া বনমালী পরমানন্দে সন্দেশ আহার করিতেছে। বয়স সাত। তিনকড়ির প্রবেশ। বয়স পনেরো।

সন্দেশের প্রতি সলোভ দৃষ্টিপাত করিয়া

তিনকড়ি। কী হে বটকৃষ্ণবাবু, কী করছ?

বনমালীর নিরুত্তরে অবাক হইয়া থাকন

তিনকড়ি। উত্তর দিচ্ছ না যে? তোমার নাম বটকৃষ্ণ নয়?

বনমালী। (সংক্ষেপে) না।

তিনকড়ি। অবিশ্যি বটকৃষ্ণ। যদি হয়? আচ্ছা, তোমার নাম কী বলো।

বনমালী। আমার নাম বনমালী।

তিনকড়ি। (হাসিয়া উঠিয়া) ছেলেমানুষ, কিচ্ছু জান না। বনমালীও যা বটকৃষ্ণও তাই, একই। বনমালীর মানে জান?

বনমালী। না।

তিনকড়ি। বটকৃষ্ণের মানে বনমালী।—আচ্ছা, বাবা তোমাকে কখনো আদর করেও ডাকে না বটকৃষ্ণ?

বনমালী। না।

তিনকড়ি । বনমালীর মানে বটকৃষ্ণ। বটকৃষ্ণের মানে জান?

বনমালী। না।

তিনকড়ি। ছি ছি! আমার বাবা আমাকে বলে বটকৃষ্ণ, মোধোর বাবা মোধোকে বলে বটকৃষ্ণ—তোমার বাবা তোমাকে কিচ্ছু বলে না! ছি ছি!

পার্শ্বে উপবেশন

বনমালী। (সগর্বে) বাবা আমাকে বলে ভুতু।

তিনকড়ি। আচ্ছা ভুতুবাবু, তোমার ডান হাত কোন্‌টা বলো দেখি!

বনমালী। (ডান হাত তুলিয়া) এইটে ডান হাত।

তিনকড়ি। আচ্ছা, তোমার বাঁ হাত কোন্‌টা বলো দেখি।

বনমালী। (বাম হাত তুলিয়া) এইটে।

তিনকড়ি। (খপ্‌ করিয়া পাত হইতে একটা সন্দেশ তুলিয়া নিজের মুখের কাছে ধরিয়া) আচ্ছা ভুতুবাবু, এইটে কী বলো দেখি।

বনমালীর শশব্যস্ত হইয়া কাড়িয়া লইবার চেষ্টা

তিনকড়ি। (সরোষে পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া) এতবড়ো ধেড়ে ছেলে হলি, এইটে কী জানিস নে! এটা সন্দেশ। এটা খেতে হয়।

তিনকড়ির মুখের মধ্যে সন্দেশের দ্রুত অন্তর্ধান

বনমালী। (পৃষ্ঠে হাত দিয়া) ভ্যাঁ—

তিনকড়ি। ছি ছি ভুতুবাবু, তোমার জ্ঞান কবে হবে বলো দেখি। এইটে জান না যে পেটে খেলে পিঠে সয়?

আর একটা সন্দেশ মুখের ভিতর পূরণ

বনমালী। (দ্বিগুণ বেগে) ভ্যাঁ—

তিনকড়ি। তবে, তুমি কি বল পেটে খেলে পিঠে সয় না? এই দেখো-না কেন, পেটে খেলে—

আর-একটা সন্দেশ খাইয়া

পিঠে সয়—

বনমালীর পৃষ্ঠে চপেটাঘাত

সয় না?

বনমালী। (সরোদনে চীৎকারপূর্বক) না—ন্‌না—ন্‌না।

তিনকড়ি। (শেষ সন্দেশটি নিঃশেষ করিয়া) তা হবে। তোমার তা হলে সয় না দেখছি। যার যেমন ধাত। তবে থাক্, তবে আর কাজ নেই। তবে আজ এই স্থির হল, কারো-বা পেটে সমস্তই সয়, কারো-বা পিঠে কিচ্ছুই সয় না। যেমন আমি আর তুমি।

সহসা বনমালীর পিতার প্রবেশ

পিতা। কী রে ভুতু, কাঁদছিস কেন?

পিতাকে দেখিয়া বনমালীর দ্বিগুণ ক্রন্দন

তিনকড়ি। (বনমালীর পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া অতি কোমল স্বরে) বাবা জিগ্‌গেস করছেন, কথার উত্তর দাও।

বনমালী। (সরোদনে) আমাকে মেরেছে।

তিনকড়ি। আজ্ঞে, পাড়ার একটা ডানপিটে ছেলে খামকা মেরে গেল, বেচারার কোনো দোষ নেই—সন্দেশগুলি খেয়ে ভুতুবাবু ঠোঙাটি নিয়ে খেলা করছিল—

পিতা। (সরোষে) ভুতু, কে মেরেছে রে?

বনমালী। (তিনকড়িকে দেখাইয়া) ও মেরেছে।

তিনকড়ি। আজ্ঞে হাঁ, আমি তাকে খুব মেরেছি বটে। কার না রাগ হয় বলুন দেখি। ছেলেমানুষ খেলা করছে—খামকা ওকে মেরে ওর ঠোঙাটা কেড়ে নেও কেন বাপু? আপনি থাকলে আপনিও তাকে মারতেন।

পিতা। আমি থাকলে তার দুখানা হাড় একত্তর রাখতেম না। যত-সব ডানপিটে ছেলে এ পাড়ায় জুটেছে।

বনমালী। বাবা, ও আমার সন্দেশ—

তিনকড়ি। (নিবৃত্ত করিয়া) আরে আরে, ও কথা আর বলতে হবে না।

পিতা। কী কথা?

তিনকড়ি। আজ্ঞে, কিছুই নয়। আমি ভুতুবাবুকে আনা-দুয়েকের সন্দেশ কিনে খাইয়েছি। সামান্য কথা। সে কি আর বলবার বিষয়?

পিতা। (পরম সন্তোষে) তোমার নাম কী বাপু?

তিনকড়ি। (সবিনয়ে) আজ্ঞে, আমার নাম তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

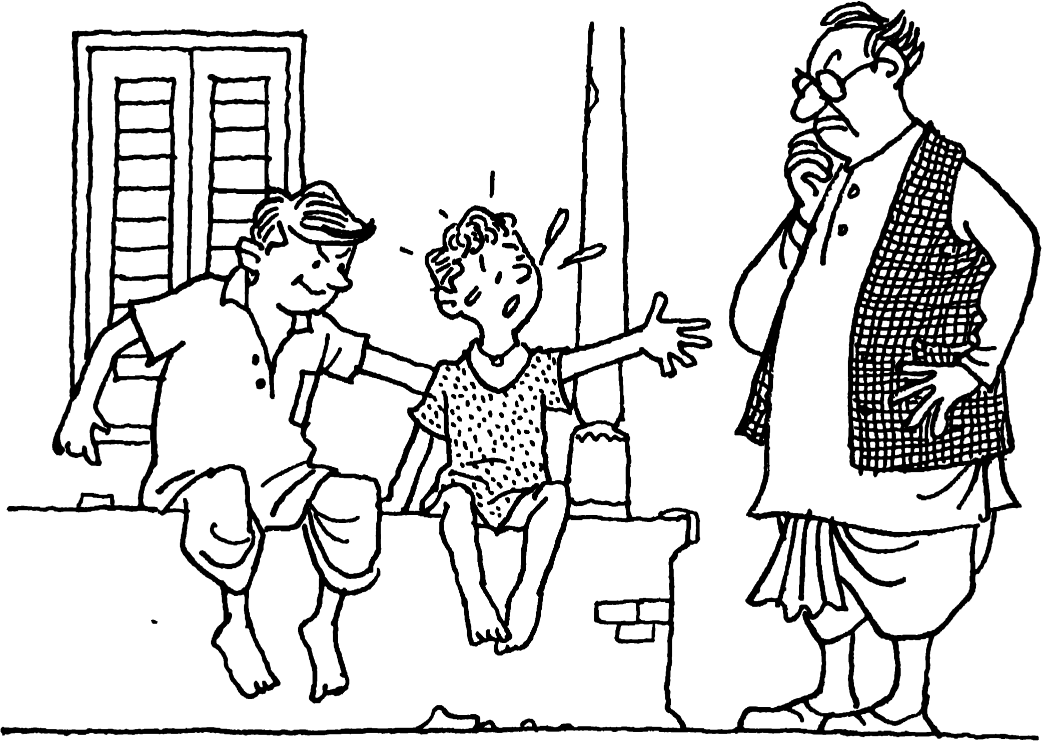
পিতা। ঠাকুরের নাম?

তিনকড়ি। খুদিরাম মুখোপাধ্যায়।

পিতা। তুমি আমার পরমাত্মীয়। খুদিরাম যে আমার পিসতুতো ভাই হয়।

তিনকড়ির ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

পিতা। চলো বাবা, বাড়ির ভিতর চলো। জলখাবার খাবে। আজ পৌষপার্বণ, পিঠে না খাইয়ে



ছাড়ব না।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে।

পিতা। আজ রাত্রে এখানে থাকবে। কাল মধ্যাহ্নভোজন করে বাড়ি যেয়ো।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুরে তিনকড়ি পিষ্টক-আহারে প্রবৃত্ত

তিনকড়ি। (স্বগত) ডান হাতের ব্যাপারটা আজ বেশ চলছে ভালো।

ভুতুর মা। (পাতে চারটে পিঠে দিয়া) বাবা, চুপ করে বসে থাকলে হবে না, এ চারখানাও খেতে হবে।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে।

আহার

ভুতুর বাপের প্রবেশ

পিতা। ওকি ও, পাত খালি যে! ওরে, খান-আষ্টেক পিঠে দিয়ে যা।

পিঠে দেওন

বাবা, খেতে হবে। এরই মধ্যে হাত গুটোলে চলবে না।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে।

আহার

পিসিমার প্রবেশ

পিসিমা। (ভুতুর মার প্রতি) ও বউ, তিনকড়ির পাত খালি যে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? ওকে খান-দশেক পিঠে দাও। লজ্জা কোরো না বাবা, ভালো করে খাও।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে।

পিসেমহাশয়ের প্রবেশ

পিসেমহাশয়। বাপু, তোমার খাওয়া হল না দেখছি। দিয়ে যা, দিয়ে যা, এ দিকে দিয়ে যা। পাতে খান-পনেরো পিঠে দে। তোমাদের বয়সে আমরা খেতুম হাঁসের মতো। সবগুলি খেতে হবে তা বলছি।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে।

দিদিমার প্রবেশ

দিদিমা। (ভুতুর মার প্রতি অন্তরালে) ও বউ, পিঠে তো সব ফুরিয়ে গেছে, আর একখানাও বাকি নেই।

ভুতুর মা। কী হবে!

দিদিমা। কী আর হবে?

তিনকড়ির পাশে গিয়া

পরিহাস করিয়া পিঠে এক কিল মারিয়া

পিঠে আর খাবে!

তিনকড়ি। আজ্ঞে না।

দিদিমা। সে কী কথা? আর দুটো খাও।

আরো দুটো কিল

তিনকড়ি (গাত্রোত্থান করিয়া) আজ্ঞে না। আর আবশ্যক নেই।

তৃতীয় দৃশ্য

পরদিন তিনকড়ি শয্যাগত। পাশে বনমালী

তিনকড়ি। (ক্ষীণ কণ্ঠে) ভুতুবাবু, তোমার বাবা কোথায় হে?

বনমালী। বদ্যি ডাকতে গেছে।

তিনকড়ি। (কাতর স্বরে) আর বদ্যি ডেকে কী হবে? ওষুধ খাব যে তার জায়গা কোথায়?

বনমালী। তোমার পেটে কী হয়েছে তিনকড়িদা?

তিনকড়ি। যাই হোক গে। কাল তোমাকে যা শিখিয়েছিলুম মনে আছে কি?

বনমালী। আছে।

তিনকড়ি। কী বলো দেখি।

বনমালী। পেটে খেলে পিঠে সয়।

তিনকড়ি। আজ আর-একটা শেখাব। কথাটা মনে রেখো—'পিঠে খেলে পেটে সয় না।'

আষাঢ় ১২৯২

অভ্যর্থনা

প্রথম দৃশ্য

গ্রামের পথ

চতুর্ভুজবাবু এম. এ. পাস করিয়া গ্রামে আসিয়াছেন; মনে করিয়াছেন গ্রামে হুলস্থুল পড়িবে। সঙ্গে একটি মোটাসোটা কাবুলি বিড়াল আছে

নীলরতনের প্রবেশ

নীলরতন। এই-যে চতুবাবু, কবে আসা হল?

চতুর্ভুজ। কলেজে এম. এ. একজামিন দিয়েই—

নীলরতন। বা বা, এ বেড়ালটি তো বড়ো সরেস।

চতুর্ভুজ। এবারকার এক্‌জামিনেশন ভারি—

নীলরতন। মশায়, বেড়ালটি কোথায় পেলেন?

চতুর্ভুজ। কিনেছি। এবারে সে সব্‌জেক্ট নিয়েছিলুম—

নীলরতন। কত দাম লেগেছে মশায়?

চতুর্ভুজ। মনে নেই। নীলরতনবাবু, আমাদের গ্রামের থেকে কেউ কি পাস হয়েছে?

নীলরতন। বিস্তর। কিন্তু এমন বেড়াল এ মুল্লুকে নেই।

চতুর্ভুজ। (স্বগত) আ মোলো, এ যে কেবল বেড়ালের কথাই বলে—আমি যে পাস করে এলুম সে কথা যে আর তোলে না।

জমিদারবাবুর প্রবেশ

জমিদার। এই-যে চতুর্ভুজ, এতকাল কলকাতায় বসে কী করলে বাপু?

চতুর্ভুজ। আজ্ঞে এম. এ. দিয়ে আসছি।

জমিদার। কী বললে? মেয়ে দিয়ে এসেছ? কাকে দিয়ে এসেছ?

চতুর্ভুজ। তা নয়—বি. এ. দিয়ে—

জমিদার। মেয়ের বিয়ে দিয়েছ? তা, আমরা কিছুই জানতে পারলেম না?

চতুর্ভুজ। বিয়ে নয়—বি. এ.—

জমিদার। তবেই হল। তোমরা শহরে বল বিএ, আমরা পাড়াগাঁয়ে বলি বিয়ে। সে কথা যাক। এ বেড়ালটি তোফা দেখতে।

চতুর্ভুজ। আপনার ভ্রম হয়েছে; আমার—

জমিদার। ভ্রম কিসের? এমন বেড়াল তুমি এ জেলার মধ্যে খুঁজে বের করো দেখি!

চতুর্ভুজ। আজ্ঞে না, বেড়ালের কথা হচ্ছে না—

জমিদার। বেড়ালের কথাই তো হচ্ছে—আমি বলছি এমন বেড়াল মেলে না।

চতুর্ভুজ। (স্বগত) আ খেলে যা!

জমিদার। বিকেলের দিকে বেড়ালটি সঙ্গে করে আমাদের ও দিকে একবার যেয়ো। ছেলেরা দেখে ভারি খুশি হবে।

চতুর্ভুজ। তা হবে বৈকি। ছেলেরা অনেকদিন আমাকে দেখে নি।

জমিদার। হাঁ—তা তো বটেই—কিন্তু আমি বলছি, তুমি যদি যেতে না পার তো বেড়ালটি বেণীর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো—ছেলেদের দেখাব।

[প্রস্থান

সাতুখুড়োর প্রবেশ

সাতুখুড়ো। এই-যে, অনেক দিনের পর দেখা।

চতুর্ভুজ। তা আর হবে না! কতগুলো এক্‌জামিন—

সাতুখুড়ো। এই বেড়ালটি—

চতুর্ভুজ। (সরোষে) আমি বাড়ি চললেম।

[প্রস্থানোদ্যম

সাতুখুড়ো। আরে, শুনে যাও-না—এ বেড়ালটি—

চতুর্ভুজ। না মশায়, বাড়িতে কাজ আছে।

সাতুখুড়ো। আরে, একটা কথার উত্তরই দাও-না—এ বেড়ালটি

কোনো উত্তর না দিয়া হন্ হন্ বেগে চতুর্ভুজের প্রস্থান

সাতুখুড়ো। আ মোলো! ছেলেপুলেগুলো লেখাপড়া শিখে ধনুর্ধর হয়ে ওঠেন। গুণ তো যথেষ্ট! অহংকার চার পোয়া!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

চতুর্ভুজের বাটীর অন্তঃপুর

দাসী। মা-ঠাকরুন, দাদাবাবু একেবারে আগুন হয়ে এসেছেন।

মা। কেন রে?

দাসী। কী জানি বাপু!

চতুর্ভুজের প্রবেশ

ছোটো ছেলে। দাদাবাবু, এ বেড়ালটি আমাকে—

চতুর্ভুজ। (তাহাকে এক চপেটাঘাত) দিন রাত্রি কেবল বেড়াল বেড়াল বেড়াল!



মা। বাছা সাধে রাগ করে! এত দিন পরে বাড়ি এল, ছেলেগুলি বিরক্ত করে খেলে। যা, তোরা সব যা!

চতুর্ভুজের প্রতি

আমাকে দাও বাছা—দুধভাত রেখে দিয়েছি, আমি তোমার বেড়ালকে খাইয়ে আনছি।

চতুর্‌ভুজ। (সরোষে) এই নাও মা, তোমরা বেড়ালকেই খাওয়াও, আমি খাব না, আমি চললেম।

মা। (সকাতরে) ও কী কথা! তোমার খাবার তো তৈরি আছে বাপ, এখন নেয়ে এলেই হয়।

চতুর্ভুজ। আমি চললেম—তোমাদের দেশে বেড়ালেরই আদর—এখানে গুণবানের আদর নেই।

বিড়ালের প্রতি লাথি-বর্ষণ

মাসিমা। আহা, ওকে মেরো না, ও তো কোনো দোষ করে নি।

চতুর্ভুজ। বেড়ালের প্রতি যত তোমাদের মায়ামমতা—আর মানুষের প্রতি একটু দয়া নেই।

[প্রস্থান

ছোটো মেয়ে। (নেপথ্যের দিকে নির্দেশ করিয়া) হরি-খুড়ো, দেখে যাও, ওর লেজ কত মোটা!

হরি। কার?

মেয়ে। ঐ-যে ওর!

হরি। চতুর্ভুজের?

মেয়ে। না, ঐ বেড়ালের।

তৃতীয় দৃশ্য

পথ

ব্যাগ হস্তে চতুর্ভুজ। সঙ্গে বিড়াল নাই

সাধুচরণ। মশায়, আপনার সে বেড়ালটি গেল কোথায়?

চতুর্ভুজ। সে মরেছে!

সাধুচরণ। আহা, কেমন করে মোলো?

চতুর্ভুজ। (বিরক্ত হইয়া) জানি নে মশায়!

পরানবাবুর প্রবেশ

পরান। মশায়, আপনার বেড়াল কী হল?

চতুর্ভুজ। সে মরেছে!

পরান। বটে! মোলো কী করে?

চতুর্ভুজ। এই তোমরা যেমন করে মরবে। গলায় দড়ি দিয়ে।

পরান। ও বাবা, এ যে একেবারে আগুন!

চতুর্ভুজের পশ্চাতে ছেলের পাল লাগিল হাততালি দিয়া 'কাবুলি বিড়াল' 'কাবুলি বিড়াল' বলিয়া খেপাইতে লাগিল

ভাদ্র ১২৯২

রোগের চিকিৎসা

প্রথম দৃশ্য

হাঁপাইতে হাঁপাইতে, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে, হারাধনের প্রবেশ

হারাধন। বাবা! ডাক্তার-সাহেবের আস্তাবল থেকে হাঁসের ডিম চুরি করতে গিয়ে আজ আচ্ছা নাকাল হয়েছি! সাহেব যেরকম তাড়া করে এসেছিল, মরেছিলেম আর-কি! ভয়ে পালাতে গিয়ে খানার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেম। পা ভেঙে গেছে তাতে দুঃখ নেই, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি এই ঢের। রোগীগুলোকে হাতে পেলে ডাক্তার-সাহেব পট্ পট্ করে মেরে ফেলে; আমার কোনো ব্যামোস্যামো নেই, আমাকেই তো সেরে ফেলবার জো করেছিল। এবার রোজ রোজ আর হাঁসের ডিম চুরি করব না, একেবারে আস্ত হাঁস চুরি করব, আমাদের বাড়িতে ডিম পাড়বে।

নেপথ্য হইতে। হারু!

হারাধন। (সভয়ে) ঐ রে, বাবা এসেছে। আমার একটা পা খোঁড়া দেখলে মারের চোটে বাবা আর-একটা পা খোঁড়া করে দেবে।

নেপথ্যে পুনশ্চ। হারু!

নিরুত্তর

হারা!

নিরুত্তর

হেরো!

পিতার প্রবেশ

হারাধন। (অগ্রসর হইয়া) আজ্ঞে!

পিতা। তুই খোঁড়াচ্ছিস যে!

হারাধনের মাথা-চুলকন

পিতা। (সরোষে) পা ভাঙলি কী করে?

হারাধন। (সভয়ে) আজ্ঞে, আমি ইচ্ছে করে ভাঙি নি।

পিতা। তা তো জানি। কী করে ভাঙল সেইটে বল্-না।

হারাধন। জানি নে বাবা।

পিতা। তোর পা ভাঙল তুই জানিস নে তো কি ও পাড়ার গোবরা তেলি জানে?

হারাধন। কখন ভাঙল টের পাই নি বাবা!

পিতা। বটে! এই লাঠির বাড়ি তোর মাথাটা ভাঙলে তবে টের পাবি বুঝি?

হারাধন। (তাড়াতাড়ি হাত দিয়া মাথা আড়াল করিয়া) না বাবা! ঐ মাথাটা বাঁচাতে গিয়েই পা'টা ভেঙেছি।

পিতা। বুঝেছি। তবে বুঝি সেদিনকার মতো ডাক্তার-সাহেবের বাড়িতে হাঁসের ডিম চুরি করতে গিয়েছিলি, তা ই তারা মেরে তোর পা ভেঙে দিয়েছে।

হারাধন। (চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে) হাঁ বাবা! আমার কোনো দোষ নেই। পা আমি নিজে ভাঙি নি, পা তারাই ভেঙে দিয়েছে।

পিতা। লক্ষ্মীছাড়া, তোর কি কিছুতেই চৈতন্য হবে না?

হারাধন। চৈতন্য কাকে বলে বাবা?

পিতা। চৈতন্য কাকে বলে দেখবি?

পিঠে কিল মারিয়া

চৈতন্য একে বলে।

হারাধন। এ তো আমার রোজই হয়।

পিতা। আমি দেখছি তুমি জেলে গিয়েই মরবে।

হারাধন। না বাবা, রোজ চৈতন্য পেলে ঘরে মরব।

পিতা। নাঃ, তোকে আর পেরে উঠলেম না।

হারাধন। (চুপড়ির দিকে চাহিয়া) বাবা, তাল এনেছ কার জন্যে? আমি খাব।

পিতা। (পৃষ্ঠে কিল মারিয়া) এই খাও!

হারাধন। (পিঠে হাত বুলাইয়া) এ তো ভালো লাগল না।

নেপথ্যে। হারু!

হারাধন। কী মা!

নেপথ্যে। তোর জন্যে তালের বড়া করে রেখেছি—খাবি আয়।

[খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হারাধনের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

ডাক্তার-সাহেবের আস্তাবলে হারাধন হাঁস-চুরি-করণে প্রবৃত্ত

পিতা। (দূর হইতে) হারু!

হারাধন। ঐ রে, বাবা আসছে! কী করি?

হারাধনের গলা হইতে পেট পর্যন্ত থলি ঝুলিতেছিল তাড়াতাড়ি থলির মধ্যে হাঁস পুরিয়া ফেলিল

পিতা। হারু!

নিরুত্তর

হারা!

নিরুত্তর

হেরো!

হারাধন। আজ্ঞে!

পিতা। তোর পেট হঠাৎ অমন ফুলে উঠল কী করে?

হারাধন। বাবা, কাল সেই তালের বড়া খেয়ে।

পিতা। অমন কঁ্যাক কঁ্যাক শব্দ হচ্ছে কেন?

হারাধন। পেটের ভিতর নাড়ীগুলো ডাকছে।

পিতা। দেখি, পেটে হাত দিয়ে দেখি।

হারাধন। (শশব্যস্ত) ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, বড্ড ব্যথা হয়েছে।

পেটের মধ্যে কঁ্যাক কঁ্যাক

পিতা। (স্বগত) সব বোঝা গেছে! হতভাগাকে জব্দ করতে হবে। (প্রকাশ্যে) তোমার রোগ সহজ নয়। এসো বাপু, তোমাকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাই।

হারাধন। না বাবা, এমন আমার মাঝে মাঝে হয়, আপনি সেরে যায়।

কঁ্যাক কঁ্যাক কঁ্যাক

পিতা। কই রে, এ তো ক্রমেই বাড়ছে। চল্‌, আর দেরি নয়।

[টানিয়া লইয়া প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

হারাধন। পিতা ও মাতা

মা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বাছার আমার কী হল গা!

পিতা। হ্যাঁগো, তুমি বেশি গোল কোরো না। হাঁসপাতালে নিয়ে গেলেই এ ব্যামো সেরে যাবে।

মা। আমি বেশি গোল করছি, না তোমার ছেলের পেট বেশি গোল করছে! (সভয়ে) এ যে হাঁসের মতো ক্যাঁক ক্যাঁক করে। বাবা হাবু, তোকে আর আমি হাঁসের ডিম খেতে দেব না—তোর পেটের মধ্যে হাঁস ডাকছে—কী হবে!

ক্রন্দন

হারাধন। (তাড়াতাড়ি) না মা, ও হাঁস নয়, ও তালের বড়া। হাঁস তোমাকে কে বললে? কক্‌খনো হাঁস নয়। হাঁস হতেই পারে না। আচ্ছা, বাজি রাখো, যদি তালের বড়া হয়!

মা। তালের বড়া কি অমন করে ডাকে বাছা?

হারাধন। তুমি একটু চুপ করো না। তোমাদের গোলমাল শুনে পেটের ভিতর আরো বেশি করে ডাকছে।

পিতা। বোসেদের বাড়ি আমার একটু কাজ আছে, আমি কাজ সেরেই হাবুকে নিয়ে হাঁসপাতালে যাচ্ছি।

[প্রস্থান

ক্যাঁক ক্যাঁক ক্যাঁক ক্যাঁক

মা। ওগো, এ যে ক্রমেই বাড়তে চলল! ওগো মুখুজ্জে-মশাই!

মুখুজ্জে-মশায়ের প্রবেশ

মুখুজ্জে। কী গো বাছা?

মা। বাছার আমার ক্রমেই বাড়তে লাগল। একে শিগ্‌গির—ঐ-যে কী বলে ঐ—তোমাদের হাঁচপাতালে নিয়ে চলো।

মুখুজ্জে। আমি তো তাই প্রথম থেকেই বলছি, হাবুর বাবাই তো এতক্ষণ দেরি করিয়ে রাখলে। (হারার প্রতি) তবে চল্‌, ওঠ্‌।

হারাধন। না দাদামশায়, আমি হাঁসপাতালে যাব না, আমার কিছু হয় নি।

মুখুজ্জে। কিছু হয় নি বটে! তোর পেটের ডাকের চোটে পাড়াসুদ্ধ অস্থির হয়ে উঠল। পেটের মধ্যে বাত শ্লেষ্মা পিত্ত তিনটিতে মিলে যেন দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়েছে।

[বলপূর্বক লইয়া যাওন

চতুর্থ দৃশ্য

হাঁসপাতালে ডাক্তার-সাহেব ও হারাধন

ডাক্তার। টোমার পেটে কী হইয়াছে?

হারাধন। কিছু হয় নি সাহেব! এবার আমাকে মাপ করো সাহেব, আমার কিছু হয় নি।

ডাক্তার। কিছু হয় নি টো এ কী?

পেটে খোঁচা দেওন ও দ্বিগুণ ক্যাঁক ক্যাঁক শব্দ

(হাসিয়া) টোমার ব্যামো আমি সমস্ট বুঝিয়াছি।

হারাধন। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি সাহেব, আমার কোনো ব্যামো হয় নি। এমন কাজ আর কখনো করব না।

ডাক্তার। টোমার ভয়ানক ব্যামো হইয়াছে।

হারাধন। সাহেব, আমার ব্যামো আমি জানি নে, তুমি জান!

ক্যাঁক ক্যাঁক

সরোষে থলিতে চাপড় মারিয়া

আ মোলো যা, এর যে ডাক কিছুতেই থামে না।

ডাক্তার। (বৃহৎ ছুরি লইয়া) টোমার চুরি ব্যামো হইয়াছে, ছুরি না ডিলে সারিবে না।

পেট চিরিতে উদ্যত

হারাধন। (কাঁদিয়া, হাঁস বাহির করিয়া) সাহেব, এই নাও তোমার হাঁস। তোমার এ হাঁস কোনোমতেই আমার পেটে সইল না। এর চেয়ে ডিমগুলো ছিল ভালো।

হারাধনকে ধরিয়া সাহেবের প্রহার

সাহেব, আর আবশ্যক নেই, আমার ব্যামো একেবারেই সেরে গেছে।

জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

চিন্তাশীল

প্রথম দৃশ্য

চিন্তাশীল নরহরি চিন্তায় নিমগ্ন। ভাত শুকাইতেছে
মা মাছি তাড়াইতেছেন

মা। অত ভেবো না, মাথার ব্যামো হবে বাছা!

নরহরি। আচ্ছা মা, 'বাছা' শব্দের ধাতু কী বলো দেখি।

মা। কী জানি বাপু!

নরহরি। 'বৎস'। আজ তুমি বলছ 'বাছা'—দু হাজার বৎসর আগে বলত 'বৎস'—এই কথাটা একবার ভালো করে ভেবে দেখো দেখি মা! কথাটা বড়ো সামান্য নয়। এ কথা যতই ভাববে ততই ভাবনার শেষ হবে না।

পুনরায় চিন্তায় মগ্ন

মা। যে ভাবনা শেষ হয় না এমন ভাবনার দরকার কী বাপ! ভাবনা তো তোর চিরকাল থাকবে, ভাত যে শুকোয়। লক্ষ্মী আমার, একবার ওঠ্।

নরহরি। (চমকিয়া) কী বললে মা? লক্ষ্মী? কী আশ্চর্য! এক কালে লক্ষ্মী বলতে দেবী-বিশেষকে বোঝাত। পরে লক্ষ্মীর গুণ অনুসারে সুশীলা স্ত্রীলোককে লক্ষ্মী বলত, কালক্রমে দেখো পুরুষের প্রতিও লক্ষ্মী শব্দের প্রয়োগ হচ্ছে! একবার ভেবে দেখো মা, আস্তে আস্তে ভাষার কেমন পরিবর্তন হয়! ভাবলে আশ্চর্য হতে হবে।

ভাবনায় দ্বিতীয় ডুব

মা। আমার আর কি কোনো ভাবনা নেই নরু? আচ্ছা, তুই তো এত ভাবিস, তুইই বল্ দেখি, উপস্থিত কাজ উপস্থিত ভাবনা ছেড়ে কি এই-সব বাজে ভাবনা নিয়ে থাকা ভালো? সকল ভাবনারই তো সময় আছে।

নরহরি। এ কথাটা বড়ো গুরুতর মা! আমি হঠাৎ এর উত্তর দিতে পারব না। এটা কিছুদিন ভাবতে হবে—ভেবে পরে বলব।

মা। আমি যে কথাই বলি তোর ভাবনা তাতে কেবল বেড়েই ওঠে, কিছুতেই আর কমে না। কাজ নেই বাপু, আমি আর-কাউকে পাঠিয়ে দিই।

[প্রস্থান

মাসিমা

মাসিমা। ছি নরু, তুই কি পাগল হলি? ছেঁড়া চাদর, একমুখ দাড়ি। সমুখে ভাত নিয়ে ভাবনা! সুবলের মা তোকে দেখে হেসেই কুরুক্ষেত্র!

নরহরি। কুরুক্ষেত্র! আমাদের আর্যগৌরবের শ্মশানক্ষেত্র! মনে পড়লে কি শরীর লোমাঞ্চিত হয় না? অন্তঃকরণ অধীর হয়ে ওঠে না? আহা, কত কথা মনে পড়ে! কত ভাবনাই জেগে ওঠে! বল কী মাসি! হেসেই কুরুক্ষেত্র! তার চেয়ে বলো-না কেন কেঁদেই কুরুক্ষেত্র?

অশ্রুনিপাত

মাসিমা। ওমা, এ যে কাঁদতে বসল! আমাদের কথা শুনলেই এর শোক উপস্থিত হয়। কাজ নেই বাপু! [প্রস্থান

দিদিমা

দিদিমা। ও নরু, সূর্য যে অস্ত যায়।

নরহরি। ছি দিদিমা, সূর্য তো অস্ত যায় না। পৃথিবীই উল্‌টে যায়। রোসো, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

চারি দিকে চাহিয়া

একটা গোল জিনিস কোথাও নেই?

দিদিমা। এই তোমার মাথা আছে—মুণ্ডু আছে।

নরহরি। কিন্তু মাথা যে বদ্ধ, মাথা যে ঘোরে না।

দিদিমা। তোমারই ঘোরে না, তোমার রকম দেখে পাড়া-সুদ্ধ লোকের মাথা ঘুরছে। নাও, আর তোমায় বোঝাতে হবে না, এ দিকে ভাত জুড়িয়ে গেল, মাছি ভন্ ভন্ করছে।

নরহরি। ছি দিদিমা, এটা যে তুমি উল্‌টো কথা বললে; মাছি তো ভন্ ভন্ করে না। মাছির ডানা থেকেই এইরকম শব্দ হয়। রোসো, আমি তোমাকে প্রমাণ করে দিচ্ছি—

দিদিমা। কাজ নেই তোমার প্রমাণ করে।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

নরহরি চিন্তামগ্ন। ভাবনা ভাঙাইবার উদ্দেশে
নরহরির শিশু ভাগিনেয়কে কোলে করিয়া মাতার প্রবেশ

মা। (শিশুর প্রতি) জাদু, তোমার মামাকে দণ্ডবৎ করো।

নরহরি। ছি মা, ওকে ভুল শিখিয়ো না। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, ব্যাকরণ অনুসারে দণ্ডবৎ করা হতেই পারে না—দণ্ডবৎ হওয়া বলে। কেন বুঝতে পেরেছ মা? কেননা দণ্ডবৎ মানে—

মা। না বাবা, আমাকে পরে বুঝিয়ে দিলেই হবে। তোমার ভাগ্নেকে এখন একটু আদর করো।

নরহরি। আদর করব? আচ্ছা এসো, আদর করি।

শিশুকে কোলে লইয়া

কী করে আদর আরম্ভ করি? রোসো, একটু ভাবি।

চিন্তামগ্ন

মা। আদর করবি, তাতেও ভাবতে হবে নরু?

নরহরি। ভাবতে হবে না মা? বল কী? ছেলেবেলাকার আদরের উপরে ছেলের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তা কি জান? ছেলেবেলাকার এক-একটা সামান্য ঘটনার ছায়া বৃহৎ আকার ধরে আমাদের সমস্ত যৌবনকালকে, আমাদের সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে, এটা



যখন ভেবে দেখা যায় তখন কি ছেলেকে আদর করা একটা সামান্য কাজ বলে মনে করা যায়? এইটে একবার ভেবে দেখো দেখি মা।

মা। থাক্ বাবা, সে কথা আর একটু পরে ভাবব, এখন তোমার ভাগ্নেটির সঙ্গে দুটো কথা কও দেখি।

নরহরি। ওদের সঙ্গে এমন কথা কওয়া উচিত যাতে ওদের আমোদ ও শিক্ষা দুই হয়। আচ্ছা হরিদাস, তোমার নামের সমাস কী বলো দেখি?

হরিদাস। আমি চমা কাব।

মা। দেখো দেখি বাছা, ওকে এ-সব কথা জিগেস কর কেন? ও কী জানে!

নরহরি। না, ওকে এই বেলা থেকে এইরকম করে অল্পে অল্পে মুখস্থ করিয়ে দেব।

মা। (ছেলে তুলিয়া লইয়া) না বাবা, কাজ নেই তোমার আদর করে।

নরহরি মাথায় হাত দিয়া পুনশ্চ চিন্তায় মগ্ন

মা। (কাতর হইয়া) বাবা, আমায় কাশী পাঠিয়ে দে, আমি কাশীবাসী হব।

নরহরি। তা যাও-না মা! তোমার ইচ্ছে হয়েছে, আমি বাধা দেব না।

মা। (স্বগত) নরু আমার সকল কথাতেই ভেবে অস্থির হয়ে পড়ে, এটাতে বড়ো বেশি ভাবতে হল না। (প্রকাশ্যে) তা হলে তো আমাকে মাসে মাসে কিছু টাকার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে।

নরহরি। সত্যি নাকি? তা হলে আমাকে আর কিছু দিন ধরে ভাবতে হয়। এ কথা নিতান্ত সহজ নয়। আমি এক হপ্তা ভেবে পরে বলব।

মা। (ব্যস্ত হইয়া) না বাবা, তোমার আর ভাবতে হবে না—আমার কাশী গিয়ে কাজ নেই।

আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২

ভাব ও অভাব

কবিবর কুঞ্জবিহারীবাবু ও বশম্বদবাবু

কুঞ্জবিহারী। কী অভিপ্রায়ে আগমন?

বশম্বদ। আজ্ঞে, আর তো অন্ন জোটে না; মশাই সেই যে কাজের—

কুঞ্জবিহারী। (ব্যস্তসমস্ত হইয়া) কাজ? কাজ আবার কিসের? আজ এই সুমধুর শরৎকালে কাজের কথা কে বলে?



বশম্বদ। আজ্ঞে, ইচ্ছে করে কেউ বলে না, পেটের জ্বালায়—

কুঞ্জবিহারী। পেটের জ্বালা? ছি ছি, ওটা অতি হীন কথা—ও কথা আর বলবেন না।

বশম্বদ। যে আজ্ঞে, আর বলব না। কিন্তু ওটা সর্বদাই মনে পড়ে।

কুঞ্জবিহারী। বলেন কী বশম্বদবাবু, সর্বদাই মনে পড়ে? এমন প্রশান্ত নিস্তব্ধ সুন্দর সন্ধ্যাবেলাতেও মনে পড়ছে?

বশম্বদ। আজ্ঞে, পড়ছে বৈকি। এখন আরো বেশি মনে পড়ছে। সেই সাড়ে-দশটা বেলায় দুটি ভাত মুখে গুঁজে উমেদারি করতে বের হয়েছিলুম, তার পরে তো আর খাওয়া হয় নি।

কুঞ্জবিহারী। তা না'ই হল। খাওয়া না'ই হল।

বশম্বদবাবুর নীরবে মাথা-চুলকন

এই শরতের জ্যোৎস্নায় কি মনে হয় না যে, মানুষ যেন পশুর মতো কতকগুলো আহার না করেও বেঁচে থাকে। যেন কেবল এই চাঁদের আলো, ফুলের মধু, বসন্তের বাতাস খেয়েই জীবন বেশ চলে যায়!

বশম্বদ। (সভয়ে মৃদুস্বরে) আজ্ঞে, জীবন বেশ চলে যায় সত্যি, কিন্তু জীবন রক্ষে হয় না—আরো কিছু খাবার আবশ্যক করে।

কুঞ্জবিহারী। (উষ্ণভাবে) তবে তাই খাও গে যাও। কেবল মুঠো মুঠো কতকগুলো ভাত

ডাল আর চচ্চড়ি গেলো গে যাও। এখানে তোমাদের অনধিকার প্রবেশ।

বশম্বদ। সেগুলো কোথায় পাওয়া যাবে মশায়! আমি এখনই যাচ্ছি।

কুঞ্জবাবুকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতে দেখিয়া

কুঞ্জবাবু, আপনি ঠিক বলেছেন, আপনার এই বাগানের হাওয়া খেলেই পেট ভরে যায়। আর কিছু খেতে ইচ্ছে করে না।

কুঞ্জবিহারী। এ কথা আপনার মুখে শুনে খুশি হলুম, এই হচ্ছে যথার্থ মানুষের মতো কথা। চলুন, বাইরে চলুন—এমন বাগান থাকতে ঘরে কেন?

বশম্বদ। চলুন।

আপন মনে মৃদুস্বরে

হিমের সময়টা—গায়েও একখানা কাপড় নেই—

কুঞ্জবিহারী। বা—শরৎকালের কি মাধুরী!

বশম্বদ। তা ঠিক কথা। কিন্তু কিছু ঠাণ্ডা।

কুঞ্জবিহারী। (গায়ে শাল টানিয়া) কিছুমাত্র ঠাণ্ডা নয়।

বশম্বদ। না, ঠাণ্ডা নয়।

কম্পন

কুঞ্জবিহারী। (আকাশে চাহিয়া) বা বা বা—দেখে চক্ষু জুড়োয়। খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘগুলি নীল আকাশ-সরোবরে রাজহংসের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে, আর মাঝখানে চাঁদ যেন—

বশম্বদ। (গুরুতর কাশি) খক্ খক্ খক্ খক্!

কুঞ্জবিহারী। মাঝখানে চাঁদ যেন—

বশম্বদ। খন্ খন্, খক্ খক্!

কুঞ্জবিহারী। (ঠেলা দিয়া) শুনছেন বশম্বদবাবু—মাঝখানে চাঁদ যেন—

বশম্বদ। রসুন একটু—খক্ খক্, খন্ খন্, ঘড়্ ঘড়্!

কুঞ্জবিহারী। (চটিয়া উঠিয়া) আপনি অত্যন্ত বদলোক। এরকম করে যদি কাশতে হয় তো আপনি ঘরের কোণে গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকুন। এমন বাগান—

বশম্বদ। (সভয়ে প্রাণপণে কাশি চাপিয়া) আজ্ঞে, আমার আর কিছু নেই। (স্বগত) অর্থাৎ কম্বলও নেই, কাঁথাও নেই।

কুঞ্জবিহারী। এই শোভা দেখে আমার একটি গান মনে পড়ছে। আমি গাই—

সু-উ-উন্দর উপবন বিকশিত তরু-উগণ মনোহর বকু—

বশম্বদ। (উৎকট হাঁচি) হ্যাঁচ্চোঃ!

কুঞ্জবিহারী। মনোহর বকু—

বশম্বদ। হ্যাঁচ্চোঃ—হ্যাঁচ্চোঃ—

। শুনছেন? মনোহর বকু—

বশম্বদ। হ্যাঁচ্ছোঃ—হ্যাঁচ্ছোঃ—

কুঞ্জবিহারী। বেরোও আমার বাগান থেকে।

বশম্বদ। রসুন—হ্যাঁচ্ছোঃ!

কুঞ্জবিহারী। বেরোও এখেন থেকে--

বশম্বদ। এখনই বেরোচ্ছি—আমার আর এক দণ্ডও এ বাগানে থাকবার ইচ্ছে নেই—আমি না বেরোলে আমার মহাপ্রাণী বেরোবেন। হ্যাঁচ্ছোঃ! শরৎকালের মাধুরী আমার নাক-চোখ দিয়ে বেরোচ্ছে। প্রাণটা সুদ্ধ হেঁচে ফেলবার উপক্রম। হ্যাঁচ্ছোঃ, হ্যাঁচ্ছোঃ! খক্ খক্! কিন্তু কুঞ্জবাবু, সেই কাজটা যদি—হ্যাঁচ্ছোঃ!

কুঞ্জবাবুর শাল মুড়ি দিয়া নীরবে আকাশের চাঁদের দিকে চাহিয়া থাকন

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। খাবার এসেছে।

কুঞ্জবিহারী। দেরি করলি কেন? খাবার আনতে দু-ঘণ্টা লাগে বুঝি?

[দ্রুত প্রস্থান]

অগ্রহায়ণ ১২৯২

রোগীর বন্ধু

রেলগাড়িতে দুঃখীরাম ও বৈদ্যনাথবাবু

বৈদ্যনাথ। (মাথায় হাত দিয়া) উ—উ—উঃ!

দুঃখীরাম। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) হা—হাঃ!

কাতরভাবে বৈদ্যনাথের প্রতি নিরীক্ষণ

বৈদ্যনাথ। (দুঃখীরামের মনোযোগ দেখিয়া) দেখছেন তো মশায়, ব্যামোর কষ্টটা তো দেখছেন!

দুঃখীরাম। না, আমি তা দেখছি নে। আপনাকে দেখে আমার পুনর্বার ভ্রাতৃশোক উপস্থিত হচ্ছে। হা হাঃ!

নিশ্বাস

বৈদ্যনাথ। সেকি কথা!

দুঃখীরাম। হাঁ মশায়! মরবার সময় তার ঠিক আপনার মতো চেহারা হয়ে এসেছিল—

বৈদ্যনাথ। (শশব্যস্ত হইয়া) বলেন কী?

দুঃখীরাম। যথার্থ কথা। ঐরকম তার চোখ বসে গিয়েছিল, গালের মাংস ঝুলে পড়েছিল, হাত-পা সরু হয়ে গিয়েছিল, ঠোঁট সাদা, মুখের চামড়া হলদে—

বৈদ্যনাথ। (আকুলভাবে) বলেন কী মশায়? আমার কি তবে এমন দশা হয়েছে? এ কথা আমাকে তো কেউ বলে নি—

দুঃখীরাম। কেনই বা বলবে? এ সংসারে প্রকৃত বন্ধু কেই বা আছে?

দীর্ঘনিশ্বাস

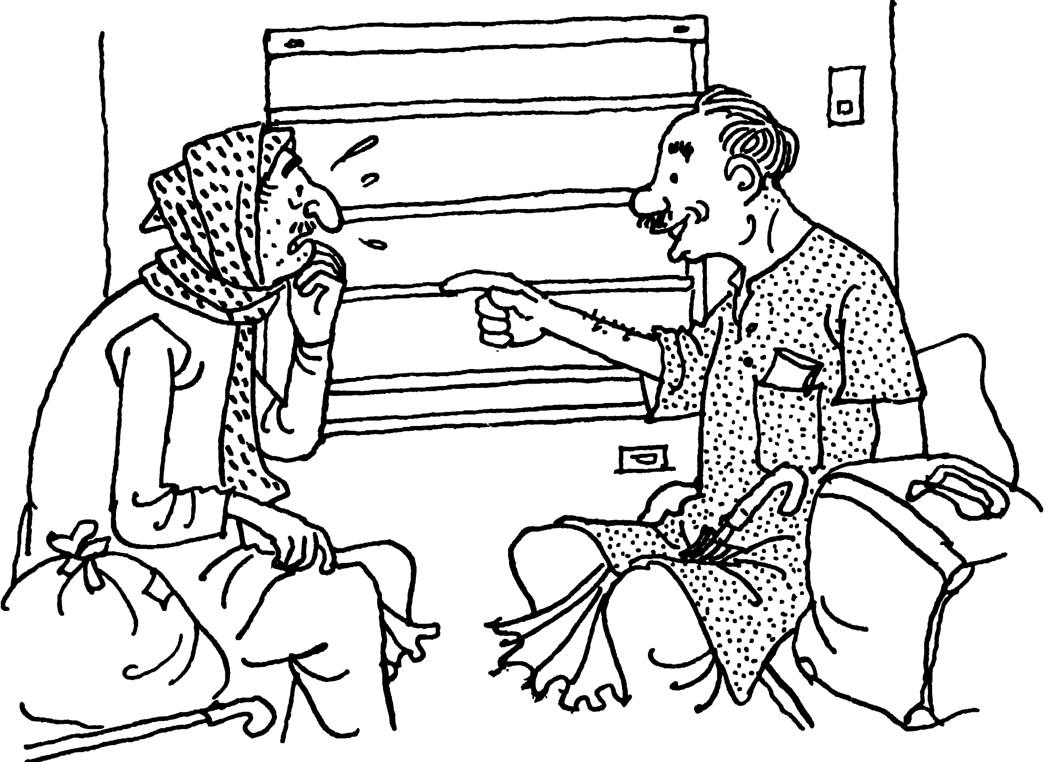
বৈদ্যনাথ। ডাক্তার তো আমাকে বার বার বলেছে আমার কোনো ভাবনার কারণ নেই।

দুঃখীরাম। ডাক্তার! ডাক্তারের কথা আপনি এক তিল বিশ্বাস করেন? ডাক্তারকে বিশ্বাস করেই কি আমরা অকূল পাথারে পড়ি নি? যখন আসন্ন বিপদ সেই সময়েই তারা বেশি করে আশ্বাস দেয়, অবশেষে যখন রোগীর হাতে পায়ে খিল ধরে আসে, তার চোখ উল্‌টে যায়, তার গা-হাত-পা হিম হয়ে আসে, তার—

বৈদ্যনাথ। (দুঃখীরামের হাত ধরিয়া) ক্ষমা করুন মশায়, আর বলবেন না মশায়! আমার গা-হাত-পা হিম হয়েই এসেছে। আপনার বর্ণনা সদ্যসদ্যই খেটে যাবে।

বুকে হাত দিয়া

উ উ উঃ!



দুঃখীরাম। দেখছেন মশাই? আমি তো বলেইছি—ডাক্তারের আশ্বাসবাক্যে কিছুমাত্র বিশ্বাস করবেন না। আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—আপনি কি রাত্রে চিত হয়ে শোন?

বৈদ্যনাথ। হাঁ। চিত হয়ে না শুলে আমার ঘুম হয় না।

দুঃখীরাম। (নিশ্বাস ফেলিয়া) আমার ভায়েরও ঠিক ঐ দশা হয়েছিল। সে একেবারেই পাশ ফিরতে পারত না।

বৈদ্যনাথ। আমি তো ইচ্ছা করলেই পাশ ফিরতে পারি।

দুঃখীরাম। এখন পারছেন। কিন্তু ক্রমে আর পারবেন না।

বৈদ্যনাথ। সত্যি নাকি!

দুঃখীরাম। ক্রমে আপনার বাঁ-দিকের পাঁজরায় একরকম বেদনা ধরবে, ক্রমে পায়ের আঙুলগুলো একেবারে আড়ষ্ট হয়ে যাবে, গাঁঠ ফুলে উঠবে, ক্রমে—

বৈদ্যনাথ। (গলদ্‌ঘর্ম হইয়া) দোহাই আপনার, আর বলবেন না। আমার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করছে!

দুঃখীরাম। আপনার এই বেলা সাবধান হওয়া উচিত।

বৈদ্যনাথ। উচিত তা যেন বুঝলুম, কিন্তু কী করব বলুন।

দুঃখীরাম। আপনি কি অ্যালোপ্যাথি-মতে চিকিৎসা করাচ্ছেন?

বৈদ্যনাথ। হাঁ।

দুঃখীরাম। কী সর্বনাশ! অ্যালোপ্যাথ্‌রা তো বিষ খাওয়ায়, ব্যামোর চেয়ে ওষুধ ভয়ানক। যমের চেয়ে ডাক্তারকে ডরাই।

বৈদ্যনাথ। (শঙ্কিত হইয়া) বটে! তা কী করব? হোমিওপ্যাথি দেখব?

দুঃখীরাম। হোমিওপ্যাথি তো শুধু জলের ব্যবস্থা।

বৈদ্যনাথ। তবে কি বদ্যি দেখাব?

দুঃখীরাম। তার চেয়ে খানিকটা আফিং তুঁতের জলে গুলে হরতেল মিশিয়ে খান-না কেন?

বৈদ্যনাথ। রাম রাম! তবে কী করা যায় মশায়?

দুঃখীরাম। কিছু করবার নেই, কোনো উপায় নেই, এ আপনাকে নিশ্চিত বলছি।

বৈদ্যনাথ। মশায়, আমি রোগা মানুষ, আমাকে এরকম ভয় দেখানো উচিত হয় না।

দুঃখীরাম। ভয় কিসের মশায়? এ সংসারে তো কেবলই দুঃখ কষ্ট বিপদ। চতুর্দিক অন্ধকার। বিষাদের মেঘে আচ্ছন্ন। হা-হুতাশ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। এখানে আমরা বিষধর সর্পের গর্তে বাস করছি। এখেন থেকে বিদায় হওয়াই ভালো।

নিশ্বাস

বৈদ্যনাথ। দেখুন, ডাক্তার আমাকে সর্বদা আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে প্রফুল্ল থাকতে বলেছে। আপনার ঐ মুখ দেখেই আমার ব্যামো যেন হুহু করে বেড়ে উঠছে। আমাকে দেখে আপনার ভ্রাতৃশোক জন্মেছিল, কিন্তু আপনার ঐ অন্ধকার দাড়ি ঝাড়া দিলেই দেড় ডজন পুত্রশোক ঝরে

পড়ে। আপনি একটা ভালো কথা তুলুন। এটা কোন্ স্টেশন মশায়?

দুঃখীরাম। এটা মধুপুর। এখেনে এ বৎসর যেরকম ওলা-উঠো হয়েছে সে আর বলবার নয়।

বৈদ্যনাথ। (ব্যস্ত হইয়া) ওলাউঠো! বলেন কী! এখেনে গাড়ি কতক্ষণ থাকে?

দুঃখীরাম। আধঘন্টা। এখেনে পাঁচ মিনিট থাকাও উচিত না।

বৈদ্যনাথ। (শুইয়া পড়িয়া) কী সর্বনাশ!

দুঃখীরাম। ভয় করা বড়ো খারাপ। ভয় ধরলে তাকে ওলাউঠো আগে ধরে। লরি-সাহেবের বইয়ে লেখা আছে—

বৈদ্যনাথ। আপনি আমাকে ছাড়লে আমার ভয়ও ছাড়ে। আপনি আমার হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়েছেন। আপনি ডাক্তার ডাকুন—আমার কেমন করছে।

দুঃখীরাম। ডাক্তার কোথায়?

বৈদ্যনাথ। তবে স্টেশন-মাস্টারকে ডাকুন।

দুঃখীরাম। গাড়ি যে ছাড়ে-ছাড়ে।

বৈদ্যনাথ। তবে গার্ড্‌কে ডাকুন।

দুঃখীরাম। গার্ড্‌ আপনার কী করতে পারবে?

দীর্ঘনিশ্বাস

বৈদ্যনাথ। তবে হরিকে ডাকুন। আমার হয়ে এল। (মূর্ছা)

দুঃখীরামের উপর্যুপরি সুদীর্ঘ নিশ্বাসপতন ও গান—
'মনে করো শেষের সে দিন ভয়ংকর।'

পৌষ ১২৯২

খ্যাতির বিড়ম্বনা

প্রথম দৃশ্য

উকিল দুকড়ি দত্ত চেয়ারে আসীন
ভয়ে ভয়ে খাতা-হস্তে কাঙালিচরণের প্রবেশ

দুকড়ি। কী চাই?

কাঙালি। আজ্ঞে, মশায় হচ্ছেন দেশহিতৈষী—

দুকড়ি। তা তো সকলেই জানে, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী?

কাঙালি। আপনি সাধারণের হিতের জন্য প্রাণপণ—



দুকড়ি। ক'রে ওকালতি ব্যাবসা চালাচ্ছি তাও কারো অবিদিত নেই—কিন্তু তোমার ব্যক্তব্যটা কী?

কাঙালি। আজ্ঞে, বক্তব্য বেশি নেই।

দুকড়ি। তবে শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেলো-না।

কাঙালি। একটু বিবেচনা করে দেখলে আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে 'গানাৎ পরতরং নহি'—

দুকড়ি। বাপু, বিবেচনা এবং স্বীকার করবার পূর্বে যে কথাটা বললে তার অর্থ জানা বিশেষ আবশ্যক। ওটা বাংলা করে বলো।

কাঙালি। আজ্ঞে বাংলাটা ঠিক জানি নে। তবে মর্ম হচ্ছে এই, গান জিনিসটা শুনতে বড়ো ভালো লাগে।

দুকড়ি। সকলের ভালো লাগে না।

কাঙালি। গান যার ভালো না লাগে সে হচ্ছে—

দুকড়ি। উকিল শ্রীযুক্ত দুকড়ি দত্ত।

কাঙালি। আজ্ঞে, অমন কথা বলবেন না।

দুকড়ি। তবে কি মিথ্যে কথা বলব?

কাঙালি। আর্যাবর্তে ভরত মুনি হচ্ছেন গানের প্রথম—

দুকড়ি। ভরত মুনির নামে যদি কোনো মকদ্দমা থাকে তো বলো, নইলে বক্তৃতা বন্ধ করো।

কাঙালি। অনেক কথা বলবার ছিল—

দুকড়ি। কিন্তু অনেক কথা শোনবার সময় নেই।

কাঙালি। তবে সংক্ষেপে বলি। এই মহানগরীতে 'গানোন্নতি-বিধায়িনী'-নাম্নী এক সভা স্থাপন করা গেছে, তাতে মহাশয়কে—

দুকড়ি। বক্তৃতা দিতে হবে?

কাঙালি। আজ্ঞে না।

দুকড়ি। সভাপতি হতে হবে?

কাঙালি। আজ্ঞে না।

দুকড়ি। তবে কী করতে হবে বলো। গান গাওয়া এবং গান শোনা, এ দুটোর কোনোটা আমার দ্বারা কখনো হয় নি এবং হবেও না—তা আমি আগে থাকতে বলে রাখছি।

কাঙালি। মশায়কে ও দুটোর কোনোটাই করতে হবে না।

খাতা অগ্রসর করিয়া

কেবল কিঞ্চিৎ চাঁদা—

দুকড়ি। (ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিয়া) চাঁদা! আ সর্বনাশ! তুমি তো সহজ লোক নও হে—ভালোমানুষটির মতো মুখ কাঁচুমাচু করে এসেছ—আমি বলি বুঝি কী মকদ্দমার ফেসাদে পড়েছ। তোমার চাঁদার খাতা নিয়ে বেরোও এখনই—নইলে ট্রেস্‌পাসের দাবি দিয়ে পুলিস-কেস আনব!

কাঙালি। চাইলুম চাঁদা, পেলুম অর্ধচন্দ্র। (স্বগত) কিন্তু তোমাকে জব্দ করব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দুকড়িবাবু কতকগুলি সংবাদপত্র-হস্তে

দুকড়ি। এ তো বড়ো মজাই হল! কাঙালিচরণ ব'লে কে একজন লোক ইংরিজি বাংলা সমস্ত খবরের কাগজে লিখে পাঠিয়েছে যে, আমি তাদের 'গানোন্নতিবিধায়িনী' সভায় পাঁচ হাজার টাকা দান করেছি। দান চুলোয় যাক, গলাধাক্কা দিতে বাকি রেখেছি। মাঝের থেকে আমার খুব নাম রটে গেল—এতে আমার ব্যাবসার পক্ষে ভারি সুবিধে। তাদেরও সুবিধে, লোকে মনে করবে, যখন পাঁচ হাজার টাকা দান পেয়েছে তখন অবিশ্যি মস্ত সভা। পাঁচ জায়গা থেকে ভারী ভারী চাঁদা আদায় হবে। যা হোক, আমার অদৃষ্ট ভালো।

কেরানিবাবুর প্রবেশ

কেরানি। মশায় তবে গানোন্নতিসভায় পাঁচ হাজার টাকা দান করেছেন?

দুকড়ি। (মাথা চুলকাইয়া হাসিয়া) আ— ও একটা কথার কথা। শোন কেন? কে বললে দিয়েছি? মনে করো যদি দিয়েই থাকি, তা হয়েছে কী? এত গোলের আবশ্যক কী?

কেরানি। আহা, কী বিনয়! পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিয়ে গোপন করবার চেষ্টা, সাধারণ লোকের কাজ নয়।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। নীচের ঘরে বিস্তর লোক জমা হয়েছে।

দুকড়ি। (স্বগত) দেখেছ! এক দিনেই আমার পসার বেড়ে গেছে। (সানন্দে) একে একে তাদের উপরে নিয়ে আয়—আর পান-তামাক দিয়ে যা।

প্রথম ব্যক্তির প্রবেশ

দুকড়ি। (চৌকি সরাইয়া) আসুন—বসুন। মশায়, তামাক ইচ্ছে করুন। ওরে—পান দিয়ে যা।

প্রথম। (স্বগত) আহা, কী অমায়িক প্রকৃতি। এঁর কাছে কামনাসিদ্ধি হবে না তো কার কাছে হবে!

দুকড়ি। মশায়ের কী অভিপ্রায়ে আগমন?

প্রথম। আপনার বদান্যতা দেশবিখ্যাত।

দুকড়ি। ও-সব গুজবের কথা শোনেন কেন?

প্রথম। কী বিনয়! কেবল মশায়ের নামই শ্রুত ছিলুম, আজ চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হল।

দুকড়ি। (স্বগত) এখন আসল কথাটা যে পাড়লে হয়। বিস্তর লোক বসে আছে। (প্রকাশ্যে) তা মশায়ের কী আবশ্যক?

প্রথম। দেশের উন্নতি-উদ্দেশে হৃদয়ের—

দুকড়ি। আজ্ঞে, সে-সব কথা বলাই বাহুল্য—

প্রথম। তা ঠিক। মশায়ের মতো মহানুভব ব্যক্তি যাঁরা ভারতভূমির—

দুকড়ি। সমস্ত মানছি মশায়, অতএব ও অংশটুকুও ছেড়ে দিন। তার পরে—

প্রথম। বিনয়ী লোকের স্বভাবই এই যে, নিজের গুণানুবাদ—

দুকড়ি। রক্ষে করুন মশায়, আসল কথাটা বলুন।

প্রথম। আসল কথা কী জানেন—দিনে দিনে আমাদের দেশ অধোগতি প্রাপ্ত হচ্ছে—

দুকড়ি। সে কেবলমাত্র কথা সংক্ষেপ করতে না জানার দরুন।

প্রথম। আমাদের স্বর্ণশস্যশালিনী পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ দারিদ্র্যের অন্ধকূপে—

দুকড়ি। (সকাতরে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া) বলে যান।

প্রথম। দারিদ্র্যের অন্ধকূপে দিনে দিনে নিমজ্জমানা—

দুকড়ি। (কাতর স্বরে) মশায়, বুঝতে পারছি নে।

প্রথম। তবে আপনাকে প্রকৃত ব্যাপারটা বলি—

দুকড়ি। (সানন্দে সাগ্রহে) সেই ভালো।

প্রথম। ইংরেজরা লুঠ করছে।

দুকড়ি। এ তো বেশ কথা। প্রমাণ সংগ্রহ করুন, ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে নালিশ রুজু করি।

প্রথম। ম্যাজিস্ট্রেটও লুঠছে।

দুকড়ি। তবে ডিস্ট্রিক্ট্ জজের আদালত—

প্রথম। ডিস্ট্রিক্ট্ জজ তো ডাকাত।

দুকড়ি। (অবাকভাবে) আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি নে।

প্রথম। আমি বলছি, দেশের টাকা বিদেশে চালান যাচ্ছে।

দুকড়ি। দুঃখের বিষয়।

প্রথম। তাই একটা সভা—

দুকড়ি। (সচকিত) সভা!

প্রথম। এই দেখুন-না খাতা।

দুকড়ি। (বিস্ফারিতনেত্রে) খাতা!

প্রথম। কিঞ্চিৎ চাঁদা—

দুকড়ি। (চৌকি হইতে লাফাইয়া উঠিয়া) চাঁদা! বেরোও—বেরোও—বেরোও—

তাড়াতাড়ি চৌকি-উল্‌টায়ন, কালি-ফেলন, প্রথম ব্যক্তির
বেগে প্রস্থানোদ্যম, পতন, উত্থান, গোলমাল

দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশ

দুকড়ি। কী চাই?

দ্বিতীয়। মহাশয়ের দেশবিখ্যাত বদান্যতা—

দুকড়ি। ও-সব হয়ে গেছে—হয়ে গেছে—নতুন কিছু থাকে তো বলুন।

দ্বিতীয়। আপনার দেশহিতৈষিতা—

দুকড়ি। আ মোলো—এও যে সেই কথাটাই বলে!

দ্বিতীয়। স্বদেশের সদনুষ্ঠানে আপনার সদনুরাগ—

দুকড়ি। এ তো বিষম দায় দেখি। আসল কথাটা খুলে বলুন।

দ্বিতীয়। একটা সভা—

দুকড়ি। আবার সভা!

দ্বিতীয়। এই দেখুন-না খাতা।

দুকড়ি। খাতা! কিসের খাতা?

দ্বিতীয়। চাঁদা আদায়—

দুকড়ি। চাঁদা! (হাত ধরিয়া টানিয়া) ওঠো, ওঠো, বেরোও, বেরোও—প্রাণের মায়া থাকে তো—

[দ্বিরুক্তি না করিয়া চাঁদাওয়ালার প্রস্থান

তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ

দুকড়ি। দেখো বাপু, আমার দেশহিতৈষিতা বদান্যতা বিনয় এ-সমস্ত শেষ হয়ে গেছে— তার পর থেকে আরম্ভ করো।

তৃতীয়। আপনার সার্বভৌমিকতা— সার্বজনীনতা—উদারতা—

দুকড়ি। তবু ভালো। এ কিছু নতুন ঠেকছে বটে। কিন্তু মশায়, ওগুলোও থাক্—ভাষায় কথা আরম্ভ করুন।

তৃতীয়। আমাদের একটা লাইব্রেরি—

দুকড়ি। লাইব্রেরি! সভা নয় তো?

তৃতীয়। আজ্ঞে, সভা নয়।

দুকড়ি। আ, বাঁচা গেল। লাইব্রেরি। অতি উত্তম। তার পরে বলে যান।

তৃতীয়। এই দেখুন-না প্রস্‌পেক্‌টস—

দুকড়ি। খাতা নেই তো?

তৃতীয়। আজ্ঞে না—খাতা নয়, ছাপানো কাগজ।

দুকড়ি। আ!—তার পরে?

তৃতীয়। কিঞ্চিৎ চাঁদা।

দুকড়ি। (লাফাইয়া) চাঁদা! ওরে, আমার বাড়ি আজ ডাকাত পড়েছে রে! পুলিসম্যান পুলিসম্যান!

[তৃতীয় ব্যক্তির উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন

হরশংকরবাবুর প্রবেশ

দুকড়ি। আরে, এসো এসো, হরশংকর এসো। সেই কালেজে একসঙ্গে পড়া—তার পরে তো আর দেখা হয় নি— তোমাকে দেখে কী যে আনন্দ হল সে আর কী বলব!

হরশংকর। তোমার সঙ্গে সুখদুঃখের অনেক কথা আছে ভাই—সে-সব কথা পরে হবে, আগে একটা কাজের কথা বলে নিই।

দুকড়ি। (পুলকিত হইয়া) কাজের কথা অনেকক্ষণ শুনি নি ভাই—বলো, শুনে কান জুড়োক।

শালের মধ্য হইতে হরশংকরের খাতা বাহির-করণ

ও কী ও, খাতা বেরোয় যে!

হরশংকর। আমাদের পাড়ার ছেলেরা মিলে একটা সভা—

দুকড়ি। (চমকিত হইয়া) সভা!

হরশংকর। সভাই বটে। তা কিছু চাঁদার জন্যে—

দুকড়ি। চাঁদা! দেখো, তোমার সঙ্গে আমার বহুকালের প্রণয়—কিন্তু ঐ কথাটা যদি আমার সামনে উচ্চারণ কর তা হলে চিরকালের মতো চটাচটি হবে তা বলে রাখছি।

হরশংকর। বটে! তুমি কোথাকার খড়গেছের ‘গানোন্নতি’-সভায় পাঁচ হাজার টাকা দান করতে পার, আর বন্ধুর অনুরোধে পাঁচ টাকা সই করতে পার না! কোন্ পাষণ্ড নরাধম এখেনে আর পদার্পণ করে!

[সবেগে প্রস্থান

খাতা-হস্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ

দুকড়ি। খাতা? আবার খাতা? পালাও, পালাও!

খাতাবাহক। (ভীত হইয়া) আমি নন্দলালবাবুর—

দুকড়ি। নন্দলাল ফন্দলাল বুঝি নে, পালাও এখনি।

খাতাবাহক। আজ্ঞে সেই টাকাটা—

দুকড়ি। আমি টাকা দিতে পারব না। বেরোও বেরোও।

[খাতাবাহকের পলায়ন

কেরানি। মশায়, করলেন কী? নন্দলালবাবুর কাছ থেকে আপনার পাওনার টাকাটা নিয়ে এসেছে। ও টাকাটা আদায় না হলে আজ যে চলবে না।

দুকড়ি। কী সর্বনাশ! ওকে ডাকো ডাকো।

কেরানির প্রস্থান ও কিয়ৎক্ষণ পরে প্রবেশ

কেরানি। সে চলে গেছে, তাকে পাওয়া গেল না।

দুকড়ি। বিষম দায় দেখছি।

তম্বুরা-হস্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ

কী চাও?

তম্বুরা। আপনার মতো এমন রসজ্ঞ কে আছে? গানের উন্নতির জন্য আপনি কী না করছেন! আপনাকে গান শোনাব!

তৎক্ষণাৎ তম্বুরা ছাড়িয়া গান

ইমনকল্যাণ

জয় জয় দুকড়ি দত্ত,
ভুবনে অনুপম মহত্ত্ব—ইত্যাদি—

দুকড়ি। আরে, কী সর্বনাশ! থাম্ থাম্!

তম্বুরা-হস্তে দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশ

দ্বিতীয়। ও গানের কী জানে মশায়? আমার গান শুনুন—

দুকড়ি দত্ত তুমি ধন্য,
তব মহিমা কে জানিবে অন্য—

প্রথম। জয়-অ-জ-অ-অ-য়-অ-অ—

দ্বিতীয়। দু-উ-উ-উ-উ-উ- কড়ি-ই-ই—

প্রথম। দুক-অ-অ-অ—

দুকড়ি। (কানে আঙুল দিয়া) আরে গেলুম, আরে গেলুম!

বাঁয়া-তবলা লইয়া বাদকের প্রবেশ

বাদক। মশায়, সংগত নেই, গান! সে কি হয়!

বাদ্য-আরম্ভ

দ্বিতীয় বাদকের প্রবেশ

দ্বিতীয় বাদক। ও বেটা সংগতের কী জানে? ও তো বাঁয়া ধরতেই জানে না।

প্রথম গায়ক। তুই বেটা থাম্।

দ্বিতীয়। তুই থাম্-না।

প্রথম। তুই গানের কী জানিস?

দ্বিতীয়। তুই কী জানিস?

উভয়ে মিলিয়া ওড়ব খাড়ব প্রণব নাদ উদারা তারা লইয়া তর্ক

অবশেষে তম্বুরায় তম্বুরায় লড়াই

দুই বাদকের মুখে মুখে বোল-কাটাকাটি 'ধ্রেকেটে দেধে ঘেনে গেধে ঘেনে'

অবশেষে তবলায় তবলায় যুদ্ধ

দলে দলে গায়ক বাদক ও খাতা-হস্তে চাঁদাওয়ালার প্রবেশ

প্রথম। মশায়, গান—

দ্বিতীয়। মশায়, চাঁদা—

তৃতীয়। মশায়, সভা—-

চতুর্থ। আপনার বদান্যতা—

পঞ্চম। ইমকল্যাণের খেয়াল—

ষষ্ঠ। দেশের মঙ্গল—

সপ্তম। সরি মিঞার টপ্পা—

অষ্টম। আরে, তুই থাম্-না বাপু—

নবম। আমার কথাটা বলে নিই, একটু থাম্-না ভাই!

সকলে মিলিয়া দুকড়ির চাদর ধরিয়া টানাটানি

'শুনুন মশাই, আমার কথা শুনুন মশাই' ইত্যাদি

দুকড়ি। (সকাতরে কেরানির প্রতি) আমি মামার বাড়ি চললুম। কিছুকাল সেখানে গিয়ে থাকব। কাউকে আমার ঠিকানা বোলো না। [প্রস্থান

গৃহমধ্যে সমস্ত দিন গায়ক-বাদকদের কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ

বিবাদ মিটাইতে গিয়া সন্ধ্যাকালে আহত হইয়া কেরানির পতন

মাঘ ১২৯২

আর্য ও অনার্য

অদ্বৈতচরণ চট্টোপাধ্যায় ও চিন্তামণি কুণ্ডু

অদ্বৈত। তুমি কে?

চিন্তামণি। আমি আর্য, আমি হিন্দু।

অদ্বৈত। নাম কী?

চিন্তামণি। শ্রীচিন্তামণি কুণ্ডু।

অদ্বৈত। কী অভিপ্রায়?

চিন্তামণি। মহাশয়ের কাগজে আমি লিখব।

অদ্বৈত। কী লিখবেন?

চিন্তামণি। আমি আর্য—আর্যধর্ম সম্বন্ধে লিখব।

অদ্বৈত। আর্য জিনিসটা কী মশায়?

চিন্তামণি। (বিস্মিত হইয়া) আজ্ঞে, আর্য কাকে বলে জানেন না? আমি আর্য, আমার বাবা শ্রীনকুড় কুণ্ডু আর্য, তাঁর বাবা ঁনফর কুণ্ডু আর্য, তাঁর বাবা—

অদ্বৈত। বুঝেছি। আপনাদের ধর্মটা কী?

চিন্তামণি। বলা ভারি শক্ত। সংক্ষেপে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, যা অনার্যদের ধর্ম তা আর্যদের ধর্ম নয়।

অদ্বৈত। অনার্য আবার কারা?

চিন্তামণি। যারা আর্য নয় তারাই অনার্য। আমি অনার্য নই, আমার বাবা শ্রীনকুড় কুণ্ডু অনার্য নয়, তাঁর বাবা ঁনফর কুণ্ডু অনার্য নয়, তাঁর বাবা—

অদ্বৈত। আর বলতে হবে না। অতএব যে-হেতুক শ্রীনকুড় কুণ্ডু আমার বাবা নন এবং ঁনফর কুণ্ডুর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমিই হচ্ছি অনার্য।

চিন্তামণি। তা স্থির বলতে পারি নে।

অদ্বৈত। (ক্রুদ্ধ হইয়া) এ তোমার কিরকম কথা! 'স্থির বলতে পারি নে' কী? নকুড় আমার বাবা নয়, তুমি স্থির বলতে পার না? তুমি কোথাকার কী জাত, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিসের!

চিন্তামণি। জাতের কথা হচ্ছে না, বংশের কথা হচ্ছে। আপনিও তো ভুবনবিদিত আর্যবংশে জন্মগ্রহণ—

অদ্বৈত। তোমার বাবা নকুড় কুণ্ডু যে বংশে জন্মেছে আমিও সেই বংশে জন্মেছি! চাষার ঘরে জন্মে তোমার এতবড়ো আস্পর্ধা!

চিন্তামণি। যে আজ্ঞে, আপনি নাহয় আর্য না হলেন, আমি এবং আমার শ্রীবাবা আর্য। হায়! কোথায় আমাদের সেই পূর্বপুরুষগণ, কোথায় কশ্যপ ভরদ্বাজ ভৃগু—

অদ্বৈত। এ ব্যক্তি বলে কী? কশ্যপ তো আমাদের পূর্বপুরুষ—আমাদের কাশ্যপ গোত্রে জন্ম—তোমার পূর্বপুরুষ কশ্যপ ভরদ্বাজ ভৃগু এ কিরকম কথা?

চিন্তামণি। আপনি এ-সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আপনার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা হতেই পারে না। হায়! এ-সকল ইংরাজি শিক্ষার শোচনীয় ফল।

অদ্বৈত। ইংরিজি শিক্ষা আপনাতে কি ফলে নি?

চিন্তামণি। আজ্ঞে, সে দোষ আমাকে দিতে পারবেন না, স্বাভাবিক আর্যরক্তের তেজে আমি অতি বাল্যকালেই ইস্কুল পালিয়েছিলুম।

হরিহরবাবু এবং অন্যান্য অনেকানেক লেখকের প্রবেশ

অদ্বৈত। আসতে আজ্ঞে হোক। লেখা সমস্ত প্রস্তুত?

হরিহর। এই দেখুন-না।

চিন্তামণি। কী বিষয়ে লিখেছেন মশায়?

হরিহর। নানা বিষয়ে।

চিন্তামণি। আর্যদের সম্বন্ধে কিছু লিখেছেন?

হরিহর। না।

চিন্তামণি। আর্যদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে—

হরিহর। য়ুরোপীয়েরা আর্যজাতি এবং তাঁদের বিজ্ঞান—

চিন্তামণি। য়ুরোপীয়েরা অতি নিকৃষ্ট জাতি এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের পূর্বপুরুষ আর্যদের তুলনায় তারা নিতান্ত মূর্খ, আমি প্রমাণ করে দেব। এখনো আর্যবংশীয়েরা তেল মাখবার পূর্বে অশ্বত্থামাকে স্মরণ করে ভূমিতে তিন বার তৈল নিক্ষেপ করেন। কেন করেন আপনি জানেন?

হরিহর। না।

চিন্তামণি। আপনি?

অদ্বৈত। না।

চিন্তামণি। আপনি জানেন?

প্রথম লেখক। না।

চিন্তামণি। না যদি জানেন তবে আপনারা বিজ্ঞান সম্বন্ধে কথা কইতে যান কেন? হাই তোলবার সময় আর্যরা তুড়ি দেন কেন আপনারা কেউ জানেন।

সকলে। (সমস্বরে) আজ্ঞে, আমরা কেউ জানি নে।

চিন্তামণি। তবে? এই-যে আমাদের আর্য মেয়েরা বাতাস করতে করতে পাখা গায়ে লাগলে ভূমিতে একবার ঠেকায় তার কারণ আপনারা কিছু জানেন?

সকলে। কিছু না!

চিন্তামণি। এই দেখুন দেখি! এই-সকল বিষয় কিছুমাত্র আলোচনা না করেই, অনুসন্ধান

না করেই, আপনারা বলেন য়ুরোপীয় বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ! অথচ আর্যরা হাঁচে কেন, হাই তোলে কেন, তেল মাখে কেন, এ আপনারা কিছু জানেন না!

হরিহর। আচ্ছা মশায়, আপনিই বলুন। তেল মাখবার পূর্বে ভূমিতে তৈল নিক্ষেপ করবার কারণ কী?

চিন্তামণি। ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌। আর কিছু নয়। ইংরাজিতে যাকে বলে ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌।

হরিহর। (সবিস্ময়ে) আপনি ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে ইংরাজি বিজ্ঞানশাস্ত্র কিছু পড়েছেন?

চিন্তামণি। কিছু না। দরকার নেই। বিজ্ঞান শিক্ষা কিংবা কোনো শিক্ষার জন্য ইংরিজি পড়বার কিছু প্রয়োজন নেই। আমাদের আর্যেরা কী বলেন? প্রাণশক্তি কারণশক্তি এবং ধারণশক্তি এই তিন শক্তি আছে, তার উপরে তৈলের সারণশক্তি যোগ হয়ে ঠিক স্নানের অব্যবহিত পূর্বেই আমাদের শরীরের মধ্যে ভৌতিক বারণশক্তির উত্তেজনা হয়—এই তো ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজেরা স্নানের পরে যে গায়ে তোয়ালে ঘষে, তার কত হাজার বৎসর আগে আমাদের আর্যদের মধ্যে গামছা দিয়ে গাত্রমার্জনপ্রথা প্রচলিত ছিল ভেবে দেখুন দেখি।

লেখকগণ। (সবিস্ময়ে) আশ্চর্য! ধন্য! আর্যদের কী বিজ্ঞানপারদর্শিতা! আর্য কুণ্ডুমশায়ের কী গবেষণা!

হরিহর। ভালো মূর্খের হাতেই আজ পড়া গিয়েছে! কিন্তু একে চটিয়ে কাজ নেই। নানা কাগজে লিখে থাকে। শুনেছি নাকি এই আর্য কুণ্ডু ভদ্রলোকদের বড্ড গাল্‌ দিতে পারে। সেইজন্যেই বিখ্যাত।



চিন্তামণি। ঐ দেখুন—ঐ আর্য ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে যে ফুল তুলছে, কেন তুলছে বলুন দেখি।

অদ্বৈত। পূজার সময় দেবতাকে দেবে বলে।

চিন্তামণি। ছি ছি, আপনারা কিছুই গভীর তলিয়ে দেখেন না। সকালে ফুল তুলতে যখন ঋষিরা অনুমতি করেছেন তখন স্পষ্টই প্রমাণ হচ্ছে যে, বাতাসে অক্সিজেন বাষ্প যে আছে এ তাঁরা জানতেন। তা যখন জানা ছিল, তখন অবশ্য অন্যান্য বাষ্পের কথাও তাঁরা জানতেন সন্দেহ নেই। এইরকম একে একে অতি স্পষ্ট করে প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে, আধুনিক য়ুরোপীয় রসায়নশাস্ত্রের কিছুই তাঁদের অগোচর ছিল না। হাই তোলবার সময় তুড়ি দেওয়া কেন? সেও ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্। উত্তানবায়ুর সঙ্গে আধানশক্তির যোগ হয়ে যখন ভৌতিক বলে পরিচালিত নিধানশক্তি স্বশক্তির প্রভাবে প্রাণ কারণ এবং ধারণ এই তিনটেকে অতিক্রম করতে থাকে তখন সত্ত্ব রজ এবং তম এই তিনেরই ব্যতিক্রমদশা ঘটে। এমন সময়ে মধ্যমা এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ঘর্ষণ-জনিত বায়ব তাপের কারণ-ভূত স্নায়ব তাপ সৌর তাপের সঙ্গে মিলিত হয়ে জীবদেহের ভৌতিক তাপের আত্যন্তিক প্রলয়দশা ঘটতে দেয় না। একে বিজ্ঞান বলে না তো কাকে বিজ্ঞান বলে? অথচ আমাদের আর্য ঋষিগণ ডারুয়িনের কোনো গ্রন্থই পড়েন নি।

লেখকগণ। আশ্চর্য! ধন্য! ধন্য আর্যমহিমা! আমরা এতদিন এ-সকল কথার কিছুই বুঝতুম না!

হরিহর। (স্বগত) এবং আজও কিছু বুঝতে পারছি নে!

চিন্তামণি। মাটিতে পাখা ঠোকার বিষয়ে যদি জিজ্ঞাসা করেন তো সেও ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্! সম্প্রসারণ এবং নিঃসারণ, বিপ্রকর্ষণ এবং নিকর্ষণ এই কটা ভৌতিক ক্রিয়ার যোগে—

অদ্বৈত। রক্ষা করুন মশায়, আমার মাথা ঘুরছে। পাখা ঠোকার বিষয়ে আপনি আমার কাগজে লিখবেন এখন। আপনি অনেক বকেছেন, আপনাকে একটা পান আনিয়ে

চিন্তামণি। আজ্ঞে না, আপনার এখেনে আমি পান খেতে পারি নে। আপনি আর্যক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করেন না—যে আধ্যাত্মিক শক্তি আমাদের আর্যনাড়ীতে কুলক্রমাগত প্রবাহিত হয়ে আসছে, সেই শক্তি—

অদ্বৈত। মশায়, থাক্ মশায়, আপনাকে পান দেব না, আপনি পান নেই খেলেন। অনুমতি করেন তো বরঞ্চ তামাক আনিয়ে দিচ্ছি।

চিন্তামণি। তামাক! কী সর্বনাশ! সে আরো খারাপ! উৎকৃষ্ট জাতি নিকৃষ্ট জাতির হুঁকোয় তামাক খায় না কেন? এক জাতি আর-এক জাতির স্পৃষ্ট অন্ন খায় না কেন? আগে আর্য অনার্যের ছায়া মাড়াতেন না কেন? তার মধ্যে কি বিজ্ঞান নেই? অবশ্য আছে। আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। সেও ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্। উত্তম মধ্যম এবং অধম এই তিন প্রকার দেহজ বিকিরণশক্তি—

অদ্বৈত। থামুন থামুন—তামাক দেব না মশায়, কাজ নেই আপনার তামাক খেয়ে। পানও

থাক্, তামাকও থাক্—যাতে আপনার সুবিধে হয়, যাতে আপনার দেহজ বিকিরণশক্তি রক্ষা হয়, তাই করুন।

লেখকগণ। ধিক্ অদ্বৈতবাবু, আপনি আর্যশ্রেষ্ঠ কুণ্ডুমশায়ের জ্ঞানগর্ভ কথা শুনতে দিলেন না।

প্রথম লেখক। (দ্বিতীয়ের প্রতি) কুণ্ডুমশায়ের কী অসাধারণ যুক্তিশক্তি ও জ্ঞান! কিন্তু কিছু কি বুঝতে পারলে ভাই?

দ্বিতীয় লেখক। না ভাই, বোঝা গেল না। ভালো করে জিজ্ঞাসা করা যাক-না। আচ্ছা মশায়, আপনি ধারণ কারণ প্রভৃতি যে-সকল শক্তির উল্লেখ করলেন, সেগুলো কী?

চিন্তামণি। সেগুলো আর কিছু নয়—ইংরেজিতে যাকে বলে ফোর্স, যাকে বলে ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্।

লেখকগণ। (সমস্বরে) ওঃ, বুঝেছি।

হরিহর। আজ্ঞে, আমি এখনো কিছু বুঝতে পারছি নে।

লেখকগণ। (বিরক্ত হইয়া) বুঝতে পারছেন না। ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্—ফোর্স—সোজা কথা। ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্ তো জানেন? ফোর্স তো জানেন? এও তাই আর-কি। আর্যদের অসাধারণ বিজ্ঞানচর্চা।

প্রথম লেখক। এ-সকল স্পষ্ট বুঝতে গেলে নানা শাস্ত্র জানা আবশ্যক। মশায়ের বোধ করি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করা হয়েছে।

চিন্তামণি। না, শাস্ত্রটা এখনো পড়া হয় নি। আমি, আমার বাবা এবং নফর কুণ্ডু আর্য—এইজন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন আমি বাহুল্য বিবেচনা করেছি।

দ্বিতীয় লেখক। তা বটে, কিন্তু বিজ্ঞানটা আপনি অবিশ্যি ভালো করেই পড়েছেন।

চিন্তামণি। আজ্ঞে না, আমি চিন্তাশক্তির প্রভাবে আমাদের আর্যজাতির হাঁচি কাশি তুড়ি আঙুল-মটকানো প্রভৃতি আচার-ব্যবহারের নানাবিধ সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসকল আয়ত্ত করেছি। আমার বিজ্ঞান পড়া আবশ্যক হয় নি। আপনারা শুনে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আর্যশাস্ত্রের দিব্যি নিয়ে আমি শপথ করতে পারি, আমি আর্যশাস্ত্র কিংবা বিজ্ঞান কিছুই পড়ি নি। আমার সমস্ত বিদ্যা স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত।

হরিহর। আজ্ঞে, শপথ করবার আবশ্যক নেই—পড়াশুনো আছে এরূপ অপবাদ আপনাকে কেউ দেবে না।

চৈত্র ১২৯২

একান্নবর্তী

দৌলতচন্দ্র ও কানাই

দৌলত। হৃদয় যখন ভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে তখন কোম্পানির দমকল এলেও থামাতে পারে না। একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা সম্বন্ধে সভায় দাঁড়িয়ে অনর্গল বলতে লাগলুম, সভাপতি ঘুমিয়ে পড়াতে নিষেধ করবার কেউ রইল না। শেষকালে দুজন ছোকরা এসে দুই হাত ধরে আমাকে টেনে বসিয়ে দিলে। সেদিন এত উৎসাহ হয়েছিল!

কানাই। বটে, তা হবার কথাই তো। তা আপনি কী বলেছিলেন?

দৌলত। আমি বলেছিলাম, স্বার্থত্যাগের একমাত্র উপায় একান্নবর্তী পরিবার। যেখানে পরের অর্থেই জীবননির্বাহ হয় সেখানে স্বার্থের কোনো প্রয়োজনই হয় না। খবরের কাগজে আমার বক্তৃতা খুব রটে গেছে—তারা সকলেই বলছে, দুঃখের বিষয় দৌলতবাবুর পরিবার কেউ নেই, তিনি একলা।

দীর্ঘনিশ্বাস

জয়নারায়ণের প্রবেশ

জয়নারায়ণ। জয় হোক বাবা। আমি তোমার পিসে।

দৌলত। সে কী মশায়, আমার তো পিসি নেই।

জয়নারায়ণ। না, তাঁর কাল হয়েছে বটে।

দৌলত। পিসি কোনোকালেই যে ছিলেন না।

জয়নারায়ণ। (ঈষৎ হাসিয়া) সে কী করে হয় বাবা? আমি তা হলে তোমার পিসে হলুম কী করে?

কানাইয়ের প্রতি

কী বলেন মশাই?

কানাই। তা তো বটেই।

দৌলত। যে আজ্ঞে, তা আপনার কী অভিপ্রায়ে আগমন?

জয়নারায়ণ। অভিপ্রায় তেমন বিশেষ-কিছু নয়। শুনলুম আমরা পৃথক্ হয়ে আছি বলে খবরের কাগজে নিন্দে করছে, তাই একত্র বাস করতে এসেছি।

দৌলত। আপনার সম্পত্তি কিছু আছে?

জয়নারায়ণ। কিছু নেই, কোনো বালাই নেই, কোনো উৎপাত নেই। কেবল এক খুড়তুতো ভাই আছে—তা, সেও এল বলে।

দৌলত। তা বটে! তাঁর কিছু আছে?

জয়নারায়ণ। কিছু না, কোনো ঝঞ্ঝাট না। কেবল দুই স্ত্রী ও চারটি শিশু সন্তান। তারাও

এল বলে। এতক্ষণ এসে পড়ত ; যাত্রা করবার বেলা দুই স্ত্রীতে চুলোচুলি বেধে গেছে, তাই যা দেরি।

দৌলত। কানাই, কী করা যায়?

জয়নারায়ণ। তোমাকে কিছুই করতে হবে না—তারা আপনারাই আসবে, ভাবনা কী দৌলত ? এত অল্পে কাতর হোয়ো না। তারা আজ সন্ধের মধ্যেই এসে পৌঁছবে।

রামচরণের প্রবেশ ও ভূমিষ্ঠ হইয়া দৌলতকে প্রণাম

রামচরণ। মামা, তোমার বক্তৃতায় বড়ো লজ্জা দিয়েছ।

দৌলত। কে হে বাপু, কে তুমি?

রামচরণ। আজ্ঞে, আপনারই ভাগ্নে রামচরণ। ইস্‌টিশনে লোক পাঠিয়ে দিন—সেখানে একটি পুঁটুলি আর বুড়ি মাকে রেখে এসেছি।

দৌলত। এখানে কী করতে আসা?

রামচরণ। বাস করতে।

দৌলত। আর কোথাও বাসস্থান নেই?

রামচরণ। অমনি একরকম আছে বটে, কিন্তু সেখানে স্বার্থত্যাগ শিক্ষা হয় না।

দৌলত। (ভীতভাবে) কানাই।

কানাই। আপনার উপদেশ উনি যেরকম দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেছেন ওঁকে বোধ হয় নড়ানো শক্ত হবে।

নিতাইয়ের প্রবেশ

নিতাই। দাদা, চাকরি ছেড়ে এলুম, নইলে তোমার যে নিন্দে হয়। কে আছিস রে? ঝট্‌ করে দুটো ডাব পেড়ে নিয়ে আয় তো। বড়ো পিপাসা লেগেছে।

নদেরচাঁদের প্রবেশ

নদেরচাঁদ। এই লও খুড়ো, আমার সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিতে এসেছি। এই আমার ভাঙা বোক্‌নো, থেলো হুঁকো আর এই বেড়াল-ছানাটি। এর মধ্যে ও দুটো পৈতৃক সম্পত্তি, বেড়াল-ছানা আমার স্বোপার্জিত। আর আমায় দোষ দিতে পারবে না, তোমার এখানেই আমি লেগে রইলুম।

দরজির প্রবেশ

দৌলত। তুমি আমার কে হও বাপু?

দরজি। আজ্ঞে আমি দরজি, আপনার গায়ের মাপ নিতে এসেছি।

দৌলত। এখন যাও, টানাটানির সময়, এখন আমি কাপড় করাতে পারব না।

নদেরচাঁদ। খলিফাজি, যাও কোথায়? আমার গায়ের মাপটা নেও। খুড়োর গায় যেরকম ফুলকাটা ছিটের জামা দেখছি অমনি ছ জোড়া হলেই আমার চলে যাবে। যদি বেশ ভালো রকম করে তৈরি করে দিতে পার তো খুড়ো তোমাকে খুশি করে দেবেন, বুঝেছ খলিফাজি?



দরজি। যে আজ্ঞে

গায়ের মাপ-লওন

বালক-সমেত পরেশনাথের প্রবেশ

পরেশ। (দৌলতকে প্রণাম করিয়া বালকের প্রতি) তোর জ্যাঠামশায়কে প্রণাম কর। দাদা, এই লও তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র।

দৌলত। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র!

পরেশ। যাকে চলিত বাংলায় বলে ভাইপো। দাদা যে একেবারে অবাক ! ভ্রাতৃ শব্দের ষষ্ঠীতে হয় ভ্রাতুঃ; তার উপর পুত্র শব্দ যোগ করলেই হল ভ্রাতুষ্পুত্র। স্বয়ং পাণিনি বোপ্‌দেব রয়েছেন, অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কী? অতএব ইনি হলেন ভাইপো।

কানাই। আপনার ছেলেটি কী করেন?

পরেশ। ওকে নিজেই পড়াচ্ছিলুম। হ্রস্ব-ই পর্যন্ত সেরে দীর্ঘ-ঈতে এমনি আটকা পড়ল যে ভাবলুম, দৌলদ্দা যখন আছেন তখন ছেলের লেখাপড়ার দরকার কী? যে বেটার হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান নেই তার পক্ষে বাবা-জ্যাঠা দুই সমান। কেমন কিনা?

কানাই। সমান বৈকি।

পরেশ। দাদা বলেছেন নিজের ক্ষুধা হেয় জ্ঞান করে পরের ক্ষুধানিবৃত্তির সুখ একমাত্র একান্নবর্তী পরিবারেই সম্ভব। শুনেই ঠাওরালুম, এ সুখ দাদা নিশ্চয়ই অনেক দিন পান নি।

যদি-বা পেয়ে থাকেন বিস্মৃত হয়েছেন; তাই নিতান্ত মমতা-পরবশ হয়ে ছেলেটিকে এখানে নিয়ে এলুম। রাবণের চুলো যদি কোথাও জ্বলে সে এর পেটের মধ্যে।

নটবরের প্রবেশ

নটবর। (দৌলতের কান মলিয়া) কী রে শালা, শুনলুম নাকি শালার শোকে সভায় দাঁড়িয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিস?

দৌলত। কে হে তুমি বেল্লিক, ভদ্রলোকের কানে হাত দাও!

নটবর। ভগ্নীপতির কান মলব না তো কি কান ভাড়া করে এনে মলব! কী বলেন মশায়?

কানাই। কথাটা তো ঠিক বটে।

দৌলত। কী বল হে কানাই! আমার স্ত্রীই নেই তো আবার শালা কিসের?

নটবর। তোমারই যেন স্ত্রী নেই, তাই বলে আর কারো স্ত্রী নেই? একটু ভেবে দেখো-না।

দৌলত। স্ত্রী তো অনেকেরই আছে, তা আর ভাবতে হবে কী?

নটবর। (হাসিয়া) তবে?

দৌলত। (সরোষে) তবে কী! তুমি আমার শালা কোন্ সম্পর্কে?

নটবর। কেন, দাদার সম্পর্কে। দাদা আছেন তো! শালাই যেন ভাঁড়ালে, কিন্তু দাদা বেকবুল গেলে তো চলবে না।

দৌলত। আমি তো জানতেম নেই, কিন্তু আজ যেরকম দেখছি তাতে—

নটবর। থাক্, তা হলেই তো চুকে গেল। বেশি বকাবকিতে কাজ কী? ভদ্রলোক বসে আছেন, এঁর সামনে কে শালা আর কে শালা নয় তা নিয়ে তক্‌রার করা ভালো দেখায় না।

দৌলতের পশ্চাৎ হইতে তাকিয়া টানিয়া লইয়া

একটু জিরোনো যাক। এক ছিলিম তামাক ডাকো।

ফল মূল মিষ্টান্ন লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। (দৌলতকে) আপনার জলখাবার।

দৌলত। (সরোষে) বেটা, তোকে এখানে কে খাবার আনতে বলেছে? বাড়ি-ভিতর নিয়ে যা।

পরেশ। বিলক্ষণ, তাতে দোষ হয়েছে কী?

ভৃত্যের প্রতি

ওরে, তুই দিয়ে যা, এ দিকে দিয়ে যা।

থালা লইয়া আহার আরম্ভ

চুলের মুঠি ধরিয়া বিধুভূষণকে লইয়া দুই স্ত্রীলোকের প্রবেশ

প্রথমা। পোড়ারমুখো, তোমার মরণ হয় না?

দৌলত। (শশব্যস্তে) এঁরা কে?

জয়নারায়ণ। বাবা, ব্যস্ত হোয়ো না, আমার সেই খুড়তুত ভাই এসে পৌঁচেছেন।

প্রথমা। ও আবাগের বেটা ভূত!

দ্বিতীয়া। মার্‌ ঝাঁটা, মার্‌ ঝাঁটা!

দৌলত। ভাই কানাই!

কানাই। সহিষ্ণুতা শিক্ষার এমন উপায় আর কী আছে!

প্রথমা। মিন্‌সে, বুড়োবয়সে তুমি আক্কেল খুইয়ে বসেছ!

দ্বিতীয়া। ওগো, এত লোকের এত সোয়ামি মরছে, যমরাজ কি তোমাকেই ভুলেছে!

দৌলত। বাছারা, একটু ঠাণ্ডা হও।

উভয়ে। ঠাণ্ডা হব কিরে মিন্‌সে। তুই ঠাণ্ডা হ, তোর সাত পুরুষ ঠাণ্ডা হয়ে মরুক।

দৌলত। কানাই!

কানাই। গৃহ পূর্ণ হয়েছে—

দৌলত। গ্রহ পূর্ণ হয়েছে বলো—

কানাই। যাই হোক, আজ আর আমাকে প্রয়োজন নেই। আমি এই বেলা সরি।

[প্রস্থান

দৌলত। (উচ্চস্বরে) কানাই, আমাকে একলা রেখে পালাও কোথায়?

সকলে মিলিয়া। (দৌলতকে চাপিয়া ধরিয়া) একলা কিসের? আমরা সবাই আছি, আমরা কেউ নড়ব না।

দৌলত। বল কী!

সকলে। হাঁ, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।

বৈশাখ ১২৯৪

সূক্ষ্ম বিচার

চণ্ডীচরণ ও কেবলরাম

কেবলরাম। মশায়, ভালো আছেন?

চণ্ডীচরণ। 'ভালো আছেন' মানে কী?

কেবলরাম। অর্থাৎ, সুস্থ আছেন?

চণ্ডীচরণ। স্বাস্থ্য কাকে বলে?

কেবলরাম। আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম মহাশয়ের শরীর-গতিক—

চণ্ডীচরণ। তবে তাই বলো। আমার শরীর কেমন আছে জানতে চাও। তবে কেন জিজ্ঞাসা করছিলে আমি কেমন আছি? আমি কেমন আছি আর আমার শরীর কেমন আছে কি একই হল? আমি কে, আগে সে'ই বলো।

কেবলরাম। আজ্ঞে, আপনি তো চণ্ডীচরণবাবু।

চণ্ডীচরণ। সে বিষয়ে গুরুতর তর্ক উঠতে পারে।

কেবলরাম। তর্ক কেন উঠবে? আপনি বরঞ্চ আপনার পিতাঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করবেন।

চণ্ডীচরণ। নাম জিনিসটা কী? নাম কাকে বলে?

কেবলরাম। (বহু চিন্তার পর) নাম হচ্ছে মানুষের পরিচয়ের—

চণ্ডীচরণ। নাম কি কেবল মানুষেরই আছে, অন্য প্রাণীর নেই?

কেবলরাম। ঠিক কথা। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর—

চণ্ডীচরণ। কেবল মানুষ ও প্রাণী ছাড়া আর কিছুর নাম নেই? তবে বস্তু চেনার কী উপায়?

কেবলরাম। ঠিক বটে। মানুষ প্রাণী এবং বস্তু—

চণ্ডীচরণ। শব্দ স্বাদ বর্ণ প্রভৃতি অবস্তুর কি নাম নেই?

কেবলরাম। তাও বটে। মানুষ প্রাণী বস্তু এবং শব্দ স্বাদ বর্ণ প্রভৃতি অবস্তু—

চণ্ডীচরণ। এবং—

কেবলরাম। আবার এবং!

চণ্ডীচরণ। এবং আমাদের মনোবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির—

কেবলরাম। এবং আমাদের মনোবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির—

চণ্ডীচরণ। এবং অন্তর ও বাহিরের যাবতীয় পরিবর্তনের ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার—

কেবলরাম। যাবতীয় পরিবর্তনের এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার—

চণ্ডীচরণ। এবং—

কেবলরাম। (কাতরভাবে) এবং না বলে এইখানে একটা ইত্যাদি লাগানো যাক-না।

চণ্ডীচরণ। আচ্ছা বেশ। এখন সমস্তটা কী হল বলো তো। কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাক।

কেবলরাম। (মাথা চুলকাইয়া) পরিষ্কার হবে কি না বলতে পারি নে, চেষ্টা করি। নাম হচ্ছে মানুষের এবং অবস্তুর, না না—বস্তু এবং অবস্তুর, এবং বাহিরের ও অন্তরের যাবতীয় হৃদয়বৃত্তির, না—মনোবৃত্তির, না না—যাবতীয় ভিন্ন ভিন্ন কিম্বা পরিবর্তন ও অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন যাবতীয়—এ তো মুশকিল হল। কিছুতেই গুছিয়ে উঠতে পারছি নে। এক কথায় নাম হচ্ছে মানুষের এবং প্রাণীর এবং—দূর হোক গে, মানুষের প্রাণীর এবং ইত্যাদির পরিচয়ের উপায়।

চণ্ডীচরণ। এ সম্বন্ধে তর্ক আছে। পরিচয় কাকে বল?

কেবলরাম। (জোড়হস্তে) আমি কাউকেই বলি নে। মশায়ই বলুন।

চণ্ডীচরণ। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের প্রভেদ অবগত হয়ে তাদের স্বতন্ত্র করে জানা। এই ঠিক তো?

কেবলরাম। এ ছাড়া আর তো কিছু হতেই পারে না।

চণ্ডীচরণ। তা হলে তুমি অস্বীকার করছ না?

কেবলরাম। আজ্ঞে না।

চণ্ডীচরণ। যদিই অস্বীকার কর তা হলে এ সম্বন্ধে গুটিকতক তর্ক আছে।

কেবলরাম। না না, আমি কিছুমাত্র অস্বীকার করছি নে।

চণ্ডীচরণ। মনে করো, যদিই কর।

কেবলরাম। (ভীতভাবে) আজ্ঞে না, মনেও করতে পারি নে।

চণ্ডীচরণ। তুমি না কর, যদি আর কেউ করে?

কেবলরাম। কারো সাধ্য নেই যে করে। এতবড়ো দুঃসাহসিক কে আছে!

চণ্ডীচরণ। আচ্ছা বেশ, এটা যেন স্বীকারই করলে; তার পরে, নামই যদি পরিচয়ের একমাত্র উপায় হবে, তবে কি আমার চেহারা পরিচয়ের উপায় নয়? আর আমার অন্যান্য লক্ষণগুলো—

কেবলরাম। আজ সম্পূর্ণ বুঝেছি নাম কাকে বলে তার নামগন্ধও জানি নে, আপনিই বলে দিন।



চণ্ডীচরণ। ভাষার দ্বারা স্বতন্ত্র পদার্থের স্বাতন্ত্র্য নির্দিষ্ট করবার একটি কৃত্রিম উপায়কে বলে নামকরণ। যদি অস্বীকার কর—

কেবলরাম। না, আমি অস্বীকার করি নে—

চণ্ডীচরণ। কেবল তর্কের অনুরোধেও যদি অস্বীকার কর—

কেবলরাম। তর্কের অনুরোধে কেন, বাবার অনুরোধেও অস্বীকার করতে পারি নে।

চণ্ডীচরণ। এর কোনো একটা অংশও যদি অস্বীকার কর।

কেবলরাম। একটি অক্ষরও অস্বীকার করতে পারি নে।

চণ্ডীচরণ। এই মনে করো, 'কৃত্রিম' কথাটা সম্বন্ধে নানা তর্ক উঠতে পারে।

কেবলরাম। ঠিক তার উলটো, ঐ কথাতেই সকল তর্ক দূর হয়ে যায়।

চণ্ডীচরণ। আচ্ছা, তাই যদি হল, মীমাংসা করা যাক আমার নাম কী।

কেবলরাম। (হতাশভাবে) মীমাংসা আপনিই করুন, আমার খিদে পেয়েছে।

চণ্ডীচরণ। নাম আমার সহস্র আছে, কোন্‌টা তুমি শুনতে চাও।

কেবলরাম। যেটা আপনি সব চেয়ে পছন্দ করেন।

চণ্ডীচরণ। প্রথমে বিচার করতে হবে কিসের সঙ্গে আমার প্রভেদ জানতে চাও। যদি পশুর সঙ্গে আমার প্রভেদ নির্দেশ করতে চাও—

কেবলরাম। আজ্ঞে তা চাই নে।

চণ্ডীচরণ। তা হলে আমার নাম মানুষ। যদি শ্বেত পীত পদার্থের সঙ্গে আমার প্রভেদ জানতে চাও তবে আমার নাম—

কেবলরাম। কালো।

চণ্ডীচরণ। শাম্‌লা। যদি ছেলের সঙ্গে প্রভেদ জানতে চাও তবে আমার নাম—

কেবলরাম। বুড়ো।

চণ্ডীচরণ। মধ্যবয়সী।

কেবলরাম। তবে চণ্ডীচরণ কার নাম মশায়।

চণ্ডীচরণ। একটি মনুষ্যের মধ্যে, একটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মনুষ্যবিশেষের মধ্যে, একটি পূর্ণপরিণত মনুষ্যের মধ্যে, তার জন্মকাল হতে আজ পর্যন্ত যে-সকল পরিবর্তন অহরহ সংঘটিত হচ্ছে এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত হবার সম্ভাবনা আছে, সেই পরিবর্তন ও পরিবর্তন-সম্ভাবনার কেন্দ্রস্থলে যে-একটি সজ্ঞান ঐক্য বিরাজ করছে, তাকেই এক দল লোক, অর্থাৎ সেই লোকদের সজ্ঞান ঐক্য চণ্ডীচরণ নামে নির্দেশ করে।

কেবলরাম। সর্বনাশ! মশায়, বেলা হল। অত্যন্ত ক্ষুধানুভব হয়েছে, আহারও প্রস্তুত, এবার তবে না—

চণ্ডীচরণ। (হাত চাপিয়া ধরিয়া) রোসো—আসল কথাটার কিছুই মীমাংসা হয় নি। সবে আমরা তার ভূমিকা করেছি মাত্র। তুমি জিজ্ঞাসা করছিলে আমি ভালো আছি কি না; এখন প্রশ্ন এই, তুমি কী জানতে চাও। আমার অন্তর্গত প্রাণী কেমন আছে জানতে চাও, না মনুষ্য

কেমন আছে জানতে চাও, না—

কেবলরাম। গোড়ায় কী জানতে চেয়েছিলুম তা বলা ভারি শক্ত। কিন্তু আপনার সঙ্গে এতক্ষণ কথা কয়ে এখন অনুমান হচ্ছে, আপনার সঙ্গে এবং কেমন আছেন। এইটে জানাই অজ্ঞান আমার অভিপ্রায় ছিল।

চণ্ডীচরণ। অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলে।

কেবলরাম। তা হলে মাপ করবেন—অপরাধ করেছি, এখন অনুতাপে এবং পেটের জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছি। আহারের পূর্বে এরকম প্রশ্ন আমি আর কখনো আপনাকে জিজ্ঞাসা করব না।

চণ্ডীচরণ। (কর্ণপাত না করিয়া) আমি ভালো আছি কি না জিজ্ঞাসা করলে প্রথম দেখা আবশ্যক ভালোমন্দ কাকে বলে। তার পরে স্থির করতে হবে আমার সম্বন্ধে ভালোই বা কী আর মন্দই বা কী। তার পরে দেখতে হবে বর্তমানে যা ভালো তা—

কেবলরাম। মশায়, আপনার পায়ে ধরছি, এখনকার মতো ছুটি দিন। বরং 'আপনি কেমন আছেন' এই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের উত্তর আপনি কবে দিতে পারবেন একটা দিন স্থির করে দিন—আমি যে নিতান্ত ব্যস্ত হয়েছি তা নয়—নাহয় উত্তর পেতে কিছুদিন দেরিই হবে, নাহয় উত্তর নেই পাওয়া গেল। কিন্তু আজ আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, ভবিষ্যতে আমি সতর্ক হব।

বৈশাখ ১২৯৩

আশ্রমপীড়া

প্রথম দৃশ্য

নবকান্ত

নবকান্ত। ওঃ, প্রেমের রহস্য কে ভেদ করতে পারে! না জানি সে কিসের বন্ধন যাতে এক হৃদয়ের সঙ্গে আর-এক হৃদয় বাঁধা পড়ে! কী জ্যোৎস্নাপাশ, কী পুষ্পসৌরভের ডোর, কী মুকুলিত মধুমাসের মধুর মলয়ানিলের বন্ধন!

নরোত্তমের প্রবেশ

নরোত্তম। কী সর্বনাশ! নবকান্তের হাতে পড়লে তো রক্ষা নেই! ধরলে বুঝি!

নবকান্ত। (নরোত্তমকে ধরিয়া) ভাই, প্রেমের কী মহান শক্তি!

নরোত্তম। খিদের শক্তি তার চেয়ে বেশি। আমি খেতে যাই, আমাকে ছাড়ো—

নবকান্ত। হৃদয়ের ক্ষুধা—

নরোত্তম। হৃদয়ের নয়, উদরের। আমি খেয়ে আসি—

নবকান্ত। খাওয়ার কথা বলছি নে।

নরোত্তম। তুমি কেন বলবে? আমি বলছি। একটু রোসো, আমি—ঐ-যে আদ্যানাথবাবু আসছেন। ওঁকে ধরো, প্রেমের শক্তি বোঝবার লোক এমন আর পাবে না।

[প্রস্থান

আদ্যানাথের প্রবেশ

নবকান্ত। (আদ্যানাথকে ধরিয়া) মশায়, প্রেমের কী মহান শক্তি!

আদ্যানাথ। মহান শক্তি কী বাপু! মহতী শক্তি। কারণ, শক্তি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, তৎপূর্বে—

নবকান্ত। ভেবে দেখুন, প্রেমের সৈন্য নেই, সামন্ত নেই, অথচ প্রেম বিশ্ববিজয়ী। সে আপন জীবন্ত—

আদ্যানাথ। জীবন্ত হতেই পারে না।

নবকান্ত। আজ্ঞে হাঁ, সে আপনার জীবন্ত প্রভাবেই—

আদ্যানাথ। জীবিত বলো-না কেন, তা হলে ব্যাকরণ—

নবকান্ত। জীবন্ত প্রভাবে সর্বত্র আপনার পথ সৃজন—

আদ্যানাথ। সৃজন নয়—সর্জন।

নবকান্ত। পথ সৃজন করে নেয়। এই-যে সূর্যতারাখচিত—

আদ্যানাথ। সর্জন, কেননা সৃজ্‌ ধা—

নবকান্ত। নীলাকাশ, এই-যে বিচিত্রপুষ্পশোভিত—

আদ্যানাথ। সৃজ্‌ ধাতুর উত্তর—

নবকান্ত। পুষ্পকানন—

[কথোপকথন করিতে করিতে প্রস্থান

গণেশের প্রবেশ

গণেশ। লেখাটা তো শেষ করেছি, এখন শোনাই কাকে? খাতা হাতে যেখানেই যাই কাউকে দেখতে পাই নে। আজ কাউকে শোনাতেই হবে—সন্ধান দেখি গে।

৷য় দৃশ্য

হরিচরণ নবীনমাধব নরোত্তম

হরিচরণ। ওহে, এতদিন ছিলেম ভালো, কোনো আপদ ছিল না। এখন কী করা যায়!

নবীন। তাই তো, কী করা যায়!

নরোত্তম। তাই তো হে, উপায় কী?

হরিচরণ। এতদিন আমাদের বাসায় আপদের মধ্যে নবকান্ত ছিল, তাকে সয়ে গিয়েছিল;

এখন কোথা থেকে একটা লেখক এসেছে!

নরোত্তম। বাসায় লেখক থাকা কাজের কথা নয়।

নবীন। কাল জাতিভেদের উপর এক কবিতা লিখে শোনাতে এসেছিল।

হরিচরণ। কাল রাত্রি সাড়ে-দশটা, সবে আমার একটু তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় লেখক এসে উপস্থিত। তন্দ্রা তো ছুটলই, আমিও তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটলুম!

নরোত্তম। আরে ভাই, আমাকেও—ঐ আসছে।

হরিচরণ। ঐ এল রে!

নবীন। ঐ খাতা!

হরিচরণ। পালাই।

[প্রস্থান

নবীন। আমিও পালাই।

[প্রস্থান

নরোত্তম। আমি মোটা মানুষ ছুটতে পারব না। করি কী?

গণেশের প্রবেশ

গণেশ। তিনটে প্রবন্ধ—

নরোত্তম। কটা বাজল কে জানে—

গণেশ। একটা হচ্ছে আধুনিক স্ত্রী জাতির—

নরোত্তম। মশায়, ঘড়ি আছে? দেখুন তো সময়—

গণেশ। আজ্ঞে, ঘড়ি নেই। আমার প্রবন্ধের একটা হচ্ছে—

নরোত্তম। (উচ্চস্বরে) ওরে মেধো, আপিসের চাপকানটা কোথায় রাখলি?

গণেশ। বুঝেছেন নরোত্তমবাবু, একটা প্রবন্ধ হিন্দুধর্মের—

নরোত্তম। (নেপথ্যে চাহিয়া) ঐ ঐ ঐ, সর্বনাশ হল! ছেলেটা প'ল বুঝি!

[প্রস্থান

গণেশ। কাল থেকে চেষ্টা করছি, কাউকে পাচ্ছি নে। কে যেন কাকের বাসায় ঢিল ছুঁড়েছে—বাসাসুদ্ধ প্রাণী চঞ্চল হয়ে বেড়াচ্ছে। পূর্বে যে বাসায় ছিলুম সেখানে একটি লোকও বাকি রইল না, কাজেই ছেড়ে আসতে হল। এখানেই বা এরা দু-দণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারে না কেন? যাই, নরোত্তমবাবুকে ধরি গে। লোকটি বেশ মোটাসোটা, ভালোমানুষ।

তৃতীয় দৃশ্য

নরোত্তম ও নবকান্ত

নবকান্ত। দেখো নরোত্তম, হৃদয়ের রহস্য—

নরোত্তম। এখন নয় ভাই, আপিস আছে।

নবকান্ত। (দীর্ঘনিশ্বাসে) আহা, তোমার তো আপিস আছে, আমার কী আছে বলো তো। আমার যে occupation gone! Othello's occupation gone! শেক্‌স্‌পিয়র যে লিখেছে—কোথায় যাও—আঃ, শোনো-না—

নরোত্তম। না ভাই, আমাকে মাপ করো—সাহেব রাগ করবে, আমারও occupation যাবার জো হবে।

নবকান্ত। আমি বলছিলুম, উভয় পক্ষের যদি—আহা শোনো-না—উভয় পক্ষের—

নরোত্তম। ও-সব কথা আমার জানা নেই, উভয় পক্ষের কথা শুনলে আমার ভারি গোল বেধে যায়, মাথা ঘুরতে থাকে।

নবকান্ত। তুমি আমার কথা না শুনেই যে ভয় পাচ্ছ! আমি যা বলছি তা তর্কের কথা নয়—হৃদয়ের কথা, সহজ কথা।

নরোত্তম। কিন্তু ঐ সহজ কথাতেই সাড়ে-চারটে বেজে যাবে—আমায় ছাড়ো।

নবকান্ত। আচ্ছা দেখো, দশ মিনিটের বেশি লাগবে না—ঘড়ি ধরে থাকো, আমি বলে যাই।

নরোত্তম। (সকাতরে) নবকান্ত, কেন তোমরা সকলে আমাকে নিয়েই পড়েছ? ও ঘরে হরি আছে, নবীন আছে, তাদের কাছে তো ঘেঁষ না। সেদিন ঠিক এমনি সময়ে হৃদয়ের রহস্যের কথা পাড়লে, সাড়ে-দুপুর বেজে গেল, সাহেবের কাছে জরিমানা দিতে হল। আবার আজও সেই হৃদয়ের রহস্য! গরিবের চাকরিটি গেলে হৃদয়ের রহস্য আমার কোন্ কাজে লাগবে!

প্রস্থানোদ্যম

নবকান্ত। (ধরিয়া) রাগ করলে ভাই?

নরোত্তম। না, রাগের কথা হচ্ছে না। আপিসের বেলা হল, তাই তাড়াতাড়ি করছি।

প্রস্থানোদ্যম

নবকান্ত। (ধরিয়া) না ভাই, তুমি রাগ করছ।

নরোত্তম। এও তো বিষম মুশকিলে ফেললে। কিন্তু শীতকালের দিনে কথায় কথায় বেলা হয়ে যায়।

প্রস্থানোদ্যম

নবকান্ত। (ধরিয়া) না ভাই, তুমি রাগ করে চলে যাচ্ছ, আমার সমস্ত দিন মন খারাপ থাকবে।

নরোত্তম। আচ্ছা ভাই, আপিস থেকে ফিরে এসে কথা হবে।

প্রস্থানোদ্যম

নবকান্ত। না, তুমি বলো, আমাকে মাপ করলে।

নরোত্তম। মাপ করলুম।

প্রস্থানোদ্যম

নবকান্ত। (ধরিয়া) না ভাই, তোমার মুখ যে প্রসন্ন দেখছি নে।



নরোত্তম। প্রসন্ন হবে কী করে? বেলা যে বিস্তর হল।

নবকান্ত। (আটক করিয়া) প্রসন্ন মুখে মাপ করে যাও, তবে ছাড়ব।

নরোত্তম। তোমাকে মাপ করব কী, তুমি আমাকে মাপ করো। আমি পায়ে ধরছি, নাকে খত দিচ্ছি, আর যা বল তাই করছি, কিন্তু এই অবেলায় হৃদয়ের রহস্য শুনতে পারব না। [প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

নরোত্তমের পশ্চাতে গণেশ

গণেশ। অত হাঁপাচ্ছেন কেন? একটু স্থির হোন-না। আমার প্রবন্ধে—

নরোত্তম। কী ভয়ানক! মশায়ের খাওয়া হয়েছে?

গণেশ। আজ্ঞে, না। কিন্তু আমার লেখায়—

নরোত্তম। মাছি পড়েছে।

গণেশ। আজ্ঞে, মাছি পড়বে কেন?

নরোত্তম। আপনার লেখায় নয়—আমার দুধে মাছি পড়েছে।

[প্রস্থানোদ্যম

নবকান্তের প্রবেশ

নবকান্ত। তুমি ভাই, রাগ করে এলে—আমার মন স্থির হচ্ছে না।

নরোত্তম। আমারও মন অত্যন্ত অস্থির। [তাড়াতাড়ি প্রস্থান

নবকান্ত। যাই, নরোত্তমের মুখ প্রফুল্ল না দেখে তাকে তো কিছুতেই ছাড়তে পারি নে।

[প্রস্থান

গণেশ। নরোত্তমবাবু গেলেন কোথায় দেখে আসি।

পঞ্চম দৃশ্য

নরোত্তম আহারে প্রবৃত্ত

গণেশের প্রবেশ

গণেশ। এত সকাল-সকাল আহারে বসেছেন যে!

নরোত্তম। সকাল আর কই? আপিসে বেরোতে হবে যে।

গণেশ। এখনি যেতে হবে! তবে যতক্ষণ খাচ্ছেন ততক্ষণ যদি আমার—

নরোত্তম। মশায়, আমার খাওয়া হয়েছে, আমি উঠলুম।

গণেশ। কিছুই যে খেলেন না, সবই যে পড়ে রইল। পান-তামাক তো খাবেন, ততক্ষণ যদি—

নরোত্তম। (নেপথ্যে চাহিয়া) ঐ রে, নবকান্ত মুখ বিমর্ষ করে আসছে! আজ্ঞে না, পান-তামাকে প্রয়োজন নেই, আমি চললুম।

[প্রস্থান

নবকান্তের প্রবেশ

নবকান্ত। নরোত্তম কোথায় মশায়?

গণেশ। (খাতা বাহির করিয়া) তিনি চলে গেলেন। তা হোক-না, আপনি বসুন-না।

নবকান্ত। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) হায়, আমার কী অবস্থা হল।

গণেশ। কিছুই হয় নি, আপনি ভাববেন না, বেশ আছেন। হিন্দুপ্রকাশে আমার লেখা—

নবকান্ত। কিছুই নয়? বলেন কী! হৃদয়ের—

গণেশ। হৃদয়ের কথা তো হচ্ছিল না। আর্যমনীষিগণের—

নবকান্ত। আর্যমনীষী আবার কোত্থেকে এল? হৃদয়ের কথাই তো হচ্ছিল। আমি বলছিলুম, হৃদয় যখন—

গণেশ। আমি যা লিখেছি তার বিষয়টা হচ্ছে, আর্যমনীষিগণ যে-সকল বিধান করে গেছেন আমাদের বর্তমান অবস্থায় তার কী করা উচিত।

নবকান্ত। শ্রাদ্ধ করা উচিত। সে যাক গে। যার হৃদয়ে তুষানল ধিকি ধিকি জ্বলছে—

গণেশ। সে যেন ভদ্রলোকের ঘরের চালের উপর গিয়ে না বসে, তা হলেই লঙ্কাকাণ্ড বাধবে। আমার প্রশ্ন এই, শাস্ত্রের মূলে কী আছে—

নবকান্ত। কচু!

গণেশ। এবং তার থেকে কী ফলছে?

নবকান্ত। কলা।

গণেশ। এবং সে মূল উদ্ধার কে করবে?

নবকান্ত। বরাহ অবতার।

গণেশ। সে ফল ভোগ করবে কে?

নবকান্ত। হনুমান অবতার। এখন আমার প্রশ্ন এই, জগতে সকলের চেয়ে গভীর রহস্য কী?

গণেশ। আর্যশাস্ত্র।

নবকান্ত। প্রেম।

গণেশ। মনু এবং—

নবকান্ত। অভিমানের অশ্রুজল—

গণেশ। এবং গৃহ্যসূত্র—

নবকান্ত। এবং চোখে চোখে চাহনি—

গণেশ। দায়ভাগ।

নবকান্ত। এবং প্রাণে প্রাণে মিলন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

গণেশ লিখিতে প্রবৃত্ত

গণেশ। বিষয়টা গুরুতর, 'নারদের ঢেঁকি এবং আধুনিক বেলুন'। আরম্ভটা দিব্যি হয়েছে, শেষটা মেলাতে পারছি নে। তা শেষটা না হলেও চলবে। কিন্তু শোনাই কাকে? নরোত্তমবাবু বাসা ছেড়ে গেছেন। হরিহরবাবুর কাছে ঘেঁষতে ভয় হয়।

নবকান্তের প্রবেশ

নবকান্ত। হায় হায়, নরোত্তম বাসা ছেড়েছে, এখন যাই কার কাছে?

গণেশ। এই-যে নবকান্তবাবু, নারদের ঢেঁকি—

নবকান্ত। নিথর জোছনাজালে নধর নবীন—

আদ্যানাথের প্রবেশ

গণেশ। বাঁচা গেল। আদ্যানাথবাবু আমার নারদের ঢেঁকি—

নবকান্ত। নয়ননলিনীদল নিদ্রায় নিলীন—

গণেশ। সনাতনশাস্ত্র মন্থন করে নারদের ঢেঁকি—

আদ্যানাথ। ঢেঁকি শব্দটা কি গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট নয়? সাহিত্য-দর্পণে—

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। বাবুরা পালাও গো, আগুন লেগেছেন।

আদ্যানাথ। বেটার ব্যাকরণজ্ঞান দেখো।

নবকান্ত। (সনিশ্বাসে) আগুন! হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে—

গণেশ। নল যে বিনা-আয়োজনে আগুন জ্বালাতেন সে অক্সিজেন-হাইড্রোজেন যোগে

আদ্যানাথ। ওটা যাবনিক প্রয়োগ হল। ও স্থলে—

গৃহে অগ্নির আবির্ভাব

কার্তিক ১২৯৩

অন্ত্যেষ্টি-সৎকার

প্রথম দৃশ্য

রায় কৃষ্ণকিশোর বাহাদুর মৃত্যুশয্যায় শয়ান। চন্দ্রকিশোর
নন্দকিশোর ও ইন্দ্রকিশোর পুত্রত্রয় পরামর্শে রত।
ডাক্তার উপস্থিত। মহিলাগণ ক্রন্দনোন্মুখী

চন্দ্র। কাকে কাকে লিখি?

ইন্দ্র। রেনল্‌ড্‌স্‌-সায়েবকে লেখো।

কৃষ্ণ। (অতিকষ্টে) কী লিখবে বাবা?

নন্দ। তোমার মৃত্যুসংবাদ।

কৃষ্ণ। এখনো তো মরি নি বাবা!

ইন্দ্র। এখনি নেই বা ম'লে, কিন্তু একটা সময় স্থির করে লিখতে হবে তো।

চন্দ্র। যত শীঘ্র পারি সাহেবদের কন্‌ডোলেন্‌স্‌ লেটারগুলো আদায় করে কাগজে ছাপিয়ে ফেলা দরকার, এর পরে জুড়িয়ে গেলে ছাপিয়ে তেমন ফল হবে না।

কৃষ্ণ। রোসো বাবা, আগে আমি জুড়িয়ে যাই।

নন্দ। সবুর করলে চলবে না বাবা! সিমলে-দার্জিলিঙে যাদের যাদের চিঠি পাঠাতে হবে তাদের একটা ফর্দ করা যাক। বলে যাও।

চন্দ্র। লাট-সায়েব, ইল্‌বর্ট্‌-সায়েব, উইল্‌সন-সায়েব, বেরেস্‌-ফোর্ড, মেকলে, পিকক—

কৃষ্ণ। বাবা, কানের কাছে ও কী নামগুলো করছ, তার চেয়ে ভগবানের নাম করো। অন্তিমে তিনিই সহায়। হরি হে—

ইন্দ্র। ভালো মনে করিয়ে দিয়েছ, হ্যারিসন-সায়েবকে ধরা হয় নি।

কৃষ্ণ। বাবা, বলো রাম রাম—

নন্দ। তাই তো, রাম্‌জে-সায়েবকে তো ভুলেছিলুম।

কৃষ্ণ। নারায়ণ, নারায়ণ—

চন্দ্র। নন্দ লেখো তো, নোরান-সায়েবের নামটা লেখো তো।

স্কন্দকিশোরের প্রবেশ

স্কন্দ। বা, তোমরা বেশ তো! আসল কাজটাই তো বাকি।

চন্দ্র। কী বলো তো।

স্কন্দ। ঘাটে যাবার প্রোসেশ্যনে যারা যোগ দেবে তাদের তো আগে থাকতে খবর দেওয়া চাই।

কৃষ্ণ। বাবা, কোন্‌টা আসল হল? আগে তো মরতে হবে, তার পরে—

চন্দ্র। সেজন্য ভাবনা নেই। ডাক্তার!

ডাক্তার। আজ্ঞে!

চন্দ্র। বাবার আর কত বাকি? সাধারণকে কখন আসতে বলব?

ডাক্তার। বোধ হয়—

রমণীদের রোদন

স্কন্দ। (বিরক্ত হইয়া) মা, তুমি তো ভারি উৎপাত আরম্ভ করলে! আগে কথাটা জিজ্ঞাসা করে নিই।—

কখন ডাক্তার?

ডাক্তার। বোধ হয় রাত্রি—

রমণীদের পুনশ্চ ক্রন্দন

নন্দ। এ তো মুশকিল হল। কাজের সময় এমন করলে তো চলে না। তোমাদের কান্নায় ফল কী? আমরা বড়ো বড়ো সায়েবদের কাঁদুনি-চিঠি কাগজে ছাপিয়ে দেব।

রমণীগণকে বহিষ্করণ

স্কন্দ। ডাক্তার, কী বোধ হচ্ছে?

ডাক্তার। যেরকম দেখছি, আজ রাত্রি চারটের সময়েই বা হয়ে যায়।

চন্দ্র। তবে তো আর সময়—নন্দ, যাও ছুটে যাও, স্লিপগুলো দাঁড়িয়ে থেকে ছাপিয়ে আনো।

ডাক্তার। কিন্তু ওষুধটা আগে—

স্কন্দ। আরে, তোমার ডাক্তারখানা তো পালিয়ে যাচ্ছে না। প্রেস বন্ধ হলে যে মুশকিলে পড়তে হবে।

ডাক্তার। আজ্ঞে, রুগি যে ততক্ষণে—

চন্দ্র। সেইজন্যই তো তাড়াতাড়ি—পাছে স্লিপ ছাপার আগেই রুগি—

নন্দ। এই আমি চললুম।

স্কন্দ। লিখে দিয়ো, কাল আটটার সময় প্রোসেশ্যন আরম্ভ হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্কন্দ। কই ডাক্তার, চারটে ছেড়ে সাতটা বাজল যে!

ডাক্তার। (অপ্রতিভভাবে) তাই তো, নাড়ী এখনো বেশ সবল আছে।

চন্দ্র। বা, তুমি তো বেশ ডাক্তার! আচ্ছা বিপদে ফেলেছ!

নন্দ। ওষুধটা আনতে দেরি করেই বিপদ ঘটল। ডাক্তারের ওষুধ বন্ধ হয়েই বাবা বল পেয়েছেন।

কৃষ্ণ। এতক্ষণ তোমরা প্রফুল্ল ছিলে, হঠাৎ বিমর্ষ হলে কেন? আমি তো ভালোই বোধ করছি।

স্কন্দ। আমরা যে ভালো বোধ করছি নে। ঘাটে যাবার এন্‌গেজ্‌মেন্ট্‌ যে করে বসেছি।

কৃষ্ণ। তাই তো, আমার মরা উচিত ছিল।



ডাক্তার। (অসহ্য হইয়া) এক কাজ কর তো সব গোল চুকে যায়।

ইন্দ্র। কী?

স্কন্দ। কী?

চন্দ্র। কী?

নন্দ। কী?

ডাক্তার। ওঁর বদলে তোমরা যদি কেউ সময়মত মর।

তৃতীয় দৃশ্য

বহির্বাটীতে লোকসমাগম

কানাই। ওহে, সাড়ে-আটটা বাজল। দেরি কিসের?

চন্দ্র। বসুন, একটু তামাক খান।

কানাই। তামাক তো সকাল থেকেই খাচ্ছি।

বলাই। কই হে, তোমাদের জোগাড় তো কিছুই দেখি নে।

চন্দ্র। জোগাড় সমস্তই আছে—আমাদের কোনো ত্রুটি নেই—এখন কেবল—

রামতারণ। কী হে চন্দ্র, আর দেরি করা তো ভালো হয় না।

চন্দ্র। সে কি আমি বুঝি নে—কিন্তু—

হরিহর। দেরি কিসের জন্যে হচ্ছে! আপিসের বেলা হয় যে, কাণ্ডখানা কী?

ইন্দ্রকিশোরের প্রবেশ

ইন্দ্র। ব্যস্ত হবেন না, হল বলে। ততক্ষণ কন্‌ডোলেন্‌স্‌-লেটারগুলো পড়ুন। (হাতে হাতে বিলি) এটা ল্যাম্‌বার্টের এটা হ্যারিসনের, এটা সার জেম্‌স্‌—

স্কন্দকিশোরের প্রবেশ

স্কন্দ। এই নিন, ততক্ষণ কাগজে বাবার মৃত্যুর বিবরণ পড়ুন। এই স্টেট্‌স্‌ম্যান, এই ইংলিশ্‌ম্যান—

মধুসূদন। (যাদবের প্রতি) দেখেছ ভাই, বাঙালি পাংচুয়ালিটি কাকে বলে জানে না।

ইন্দ্র। ঠিক বলেছেন। মরবে, তবু পাংচুয়াল হবে না।

খবরের কাগজ ও কন্‌ডোলেন্‌স্‌ পত্র পড়িতে পড়িতে
অভ্যাগতগণের অশ্রুপাত

রাধামোহন। (সজল নেত্রে) হরি হে দীনবন্ধু!

নয়ানচাঁদ। হায় হায়, এমন লোকেরও এমন বিপদ ঘটে!

নবদ্বীপচন্দ্র। (সনিশ্বাসে) প্রভু, তোমারই ইচ্ছা!

রসিক। 'হৃদয়বৃন্তে ফুটে যে কমল' তার পরে কী ভুলে যাচ্ছি—

'হৃদয়বৃন্তে ফুটে যে কমল
তাহারে কাল অকালে ছিঁড়িলে, হৃদয়-
মৃণাল ডুবে শোকসাগরের জলে।'

এও ঠিক তাই। হৃদয়মৃণাল শোকসাগরের জলে! আহা!

আড্ডি এস্কোয়ার। O tempora, O mores!

তর্কবাগীশ। চলচ্চিত্তং চলদ্‌বিত্তং চলজ্জীবন—হায় হায় হায়!

ন্যায়বাগীশ। যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ—(কণ্ঠরোধ)

দুঃখীরাম। হা কৃষ্ণকিশোর বাহাদুর, তুমি কোথায় গেলে!

নেপথ্য হইতে ক্ষীণ কণ্ঠ। আমি এইখানেই আছি বাবা! দোহাই, তোরা এত চেঁচাস নে

ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৩

রসিক

তিনকড়ি নেপাল ভোলা এবং নীলমণি হাসিয়া কুটিকুটি

ধীরাজের প্রবেশ

ধীরাজ। এত হাসছ কেন? খেপলে নাকি?

তিনকড়ি। (দূরে নির্দেশ করিয়া) দেখছেন না, রসিকরাজবাবু আসছেন?

ধীরাজ। তা তো দেখছি, কিন্তু হাস্যকর কিছু তো দেখা যাচ্ছে না।

নেপাল। উনি ভারি মজার লোক!

ভোলা। ভা-আ-রি মজার লোক!

নীলমণি। বড্ড মজার লোক!

তিনকড়ি। ওঁর একটা গল্প বলি শুনুন। সেদিন আমরা এই ক'টিতে মিলে হাসতে হাসতে রসিকবাবুর সঙ্গে আসছি—চোরবাগানের মোড়ের কাছে—হা হা হা!

নীলমণি। হো হো হো!

ভোলা। হী হী হী!

তিনকড়ি। বুঝেছেন, চোরবাগানের— হা হা।

নেপাল। রোসো ভাই, কাপড় সামলে নিই! হাসতে হাসতে বিলকুল আলগা হয়ে এসেছে।

তিনকড়ি। বুঝেছেন ধীরাজবাবু, আমাদের এই মোড়টার কাছে—সে কী আর বলব? ভারি মজা।

ধীরাজ। আচ্ছা, পরে বোলো—আমি তবে চললুম।

ভোলা। না না, শুনে যান। সে ভারি মজা। বলো-না ভাই, গল্পটা শেষ করো-না।

তিনকড়ি। বুঝেছেন ধীরাজবাবু! মোড়ের কাছে এক বেটা গোবুর গাড়ির গাড়োয়ান—হা-হা-হা—(ভোলার প্রতি) কী নিয়ে যাচ্ছিল হে?

ভোলা। পাথুরে কয়লা।

তিনকড়ি। হাঁ, পাথুরে কয়লাই বটে। রসিকবাবু তাকে দেখে—হা হা হা হা—(সকলের হাস্য) রসিকবাবু তাকে দেখে—

নেপালের প্রতি

কী হে কী বললেন?

নেপাল। হা হা হা। সে ভারি মজার কথা।

ভোলার প্রতি

কিন্তু কথাটা কী বলো তো হে।

ভোলা। মনে পড়ছে না, কিন্তু সে ভারি মজা। বুঝেছেন ধীরাজবাবু, সে ভারি মজা।

নীলমণি। একটু একটু মনে পড়ছে, এই পাথুরে কয়লা নিয়ে কী যেন একটা—

নেপাল। আহা, বল কী হে? পাথুরে কয়লা নিয়ে আবার কী বলবেন? নিশ্চয় দেশের ভগ্নীদের লক্ষ্য করে কিছু বলেছিলেন, তা ছাড়া তিনি আর তো কিছু বলেন না।

ভোলা। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে গোবুর লেজ মলা নিয়ে যেন কী একটা বলেছিলেন।

তিনকড়ি। তা হতে পারে। কিন্তু ভারি মজা।

সকলে মিলিয়া হাস্য

রসিকরাজের প্রবেশ

রসিক। কী হে, এখানে যে এত হস্ ধাতুর আমদানি?

নীলমণি। হস্ ধাতুই বটে! হা হা হা!

তিনকড়ি। (ধীরাজের প্রতি) একবার কথাটা শুনুন। হস্ ধাতু—হা হা হা!

ভোলা। ধীরাজবাবু, শুনছেন? কী চমৎকার! হস্ ধাতু—আবার আমদানি!

নীলমণি। ধীরাজবাবু—

ধীরাজ। আমি বুঝেছি।

নেপাল। ধীরাজবাবু—

ধীরাজ। আর কষ্ট পেতে হবে না, একরকম বুঝেছি।



রসিক। ভেগ্নীদের কোনো নতুন খবর পেয়েছ?

নীলমণি প্রভৃতি। হী-হী হো-হো হা-হা!

ধীরাজ। ভেগ্নী কী?

তিনকড়ি। আর সকলে ভগ্নী বলে, রসিকবাবু বলেন ভেগ্নী। হা হা হা!

ধীরাজ। কেন, উনি কি বাংলা জানেন না?

তিনকড়ি। মজাটা বুঝছেন না? ভগ্নী তো সবাই বলে, কিন্তু ভেগ্নী!

রসিক। বুঝেছ ভোলা, আজ এক কাণ্ডই হয়ে গেছে। ভেগ্নীসভার সভ্যি অ সভাপেত্নী—

তিনকড়ি প্রভৃতি। হো-হো হী-হী হা-হা!

দামোদর ও চিন্তামণির প্রবেশ

উভয়ে। কী হে, কী হে, কী হল? কী কথাটা হল?

তিনকড়ি। রসিকবাবু বলছিলেন, "ভেগ্নীসভার সভ্যি ও সভাপেত্নী"—হা-হা হো-হো!

দামোদর। এ ভারি মজা। এটা আপনাকে লিখতে হচ্ছে। আমাদের কাগজে লিখুন।

চিন্তামণি। রসিকবাবু, এটা লিখে ফেলুন।

তিনকড়ি। ধীরাজবাবু, বুঝেছেন?

ভোলা। পেত্নী কেন বললেন বুঝেছেন? যেমন ভেগ্নী তেমনি পেত্নী। হা হা হা!

নেপাল। ওর মজাটা বোঝেন নি ধীরাজবাবু! আসল কথাটা পত্নী। কিন্তু রসিকবাবু—

ধীরাজ। দোহাই, আমাকে আর বেশি বুঝিয়ো না।

ভোলা। কোন্ ভদ্রলোকের ঘর লক্ষ্য করে বলা হয়েছে বোঝেন নি বলে ধীরাজবাবু হাসছেন না।

ধীরাজ। বুঝতে পেরেছি বলেই হাসছি নে। আমিও যে ভদ্রলোক, আমারও স্ত্রী কন্যা ভগ্নী আছে।

রসিক। তোমরা যখন বলছ তখন অবশ্যই লিখব। কিন্তু এ-সব চণ্ডমুণ্ডবধের পালা, একেবারে সারেগামাপাধানি; তেরেকেটে মেরেকেটে ছাড়া কথা নেই। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া আর-কি। বুঝেছ?

সকলে। বুঝেছি বৈকি। হা-হা হো-হো!

তিনকড়ি। বুঝেছেন ধীরাজবাবু?

ধীরাজ। কিচ্ছু বুঝি নি।

নেপাল। ধীরাজবাবু, বুঝেছেন তো?

ধীরাজ। না বাপু, কথাগুলো কী বলে গেলেন বুঝলুম না।

তিনকড়ি। কথা নেই বুঝলেন, ওর মজাটা তো বুঝেছেন? কথা তো আমরাও বুঝি নি।

দামোদর। রসিকবাবু, এই কথাগুলোও লিখতে হবে।

রসিক। (ধীরাজের প্রতি) আপনার মুখে হাসি নেই যে! হাসলে কোনো লোকসান আছে?

ধীরাজ। রাগ করবেন না মশায়, হাসবার চেষ্টা করছি।

চিন্তামণি। আপনি বুঝি ভ্রাতাদের কেউ হবেন?

রসিক। ভ্রাতাও হতে পারেন, ভর্তাও হতে পারেন।

দামোদর প্রভৃতি। (হাততালি দিয়া) বাহবা, বাহবা, কী মজা! হো-হো হা-হা!

দামোদর। এটাও লিখবেন। ভারি মজা হবে।

নীলমণি। (ধীরাজকে ধরিয়া) মশায়, যান কোথায়?

ধীরাজ। বুকে টার্পিন তেল মালিশ করতে যাচ্ছি, রসিকবাবু বড্ড বলেছেন।

[প্রস্থান]

চিন্তামণি। লোকটা জব্দ হয়ে গেছে। পাঁচ কথা যা শোনালেন ওর বাপের বয়সে—

রসিক। পাঁচ কথা আর হতে দিলে কই? আড়াইখানার বেশি কথাই কই নি।

রসিককে ঘিরিয়া সকলের অবিশ্রাম হাস্য

দামোদর। দুখানা নয়, দশখানা নয়, আড়াইখানা—কী চমৎকার! ও কথাটাও লিখতে হবে। টুকে রাখুন, বুঝেছেন রসিকবাবু!

ফাল্গুন ১২৯৩

গুরুবাক্য

অচ্যুত অপূর্ব উমেশ কার্তিক ও খগেন্দ্র

অচ্যুত। গুরুদেব এখনো এলেন না—উপায় কী?

কার্তিক। আমি তো বিষম মুশকিলে পড়েছি। আমার নাম কার্তিক, আমার ছোটো শালার নাম কীর্তি। আমার স্ত্রী তার ভাইকে কীর্তি বলে ডাকতে পারে কি না এটা স্থির করে না দিলে স্ত্রীর সঙ্গে একত্র বাস করাই দায় হয়েছে। তার উপর আবার গয়লা বেটার নাম কীর্তিবাস; এখন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, আমার স্ত্রী যদি কীর্তিবাস গোয়ালাকে বাসুদেব বলে ডাকে তা হলে বৈধ হয় কি না। বাড়িতে কার্তিকপূজার সময় স্ত্রী কার্তিককে নাস্তিক বলে; নাম খারাপ করার দরুন ঠাকুরের কিম্বা তাঁর মার কোনো অসন্তোষ ঘটে কি না এও জিজ্ঞাস্য।

অপূর্ব। আমারও একটা ভাবনা পড়েছে। সেবার শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে জগন্নাথকে কুল দিয়ে এসেছিলুম, এখন এই গরমির দিনে কুলটুকু বাদ দিয়ে যদি তার ঝোলটুকু খাই তাতে অপরাধ হয় কি না।

অচ্যুত। আমি সেদিন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম যে, শাস্ত্রমতে ভোক্তা শ্রেষ্ঠ না ভোজ্য শ্রেষ্ঠ, অন্ন শ্রেষ্ঠ না অন্নপায়ী শ্রেষ্ঠ ? তিনি এমনি এক গভীর উত্তর দিলেন যে, তখন যদিচ আমরা সকলেই জলের মতো বুঝে গেলুম কিন্তু এখন আমাদের কারো একটা কথাও মনে পড়ছে না।

উমেশ। আমার যতদূর মনে হচ্ছে, বোধ হয় তিনি বলেছিলেন, অন্নও শ্রেষ্ঠ নয়, অন্নপায়ীও শ্রেষ্ঠ নয়, কিন্তু আর একটা কী শ্রেষ্ঠ, সেইটে যে কী মনে পড়ছে না।

অপূর্ব। না, না, তিনি বলেছিলেন অন্নও শ্রেষ্ঠ, অন্নপায়ীও শ্রেষ্ঠ—কিন্তু অন্নই বা কেন শ্রেষ্ঠ আর অন্নপায়ীই বা কেন শ্রেষ্ঠ তখন বুঝেছিলুম, এখন কোনোমতেই ভেবে পাচ্ছি নে।

খগেন্দ্র। অন্ন এবং অন্নপায়ীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, সহজ বুদ্ধিতে পূর্বে সেটা একরকম ঠাউরেছিলুম, কিন্তু গুরুদেবের কথা শুনে বুঝলুম যে পূর্বে কিছুই বুঝি নি, এবং তিনি যা বললেন তাও কিছুই বুঝলুম না।

অচ্যুত। যা হোক, সেও একটা লাভ।

বদনচন্দ্রের ছুটিয়া প্রবেশ

বদন। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) গুরু কোথায়? আমাদের শিরোমণিমশায় কোথায়? বলো-না হে, কোথায় গেলেন তিনি?

অচ্যুত প্রভৃতি। কেন? কেন?

বদন। হঠাৎ কাল রাত্রে আমার মনে একটা প্রশ্ন উদয় হল, সে অবধি আহার নিদ্রা প্রায় ছেড়েছি।

কার্তিক। তাই তো! বিষয়টা কী বলো তো।

বদন। কী জান? কাল মশারি ঝাড়তে ঝাড়তে হঠাৎ মনে একটা তর্ক এল যে, এত দেশ থাকতে জটায়ু কেন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে মারা পড়ল? জটায়ু যে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে ম'ল তার অর্থ কী, তার কারণ কী, এবং তার তাৎপর্যই বা কী? এর মধ্যে যদি কোনো রূপক থাকে তবে তাই বা কী? যদি কোনো অর্থ না থাকে তাই বা কেন?

কার্তিক। বিষয়টা শক্ত বটে। শিরোমণিমশায় আসুন।

খগেন্দ্র। (ভয়ে ভয়ে) ঠিক বলতে পারি নে, কিন্তু আমার বোধ হয় জটায়ুর মৃত্যুর একমাত্র কারণ, যুদ্ধের সময় রাবণ তাকে এমন অস্ত্র মেরেছিলেন যে সেটা সাংঘাতিক হয়ে উঠল।

বদন। আরে রামো, ও কি একটা উত্তর হল? ও তো সকলেই জানে।

কার্তিক। ও তো আমিও বলতে পারতুম।

অপূর্ব। ওরকম উত্তরে কি মন সন্তুষ্ট হয়?

বদন চিন্তান্বিত। খগেন্দ্র অপ্রতিভ

অচ্যুত। (শশব্যস্ত) ঐ-যে গুরু আসছেন।

উমেশ। ঐ-যে শিরোমণিমশায়।

বদন। (সহাস চিন্তাভঙ্গে চকিত হইয়া) অ্যাঁ, গুরুদেব আসছেন? বাঁচলুম, আমার অর্ধেক সংশয় এখনই দূর হয়ে গেল।

শিরোমণিমহাশয়ের প্রবেশ। সকলের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

শিরোমণি। স্বস্তি, স্বস্তি!

বদন। গুরুদেব, কাল মশারি ঝাড়তে ঝাড়তে মনে একটা প্রশ্ন উদয় হয়েছে।

শিরোমণি। প্রকাশ করে বলো।

বদন। বিহগরাজ জটায়ু রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে কেন নিহত হলেন? (অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বক) আমাদের খগেন্দ্রবাবু (খগেন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত) বলছিলেন, অস্ত্রাঘাতই তার কারণ।

শিরোমণি। বটে? হাঃ হাঃ হাঃ, আধুনিক নব্যতন্ত্র কালেজের ছেলের মতোই উত্তর হয়েছে। শাস্ত্রচর্চা ছেড়ে বিজ্ঞান পড়ার ফলই এই। প্রশ্ন হল, জটায়ুর মৃত্যু হল কেন; উত্তর হল, অস্ত্রাঘাতে। এ কেমন হল জান? কাশীধামে বৃষ্টি হল আর খড়দহে পঙ্গপালে ধান খেলে। হা হা হাঃ!

অপূর্ব। ঠিক তাই বটে। আজকাল এইরকমই হয়েছে—বুঝেছেন শিরোমণিমশায়?

শিরোমণি। আচ্ছা বাপু খগেন্দ্র, তুমি তো অনেকগুলো পাস দিয়েছ, তুমিই বলো তো, অস্ত্রাঘাতেই বা জটায়ুর মৃত্যু হল কেন, রক্তপিত্ত রোগেই বা না মরে কেন? রাবণের সঙ্গেই বা যুদ্ধ হয় কেন, ভস্মলোচনের সঙ্গেই বা না হল কেন? অত কথায় কাজ কী, জটায়ুই বা মরে কেন, রাবণ মলেই বা ক্ষতি কী ছিল?

বদন পূর্বাপেক্ষা চিন্তান্বিত

অচ্যুত ও অপূর্ব। (গভীর চিন্তার সহিত) তাই তো, এত দেশ থাকতে জটায়ুই বা মরে

কেন।

উমেশ। কী হে খগেন্দ্র, একটা জবাব দাও-না। তোমাদের রস্কো-সাহেব কী লেখেন?

কার্তিক। তোমাদের টিন্‌ডালই বা কী বলেন—রাবণের সঙ্গেই বা যুদ্ধ হয় কেন?

অচ্যুত। রক্তপিত্তে না মরে অস্ত্রাঘাতে মরবার জন্যেই বা তার এত মাথাব্যথা কেন? হক্‌স্‌লি-সাহেব কী মীমাংসা করেন শুনি।

খগেন্দ্র। (আধমরা হইয়া) গুরুদেব, আমি মূঢ়মতি, না বুঝে একটা কথা বলে ফেলেছি। মাপ করুন। শ্রীমুখের উত্তরের জন্যে উৎসুক হয়ে আছি।

শিরোমণি। তোমরা বলছ রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জটায়ু ম'ল কেন—এক কথায় এর উত্তর দিই কী করে?

সকলে। তা তো বটেই। তা তো বটেই।

শিরোমণি। প্রথমে দেখতে হবে, 'রাবণের'ই সঙ্গে যুদ্ধ হয় কেন; তার পরে দেখতে হবে, রাবণের সঙ্গে 'যুদ্ধ'ই বা হয় কেন; তার পরে দেখতে হবে, রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে 'জটায়ু'ই বা মরে কেন; সব-শেষে দেখতে হবে, রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জটায়ু 'মরে'ই বা কেন?

বদন হাল ছাড়িয়া চিন্তাসাগরে নিমজ্জমান

অচ্যুত। (খগেন্দ্রকে ঠেলিয়া) শুনছ খগেন্দ্রবাবু?

অপূর্ব। কী খগেনবাবু, মুখে যে কথাটি নেই?



কার্তিক। খগেন্দ্র-সাহেব, তোমার কেমিস্‌ট্রি গেল কোথায় হে?

খগেন্দ্র রক্তমুখচ্ছবি

শিরোমণি। তবে একে একে উত্তর দিই। প্রথম প্রশ্নের উত্তর : নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।

বদন। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) আঃ, বাঁচলুম। এ ছাড়া আর কোনো উত্তর হতেই পারে না।

শিরোমণি। যদি বল নিয়তিকে কে বাধা দিতে পারে এ কথার অর্থ কী, তবে সরল করে বুঝিয়ে দিই। নিয়তত্বই হচ্ছে নিয়তির গুণ এবং নিয়তের গুণই হচ্ছে নিয়তি। তা যদি হয় তবে নিয়তকালবর্তী যে নিয়তি তাকে পুনশ্চ নিয়ত নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এমন দ্বিতীয় নিয়তির সম্ভাবনা কুতঃ? কারণ কিনা, নিত্য যাহা তাহাই নিয়ত এবং তাহাই নিয়ন্তা, অতএব রাবণের সঙ্গেই যে জটায়ুর যুদ্ধ হবে এ আর বিচিত্র কী?

সকলে। এ আর বিচিত্র কী!

বদন। অহো, এ আর বিচিত্র কী!

শিরোমণি। এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্ন—

বদন। কিন্তু আর নয়, প্রথমটা আগে ভালো করে জীর্ণ করি।

অচ্যুত। কিন্তু কী চমৎকার উত্তর!

অপূর্ব। কী সরল মীমাংসা!

কার্তিক। কী পরিষ্কার ভাব!

উমেশ। কী গভীর শাস্ত্রজ্ঞান!

শিরোমণির মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া

বদন। গুরুদেব, আপনার অবর্তমানে আমাদের কী দশা হবে!

সকলের বাষ্পবিসর্জন

চৈত্র ১২৯৩

হেঁয়ালিনাট্য

বৈকুণ্ঠ, তস্য পুত্র খগেশ এবং অন্যান্য পাঁচজন

বৈকুণ্ঠ। আমার ছেলের কী বুদ্ধি! প্রায় আমারই মতো। যখন তর্ক করে মুখের কাছে দাঁড়ানো যায় না। বাবা খগেশ, অনেক লোক উপস্থিত আছেন, এইখেনে একবার তর্ক করতে আরম্ভ করো দেখি।

অন্য পাঁচজন। (মনে মনে) তা হলে পালাতে হয় বুঝি!

খগেশ। আচ্ছা, রাজি আছি। এখন কাকে ওড়াতে হবে কাকে রাখতে হবে বলে দাও।

অন্য পাঁচজন। (মনে মনে) আপনাকে আর বাবাকে রেখে বাকি সকলকে উড়িয়ে দাও।

বৈকুণ্ঠ। বাবা, যেটা হাতের কাছে পাও সেইটেই ওড়াও। ইহকাল ওড়াও, পরকাল ওড়াও।

খগেশ। তা হলে রোসো বাবা, আগে dinnerটা খেয়ে নেওয়া যাক, তার পরে খেয়ে-দেয়ে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে রয়ে-বসে চুরট টানতে টানতে চুরটের ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আরামে উড়িয়ে দেব, যারা যারা উপস্থিত থাকবে দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে।

বৈকুণ্ঠ। That's right খগেশ! আপনারা সকলেই দেখছেন আমার খগেশ কেমন sensible। ওর মাথায় কোনোরকম nonsense নেই। যেটা real এবং immediate want তার প্রতি ওর প্রথম নজর—তার পরে সেটা satisfied হলে পরে কাগজের চুরটের মতো জগতের ডগায় তর্কের দেশলাই ধরিয়ে ওটাকে quietly বসে বসে ধোঁয়া করেই ওড়াও বা ছাই করেই ফেলো তাতে আরাম বৈ কারো কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

খগেশ। হাঃ হাঃ হাঃ, বাবা has put the matter very well indeed। আমি দেখেছি বাবা যেমন clearly and with great precision একটা proposition lay down করতে পারেন, এমন there are very few men who—

বৈকুণ্ঠ। সে আর তোমার বলবার দরকার নেই। I know that। আর কিছু না, এর secret হচ্ছে clear head এবং proper training। আমাদের দেশের লোকের ঐ দুটো জিনিসেরই বিশেষ অভাব and in consequence, none of them has the least idea how to think out a subject।

খগেশ। And I must confess তুমি আমার বাবা হওয়াতে আমার ঐ এক মস্ত advantage হয়েছে, certainly I possess a clear head, আর তার জন্যে আমি তোমার কাছে really grateful আছি বাবা!

অন্য পাঁচজন। বাপ-বেটার কী বিনয়!

খগেশ। Nonsense! বিনয়!—আচ্ছা, এসো, এই বিষয়ে একটা settle করা যাক। I don't believe in বিনয়। It must be either hypocrisy or ignorance। যারা really clever they know they are clever and why should they not make it known to other people! Now, come, বিনয় কাকে বলে— let us have a definition of it।

অন্য পাঁচজন। (মাথা চাপড়াইয়া) clear head নেই খগেশবাবু, তোমার বাবার মতো বাবা আমাদের ছিল না। বিনয়ের definition আমাদের ঠাহর হচ্ছে না!

বৈকুণ্ঠ। ওহে ও যজ্ঞেশ্বর, শুনে যাও, শুনে যাও। আমার ছেলে খগেশ এ দিকে তর্ক করতে আরম্ভ করেছে— It's a treat to hear him argue।—(খগেশের পিঠ চাপড়াইয়া) Go on খগেশ!

যজ্ঞেশ্বর। আজ আমাদের ওখেনে খেতে গেলে না যে!

খগেশ। (হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া) Now, come—কেন খেতে যাব!

যজ্ঞেশ্বর। কথা ছিল যে।

খগেশ। কী কথা ছিল ভালো করে analyse করে দেখা যাক। তুমি আমাকে বললে, 'খগি, কাল আমাদের বাড়ি খেতে যাবে কি?' আমি বললুম, 'হাঁ' ভেবে দেখো it was no promise। তুমি simply একটি fact জানতে চেয়েছিলে, এবং তখন যেটা likely answer বোধ হল সেইটে তোমাকে বললুম। মনে করো if you had asked me 'খগি, কাল তুমি কি কালো মোজা পরবে' and if I happened to have answered 'হাঁ' এবং আজ যদি আমি কালো মোজা না পরতুম, what then! কিন্তু তুমি যদি বলতে—

যজ্ঞেশ্বর। বুঝেছি খগেশ, আর কাজ নেই।

খগেশ। কাজ আছে। তুমি নাকি হঠাৎ এসে একটা wrong statement করে সকলের মনে একটা vague impression create করে দিয়েছ যে আমি আমার promise রাখি নে, তারই absurdity আমি প্রমাণ করে দিতে চাই! Now, to the point—তুমি আমাকে next question জিজ্ঞাসা করলে, 'কখন আসবে?' আমি বললুম, 'তা বলতে পারি নে, আমি ঘড়ি ধরে কাজ করি নে।' তুমি একটা further question জিজ্ঞাসা করলে, আমি তার একটা indefinite উত্তর দিলুম—and the last question was, 'তুমি কী খাবে? মাংস না ডাল ভাত?' আমি বললুম, 'যা পাব তাই খাব।' There it ended। এর থেকে কী কী প্রমাণ হচ্ছে দেখা যাক—

যজ্ঞেশ্বর। রক্ষে করো বাপু, আমার বাড়িতে যে তোমার পা পড়ে নি সে আমার পরম সৌভাগ্য বলতে হবে।

অন্য পাঁচজন। পা পড়ে নি বলছেন কি, মাথা পড়ে নি বলুন—আপনার নেমন্তন্নের মধ্যে যদি ওর clear headটা হঠাৎ গিয়ে পড়ত সে তো কামানের গোলা পড়ত, আপনার বন্ধুবান্ধবেরা সশঙ্কিত হয়ে উঠত। clear head অতি ভয়ানক জিনিস! বিশেষ সভাস্থলে।

যজ্ঞেশ্বর। তা ঠিক বলেছেন।

বৈকুণ্ঠ। (পিঠ থাবড়াইয়া) তুমি বলে যাও-না খগেশ! থামলে কেন? বেশ বলছিলে।

খগেশ। যার এক-পাতা logic পড়া আছে সে কখনো deny করতে পারবে না যে—

যজ্ঞেশ্বর। তোমার যা বলবার বলো, আমরা চললুম।

বৈকুণ্ঠ। কেন কেন!

যজ্ঞেশ্বর। ভদ্রসমাজে—নিমন্ত্রণে বা বন্ধুবান্ধবের সভায়—ভদ্রলোকেরা গল্পসল্প করে, আমোদ করে, আলোচনা করে, কিন্তু পারতপক্ষে তর্ক করে না। যারা কথায় কথায় তর্ক উঁচিয়ে খোঁকিয়ে আসে, তাদের একরকম সংকীর্ণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকতে পারে বটে, কিন্তু তারা ভদ্র নয়।

বৈকুণ্ঠ। কিন্তু idea র precision—

খগেশ। perception এর clearness—

বৈকুণ্ঠ। expression এর luminous lucidity—

খগেশ। the sense of utter futility of all fog and fallacy—

যজ্ঞেশ্বর। ও-সবই থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে তার্কিকতানামক তীক্ষ্ণ ও নর্তনশীল জিহ্বাগ্রভাগ সগর্বে সকলকে প্রদর্শন করবার জন্যে সর্বদা বের করে উঁচিয়ে রেখে দিতে হবে— ভদ্রসমাজে তার কোনো আবশ্যক নেই।

খগেশ। 'ভদ্রসমাজে'র definition কী?

বৈকুণ্ঠ। and what is 'তর্ক'।

খগেশ। জিহ্বাই বা কী? where is the analogy?

বৈকুণ্ঠ। এবং 'আবশ্যক' কাকে বলে?

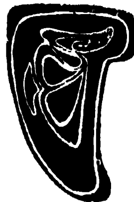
খগেশ। তোমার idea of 'সর্বদা'ই বা কিরকম।

সকলে। আর এক দণ্ড এখানে থাকা নয়।

খগেশ। দেখেছ বাবা? একটা proposition এর মধ্যে string of inaccuracies!

বৈকুণ্ঠ। want of precision and proper training!

ভারতী ও বালক
আষাঢ় ১২৯৪



ছবি | দেবাশীষ দেব

মুকুট

বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের দ্বারা অভিনীত হইবার
উদ্দেশে 'বালক' পত্রে প্রকাশিত 'মুকুট'-নামক ক্ষুদ্র
উপন্যাস হইতে নাট্যীকৃত

নাটকের পাত্রগণ

অমরমাণিক্য	॥	মহারাজ
চন্দ্রমাণিক্য	॥	যুবরাজ
ইন্দ্রকুমার	॥	মধ্যম রাজকুমার
রাজধর	॥	কনিষ্ঠ রাজকুমার
ধুরন্ধর	॥	ঐ মামাতো ভাই
ইশা খাঁ	॥	সেনাপতি
আরাকান-রাজ		
প্রতাপ		
নিশানধারী ভাট দূত সৈনিক প্রভৃতি		

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ত্রিপুরার সেনাপতি ইশা খাঁর কক্ষ
ত্রিপুরার কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধর ও ইশা খাঁ
ইশা খাঁ অস্ত্র পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত

রাজধর। দেখো সেনাপতি, আমি বারবার বলছি, তুমি আমার নাম ধরে ডেকো না।

ইশা খাঁ। তবে কী ধরে ডাকব? চুল ধরে, না কান ধরে?

রাজধর। আমি বলে রাখছি, আমার সম্মান যদি তুমি না রাখ তোমার সম্মানও আমি রাখব না।

ইশা খাঁ। আমার সম্মান যদি তোমার হাতে থাকবার ভার থাকত তবে কানাকড়ার দরে তাকে হাটে বিকিয়ে আসতুম। নিজের সম্মান আমি নিজেই রাখতে পারব।

রাজধর। তাই যদি রাখতে চাও তা হলে ভবিষ্যতে আমার নাম ধরে ডেকো না।

ইশা খাঁ। বটে!

রাজধর। হাঁ।

ইশা খাঁ। হা হা হা হা! মহারাজাধিরাজকে কী বলে ডাকতে হবে? হুজুর, জনাব, জাঁহাপনা!

রাজধর। আমি তোমার ছাত্র বটে, কিন্তু আমি রাজকুমার সে কথা তুমি ভুলে যাও।

ইশা খাঁ। সহজে ভুলি নি, তুমি যে রাজকুমার সে কথা মনে রাখা শক্ত করে তুলেছ।

রাজধর। তুমি যে আমার ওস্তাদ, সে কথাও মনে রাখতে দিলে না দেখছি।

ইশা খাঁ। বস্। চুপ।

দ্বিতীয় রাজকুমার ইন্দ্রকুমারের প্রবেশ

ইন্দ্রকুমার। খাঁ-সাহেব, ব্যাপারখানা কী?

ইশা খাঁ। শোনো তো বাবা। বড়ো তামাশার কথা। তোমাদের মধ্যে এই-যে ব্যক্তিটি সকলের কনিষ্ঠ, এঁকে জাঁহাপনা শাহেনশা বলে না ডাকলে ওঁর আর সম্মান থাকে না— ওঁর সম্মানের এত টানাটানি!

ইন্দ্রকুমার। বল কী! সত্যি নাকি! হা হা হা হা!

রাজধর। চুপ করো দাদা।

ইন্দ্রকুমার। তোমাকে কী বলে ডাকতে হবে? জাঁহাপনা! হা হা হা হা! শাহেনশা!

রাজধর। দাদা, চুপ করো বলছি।

ইন্দ্রকুমার। জনাব, চুপ করে থাকা বড়ো শক্ত— হাসিতে যে পেট ফেটে যায় হুজুর।

রাজধর। তুমি অত্যন্ত নির্বোধ।

ইন্দ্রকুমার। ঠাণ্ডা হও ভাই, ঠাণ্ডা হও। তোমার বুদ্ধি তোমারই থাক্, তার প্রতি আমার কোনো লোভ নেই।

ইশা খাঁ। ওঁর বুদ্ধিটা সম্প্রতি বড়োই বেড়ে উঠেছে।

ইন্দ্রকুমার। নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না— মই লাগাতে হবে।

অনুচরসহ যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য ও মহারাজ
অমরমাণিক্যের প্রবেশ

রাজধর। মহারাজের কাছে আমার নালিশ আছে।

মহারাজ। কী হয়েছে?

রাজধর। ইশা খাঁ পুনঃপুন নিষেধ সত্ত্বেও আমার অসম্মান করেন। এর বিচার করতে হবে।

ইশা খাঁ। অসম্মান কেউ করে না— অসম্মান তুমি করাও। আরো তো রাজকুমার আছেন, তাঁরাও মনে রাখেন আমি তাঁদের গুরু, আমিও মনে রাখি তাঁরা আমার ছাত্র— সম্মান-অসম্মানের কোনো কথাই ওঠে না।

মহারাজ। সেনাপতি সাহেব, কুমারদের এখন বয়স হয়েছে, এখন ওঁদের মান রক্ষা করে চলতে হবে বৈকি।

ইশা খাঁ। মহারাজ যখন আমার কাছে যুদ্ধ শিক্ষা করেছেন তখন মহারাজকে যে-রকম সম্মান করেছি রাজকুমারদের তা অপেক্ষা কম করি নে।

রাজধর। অন্য কুমারদের কথা বলতে চাই নে, কিন্তু—

ইশা খাঁ। চুপ করো বৎস। আমি তোমার পিতার সঙ্গে কথা কচ্ছি। মহারাজ, মাপ করবেন, রাজবংশের এই কনিষ্ঠ পুত্রটি বড়ো হলে মুন্শির মতো কলম চালাতে পারবে, কিন্তু তলোয়ার এর হাতে শোভা পাবে না। (যুবরাজ এবং ইন্দ্রকুমারকে দেখাইয়া) চেয়ে দেখুন মহারাজ, এঁরাই তো রাজপুত্র, রাজগৃহ আলো করে আছেন।

মহারাজ। রাজধর, খাঁ-সাহেব কী বলছেন! তুমি অস্ত্রশিক্ষায় ওঁকে সন্তুষ্ট করতে পারো নি?

রাজধর। সে আমার ভাগ্যের দোষ, অস্ত্রশিক্ষার দোষ নয়। মহারাজ নিজে আমাদের ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করুন, এই আমার প্রার্থনা।

মহারাজ। আচ্ছা, উত্তম। কাল আমাদের অবসর আছে, কালই পরীক্ষা হবে। তোমাদের মধ্যে যে জিতবে তাকে আমার এই হীরে-বাঁধানো তলোয়ার পুরস্কার দেব।

[প্রস্থান

ইশা খাঁ। শাবাশ রাজধর, শাবাশ! আজ তুমি ক্ষত্রিয়-সন্তানের মতো কথা বলেছ। অস্ত্রপরীক্ষায়

যদি তুমি হারো, তাতেও তোমার গৌরব নষ্ট হবে না— হার-জিত তো আল্লার ইচ্ছা, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের মনে স্পর্ধা থাকা চাই।

রাজধর। থাক্ সেনাপতি, তোমার বাহ্‌বা অন্য রাজকুমারদের জন্য জমা থাক্; এতদিন তা না পেয়েও যদি চলে গিয়ে থাকে তবে আজও আমার কাজ নেই।

যুবরাজ। রাগ কোরো না ভাই রাজধর। সেনাপতি-সাহেবের সরল ভর্ৎসনা ওঁর সাদা দাড়ির মতো সমস্তই কেবল ওঁর মুখে। কোনো একটি গুণ দেখলেই তৎক্ষণাৎ উনি সব ভুলে যান। অস্ত্র-পরীক্ষায় যদি তোমার জিত হয় তা হলে দেখবে, খাঁ-সাহেব তোমাকে যেমন মনের সঙ্গে পুরস্কৃত করবেন এমন আর কেউ নয়।

রাজধর। দাদা, আজ পূর্ণিমা আছে, আজ রাত্রে যখন গোমতী নদীতে বাঘে জল খেতে আসবে তখন শিকার করতে গেলে হয় না?

যুবরাজ। বেশ কথা। তোমার যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে তো যাওয়া যাবে।

ইন্দ্রকুমার। কী আশ্চর্য! রাজধরের যে শিকারে প্রবৃত্তি হল! এমন তো কখনো দেখা যায় নি।

ইশা খাঁ। ওঁর আবার শিকারে প্রবৃত্তি নেই! উনি সকলের চেয়ে বড়ো জীব শিকার করে বেড়ান। রাজসভায় দুই-পা-ওয়ালা এমন একটি জীব নেই যিনি ওঁর কোনো-না-কোনো ফাঁদে আটকা না পড়েছেন।

যুবরাজ। সেনাপতি-সাহেব, তোমার তলোয়ারও যেমন তোমার জিহ্বাও তেমনি, দুই-ই খরধার— যার উপর গিয়ে পড়ে তার একেবারে মর্মচ্ছেদ না করে ফেরে না।

রাজধর। দাদা, তুমি আমার জন্যে ভেবো না। খাঁ-সাহেব জিহ্বায় যতই শাণ দিন-না কেন, আমার মর্মে আঁচড় কাটতে পারবেন না।

ইশা খাঁ। তোমার মর্ম পায় কে বাবা! বড়ো শক্ত।

ইন্দ্রকুমার। যেমন, হঠাৎ আজ রাত্রে তোমার শিকারে যাবার শখ হল, এর মর্ম ভালো বোঝা যাচ্ছে না।

যুবরাজ। আহা ইন্দ্রকুমার, প্রত্যেক কথাতেই রাজধরকে আঘাত করাটা তোমার অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে।

রাজধর। সে আঘাতে বেদনা না পাওয়াও আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

ইন্দ্রকুমার। দাদা, আজ রাত্রে শিকারে যাওয়াই তোমার মত নাকি?

যুবরাজ। তোমার সঙ্গে, ভাই, শিকার করতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। নিতান্ত নিরামিষ শিকার করতে হয়। তুমি বনে গিয়ে বড়ো বড়ো জন্তু মেরে আন, আর আমরা কেবল লাউ কুমড়ো কচু কাঁঠাল শিকার করেই মরি।

ইশা খাঁ। (ইন্দ্রকুমারের পিঠ চাপড়াইয়া) যুবরাজ ঠিক বলেছেন পুত্র। তোমার তীর সকলের আগে ছোটে এবং নির্ঘাত গিয়ে লাগে—তোমার সঙ্গে পেরে উঠবে কে!

ইন্দ্রকুমার। না দাদা, ঠাট্টা নয়। তুমি না গেলে কে শিকার করতে যাবে!

যুবরাজ। আচ্ছা চলো। আজ রাজধরের ইচ্ছা হয়েছে, ওঁকে নিরাশ করব না।

ইন্দ্রকুমার। কেন দাদা, আমার ইচ্ছা হয়েছে বলে কি যেতে নেই?

যুবরাজ। সে কী কথা ভাই, তোমার সঙ্গে তো রোজই যাচ্ছি

ইন্দ্রকুমার। তাই বুঝি পুরোনো হয়ে গেছে?

যুবরাজ। আমার কথা অমন উল্টো বুঝলে বড়ো ব্যথা লাগে।

ইন্দ্রকুমার। না দাদা, ঠাট্টা করছিলুম—চলো প্রস্তুত হই গে।

ইশা খাঁ। ইন্দ্রকুমার বুকে দশটা বাণ সইতে পারে, কিন্তু দাদার সামান্য অনাদরটুকু সইতে পারে না।

[অনুচরগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান

অনুচরগণ

প্রথম। কথাটা তো ভালো ঠেকছে না রে। আমাদের ছোটো কুমারের ধনুর্বিদ্যার দৌড় তো সকলেরই জানা আছে— ইনি মধ্যম কুমারের সঙ্গে অস্ত্র-পরীক্ষায় এগোতে চান এর মানে কী?

দ্বিতীয়। কেউ-বা তীর দিয়ে লক্ষ্য ভেদ করে, কেউ-বা বুদ্ধি দিয়ে।

প্রথম। সেই তো ভয়ের কথা। অস্ত্রপরীক্ষায় অস্ত্র না চালিয়ে যদি বুদ্ধি চালাও, সেটা যে

তৃতীয়। দেখো বংশী, অস্ত্রই চলুক আর বুদ্ধিই চলুক, মাঝের থেকে তোমার ঐ জিভটিকে চালিয়ো না, আমার এই পরামর্শ। যদি টিকে থাকতে চাও তো চুপ করে থাকো।

দ্বিতীয়। বনমালী ঠিক কথাই বলেছে। ঐ ছোটো কুমারের কথা উঠলেই তুমি যা মুখে আসে তাই বলে ফেল। রাজার ছেলে কে ভালো কে মন্দ সে বিচারের ভার আমাদের উপর নেই। তবে কিনা, আমাদের যুবরাজ বেঁচে থাকুন আর আমাদের মধ্যম কুমার ভাই লক্ষ্মণের মতো সর্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাঁকে রক্ষা করুন, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করো। ছোটো কুমারের কথা মুখে না আনাই ভালো।

প্রথম। ইচ্ছে করে তো আনি নে। আমাদের মধ্যম কুমার সরল মানুষ—মনে তাঁর ভয়ডরও নেই, পাকচক্রও নেই— সর্বদাই ভয় হয়, ঐ যার নামটা করছি নে তিনি কখন তাঁকে কী ফেসাদে ফেলেন।

দ্বিতীয়। চল্ চল্, ঐ আসছেন।

প্রথম। ঐ-যে সঙ্গে ওঁর মামাতো ভাই ধুরন্ধরটিও আছেন, শনির সঙ্গে মঙ্গল এসে জুটেছেন।

[প্রস্থান

রাজধর ও ধুরন্ধর

রাজধর। অসহ্য হয়েছে।

ধুরন্ধর। কিন্তু সহ্য করতেও তো কসুর নেই। ইন্দ্রকুমারের সঙ্গে তো প্রায় জন্মাবধিই এইরকম চলছে, কিন্তু অসহ্য হয়েছে এমন তো লক্ষণ দেখি নে।

রাজধর। লক্ষণ দেখিয়ে লাভ হবে কী? যখন দেখাব একেবারে কাজে দেখাব। একটা সুযোগ এসেছে। এইবার অস্ত্রপরীক্ষায় আমি লক্ষ্য ভেদ করব।

ধুরন্ধর। ইন্দ্রকুমারের বক্ষে নাকি?

রাজধর। বক্ষে নয়, তাঁর হৃদয়ে। এবারকার পরীক্ষায় আমি জিতব, ওঁর অহংকারটাকে বিঁধে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করব।

ধুরন্ধর। অস্ত্রপরীক্ষায় ইন্দ্রকুমারকে জিতবে, এইটেকেই সুযোগ বলছ?

রাজধর। সুযোগ কি তীরের মুখে থাকে? সুযোগ বুদ্ধির ডগায়। তোমাকে কিন্তু একটি কাজ করতে হবে।

ধুরন্ধর। কাজ তো তোমার বরাবরই করে আসছি, ফল তো কিছু পাই নে।

রাজধর। ফল সবুরে পাওয়া যায়। কোনোরকম ফন্দিতে ইন্দ্রকুমার-দাদার অস্ত্রশালায় ঢুকে তাঁর তূণের প্রথম খোপটি থেকে তাঁর নাম-লেখা তীরটি তুলে নিয়ে আমার নাম-লেখা তীর বসিয়ে আসতে হবে। তার সঙ্গে আমার তীর বদল করতে হবে, ভাগ্যও বদল হবে।

ধুরন্ধর। সবই যেন বুঝলুম, কিন্তু আমার প্রাণটি? সেটি গেলে তো কারো সঙ্গে বদল চলবে না।

রাজধর। তোমার কোনো ভয় নেই, আমি আছি।

ধুরন্ধর। তুমি তো বরাবরই আছ, কিন্তু ভয়ও আছে। সেই যখন ইন্দ্রকুমারের রুপোর পাত দেওয়া ধনুকটার উপরে তুমি লোভ করলে আমিই তো সেটি সংগ্রহ করে তোমার ঘরে এনে লুকিয়ে রেখেছিলুম— শেষকালে যখন ধরা পড়লে, ইন্দ্রকুমার ঘৃণা করে সে ধনুকটা তোমাকে দান করলেন, কিন্তু আমার যে অপমানটা করলেন সে আমার জীবন গেলেও যাবে না। তখন তো ভাই, তুমি ছিলে, রক্ষা যত করেছিলে সে আমার মনে আছে।

রাজধর। এবার তোমার সময় এসেছে, সেই অপমানের শোধ দেবার জোগাড় করো।

ধুরন্ধর। সময় কখন কার আসে সেটা যে পরিষ্কার বোঝা যায় না। দুর্বল লোকের পক্ষে অপমান পরিপাক করবার শক্তিটাই ভালো; শোধ তোলবার শখটা তার পক্ষে নিরাপদ নয়। ঐ-যে ওঁরা সব আসছেন। আমি পালাই। তোমার সঙ্গে আমাকে একত্রে দেখলেই ইন্দ্রকুমার যে কথাগুলি বলবেন তাতে মধুবর্ষণ করবে না—আর ইশা খাঁও যে তোমার চেয়ে আমার প্রতি বেশি ভালোবাসা প্রকাশ করবেন এমন ভরসা আমার নেই।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালার দ্বারে

ইন্দ্রকুমার। কী হে প্রতাপ, ব্যাপারখানা কী! আমাকে হঠাৎ অস্ত্রশালার দ্বারে যে ডাক পড়ল?

প্রতাপ। মধ্যম বউরানীমা আপনাকে খবর দিতে বললেন যে, আপনার অস্ত্রশালার মধ্যে একটি

জ্যান্ত অস্ত্র ঢুকেছেন, তিনি বায়ু অস্ত্র, না নাগপাশ, না কী, সেটা সন্ধান নেওয়া উচিত।

ইন্দ্রকুমার। বল কী প্রতাপ, কলিযুগেও এমন ব্যাপার ঘটে নাকি?

প্রতাপ। আজ্ঞে কুমার, কলিযুগেই ঘটে, সত্যযুগে নয়। দরজাটা খুললেই সমস্ত বুঝতে পারবেন।

ইন্দ্রকুমার। তাই তো বটে, পায়ের শব্দ শুনি যে! (দ্বার খুলিতেই রাজধরের নিষ্ক্রমণ) এ কী! রাজধর যে! হা হা হা হা, তোমাকে অস্ত্র বলে কেউ ভুল করেছিল নাকি! হা হা হা হা!

রাজধর। মেজবউরানী তামাশা করে আমাকে এখানে বন্ধ করে রেখেছিলেন।

ইন্দ্রকুমার। এ ঘরটা তো সহজ তামাশার ঘর না—এখানকার তামাশা যে ভয়ংকর ধারালো তামাশা—এখানে তোমার আগমন হল যে?

রাজধর। আজ রাত্রে শিকারে যাব বলে অস্ত্র খুঁজতে গিয়ে দেখলুম, আমার অস্ত্রগুলোতে সব মরচে পড়ে রয়েছে। কালকের অস্ত্রপরীক্ষার জন্যে সেগুলোকে সমস্ত সাফ করতে দিয়ে এসেছি। তাই বউরানীর কাছে এসেছিলুম তোমার কিছু অস্ত্র ধার নেবার জন্যে।

ইন্দ্রকুমার। তাই তিনি বুঝি সমস্ত অস্ত্রশালাসুদ্ধই তোমাকে ধার দিয়ে বসে আছেন! হা হা হা হা! তা বেরিয়ে এলে কেন? যাও, ঢুকে পড়ো। ধারের মেয়াদ ফুরিয়েছে নাকি? হা হা হা হা!

রাজধর। হাসো, হাসো। এ তামাশায় আমিও হাসব। কিন্তু এখন নয়। চললুম দাদা, আজ আর শিকারে যাচ্ছি নে। [প্রস্থান

প্রতাপ। ছোটো কুমারকে নিয়ে আপনাদের এ-সমস্ত ঠাট্টা আমার ভালো বোধ হয় না।

ইন্দ্রকুমার। ঠাট্টা নিয়ে ভয় কিসের? উনিও ঠাট্টা করুন-না।

প্রতাপ। ওঁর ঠাট্টা বড়ো সহজ হবে না।

তৃতীয় দৃশ্য

পরীক্ষাভূমি

রাজা, রাজকুমারগণ, ইশা খাঁ, নিশানধারী ও ভাট

ইন্দ্রকুমার। দাদা, আজ তোমাকে জিততেই হবে, নইলে চলবে না।

যুবরাজ। চলবে না তো কী? আমার তীরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও জগৎসংসার যেমন চলছিল ঠিক তেমনিই চলবে। আর, যদিবা নাই চলত তবু আমার জেতবার কোনো সম্ভাবনা দেখছি নে।

ইন্দ্রকুমার। দাদা, তুমি যদি হারো তবে আমি ইচ্ছাপূর্বক লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।

যুবরাজ। না ভাই, ছেলেমানুষি কোরো না। ওস্তাদের নাম রাখতে হবে।

ইশা খাঁ। যুবরাজ, সময় হয়েছে—ধনুক গ্রহণ করো। মনোযোগ কোরো। দেখো, হাত ঠিক থাকে যেন।

যুবরাজের তীর নিক্ষেপ

ইশা খাঁ। যাঃ, ফসকে গেল।

যুবরাজ। মনোযোগ করেছিলুম খাঁ-সাহেব, তীরযোগ করতেই পারলুম না।

ইন্দ্রকুমার। কখনো না। মন দিলে তুমি নিশ্চয়ই পারতে। দাদা, তুমি কেবল উদাসীন হয়ে সব জিনিস ঠেলে ফেলে দাও, এতে আমার ভারি কষ্ট হয়।

ইশা খাঁ। তোমার দাদার বুদ্ধি তীরের মুখে কেন খেলে না তা জান? বুদ্ধিটা তেমন সূক্ষ্ম নয়।

ইন্দ্রকুমার। সেনাপতি-সাহেব, তুমি অন্যায় বলছ।

ইশা খাঁ। (রাজধরের প্রতি) কুমার, এবার তুমি লক্ষ্য ভেদ করো, মহারাজ দেখুন।

রাজধর। আগে দাদার হোক।

ইশা খাঁ। এখন উত্তর করবার সময় নয়, আমার আদেশ পালন করো।

রাজধরের তীর-নিক্ষেপ

ইশা খাঁ। যাক্, তোমার তীরও তোমার দাদার তীরেরই অনুসরণ করেছে—লক্ষ্যের দিকে লক্ষও করে নি।

যুবরাজ। ভাই, তোমার বাণ অনেকটা নিকট দিয়েই গেছে, আর একটু হলেই লক্ষ্য বিদ্ধ করতে পারত।

রাজধর। লক্ষ্য বিদ্ধ তো হয়েছে। দূর থেকে তোমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ না। ঐ-যে বিদ্ধ হয়েছে।

যুবরাজ। না রাজধর, তোমার দৃষ্টির ভ্রম হয়েছে—লক্ষ্য বিদ্ধ হয় নি।

রাজধর। আমার ধনুর্বিদ্যার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস নেই বলেই তোমরা দেখেও দেখতে পাচ্ছ না। আচ্ছা, কাছে গেলেই প্রমাণ হবে।

ইন্দ্রকুমারের ধনুক গ্রহণ

যুবরাজ। (ইন্দ্রকুমারের প্রতি) ভাই, আমি অক্ষম, সেজন্যে আমার উপর তোমার রাগ করা উচিত না। তুমি যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হও তা হলে তোমার ভ্রষ্টলক্ষ্য তীর আমার হৃদয় বিদীর্ণ করবে, এ তুমি নিশ্চয় জেনো।

ইন্দ্রকুমারের তীর-নিক্ষেপ

নেপথ্যে জনতা। জয়, কুমার ইন্দ্রকুমারের জয়!

বাদ্য বাজিয়া উঠিল। যুবরাজ ইন্দ্রকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন

ইশা খাঁ। পুত্র, আল্লার কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে থাকো। মহারাজ, মধ্যমকুমার পুরস্কারের পাত্র। যেরূপ প্রতিশ্রুত আছেন তা পালন করুন।

রাজধর। না মহারাজ, পুরস্কার আমারই প্রাপ্য। আমারই তীর লক্ষ্যভেদ করেছে।

মহারাজ। কখনোই না।

রাজধর। সেনাপতি-সাহেব, পরীক্ষা করে আসুন কার তীর লক্ষ্যে বিঁধে আছে।

ইশা খাঁ। আচ্ছা, আমি দেখে আসি। [প্রস্থান

তীর হাতে লইয়া ইশা খাঁর পুনঃপ্রবেশ

ইশা খাঁ। (ইন্দ্রকুমারের প্রতি) বাবা, আমি বুড়োমানুষ চোখে তো ভুল দেখছি নে? এই তীরের ফলায় যেন রাজধরের নাম দেখা যাচ্ছে।

ইন্দ্রকুমার। হাঁ, রাজধরেরই নাম।

মহারাজ। দেখি। তাই তো! একসঙ্গে আমাদের সকলেরই ভুল হল!

রাজধর। আজ নয় মহারাজ, আমার প্রতি বরাবরই ভুল হয়ে আসছে।

ইশা খাঁ। কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

ইন্দ্রকুমার। আমি বুঝেছি।

রাজধর। মহারাজ, আজ বিচার করুন।

ইন্দ্রকুমার। (জনান্তিকে) বিচার! তুমি বিচার চাও! তা হলে যে মুখে চুনকালি পড়বে; বংশের লজ্জা প্রকাশ করব না—অন্তর্যামী তোমার বিচার করবেন।

ইশা খাঁ। কী হয়েছে বাবা? এর মধ্যে একটা রহস্য আছে। শিলা কখনো জলে ভাসে না, বানরে কখনো সংগীত গায় না। বাবা ইন্দ্রকুমার, ঠিক কথা বলো তো, কী হয়েছে। তূণ বদল হয় নি তো?

রাজধর। কখনোই না। পরীক্ষা করে দেখো।

ইশা খাঁ। তাই তো দেখছি—তূণ তো ঠিকই আছে। আচ্ছা, বাবা ইন্দ্রকুমার, সত্য করে বলো, এর মধ্যে তোমার অস্ত্রশালায় কেউ কি প্রবেশ করেছিল?

ইন্দ্রকুমার। সে কথার প্রয়োজন নেই খাঁ-সাহেব।

ইশা খাঁ। ঠিক করে বলো বাবা, তুমি নিশ্চয় জান, কেউ তোমার অস্ত্রশালায় গিয়ে তোমার সঙ্গে তীর বদল করেছে।

ইন্দ্রকুমার। চুপ করো খাঁ-সাহেব। ও কথা থাক্।

ইশা খাঁ। তা হলে তুমি হার মানছ?

ইন্দ্রকুমার। হাঁ, আমি হার মানছি।

ইশা খাঁ। শাবাশ বাবা, শাবাশ! তুমি রাজার ছেলে বটে। মহারাজ, কোথাও একটা কিছু অন্যায় হয়ে গেছে, সে কথাটা প্রকাশ হচ্ছে না। আর-একবার পরীক্ষা না হলে ঠিকমত মীমাংসা হতে পারবে না।

রাজধর। খাঁ-সাহেব, অন্যায় আর কিছু নয়, আমার জেতাই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু, তাই বলে আবার পরীক্ষার অপমান আমি স্বীকার করতে পারব না। আমার জিত হওয়া যদি অন্যায় হয়ে থাকে, সে অন্যায়ের সহজ প্রতিকার আছে। আমি পুরস্কার চাই নে, মধ্যমকুমারকেই পুরস্কার দেওয়া হোক।

মহারাজ। সে কথা আমি বলতে পারি নে—তীরে যখন তোমার নাম লেখা আছে তখন তোমাকে পুরস্কার দিতেই আমি বাধ্য। এই তুমি নাও।

[তলোয়ার-প্রদান

রাজধর। পুরস্কার আমি শিরোধার্য করে নিচ্ছি, কিন্তু আমার এই সৌভাগ্যে কারো মন যখন প্রসন্ন হচ্ছে না তখন এই তলোয়ার আমি দাদা ইন্দ্রকুমারকেই দিলুম।

[ইন্দ্রকুমারের দিকে তলোয়ার অগ্রসর-করণ

ইন্দ্রকুমার। (তলোয়ার মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া) ধিক্! তোমার হাত থেকে এ পুরস্কারের অপমান গ্রহণ করবে কে?

ইশা খাঁ। (ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া) কী? ইন্দ্রকুমার, মহারাজের দত্ত তলোয়ার তুমি মাটিতে ফেলে দিতে সাহস কর! তোমার এই অপরাধের সমুচিত শাস্তি হওয়া চাই।

ইন্দ্রকুমার। (হাত ছাড়াইয়া লইয়া) বৃদ্ধ, আমাকে স্পর্শ কোরো না।

ইশা খাঁ। পুত্র, এ কী পুত্র। তুমি আজ আত্মবিস্মৃত হয়েছ!

ইন্দ্রকুমার। সেনাপতি-সাহেব, আমাকে ক্ষমা করো। আমি যথার্থই আত্মবিস্মৃত হয়েছি। আমাকে শাস্তি দাও।

যুবরাজ। ক্ষান্ত হও ভাই, ঘরে ফিরে চলো।

ইন্দ্রকুমার। (মহারাজের পদধূলি লইয়া) পিতা, অপরাধ মার্জনা করুন। আজ সকল রকমেই আমার হার হয়েছে।

ইশা খাঁ। মহারাজ, আমার একটি নিবেদন আছে। খেলার পরীক্ষা তো চুকেছে, এবার কাজের পরীক্ষা হোক। দেখা যাবে, তাতে আপনার কোন্ পুত্র পুরস্কার আনতে পারে।

মহারাজ। কোন্ কাজের কথা বলছ সেনাপতি?

ইশা খাঁ। আরাকান-রাজের সঙ্গে মহারাজের যুদ্ধের মতলব আছে। সৈন্যও তো প্রস্তুত হয়েছে। এইবার কুমারদের সেই যুদ্ধে পাঠানো হোক।

মহারাজ। ভালো কথাই বলেছ, সেনাপতি। খবর পেয়েছি, আরাকানের রাজা চট্টগ্রামের সীমানার কাছে এসেছেন। বারবার শিক্ষা দিয়েছি কিন্তু মূর্খের শিক্ষার শেষ তো কিছুতেই হয় না, যমরাজের পাঠশালায় না পাঠালে গতি নেই। কী বল বৎসগণ? আমাদের সেই চিরশত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে যাত্রা করে ক্ষাত্রচর্যে দীক্ষা গ্রহণ করতে রাজি আছ কি?

ইন্দ্রকুমার। আছি। দাদাও যাবেন।

রাজধর। আমিও যাব না মনে করছ নাকি?

মহারাজ। তবে ইশা খাঁ, তুমি সৈন্যাধ্যক্ষ হয়ে এঁদের সকলকে শত্রুবিজয়ে নিয়ে যাও। ত্রিপুরেশ্বরী তোমাদের সহায় হোন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজধরের শিবির

রাজধর ও ধুরন্ধর

ধুরন্ধর। তুমি পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে তফাতে থাকবে নাকি?

রাজধর। হাঁ—ইশা খাঁর কাছে আমি এই প্রস্তাব পাঠিয়েছিলুম।

ধুরন্ধর। সে তো আমি জানি; আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলুম। তাই নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়ে গেল।

রাজধর। কিরকম?

ধুরন্ধর। প্রথমেই তো ইন্দ্রকুমার অট্টহাস্য করে উঠলেন। তিনি বললেন, রাজধরের যুদ্ধ-প্রণালীটাই ঐরকম—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুদূরে থেকেই তিনি যুদ্ধ করতে ভালোবাসেন।

রাজধর। সে কথা ঠিক। ক্ষেত্রে থেকে যুদ্ধ করে মজুররা—দূরে থেকে যে যুদ্ধ করতে পারে সেই যোদ্ধা। ইশা খাঁ কী বললেন?

ধুরন্ধর। তোমার উপর তাঁর বিশ্বাস কিরকম সে তো তুমি জানই—তুমি যদি পায়ে ধরতে যাও তা হলেও তিনি সন্দেহ করেন নিশ্চয় জুতোজোড়াটা তোমার সরাবার মতলব আছে। তাই ইশা খাঁ বললেন, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজধর তফাতে থাকতে চান সেটা তাঁর পক্ষে আশ্চর্য নয়, কিন্তু পাঁচ হাজার সৈন্য সঙ্গে রাখতে চান সেইটে আমার ভালো ঠেকছে না।

রাজধর। যুবরাজ কিছু বললেন না?

ধুরন্ধর। যুবরাজ কাউকে যে সন্দেহ করবেন সে পরিমাণ বুদ্ধি ভগবান তাঁকে দেন নি—এমনকি, তুমি যে তুমি, তোমার উপরেও তাঁর সন্দেহ হয় না।

রাজধর। দেখো ধুরন্ধর, দাদার কথা তুমি অমন করে বোলো না।

ধুরন্ধর। ওঃ, ঐ জায়গাটা তোমার একটু নরম আছে, সেটা মাঝে মাঝে ভুলে যাই। যা হোক, তিনি বললেন, না না, রাজধরের প্রতি তোমরা অন্যায় অবিচার করছ, তাঁর প্রস্তাবটা তো আমার ভালোই ঠেকছে। যুদ্ধে যদি সংকট উপস্থিত হয় তা হলে তিনি তাঁর সৈন্য নিয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। যুবরাজের অনুরোধেই তো ইশা খাঁ তোমার প্রস্তাবে রাজি হলেন, নইলে তাঁর বড়ো ইচ্ছে ছিল না। যাই হোক—কিন্তু আমি তোমার আলাদা থাকবার মতলব ভালো বুঝতে পারছি না।

রাজধর। ওঁদের সঙ্গে একত্রে মিলে যুদ্ধ করে আমার লাভ কী—জিত হলে সে জিতকে কেউ আমার জিত বলবে না তো।

ধুরন্ধর। তবু ভুলেও কেউ তোমার নাম করতে পারে। কিন্তু তফাতে বসে থাকলে যুদ্ধে জয় হলেও তোমার অপযশ, হারলে তো কথাই নেই।

রাজধর। আমার এই পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়েই আমি যুদ্ধে জিতব এবং আমি একলাই জিতব।

দূতের প্রবেশ

রাজধর। কী রে, যুদ্ধের খবর কী?

দূত। আজ্ঞে, লড়াই তো সমস্তদিন ধরেই চলছে, কিন্তু এ পর্যন্ত এঁরা শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করতে পারেন নি। সূর্য অস্ত যাবার আর তো বেশি দেরি নেই— অন্ধকার হয়ে এলে বোধ হয় যুদ্ধ আজকের মতো বন্ধ রাখতে হবে।

দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ

রাজধর। কে তুমি?

দ্বিতীয় দূত। আজ্ঞে আমি ব্যোমকেশ। যুবরাজ আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন—সেও প্রায় দুই প্রহর হয়ে গেল।—আপনার যেখানে সৈন্য নিয়ে থাকবার কথা ছিল সেখানে আপনার কোনো চিহ্ন না পেয়ে বহু সন্ধানে এখানে এসেছি।

রাজধর। যুবরাজের আদেশ কী?

দূত। শত্রুসৈন্যের সংখ্যা আমরা যে-রকম অনুমান করেছিলুম তার চেয়ে অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে—যুদ্ধ খুব কঠিন হয়ে এসেছে। কুমার ইন্দ্রকুমার তাঁর অশ্বারোহীদল নিয়ে শত্রুসৈন্যের উত্তর দিক আক্রমণ করেছিলেন, আর কিছুক্ষণ সময় পেলেই তিনি সে দিক থেকে শত্রুসৈন্যকে একেবারে নদীর কিনারা পর্যন্ত হঠিয়ে আনতে পারতেন।

রাজধর। সত্যি নাকি! সময় পেলে কী করতে পারতেন সে কথা কল্পনা করে বিশেষ লাভ দেখি নে—কিন্তু সময় পান নি বলেই বোধ হচ্ছে।

দূত। শত্রুসৈন্যকে যখন প্রায় টলিয়ে এনেছেন এমন সময় খবর পেলেন যে, যুবরাজ সংকটে পড়েছেন, শত্রু তাঁকে ঘিরে ফেলেছে। ইশা খাঁ তখন অন্যদিকে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি খবর পেয়ে বললেন, যুবরাজকে উদ্ধার করবার জন্যে আমি এখানে আসি নি, আমাকে যুদ্ধে জিততে হবে; আমি এখান থেকে নড়তে গেলেই শত্রুরা সুবিধা পাবে।

রাজধর। দাদা কি তবে—

দূত। না, তাঁর কোনো বিপদ এখনো ঘটে নি। ইন্দ্রকুমার সৈন্য নিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু এই গোলমালে যুদ্ধে আমাদের অসুবিধা ঘটল। আপনাকে সন্ধান করবার জন্যে নানা দিকে দূত গিয়েছে—আপনার সাহায্য না হলে বিপদ ঘটতেও পারে, অতএব আপনি আর কিছুমাত্র বিলম্ব করবেন না।

রাজধর। না, কিছুমাত্র বিলম্ব করব না। যাও, তুমি বিশ্রাম করো গে যাও—আমি প্রস্তুত হচ্ছি।

[দূতের প্রস্থান

ধুরন্ধর। তুমি যাচ্ছ নাকি?

রাজধর। যাচ্ছি বটে, কিন্তু ও দিকে নয়, অন্য দিকে।

ধুরন্ধর। বাড়ির দিকে?

রাজধর। তুমিও কি ইশা খাঁর কাছ থেকে বিদ্রূপ অভ্যেস করেছ! বীরত্ব যাঁর খুশি তিনি দেখান, কিন্তু যুদ্ধে জয় করে যদি কেউ বাড়ি ফেরে তো সে রাজধর। ধুরন্ধর, যাও তুমি—দেখো গে আমার শিবিরে কোথাও যেন কেউ আগুন না জ্বালে, একটি প্রদীপও যেন না জ্বলতে পায়।

ধুরন্ধর। আচ্ছা, আমি সকলকে সতর্ক করে দিচ্ছি—কিন্তু, কী তোমার অভিপ্রায় খুলেই বলো-না। তুমি যদি আমাকে আর আমি যদি তোমাকে সন্দেহ করি তা হলে পৃথিবীতে আমাদের দুটির তো কোথাও ভর দেবার জায়গা থাকবে না।

রাজধর। আজ রাত্রের অন্ধকারে আমি সৈন্য নিয়ে গোপনে নদী পার হয়ে যাব। হঠাৎ আরাকান রাজের শিবিরে উপস্থিত হয়ে তাকে বন্দী করতে হবে।

ধুরন্ধর। এখানে কোথায় পার হবে, ঘাট তো নেই।

রাজধর। পথ ঘাট আমি সমস্তই সন্ধান করে ঠিক করে রেখেছি। সূর্য তো অস্ত গেল। আজ আড়াই প্রহর রাত্রে চাঁদ উঠবে, তার পূর্বেই আমাদের কাজ শেষ করতে হবে, অতএব আর বড়ো বেশি দেরি নেই—তুমি যাও, প্রস্তুত হও গে। আর-একটি কাজ করো—যুবরাজের দূত যেন ফিরে যেতে না পারে, তাকে বন্দী করে রাখো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইশা খাঁর শিবির

ইন্দ্রকুমার ও ইশা খাঁ

ইন্দ্রকুমার। সেনাপতি-সাহেব, আপনি দাদার উপর রাগ করবেন না! আজ রাত্রে সৈন্যেরা বিশ্রাম করুক, কাল আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করব।

ইশা খাঁ। দেখো ইন্দ্রকুমার, আগুন যত শীঘ্র নেবানো যায় ততই মঙ্গল—তাকে সময় দিলে কিসের থেকে কী ঘটে কিছুই বলা যায় না। আজই আমরা জিতে আসতুম—কেবল তোমার দাদা নিতান্ত নির্বোধের মতো শত্রুদের মাঝখানে নিজেকে খামকা জড়িয়ে বসলেন, আমাদের সমস্ত পণ্ড হয়ে গেল।

ইন্দ্রকুমার। নির্বোধের মতো কেন বলছ খাঁ সাহেব, বলো বীরের মতো—তিনি সামান্য কয়জন সৈন্য নিয়ে—

ইশা খাঁ। যেখানে গিয়ে পড়েছিলেন সেখানে কেবল নির্বোধই যেতে পারে—

ইন্দ্রকুমার। (উত্তেজিত স্বরে) না, সেখানে বীর না হলে কেউ প্রবেশ করতে সাহস করতে পারে না।

ইশা খাঁ। আচ্ছা বাবা, তোমার কথা মানছি। কিন্তু শুধু বীর নয়, নির্বোধ বীর না হলে সে দিকে কেউ যেত না।



ইন্দ্রকুমার। কিন্তু তাতে তোমার লড়াইয়ের তো কোনো ব্যাঘাত হয় নি।

ইশা খাঁ। খুব ব্যাঘাত হয়েছিল। আমার সৈন্যেরা খবর পেয়ে সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠল, তাদের কি আর লড়াইয়ে মন ছিল? আমাদের সৈন্যের মধ্যে একজনও নেই যুবরাজের বিপদের খবর শুনে যে স্থির থাকতে পারে।

ইন্দ্রকুমার। কিন্তু সেনাপতি-সাহেব, আমাদের রাজধরের খবর কী?

ইশা খাঁ। আমি চার দিকেই দূত পাঠিয়েছিলুম, একজন ছাড়া সব দূতই ফিরে এসেছে— কোথাও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

ইন্দ্রকুমার। হা হা হা হা, সে নিশ্চয় পালিয়েছে।

ইশা খাঁ। হাসির কথা নয় বাবা।

ইন্দ্রকুমার। তা কী করব সেনাপতি-সাহেব, আমি খুশি হয়েছি। আমরা যুদ্ধ করে মরতুম আর ও যে আমাদের খ্যাতিতে ভাগ বসাত, সে আমার কিছুতে সহ্য হত না; তার চেয়ে ও ভেগে গেছে, সে ভালোই হয়েছে। এবারকার অস্ত্রপরীক্ষায় তো ফাঁকি চলবে না।

ইশা খাঁ। কিন্তু, সেবার কী হয়েছিল তুমি আমার কাছে বল নি।

ইন্দ্রকুমার। সে বলবার কথা না, খাঁ-সাহেব—সে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না, সেবার আমি হেরেছিলুম।

ইশা খাঁ। তীর ছুঁড়ে হারো নি বাবা, রাগ করে হেরেছিলে।

তৃতীয় দৃশ্য

আরাকান-রাজের শিবির
আরাকান-রাজ ও রাজধর

আরাকান-রাজ। দেখুন রাজকুমার, আমাকে বন্দী করে আপনাদের কোনো লাভ নেই।

রাজধর। কেন লাভ নেই, রাজন্? এই যুদ্ধের মধ্যে আপনাকে লাভ করাই তো সব চেয়ে বড়ো লাভ।

আরাকন-রাজ।তাতে যুদ্ধের অবসান হবে না। আমার ভাই হামচু রয়েছে, সৈন্যেরা তাকেই রাজা করবে, যুদ্ধ যেমন চলছিল তেমনি চলবে।

রাজধর। আপনাকে মুক্তিই দেব, কিন্তু সেটা তো একেবারে বিনা মূল্যে দেওয়া চলবে না।

আরাকান-রাজ। সে আমি জানি—মূল্য দিতে হবে। আমি আপনার কাছে পরাজয় স্বীকার করে সন্ধিপত্র লিখে দিতে রাজি আছি।

রাজধর। শুধু সন্ধিপত্র দিলে তো হবে না, মহারাজ। আপনি যে পরাজয় স্বীকার করলেন তার কিছু নিদর্শন তো দেশে নিয়ে যেতে হবে।

আরাকান-রাজ। আপনাকে পাঁচশত ব্রহ্মদেশের ঘোড়া ও তিনটি হাতি উপহার দেব।

রাজধর। সে উপহারে আমার প্রয়োজন নেই—মহারাজের মাথার মুকুট আমাকে দিতে হবে।
আরাকান-রাজ। তার চেয়ে প্রাণ দেওয়া সহজ ছিল!
রাজধর। প্রাণ দিলেও মুকুটটি তো বাঁচাতে পারবেন না, মাঝের থেকে প্রাণটাই বৃথা যাবে।
আরাকান-রাজ। তবে মুকুট নিন, কিন্তু এই মুকুটের সহিত আরাকানের চিরস্থায়ী শত্রুতা আপনি ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন। এই মুকুট যতদিন-না আবার ফিরে পাব ততদিন আমার রাজবংশে শান্তি থাকবে না
রাজধর। এই তো রাজার মতো কথা। আমারও তো শান্তি চাই নে মহারাজ, আমরা ক্ষত্রিয়। আর একটি কর্তব্য বাকি আছে। শীঘ্র যুদ্ধ নিবারণ করে এক আদেশপত্র আপনার সেনাপতির নিকট পাঠিয়ে দিন, ওপারে এতক্ষণ যুদ্ধের উদ্যোগ হচ্ছে।
আরাকান-রাজ। এখনই আমার অদেশ নিয়ে দূত যাবে।
রাজধর। তবে চলুন, সন্ধিপত্র লেখার ব্যবস্থা করা যাক।

চতুর্থ দৃশ্য

রণক্ষেত্র
যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার

যুবরাজ। আজকের যুদ্ধের গতিকটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে, আমাদের সৈন্যেরা কালকের ব্যাপারে আজও নিরুৎসাহ হয়ে রয়েছে—ওরা যেন ভালো করে লড়ছে না। ইশা খাঁ কোন্ দিকে?
ইন্দ্রকুমার। ঐ-যে পূর্বকোণে তাঁর নিশান দেখা যাচ্ছে।
যুবরাজ। ভাই, তুমি কেন আজ আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছ। তোমার বোধ হয় ঐ উত্তরের দিকে যাওয়াই কর্তব্য।
ইন্দ্রকুমার। না, আমার এই জায়গাই ভালো।
যুবরাজ। ইন্দ্রকুমার, তুমি তোমার দাদাকে আজ নির্বুদ্ধিতা থেকে বাঁচাবার জন্যে সতর্ক হয়ে কাছে কাছে ফিরছ। খাঁ-সাহেব যে আবার কোনো সুযোগে আমার বুদ্ধির দোষ ধরবেন এটা তোমার ভালো লাগছে না। কিন্তু ভাই, আমারও নির্বুদ্ধিতার সীমা আছে—আমি আজ বোধ হয় সাবধানে কাজ করতে পারব। ঐ দেখো, চেয়ে দেখো ঐ পাশে আমাদের সৈন্যেরা যেন টলেছে, এখনই পালাতে আরম্ভ করবে—তুমি না হলে কেউ ওদের ঠেকাতে পারবে না। ইন্দ্রকুমার, দেরি কোরো না, আমার জন্যে তোমার কোনো ভয় নেই। এ কী! এ কী! এ কী!
ইন্দ্রকুমার। তাই তো, এ কী! শত্রুসৈন্যেরা হঠাৎ যুদ্ধ বন্ধ করলে যেন!
যুবরাজ। ঐ-যে সন্ধির নিশান উড়িয়েছে। ওদের তো পরাজয়ের কোনো লক্ষণ ছিল না, তবে

কেন এমন ঘটল। আমার তো মনে হচ্ছিল আজকের যুদ্ধে আমাদের সৈন্যেরাই টল্‌মল্‌ করছে।

দূতের প্রবেশ

দূত। যুবরাজ, শত্রুপক্ষ যুদ্ধে ক্ষান্ত হয়েছে।

যুবরাজ। সে তো দেখতে পাচ্ছি। এর কারণ কী?

দূত। কারণ এখনো জানতে পারি নি, কিন্তু শুনতে পেয়েছি, আরাকান-রাজ আর আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না বলে সংবাদ পাঠিয়েছেন।

যুবরাজ। সুসংবাদ। আমার কেবল মনে একটি বেদনা বাজছে।

ইন্দ্রকুমার। কিসের বেদনা, দাদা?

যুবরাজ। রাজধর কেন সৈন্য নিয়ে চলে গেল। সে যদি থাকত তা হলে কী আনন্দের সঙ্গে আমরা তিন ভাই জয়োৎসব করতে পারতুম। আজকের আমাদের জয়গৌরবের মধ্যে এই একটি মস্ত অভাব রয়ে গেল —রাজধর যুদ্ধে যোগ না দিয়ে আমাকে বড়ো দুঃখ দিয়েছে।

ইন্দ্রকুমার। জয়ের ভাগ না নিয়েই সে যদি পালিয়ে থাকে তাতে এমনি কী ক্ষতি হয়েছে দাদা?

যুবরাজ। না ভাই, আমরা তিন ভাই একত্রে বেরিয়েছি, বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদ আমরা ভাগ করে ভোগ না করতে পারলে আমার তো মনে দুঃখ থেকে যাবে। রাজধর যদি মাথা হেঁট করে বাড়ি ফেরে, আমাদের সৌভাগ্যে যদি তার মুখ বিমর্ষ হয়, তা হলে এই কীর্তি আমাকে কিছুমাত্র সুখ দেবে না।—ঐ যে ঘোড়া ছুটিয়ে সেনাপতি-সাহেব আসছেন।

ইশা খাঁর প্রবেশ

ইন্দ্রকুমার। খাঁ-সাহেব, শত্রুসৈন্য হঠাৎ যুদ্ধ থামিয়ে দিলে কেন তার কোনো খবর পেয়েছ?

ইশা খাঁ। পেয়েছি বৈকি! রাজধর আরাকান-রাজকে বন্দী করেছে।

ইন্দ্রকুমার। রাজধর! মিথ্যা কথা!

ইশা খাঁ। যা মিথ্যা হওয়া উচিত ছিল এক-এক সময় তাও সত্য হয়ে ওঠে। আমি দেখতে পাচ্ছি, আল্লার দূতেরা এক-এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে, শয়তান তখন সমস্ত হিসাব উল্‌টো করে দিয়ে যায়।

ইন্দ্রকুমার। শয়তানও কি রাজধরকে জিতিয়ে দিতে পারে!

ইশা খাঁ। একবার তো জিতিয়েছিল সেই অস্ত্রপরীক্ষার সময়— এবারও সেই শয়তান জিতিয়েছে।

যুবরাজ। সেনাপতি-সাহেব, তুমি রাজধরের উপর রাগ কোরো না। সে যদি জিতে থাকে তাতে তো আমাদেরই জিত। কখন সে যুদ্ধ করলে, কখন বা বন্দী করলে, আমরা তো জানতে পারি নি।

ইশা খাঁ। কাল সন্ধ্যার পরে আমরা যখন যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে শিবিরে ফিরে এলেম তখন সে অন্ধকারে গোপনে নদী পার হয়ে হঠাৎ আরাকান-রাজের শিবির আক্রমণ করে তাকে বন্দী করেছে। আমাদের সাহায্য করবার জন্যে আমি তাকে যেখানে প্রস্তুত থাকতে

বলেছিলুম সেখানে সে ছিলই না। আমি সেনাপতি, আমার আদেশ সে মান্যই করে নি।

ইন্দ্রকুমার। অসহ্য। এ জন্যে তার শাস্তি পাওয়া উচিত।

ইশা খাঁ। শুধু তাই! যুবরাজ উপস্থিত থাকতে সে কিনা নিজের ইচ্ছামত সন্ধিপত্র রচনা করেছে।

ইন্দ্রকুমার। এর শাস্তি না দিলে অন্যায় হবে।

ইশা খাঁ। তোমার দাদাকে এই সহজ কথাটি বুঝিয়ে দাও দেখি।

রাজধরের প্রবেশ

ইন্দ্রকুমার। রাজধর! তুমি কাপুরুষতা প্রকাশ করেছ।

রাজধর। তোমার মতো যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে পুরুষকার প্রকাশ করতে আমি এত দূরে আসি নি— আমি যুদ্ধে জয় করতে এসেছিলুম।

ইন্দ্রকুমার। তুমি যুদ্ধ করেছ! এবং জয় করেছ! জয়লক্ষ্মীর মুখ যে লজ্জায় লাল করে তুলেছ।

রাজধর। তা হতে পারে, সেটা প্রণয়ের লজ্জা। কিন্তু তিনি যে আমাকে বরণ করেছেন তার সাক্ষী এই।

ইন্দ্রকুমার। এ মুকুট কার?

রাজধর। এ মুকুট আমার। এ আমার জয়ের পুরস্কার।

ইন্দ্রকুমার। যুদ্ধ থেকে পালিয়েছ তুমি— তুমি পুরস্কার পাবে কিসের? এ মুকুট যুবরাজ পরবেন।

রাজধর। আমি জিতে এনেছি, আমিই পরব।

যুবরাজ। রাজধর ঠিক কথাই বলছেন। ওঁর জয়ের ধন তো উনিই পরবেন।

ইশা খাঁ। সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন করে উনি অন্ধকারে শৃগালবৃত্তি অবলম্বন করলেন—আর উনি পরবেন মুকুট! ভাঙা হাঁড়ির কানা পরে যদি দেশে যান তবেই ওঁকে সাজবে।

রাজধর। আমি যদি না থাকতুম ভাঙা হাঁড়ির কানা তোমাদের পরতে হত। এতক্ষণ থাকতে কোথায়?

ইন্দ্রকুমার। যেখানেই থাকি তোমার মতো পালিয়ে থাকতুম না।

যুবরাজ। ইন্দ্রকুমার, তুমি অন্যায় বলছ ভাই! সত্য বলতে কী, রাজধর না থাকলে আজ আমাদের বিপদ হত।

ইন্দ্রকুমার। কিচ্ছু বিপদ হত না। রাজধর সৈন্য লুকিয়ে রেখেই আমাদের বিপদে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। রাজধর না থাকলে এ মুকুট আমি যুদ্ধ করে আনতুম। রাজধর চুরি করে এনেছে। দাদা, এ মুকুট এনে আমি তোমাকেই পরাতুম, নিজে পরতুম না।

যুবরাজ। (রাজধরের প্রতি) ভাই, তুমিই আজ জিতেছ। তুমি না থাকলে অল্প সৈন্য নিয়ে আমাদের কী বিপদ হত বলা যায় না। এ মুকুট আমি তোমাকেই পরিয়ে দিচ্ছি।

ইন্দ্রকুমার। (রুদ্ধকণ্ঠে) রাজধর ক্ষাত্রধর্ম লঙ্ঘন করেছে বলে তোমার কাছ থেকে আজ পুরস্কার পেলে—আর আমি যে প্রাণকে তুচ্ছ করে বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলুম, তোমার মুখ থেকে একটা প্রশংসার কথাও শুনতে পেলুম না। এমন কথা তোমার মুখ থেকে আজ শুনতে হল যে, রাজধর না থাকলে কেউ তোমাকে বিপদ হতে উদ্ধার করতে পারত না। কেন দাদা, আমি কি প্রত্যুষ থেকে আর সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করি নি? আমি কি রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়েছিলুম? আমি কি শত্রুসৈন্যের বেষ্টন ছিন্ন করে তোমার সাহায্যের জন্যে আসি নি? কী দেখে তুমি বললে, তোমার স্নেহের রাজধর ছাড়া কেউ তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারত না!

যুবরাজ। ভাই, আমি নিজের বিপদের কথা বলছি নে।

ইন্দ্রকুমার। থাক্ দাদা, থাক্। আর কিছুই বলতে হবে না। রাজধরের মতো এমন অসাধারণ বীরকে যখন তুমি সহায় পেয়েছ তখন আমার আর প্রয়োজন নেই—আমি চললেম।

যুবরাজ। ভাই, আবার! আবার তুমি আত্মবিস্মৃত হচ্ছ!

ইন্দ্রকুমার। যেখানে আমার প্রয়োজন নেই সেখানে আমার পক্ষে থাকাই অপমান।

[প্রস্থান

ইশা খাঁ। যুবরাজ, এ মুকুট তোমার কাউকে দেবার অধিকার নেই। আমি সেনাপতি, আমি যাকে দেব এ তারই হবে।

রাজধরের মাথা হইতে মুকুট লইয়া যুবরাজকে পরাইয়া দিতে উদ্যত হইলেন

যুবরাজ। (সরিয়া গিয়া) না, এ মুকুট আমি নিতে পারি নে।

ইশা খাঁ। তবে থাক্। এ মুকুট কেউ পাবে না। এ কর্ণফুলির জলে যাক। (মুকুট নিক্ষেপ) রাজধর যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন, উনি শাস্তির যোগ্য।

রাজধর। দাদা, তুমি সাক্ষী রইলে। এ আমি ভুলব না।

যুবরাজ। এইটেই কি সকলের চেয়ে মনে রাখবার কথা? মুকুটটাও যদি জলে গিয়ে থাকে তবে ওর সমস্ত লাঞ্ছনাও যাক। তোমারও যা ভোলবার ভোলো, আমাদেরও যা ভোলবার ভুলে যাই। দেখি, ইন্দ্রকুমার সত্যই রাগ করে আমাদের ছেড়ে চলে গেল কি না।

পঞ্চম দৃশ্য

শিবির

রাজধর ও ধুরন্ধর

রাজধর। ধুরন্ধর, আমার মুকুট যেখানে গিয়েছে আমাদের যুদ্ধজয়কেও সেই কর্ণফুলির জলে জলাঞ্জলি দেব।

ধুরন্ধর। আবার হারবে নাকি?

রাজধর। হাঁ, এবার হেরে জিতব। ইন্দ্রকুমারের অহংকারকে ধুলোয় না লুটিয়ে দিয়ে আমি ফিরব না। আমার হাতের জিতকে তিনি গ্রহণ করবেন না। দেখি, এবার নিজে তিনি কেমন জিততে পারেন।

ধুরন্ধর। অত বেশি নিশ্চিন্ত হোয়ো না—দৈবাৎ জিতে যেতেও পারে। সত্যি কথায় রাগ করলে চলবে না, যুদ্ধবিদ্যাটা ইন্দ্রকুমার একটু শিখেছে।

রাজধর। আচ্ছা, সে-সব তর্ক পরে হবে। এখন তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। আরাকান-রাজ সৈন্য নিয়ে কাল প্রাতেই যাত্রা করবেন। কথা আছে, যতদিন না তিনি চট্টগ্রামের সীমানা পেরিয়ে যাবেন ততদিন তাঁর সেনাপতিরা আমার শিবিরে বন্দী থাকবেন। তিনি শিবির তোলবার পূর্বেই আজ রাত্রে গোপনে তাঁর কাছে তুমি আমার এই চিঠিখানি নিয়ে যাবে।

ধুরন্ধর। চিঠিতে কী আছে সেটা তো আমার জানা ভালো। কেননা, যদি দুটো-একটা কথা বলবার দরকার হয় তা হলে বলে কাজটা চুকিয়ে আসতে পারব।

রাজধর। আমি লিখেছি—আমি অপমানিত হয়েছি, এইজন্য আমার ভাইদের কাছ থেকে আমি অবসর নিলুম। আমার পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে আমি গৃহে ফেরবার ছলে দূরে চলে যাব। ইন্দ্রকুমারও দাদার উপর অভিমান করে চলে গেছে। সৈন্যেরাও যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে জেনে ফেরবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে—এই অবকাশে যদি আরাকান-রাজ সহসা আক্রমণ করেন তা হলে ত্রিপুরার সৈন্যদের নিশ্চয় হার হবে।

ধুরন্ধর। হার তো হবে। তার পরে? তুমি সুদ্ধ শেষে হায় হায় করে মরবে না তো? আগুন যদি লাগাতে হয় তো নিজের ঘরের চালটা সামলে লাগাতে হবে।

রাজধর। আমাকে সাবধান করে দেবার জন্যে আর কারো বুদ্ধির প্রয়োজন হবে না। তুমি প্রস্তুত হও গে— দেখো, কেউ যেন জানতে না পারে। আমার সৈন্যেরা যদি কোনোমতে সন্দেহ করে তা হলে সমস্তই পণ্ড হবে।

ধুরন্ধর। দেখো রাজধর, আমাকে সাবধান করে দেবার জন্যেও আর কারো বুদ্ধির প্রয়োজন হবে না—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রণক্ষেত্র

ইশা খাঁ ও যুবরাজ

ইশা খাঁ। যুবরাজ, আল্লাকে স্মরণ করো। আজ বড়ো শক্ত সময় এসেছে।

যুবরাজ। শক্তটা কিসের, খাঁ-সাহেব। ভগবানের যখন ইচ্ছা হয় তখন মরাও শক্ত নয়, বাঁচাও শক্ত নয়, সবই সহজ।

ইশা খাঁ। মহারাজ আমার হাতে তোমাদের দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন, সেইজন্যেই মনে আক্ষেপ হচ্ছে; নইলে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু তো বিবাহশয্যায় নিদ্রা। যুবরাজ, তুমি পালাবার চেষ্টা করো—যুদ্ধের ভার আমার উপর রইল।

যুবরাজ। তুমি আমাদের অস্ত্রগুরু, তোমার মুখে এ উপদেশ সাজে না। তা ছাড়া পথই বা কোথায়? আজ মরবার যেমন চমৎকার সুযোগ হয়েছে পালাবার তেমন নয়।

ইশা খাঁ। কিন্তু বাবা, মনের মধ্যে একটা আগুন জ্বলছে। ইন্দ্রকুমার যে অভিমান করে দূরে চলে গেল, তার এই অপরাধের শাস্তি দেবার জন্যে আমি হয়তো বেঁচে থাকব না।

যুবরাজ। যদি বেঁচে না থাক সেনাপতি, তা হলে তার শাস্তি আরো ঢের বেশি হবে। সে যে তোমাকে পিতার মতো জানে।

ইশা খাঁ। আল্লা! সে কথা সত্য। বাবা, আজ বুঝছি আমার সময় হবে না। কিন্তু যদি তোমার সুযোগ হয় তবে তাকে বোলো, যদি ইশা খাঁ বেঁচে থাকত তবে তাকে শাস্তি দিত কিন্তু মরবার আগে তাকে ক্ষমা করে মরেছে। বাস্, আর সময় নেই—চললুম বাবা! এসো, একবার আলিঙ্গন করে যাই। আল্লার হাতে দিয়ে গেলুম, তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন।

যুবরাজ। খাঁ-সাহেব, কতদিন কত অপরাধ করেছি, আজ সমস্ত মার্জনা করে যাও।

ইশা খাঁ। বাবা, জন্মকাল থেকে তোমাকে দেখছি, কোনো দিন কোনো অপরাধ তুমি জমতে দাও নি, হাতে হাতে সমস্তই নিকাশ করে দিয়েছ—আজ মার্জনা করব এমন তো কিছুই রাখ নি। তোমার নির্মল প্রাণ আজ আল্লা যদি নেন তবে তাঁর স্বর্গোদ্যানের কোনো ফুলের কাছেই সে ম্লান হবে না।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রণক্ষেত্র। সৈন্যদল

প্রথম সৈনিক। এ কি সত্যি?

দ্বিতীয় সৈনিক। কী জানি ভাই, শুনছি তো।

প্রথম । তবে তো সর্বনাশ হবে।

[দ্রুত প্রস্থান

দ্বিতীয় দলের প্রবেশ

প্রথম। কে বললে রে কে বললে?

দ্বিতীয়। আমাদের উমেশ বললে।

তৃতীয়। কী জানি ভাই, শুনে যেন মাথায় বজ্রাঘাত হল, ভালো করে সব কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না।

দ্বিতীয়। চল্, ভালো করে খোঁজ করে আসি গে। [প্রস্থান

তৃতীয় দলের প্রবেশ

প্রথম। আমরা তাঁর হাতিকে দেখেছি, হাওদা খালি, মাহুত নেই। প্রভুকে হারিয়ে সে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দ্বিতীয়। আমাদেরও যে সেই দশা হয়েছে।

তৃতীয়। কোন্ দিকে পড়েছেন কেউ দেখে নি?

প্রথম। তা তো কেউ বলতে পারে না।

দ্বিতীয়। আমাদের শিবু বলছিল, যুবরাজকে যখন বাণ এসে লাগল তখন মাহুত তাঁর হাতি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাচ্ছিল—পালাবার সময় মাহুত মারা যায়—তার পরে যুবরাজ যে সেই হাতির উপর থেকে কোন্‌খানে পড়ে গিয়েছেন তা তো কেউ বলতে পারে না।

আর-এক দলের প্রবেশ

চতুর্থ। ওরে সর্বনাশ হয়ে গেল যে রে, কুমার ইন্দ্রকুমারকে কি কেউ খবর দিতে ছোটে নি?

তৃতীয়। অনেকক্ষণ গিয়েছে— আরাকানের ফৌজ আমাদের ফাঁকি দিয়ে আক্রমণ করতেই তখনই লোক গেছে—তাঁকে খুঁজে পেলে তো হয়।

কুমার রাজধর কি এখনো খবর পান নি?

চতুর্থ

তিনি কোথায় আছেন খবরই পাওয়া গেল না—বোধ করি ত্রিপুরার দিকে চলে গেছেন যুবরাজের সংবাদ জানতে পেলে এতক্ষণে তিনিও দৌড়ে ছুটে আসতেন।

প্রথম

আমরা কোন্ মুখে দেশে ফিরব!

তৃতীয়

ফিরব কেন, মরা যাক।

চতুর্থ

যুদ্ধই ফুরিয়ে গেল তো মরব কী করে?

অপর ব্যক্তির প্রবেশ

অপর

ওরে, করছিস কী! সর্বনাশ হল যে—একবার খোঁজ করবি চল্।

চতুর্থ

হাঁ রে, চল্—আমরা ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাই।

তৃতীয়

আমাদের ভাগ্যে তিনি কি বেঁচে আছেন?

দ্বিতীয়

আমি ভাবছি, ইন্দ্রকুমার যখন এ খবর শুনবেন তখন তিনি কি প্রাণ রাখতে পারবেন?

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণক্ষেত্র

ইন্দ্রকুমার ও সৈনিক

ইন্দ্রকুমার। কোথায়—কোথায়—কোথায়? ওরে, দাদা কোথায়?

সৈনিক। তাঁকেই তো খুঁজছি, প্রভু।

ইন্দ্রকুমার। আর, ইশা খাঁ?

সৈনিক। আজ বেলা চার প্রহরের সময় যুবরাজ স্বহস্তে ইশা খাঁর কবরে মাটি দিয়েছেন—সেই মাটিতে তাঁর নিজেরও রক্ত তখন মিশছিল।

ইন্দ্রকুমার। ধিক্ ধিক্ ধিক্, ইন্দ্রকুমার! ধিক্ তোকে! ধিক্ তোর চণ্ডাল রাগকে। দাদা! দাদা! এই নরাধমকে একবার মাপ চাইতেও সময় দেবে না?

উচ্চৈঃস্বরে। দাদা! সাড়া দাও! কেবল এক মুহূর্তের জন্যেও সাড়া দাও। ওরে, আর কেউ নেই নাকি? যে যেখানে আছিস সকলে মিলে তাঁকে খোঁজ্—আজ আমার দাদাকে চাইই যে।

দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ

দ্বিতীয়। এই দিকে চলুন কুমার। তাঁর দেখা পেয়েছি।

ইন্দ্রকুমার। কোথায়? কোথায়?

দ্বিতীয়। কর্ণফুলির তীরে সেই অর্জুনগাছের তলায়।

ইন্দ্রকুমার। সত্য করে বল্, তিনি কি—

দ্বিতীয়। তিনি বেঁচে আছেন— তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে রয়েছেন।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কর্ণফুলির তীর

তরুতলে জ্যোৎস্নার ক্ষীণালোকে

যুবরাজ। ওরে, সরিয়ে দে রে, একটু সরিয়ে দে! গাছের ডালগুলো একটু সরিয়ে দে, আজ আকাশের চাঁদকে একটু দেখে নিই। কেউ নেই। এ কি গাছেরই ছায়া, না আমার চোখের উপরে ছায়া পড়ে আসছে। এখনো কর্ণফুলির স্রোতের শব্দ তো শুনতে

পাচ্ছি। এই শব্দটিতেই কি পৃথিবীর শেষ বিদায়সম্ভাষণ শুনব? ইন্দ্রকুমার! ভাই ইন্দ্রকুমার! এখনো তোমার রাগ গেল না!

ইন্দ্রকুমারের প্রবেশ

ইন্দ্রকুমার। দাদা! দাদা!

যুবরাজ। আঃ, বাঁচলুম, ভাই। তুমি আসবে জেনেই এত দেরি করেই বেঁচেছিলুম। তুমি অভিমান করে গিয়েছিলে বলেই আমি যেতে পাচ্ছিলুম না। কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেছে ভাই, এবার তবে ঘুমোই— মা কোল পেতেছেন।

ইন্দ্রকুমার। দাদা, মার্জনা করলে কি!

যুবরাজ। সমস্তই, সমস্তই! এখানকার যা-কিছু ছিল এই রক্ত দিয়ে মার্জনা করে গেলুম। কিছুই বাকি রাখি নি। কেবল একটি দুঃখ রইল, মহারাজের কাছে খবর পাঠাতে হবে, আমার পরাজয় হয়েছে।

ইন্দ্রকুমার। পরাজয় তোমার হয় নি দাদা—আমারই পরাজয় হয়েছে।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। কুমার রাজধর যুবরাজের পদধূলি নেবার জন্যে প্রার্থনা জানিয়ে পাঠিয়েছেন।

ইন্দ্রকুমার। কখনো না। কিছুতেই না।

যুবরাজ। ডাকো, ডাকো, তাকে ডাকো।

ইন্দ্রকুমার (রাগিয়া)। দাদা, রাজধরকে—

যুবরাজ। আবার, ভাই! আবার!

ইন্দ্রকুমার। না, না, না, আর নয়। আমার আর রাগ নেই।

রাজধরের প্রবেশ ও প্রণাম

রাজধর। আমি নরাধম। এ মুকুট তোমার পায়ে রাখলুম। এ তোমারই।

যুবরাজ। আমার সময় নেই! ইন্দ্রকুমারকে দাও, ভাই।

রাজধর। দাদার আদেশ মাথায় করলেম! এ মুকুট তুমি নাও।

ইন্দ্রকুমার। আমি পরাজিত—এ মুকুট আমার নয়। এ আমি তোমাকেই পরিয়ে দিলুম—দাদা!

ছবি | ইন্দ্রনীল ঘোষ

শারদোৎসব

রাগিণী ভৈরবী । তাল তেওরা

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি,
আকাশেতে সোনার আলোয়
ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।

ওরে মন, খুলে দে মন,
যা আছে তোর খুলে দে।
অন্তরে যা ডুবে আছে
আলোক-পানে তুলে দে।

আনন্দে সব বাধা টুটে
সবার সাথে ওঠ্‌ রে ফুটে,
চোখের 'পরে আলস-ভরে
রাখিস নে আর আঁচল টানি।

পাত্রগণ

সন্ন্যাসী
ঠাকুরদাদা
লক্ষেশ্বর
উপনন্দ
রাজা
রাজদূত
অমাত্য
বালকগণ

প্রথম দৃশ্য

পথে বালকগণ

গান

বিভাস। একতালা

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে,
বাদল গেছে টুটি—
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।
কী করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই
সকল ছেলে জুটি।
কেয়াপাতার নৌকো গ'ড়ে
সাজিয়ে দেব ফুলে—
তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেব,
চলবে দুলে দুলে।
রাখাল-ছেলের সঙ্গে ধেনু
চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু
চাঁপার বনে লুটি।
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।

লক্ষেশ্বর

ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া

ছেলেগুলো তো জ্বালালে! ওরে চোবে ওরে গির্‌ধারীলাল, ধর্ তো ছোঁড়াগুলোকে ধর্ তো।

ছেলেরা

দূরে ছুটিয়া গিয়া হাততালি দিয়া

ওরে লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েছে রে, লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েছে।

লক্ষেশ্বর

হনুমন্ত সিং, ওদের কান পাকড়ে আন্ তো; একটাকেও ছাড়িস নে!

একজন বালক

চুপি চুপি পশ্চাৎ হইতে আসিয়া কান হইতে

কলম টানিয়া লইয়া

কাক লেগেছে লক্ষ্মীপেঁচা,
লেজে ঠোকর খেয়ে চেঁচা।

লক্ষেশ্বর

হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া সব, আজ একটাকেও আস্ত রাখব না।

ঠাকুরদাদার প্রবেশ

ঠাকুরদাদা

কী হয়েছে লখাদাদা! মারমূর্তি কেন।

লক্ষেশ্বর

আরে দেখো-না! সক্কালবেলা কানের কাছে চেঁচাতে আরম্ভ করেছে।

ঠাকুরদাদা

আজ যে শরতে ওদের ছুটি, একটু আমোদ করবে না। গান গাইলেও তোমার কানে খোঁচা মারে! হায় রে হায়, ভগবান তোমাকে এত শাস্তিও দিচ্ছেন!

লক্ষেশ্বর

গান গাবার বুঝি আর সময় নেই! আমার হিসাব লিখতে ভুল হয়ে যায় যে। আজ আমার সমস্ত দিনটাই মাটি করলে।

ঠাকুরদাদা

তা ঠিক। হিসেব ভুলিয়ে দেবার ওস্তাদ ওরা। ওদের সাড়া পেলে আমার বয়সের হিসাবে প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের গরমিল হয়ে যায়। ওরে বাঁদরগুলো, আয় তো রে, চল্‌ তোদের পঞ্চাননতলার মাঠটা ঘুরিয়ে আনি।

যাও দাদা, তোমার দপ্তর নিয়ে বোসো গে। আর হিসেবে ভুল হবে না।

[লক্ষেশ্বরের প্রস্থান

ঠাকুরদাদাকে ঘিরিয়া ছেলেদের নৃত্য

প্রথম

হাঁ ঠাকুরদাদা, চলো।

আমাদের আজ গল্প বলতে হবে।

না গল্প না, বটতলায় বসে আজ ঠাকুরদার পাঁচালি হবে।

চতুর্থ

বটতলায় না ঠাকুরদা, আজ পারুলডাঙায় চলো।

ঠাকুরদাদা

চুপ, চুপ, চুপ। অমন গোলমাল লাগাস যদি তো লখাদাদা আবার ছুটে আসবে।

লক্ষেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ

লক্ষেশ্বর

কোন্ পোড়ারমুখো আমার কলম নিয়েছে রে!

[কলম ফেলিয়া দিয়া সকলের প্রস্থান

উপনন্দের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর

কী রে, তোর প্রভু কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলে? অনেক পাওনা বাকি।

উপনন্দ

কাল রাত্রে আমার প্রভুর মৃত্যু হয়েছে।

লক্ষেশ্বর

মৃত্যু! মৃত্যু হলে চলবে কেন। আমার টাকাগুলোর কী হবে!

উপনন্দ

তাঁর তো কিছুই নেই। যে বীণা বাজিয়ে উপার্জন ক'রে তোমার ঋণ শোধ করতেন সেই বীণাটি আছে মাত্র।

লক্ষেশ্বর

বীণাটি আছে মাত্র! কী শুভ সংবাদটাই দিলে।

উপনন্দ

আমি শুভ সংবাদ দিতে আসি নি। আমি একদিন পথের ভিক্ষুক ছিলেম, তিনিই আমাকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর বহুদুঃখের অন্নের ভাগে আমাকে মানুষ করেছেন। তোমার কাছে দাসত্ব ক'রে আমি সেই মহাত্মার ঋণ শোধ করব।

লক্ষেশ্বর

বটে! তাই বুঝি তাঁর অভাবে আমার বহুদুঃখের অন্নে ভাগ বসাবার মতলব করেছ? আমি তত বড়ো গর্দভ নই। আচ্ছা, তুই কী করতে পারিস বল্ দেখি।

উপনন্দ

আমি চিত্রবিচিত্র ক'রে পুঁথি নকল করতে পারি। —তোমার অন্ন আমি চাই নে। আমি নিজে উপার্জন ক'রে যা পারি খাব, তোমার ঋণও শোধ করব।

লক্ষেশ্বর

আমাদের বীণকারটিও যেমন নির্বোধ ছিল ছেলেটাকেও দেখছি ঠিক তেমনি করেই বানিয়ে গেছে। হতভাগা ছোঁড়াটা পরের দায় ঘাড়ে নিয়েই মরবে। এক-একজনের ঐরকম মরাই স্বভাব।

আচ্ছা বেশ, মাসের ঠিক তিন তারিখের মধ্যেই নিয়মমত টাকা দিতে হবে। নইলে—

উপনন্দ

নইলে আবার কী। আমাকে ভয় দেখাচ্ছ মিছে। আমার কী আছে যে তুমি আমার কিছু করবে। আমি আমার প্রভুকে স্মরণ করে ইচ্ছা করেই তোমার কাছে বন্ধন স্বীকার করেছি। আমাকে ভয় দেখিয়ো না বলছি।

লক্ষেশ্বর

না না, ভয় দেখাব না। তুমি লক্ষ্মীছেলে, সোনার-চাঁদ ছেলে। টাকাটা ঠিকমতো দিয়ো বাবা। নইলে আমার ঘরে দেবতা আছে, তার ভোগ কমিয়ে দিতে হবে—সেটাতে তোমারই পাপ হবে।

[উপনন্দের প্রস্থান

ঐ যে, আমার ছেলেটা এইখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি কোন্‌খানে টাকা পুঁতে রাখি ও নিশ্চয়ই সেই খোঁজে ফেরে। ওদেরই ভয়েই তো আমাকে এক সুরঙ্গ হতে আর-এক সুরঙ্গে টাকা বদল করে বেড়াতে হয়।

ধনপতি, এখানে কেন রে! তোর মতলবটা কী বল্‌ দেখি।

ধনপতি

ছেলেরা আজ সকলেই বেতসিনীর ধারে আমোদ করতে গেছে—আমাকে ছুটি দিলে আমিও যাই।

লক্ষেশ্বর

বেতসিনীর ধারে! ঐ রে, খবর পেয়েছে বুঝি। —বেতসিনীর ধারেই তো আমি সেই গজমতির কৌটো পুঁতে রেখেছি।

ধনপতির প্রতি

না, না, খবরদার বলছি, সে-সব না। চল্‌ শীঘ্র চল্‌, নামতা মুখস্থ করতে হবে।

ধনপতি

নিশ্বাস ফেলিয়া

আজ এমন সুন্দর দিনটা!

লক্ষেশ্বর

দিন আবার সুন্দর কী রে? এইরকম বুদ্ধি মাথায় ঢুকলেই ছোঁড়াটা মরবে আর-কি। যা বলছি, ঘরে যা।

[ধনপতির প্রস্থান

ভারি বিশ্রী দিন। আশ্বিনের এই রোদ্দুর দেখলে আমার সুদ্ধ মাথা খারাপ করে দেয়, কিছুতে কাজে মন দিতে পারি নে। মনে করছি মলয়দ্বীপে গিয়ে কিছু চন্দন জোগাড় করবার

জন্যে বেরিয়ে পড়লে হয়। যাই হোক, সে পরে হবে, আপাতত বেতসিনীর ধারটায় একবার ঘুরে আসতে হচ্ছে। ছোঁড়াগুলো খবর পায় নি তো! ওদের যে ইঁদুরের স্বভাব। সব জিনিস খুঁড়ে বের করে ফেলে— কোনো জিনিসের মূল্য বোঝে না, কেবল কেটেকুটে ছারখার করতেই ভালোবাসে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বেতসিনীর তীর। বন

ঠাকুরদাদা ও বালকগণ

গান

বাউলের সুর

আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা।

একজন বালক

ঠাকুরদা, তুমি আমাদের দলে।

দ্বিতীয় বালক

না ঠাকুরদা, সে হবে না, তুমি আমাদের দলে।

ঠাকুরদাদা

না ভাই, আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই; সে-সব হয়ে-বয়ে গেছে। আমি সকল দলের মাঝখানে থাকব, কাউকে বাদ দিতে পারব না। এবার গানটা ধর্‌।

আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে,
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে—
আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখির মেলা।

অন্য দল আসিয়া

অন্য দল

ঠাকুরদা, এই বুঝি! আমাদের তুমি ডেকে আনলে না কেন। তোমার সঙ্গে আড়ি। জন্মের মতো আড়ি।

ঠাকুরদা

এত বড়ো দণ্ড! নিজেরা দোষ করে আমাকে শাস্তি! আমি তোদের ডেকে বের করব, না

তোরা আমাকে ডেকে বাইরে টেনে আনবি! না ভাই, আজ ঝগড়া না, গান ধর্।

ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই,
যাব না আজ ঘরে।
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুঠ করে।
যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাটবে সকল বেলা।

প্রথম বালক

ঠাকুরদা, ঐ দেখো, ঐ দেখো, সন্ন্যাসী আসছে।

দ্বিতীয় বালক

বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, আমরা সন্ন্যাসীকে নিয়ে খেলব। আমরা সব চেলা সাজব।

তৃতীয় বালক

আমার ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে যাব, কোন্ দেশে চলে যাব কেউ খুঁজেও পাবে না।

ঠাকুরদাদা

আরে চুপ, চুপ!

সকলে

সন্ন্যাসীঠাকুর, সন্ন্যাসীঠাকুর।

ঠাকুরদাদা

আরে থাম্, থাম্! ঠাকুর রাগ করবে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

বালকগণ

সন্ন্যাসীঠাকুর, তুমি কি আমাদের উপর রাগ করবে। আজ আমরা সব তোমার চেলা হব।

সন্ন্যাসী

হা হা হা হা! এ তো খুব ভালো কথা। তার পরে আবার তোমরা সব শিশু-সন্ন্যাসী সেজো, আমি তোমাদের বুড়ো চেলা সাজব। এ বেশ খেলা, এ চমৎকার খেলা।

ঠাকুরদাদা

প্রণাম হই। আপনি কে।

সন্ন্যাসী

আমি ছাত্র।

ঠাকুরদাদা

আপনি ছাত্র!

সন্ন্যাসী

হাঁ, পুঁথিপত্র সব পোড়াবার জন্যে বের হয়েছি।

ঠাকুরদাদা

ও ঠাকুর, বুঝেছি। বিদ্যের বোঝা সমস্ত ঝেড়ে ফেলে দিব্যি একেবারে হাল্কা হয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবেন।

সন্ন্যাসী

চোখের পাতায় উপরে পুঁথির পাতাগুলো আড়াল করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে—সেইগুলো খসিয়ে ফেলতে চাই।

ঠাকুরদাদা

বেশ, বেশ, আমাকেও একটু পায়ের ধুলো দেবেন। —প্রভু, আপনার নাম বোধ করি শুনেছি—আপনি তো স্বামী অপূর্বানন্দ?

ছেলেরা

সন্ন্যাসীঠাকুর, ঠাকুরদাদা কী মিথ্যে বকছেন। এমনি করে আমাদের ছুটি বয়ে যাবে।

সন্ন্যাসী

ঠিক বলেছ বৎস, আমারও ছুটি ফুরিয়ে আসছে।

ছেলেরা

তোমার কত দিনের ছুটি।

সন্ন্যাসী

খুব অল্প দিনের। আমার গুরুমশায় তাড়া করে বেরিয়েছেন, তিনি বেশি দূরে নেই, এলেন বলে।

ছেলেরা

ও বাবা, তোমারও গুরুমশায়!

প্রথম বালক

সন্ন্যাসীঠাকুর, চলো আমাদের যেখানে হয় নিয়ে চলো। তোমার যেখানে খুশি।

ঠাকুরদাদা

আমিও পিছনে আছি ঠাকুর, আমাকেও ভুলো না।

সন্ন্যাসী

আহা, ও ছেলেটি কে! গাছের তলায় এমন দিনে পুঁথির মধ্যে ডুবে রয়েছে।

বালকগণ

উপনন্দ।

প্রথম বালক

ভাই উপনন্দ, এসো ভাই। আমরা আজ সন্ন্যাসী ঠাকুরের চেলা সেজেছি, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। তুমি হবে সর্দার-চেলা।

উপনন্দ

না ভাই, আমার কাজ আছে।

ছেলেরা

কিচ্ছু কাজ নেই, তুমি এসো।

উপনন্দ

আমার পুঁথি নকল করতে অনেকখানি বাকি আছে।

ছেলেরা

সে বুঝি কাজ! ভারি তো কাজ! ঠাকুর, তুমি ওকে বলো-না! ও আমাদের কথা শুনবে না। কিন্তু উপনন্দকে না হলে মজা হবে না।

সন্ন্যাসী

পাশে বসিয়া

বাছা, তুমি কী কাজ করছ। আজ তো কাজের দিন না।

উপনন্দ

সন্ন্যাসীর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া

পায়ের ধুলা লইয়া

আজ ছুটির দিন—কিন্তু আমার ঋণ আছে, শোধ করতে হবে, তাই আজ কাজ করছি।

ঠাকুরদাদা

উপনন্দ, জগতে তোমার আবার ঋণ কিসের ভাই!

উপনন্দ

ঠাকুরদাদা, আমার প্রভু মারা গিয়েছেন; তিনি লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণী; সেই ঋণ আমি পুঁথি লিখে শোধ দেব।

ঠাকুরদাদা

হায় হায়, তোমার মতো কাঁচা বয়সের ছেলেকেও ঋণশোধ করতে হয়! আর এমন দিনেও ঋণশোধ! ঠাকুর, আজ নতুন উত্তরে হাওয়ায় ও পারে কাশের বনে ঢেউ দিয়েছে, এ পারে ধানের খেতের সবুজে চোখ একেবারে ডুবিয়ে দিলে, শিউলি-বন থেকে আকাশে আজ পুজোর গন্ধ ভরে উঠেছে, এরই মাঝখানে ঐ ছেলেটি আজ ঋণশোধের আয়োজনে বসে গেছে এও কি চক্ষে দেখা যায়।

সন্ন্যাসী

বল কী, এর চেয়ে সুন্দর কি আর-কিছু আছে! ঐ ছেলেটিই তো আজ শারদার বরপুত্র হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মতো এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে, চেয়ে দেখো তো! লেখো লেখো বাবা, তুমি লেখো, আমি দেখি। তুমি পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ—তোমার এত ছুটির আয়োজন আমরা তো পণ্ড করতে পারব না। দাও বাবা, একটা পুঁথি আমাকে দাও, আমিও লিখি। এমন দিনটা সার্থক হোক।

ঠাকুরদাদা

আছে আছে, চশমাটা ট্যাঁকে আছে, আমিও বসে যাই-না।

প্রথম বালক

ঠাকুর, আমরাও লিখব। সে বেশ মজা হবে।

দ্বিতীয় বালক

হাঁ হাঁ, সে বেশ মজা হবে।

উপনন্দ

বল কী ঠাকুর, তোমাদের যে ভারি কষ্ট হবে।

সন্ন্যাসী

সেইজন্যেই বসে গেছি। আজ আমরা সব মজা করে কষ্ট করব। কী বল বাবা-সকল। আজ একটা-কিছু কষ্ট না করলে আনন্দ হচ্ছে না।

সকলে

হাততালি দিয়া

হাঁ হাঁ, নইলে মজা কিসের।

প্রথম বালক

দাও, দাও, আমাকে একটা পুঁথি দাও।

দ্বিতীয় বালক

আমাকেও একটা দাও-না।

উপনন্দ

তোমরা পারবে তো ভাই?

প্রথম বালক

খুব পারব। কেন পারব না।

উপনন্দ

শ্রান্ত হবে না তো?

দ্বিতীয় বালক

কখ্‌খনো না।

উপনন্দ

খুব ধরে ধরে লিখতে হবে কিন্তু।

প্রথম বালক

তা বুঝি পারি নে? আচ্ছা, তুমি দেখো।

উপনন্দ

ভুল থাকলে চলবে না।

দ্বিতীয় বালক

কিচ্ছু ভুল থাকবে না।

প্রথম বালক

এ বেশ মজা হচ্ছে। পুঁথি শেষ করব তবে ছাড়ব।

দ্বিতীয় বালক

নইলে ওঠা হবে না।

তৃতীয় বালক

কী বল ঠাকুরদা, আজ লেখা শেষ করে দিয়ে তবে উপনন্দকে নিয়ে নৌকো বাচ করতে যাব। বেশ মজা।

ঠাকুরদাদার গান

সিন্ধুভৈরবী। তেওরা

আনন্দেরই সাগর থেকে
এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধ'রে আজ বোস্‌ রে সবাই,
টান্‌ রে সবাই টান্‌।
বোঝা যত বোঝাই করি
করব রে পার দুখের তরী,
ঢেউয়ের 'পরে ধরব পাড়ি,
যায় যদি যাক প্রাণ।
কে ডাকে রে পিছন হতে,
কে করে রে মানা।
ভয়ের কথা কে বলে আজ,
ভয় আছে সব জানা।
কোন্‌ শাপে কোন্‌ গ্রহের দোষে
সুখের ডাঙায় থাকব বসে?

পালের রশি ধরব কষি,
চলবে গেয়ে গান

ঠাকুরদা!

ঠাকুরদাদা

জিভ কাটিয়া

প্রভু, তুমিও আমাকে পরিহাস করবে?

সন্ন্যাসী

তুমি যে জগতে ঠাকুরদা হয়েই জন্মগ্রহণ করেছ, ঈশ্বর সকলের সঙ্গেই তোমার হাসির সম্বন্ধ পাতিয়ে দিয়ে বসেছেন, সে তো তুমি লুকিয়ে রাখতে পারবে না। ছোটো ছোটো ছেলেগুলির কাছেও ধরা পড়েছ, আর আমাকেই ফাঁকি দেবে?

ঠাকুরদাদা

ছেলে-ভোলানোই যে আমার কাজ—তা ঠাকুর, তুমিও যদি ছেলের দলেই ভিড়ে যাও তা হলে কথা নেই। তা কী আজ্ঞা কর।

সন্ন্যাসী

আমি বলছিলেম, ঐ যে গানটা গাইলে ওটা আজ ঠিক হল না। দুঃখ নিয়ে ঐ অত্যন্ত টানাটানির কথাটা ওটা আমার কানে ঠিক লাগছে না। দুঃখ তো জগৎ ছেয়েই আছে, কিন্তু চার দিকে চেয়ে দেখো-না, টানাটানির তো কোনো চেহারা দেখা যায় না। তাই এই শরৎ-প্রভাতের মান রাখবার জন্যে আমাকে আর-একটা গান গাইতে হল।

ঠাকুরদাদা

তোমাদের সঙ্গ এইজন্যেই এত দামি—ভুল করলেও ভুলকে সার্থক ক'রে তোল।

সন্ন্যাসী

গান

ললিত। আড়াঠেকা

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার
গলার মুক্তাহার।
চন্দ্রসূর্য পায়ের কাছে
মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার
দুখের অলংকার।

ধন ধান্য তোমারই ধন,
কী করবে তা কও।
দিতে চাও তো দিয়ো আমায়,
নিতে চাও তো লও।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিস,
খাঁটি রতন তুই তো চিনিস—
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস
এ মোর অহংকার।

বাবা উপনন্দ, তোমার প্রভুর কী নাম ছিল।

উপনন্দ

সুরসেন।

সন্ন্যাসী

সুরসেন! বীণাচার্য!

উপনন্দ

হাঁ ঠাকুর। তুমি তাঁকে জানতে?

সন্ন্যাসী

[illegible]

উপনন্দ

তাঁর কি এত খ্যাতি ছিল!

ঠাকুরদাদা

তিনি কি এত বড়ো গুণী! তুমি তাঁর বাজনা শোনবার জন্যেই এ দেশে এসেছ? তবে তো আমরা তাঁকে চিনি নি।

সন্ন্যাসী

এখানকার রাজা?

ঠাকুরদাদা

এখানকার রাজা তো কোনোদিন তাঁকে ডাকেন নি, চক্ষেও দেখেন নি। তুমি তাঁর বীণা কোথায় শুনলে!

সন্ন্যাসী

তোমরা হয়তো জান না বিজয়াদিত্য ব'লে একজন রাজা—

ঠাকুরদাদা

বল কী ঠাকুর! আমরা অত্যন্ত মূর্খ, গ্রাম্য, তাই বলে বিজয়াদিত্যের নাম জানব না এও কি হয়! তিনি যে আমাদের চক্রবর্তী সম্রাট।

সন্ন্যাসী

তা হবে। তা সেই লোকটির সভায় একদিন সুরসেন বীণা বাজিয়েছিলেন, তখন শুনেছিলেম। রাজা তাঁকে রাজধানীতে রাখবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই পারেন নি।

ঠাকুরদাদা

হায় হায়, এত বড়ো লোকের আমরা কোনো আদর করতে পারি নি!

সন্ন্যাসী

আদর কর নি—তাতে তাঁকে কমাতে পার নি, আরো তাঁকে বড়ো করেছ। ভগবান তাঁকে নিজের সভায় ডেকে নিয়েছেন।—

বাবা উপনন্দ, তোমার সঙ্গে তাঁর কিরকমে সম্বন্ধ হল।

উপনন্দ

ছোটো বয়সে আমার বাপ মারা গেলে আমি অন্য দেশ থেকে এই নগরে আশ্রয়ের জন্যে এসেছিলেম। সেদিন শ্রাবণমাসের সকালবেলায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছিল, আমি লোকনাথের মন্দিরের এক কোণে দাঁড়াব বলে প্রবেশ করছিলেম। পুরোহিত আমাকে বোধ হয় নীচ জাত মনে করে তাড়িয়ে দিলেন। সেদিন সকালে সেইখানে বসে আমার প্রভু বীণা বাজাচ্ছিলেন। তিনি তখনই মন্দির ছেড়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন—বললেন, এসো বাবা, আমার ঘরে এসো। সেই দিন থেকে ছেলের মতো তিনি আমাকে কাছে রেখে মানুষ করেছেন—লোকে তাঁকে কত কথা বলেছে তিনি কান দেন নি। আমি তাঁকে বলেছিলেম, প্রভু, আমাকে বীণা বাজাতে শেখান, আমি তা হলে কিছু উপার্জন করে আপনার হাতে দিতে পারব। তিনি বললেন, বাবা, এ বিদ্যা পেট ভরাবার নয়; আমার আর-এক বিদ্যা জানা আছে তাই তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই ব'লে আমাকে রঙ দিয়ে চিত্র করে পুঁথি লিখতে শিখিয়েছেন। যখন অত্যন্ত অচল হয়ে উঠত তখন তিনি মাঝে মাঝে বিদেশে গিয়ে বীণা বাজিয়ে টাকা নিয়ে আসতেন। এখানে তাঁকে সকলে পাগল বলেই জানত।

সন্ন্যাসী

সুরসেনের বীণা শুনতে পেলেম না, কিন্তু বাবা উপনন্দ, তোমার কল্যাণে তাঁর আর-এক বীণা শুনে নিলুম, এর সুর কোনোদিন ভুলব না।— বাবা, লেখো লেখো।

ছেলেরা

ঐ রে ঐ আসছে! ঐ রে লখা, ঐ রে লক্ষ্মীপেঁচা।

[দৌড়

লক্ষেশ্বর

আ সর্বনাশ! যেখানটিতে আমি কৌটো পুঁতে রেখেছিলুম ঠিক সেই জায়গাটিতেই যে উপনন্দ বসে গেছে! আমি ভেবেছিলেম ছোঁড়াটা বোকা বুঝি, তাই পরের ঋণ শুধতে এসেছে।

তা তো নয় দেখছি। পরের ঘাড় ভাঙাই ওর ব্যাবসা। আমার গজমোতির খবর পেয়েছে। একটা সন্ন্যাসীকেও কোথা থেকে জুটিয়ে এনেছে দেখছি। সন্ন্যাসী হাত চেলে জায়গাটা বের করে দেবে।—

উপনন্দ!

উপনন্দ

কী।

লক্ষেশ্বর

ওঠ্ ওঠ্ ঐ জায়গা থেকে। এখানে কী করতে এসেছিস।

উপনন্দ

অমন করে চোখ রাঙাও কেন। এ কি তোমার জায়গা নাকি।

লক্ষেশ্বর

এটা আমার জায়গা কি না সে খোঁজে তোমার দরকার কী হে বাপু! ভারি সেয়ানা দেখছি। তুমি বড়ো ভালোমানুষটি সেজে আমার কাছে এসেছিলে। আমি বলি সত্যিই বুঝি প্রভুর ঋণশোধ করবার জন্যেই ছোঁড়াটা আমার কাছে এসেছে—কেননা, সেটা রাজার আইনেও আছে—

উপনন্দ

আমি তো সেইজন্যেই এখানে পুঁথি লিখতে এসেছি।

লক্ষেশ্বর

সেইজন্যেই এসেছ বটে! আমার বয়স কত আন্দাজ করছ বাপু। আমি কি শিশু।

সন্ন্যাসী

কেন বাবা, তুমি কী সন্দেহ করছ।

লক্ষেশ্বর

কী সন্দেহ করছি! তুমি তা কিছু জান না! বড়ো সাধু! ভণ্ড সন্ন্যাসী কোথাকার!

ঠাকুরদাদা

আরে কী বলিস লখা। আমার ঠাকুরকে অপমান!

উপনন্দ

এই রঙবাটা নোড়া দিয়ে তোমার মুখ গুঁড়িয়ে দেব না! টাকা হয়েছে বলে অহংকার! কাকে কী বলতে হয় জান না!

সন্ন্যাসীর পশ্চাতে লক্ষেশ্বরের লুক্কায়ন

সন্ন্যাসী

আরে কর কী ঠাকুরদা, কর কী বাবা! লক্ষেশ্বর তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি মানুষ চেনে।



যেমনি দেখেছে অমনি ধরা পড়ে গেছে। ভণ্ড সন্ন্যাসী যাকে বলে! বাবা লক্ষেশ্বর, এত দেশের এত মানুষ ভুলিয়ে এলেম, তোমাকে ভোলাতে পারলেম না।

লক্ষেশ্বর

না, ঠিক ঠাওরাতে পারছি নে। হয়তো ভালো করি নি। আবার শাপ দেবে কি কী করবে! তিনখানা জাহাজ এখনো সমুদ্রে আছে।

পায়ের ধুলা লইয়া

প্রণাম হই ঠাকুর! হঠাৎ চিনতে পারি নি। বিরূপাক্ষের মন্দিরে আমাদের ঐ বিকটানন্দ বলে একটা সন্ন্যাসী আছে, আমি বলি সেই ভণ্ডটাই বুঝি। ঠাকুরদা, তুমি এক কাজ করো। সন্ন্যাসীঠাকুরকে আমার ঘরে নিয়ে যাও; আমি ওঁকে কিছু ভিক্ষে দিয়ে দেব। আমি চললেম ব'লে। তোমরা এগোও।

ঠাকুরদাদা

তোমার বড়ো দয়া! তোমার ঘরের এক মুঠো চাল নেবার জন্যে ঠাকুর সাত সিন্ধু পেরিয়ে এসেছেন!

সন্ন্যাসী

বল কী ঠাকুরদা! এক মুঠো চাল যেখানে দুর্লভ সেখান থেকে সেটি নিতে হবে বৈকি! বাবা লক্ষেশ্বর, চলো তোমার ঘরে।

লক্ষেশ্বর

আমি পরে যাচ্ছি, তোমরা এগোও। উপনন্দ, তুমি আগে ওঠো। ওঠো, শীঘ্র ওঠো বলছি, তোলো তোমার পুঁথিপত্র।

উপনন্দ

আচ্ছা, তবে উঠলেম, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ রইল না।

লক্ষেশ্বর

না থাকলেই যে বাঁচি বাবা। আমার সম্বন্ধে কাজ কী। এত দিন তো আমার বেশ চলে যাচ্ছিল।

উপনন্দ

আমি যে ঋণ স্বীকার করেছিলেম, তোমার কাছে এই অপমান সহ্য করেই তার থেকে মুক্তি গ্রহণ করলেম। বাস, চুকে গেল।

[প্রস্থান

লক্ষেশ্বর

ওরে! সব ঘোড়সওয়ার আসে কোথা থেকে! রাজা আমার গজমোতির খবর পেলে নাকি! এর চেয়ে উপনন্দ যে ছিল ভালো। এখন কী করি।

সন্ন্যাসীকে ধরিয়া

ঠাকুর, তোমার পায়ে ধরি, তুমি ঠিক এইখানটিতে বোসো—এই-যে এইখানে—আর-একটু বাঁ দিকে সরে এসো—এই হয়েছে। খুব চেপে বোসো। রাজাই আসুক আর সম্রাটই আসুক তুমি কোনোমতেই এখান থেকে উঠো না। তা হলে আমি তোমাকে খুশি করে দেব।

ঠাকুরদাদা

আরে লখা করে কী। হঠাৎ খেপে গেল নাকি।

লক্ষেশ্বর

ঠাকুর, আমি তবে একটু আড়ালে যাই। আমাকে দেখলেই রাজার টাকার কথা মনে পড়ে যায়। শত্রুরা লাগিয়েছে; আমি সব টাকা পুঁতে রেখেছি—শুনে অবধি রাজা যে কত জায়গায় কূপ খুঁড়তে আরম্ভ করেছেন তার ঠিকানা নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, প্রজাদের জলদান করছেন। কোন্‌দিন আমার ভিটেবাড়ির ভিত কেটে জলদানের হুকুম হবে, সেই ভয়ে রাত্রে ঘুমোতে পারি নে।

[প্রস্থান

রাজদূতের প্রবেশ

দূত

সন্ন্যাসীঠাকুর, প্রণাম হই। আপনিই তো অপূর্বানন্দ?

সন্ন্যাসী

কেউ কেউ আমাকে তাই বলেই তো জানে।

দূত

আপনার অসামান্য ক্ষমতার কথা চার দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আমাদের মহারাজ সোমপাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করেন।

সন্ন্যাসী

যখনই আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন তখনই আমাকে দেখতে পাবেন।

দূত

আপনি তা হলে যদি একবার—

সন্ন্যাসী

আমি একজনের কাছে প্রতিশ্রুত আছি এইখানেই আমি অচল হয়ে বসে থাকব। অতএব আমার মতো অকিঞ্চন অকর্মণ্যকেও তোমার রাজার যদি বিশেষ প্রয়োজন থাকে তা হলে তাঁকে এইখানেই আসতে হবে।

দূত

রাজোদ্যান অতি নিকটেই—ঐখানেই তিনি অপেক্ষা করছেন।

সন্ন্যাসী

যদি নিকটেই হয় তবে তো তাঁর আসতে কোনো কষ্ট হবে না।

দূত

যে আজ্ঞা, তবে ঠাকুরের ইচ্ছা তাঁকে জানাই গে।

[প্রস্থান

ঠাকুরদাদা

প্রভু, এখানে রাজসমাগমের সম্ভাবনা হয়ে এল, আমি তবে বিদায় হই।

সন্ন্যাসী

ঠাকুরদা, তুমি আমার শিশু বন্ধুগুলিকে নিয়ে ততক্ষণ আসর জমিয়ে রাখো, আমি বেশি বিলম্ব করব না।

ঠাকুরদাদা

রাজার উৎপাতই ঘটুক আর অরাজকতাই হোক আমি প্রভুর চরণ ছাড়ছি নে।

[প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর

ঠাকুর, তুমিই অপূর্বানন্দ। তবে তো বড়ো অপরাধ হয়ে গেছে। আমাকে মাপ করতে হবে।

সন্ন্যাসী

তুমি আমাকে ভণ্ড তপস্বী বলেছ এই যদি তোমার অপরাধ হয় আমি তোমাকে মাপ করলেম।

লক্ষেশ্বর

বাবাঠাকুর, শুধু মাপ করতে তো সকলেই পারে—সে ফাঁকিতে আমার কী হবে। আমাকে একটা-কিছু ভালো রকম বর দিতে হচ্ছে। যখন দেখা পেয়েছি তখন শুধুহাতে ফিরছি নে।

সন্ন্যাসী

কী বর চাই।

লক্ষেশ্বর

লোকে যতটা মনে করে ততটা নয়, তবে কিনা আমার অল্পস্বল্প কিছু জমেছে—সে অতি যৎসামান্য—তাতে আমার মনের আকাঙ্ক্ষা তো মিটছে না। শরৎকাল এসেছে, আর ঘরে বসে থাকতে পারছি নে—এখন বাণিজ্যে বেরতে হবে। কোথায় গেলে সুবিধা হতে পারে আমাকে সেই সন্ধানটি বলে দিতে হবে—আমাকে আর যেন ঘুরে বেড়াতে না হয়।

সন্ন্যাসী

আমিও তো সেই সন্ধানেই আছি।

লক্ষেশ্বর

বল কী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী

আমি সত্যই বলছি।

লক্ষেশ্বর

ওঃ, তবে সেই কথাটাই বলো। বাবা, তোমরা আমাদের চেয়েও সেয়ানা।

সন্ন্যাসী

তার সন্দেহ আছে?

লক্ষেশ্বর

কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে

সন্ধান কিছু পেয়েছ?

সন্ন্যাসী

কিছু পেয়েছি বৈকি। নইলে এমন করে ঘুরে বেড়াব কেন।

লক্ষেশ্বর

সন্ন্যাসীর পা চাপিয়া ধরিয়া

বাবাঠাকুর, আর-একটু খোলসা করে বলো! তোমার পা ছুঁয়ে বলছি আমিও তোমাকে একেবারে ফাঁকি দেব না। কী খুঁজছ বলো তো, আমি কাউকে বলব না।

সন্ন্যাসী

তবে শোনো। লক্ষ্মী যে সোনার পদ্মটির উপরে পা দুখানি রাখেন আমি সেই পদ্মটির খোঁজে আছি।

লক্ষেশ্বর

ও বাবা! সে তো কম কথা নয়। তা হলে যে একেবারে সকল লেঠাই চোকে। ঠাকুর, ভেবে ভেবে এ তো তুমি আচ্ছা বুদ্ধি ঠাওরেছ। কোনোগতিকে পদ্মটি যদি জোগাড় করে আন তা হলে লক্ষ্মীকে আর তোমার খুঁজতে হবে না, লক্ষ্মীই তোমাকে খুঁজে বেড়াবেন; এ নইলে আমাদের চঞ্চলা ঠাকরুনটিকে তো জব্দ করবার জো নেই। তোমার কাছে তাঁর পা দুখানিই বাঁধা থাকবে। তা, তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, একলা পেরে উঠবে? এতে তো খরচপত্র আছে। এক কাজ করো-না বাবা, আমরা ভাগে ব্যাবসা করি।

সন্ন্যাসী

তা হলে তোমাকে যে সন্ন্যাসী হতে হবে। বহুকাল সোনা ছুঁতেই পাবে না।

লক্ষেশ্বর

সে যে শক্ত কথা।

সন্ন্যাসী

সব ব্যাবসা যদি ছাড়তে পার তবেই এ ব্যাবসা চলবে।

লক্ষেশ্বর

শেষকালে দু কূল যাবে না তো? যদি একেবারে ফাঁকিতে না পড়ি তা হলে তোমার তল্পি বয়ে তোমার পিছন পিছন চলতে রাজি আছি। সত্যি বলছি ঠাকুর, কারো কথায় বড়ো সহজে বিশ্বাস করি নে—কিন্তু তোমার কথাটা কেমন মনে লাগছে। আচ্ছা! আচ্ছা রাজি! তোমার চেলাই হব।

ঐ রে রাজা আসছে! আমি তবে একটু আড়ালে দাঁড়াই গে।

বন্দীগণের গান

মিশ্র কানাড়া। ঝাঁপতাল

রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে!
ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বময় হে!
দুষ্টদলদলন তব দণ্ড ভয়কারী,
শত্রুজনদর্পহর দীপ্ত তরবারি,
শংকটশরণ্য তুমি দৈন্যদুখহারী,
মুক্ত-অবরোধ তব অভ্যুদয় হে।

রাজার প্রবেশ

রাজা

প্রণাম হই ঠাকুর।

সন্ন্যাসী

জয় হোক। কী বাসনা তোমার।

রাজা

সে কথা নিশ্চয় তোমার অগোচর নেই। আমি অখণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর হতে চাই প্রভু!

সন্ন্যাসী

তা হলে গোড়া থেকে শুরু করো। তোমার খণ্ডরাজ্যটি ছেড়ে দাও।

রাজা

পরিহাস নয় ঠাকুর! বিজয়াদিত্যের প্রতাপ আমার অসহ্য বোধ হয়, আমি তার সামন্ত হয়ে থাকতে পারব না।

সন্ন্যাসী

রাজন্, তবে সত্য কথা বলি, আমার পক্ষেও সে ব্যক্তি অসহ্য হয়ে উঠেছে।

রাজা

বল কী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী

এক বর্ণও মিথ্যা বলছি নে। তাকে বশ করবার জন্যেই আমি মন্ত্রসাধনা করছি।

রাজা

তাই তুমি সন্ন্যাসী হয়েছ?

সন্ন্যাসী

তাই বটে।

রাজা

মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ হবে?

সন্ন্যাসী

অসম্ভব নয়।

রাজা

তা হলে ঠাকুর, আমার কথা মনে রেখো। তুমি যা চাও আমি তোমাকে দেব। যদি সে বশ মানে তা হলে আমার কাছে যদি—

সন্ন্যাসী

তা বেশ, সেই চক্রবর্তী সম্রাটকে আমি তোমার সভায় ধরে আনব।

রাজা

কিন্তু বিলম্ব করতে ইচ্ছা করছে না। শরৎকাল এসেছে—সকালবেলা উঠে, বেতসিনীর জলের উপর যখন আশ্বিনের রৌদ্র পড়ে, তখন আমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। যদি আশীর্বাদ কর তা হলে—

সন্ন্যাসী

কোনো প্রয়োজন নেই; শরৎকালেই আমি তাকে তোমার কাছে সমর্পণ করব। এই তো উপযুক্ত কাল। তুমি তাকে নিয়ে কী করবে।

রাজা

আমার একটা কোনো কাজে লাগিয়ে দেব—তার অহংকার দূর করতে হবে।

সন্ন্যাসী

এ তো খুব ভালো কথা। যদি তার অহংকার চূর্ণ করতে পার তা হলে ভারি খুশি হব।

রাজা

ঠাকুর, চলো আমার রাজভবনে।

সন্ন্যাসী

সেটি পারছি নে। আমার দলের লোকদের অপেক্ষায় আছি। তুমি যাও বাবা। আমার জন্যে কিছু ভেবো না। তোমার মনের বাসনা যে আমাকে ব্যক্ত করে বলেছ এতে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। বিজয়াদিত্যের যে এত শত্রু জমে উঠেছে তা তো আমি জানতেম না।

রাজা

তবে বিদায় হই। প্রণাম।

প্রস্থান। পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়া

আচ্ছা ঠাকুর, তুমি তো বিজয়াদিত্যকে জান, সত্য করে বলো দেখি, লোকে তার সম্বন্ধে যতটা রটনা করে ততটা কি সত্য!

সন্ন্যাসী

কিছুমাত্র না। লোকে তাকে একটা মস্ত রাজা বলে মনে করে, কিন্তু সে নিতান্তই সাধারণ মানুষের মতো। তার সাজসজ্জা দেখেই লোকে ভুলে গেছে।

রাজা

বলো কী ঠাকুর। হা হা হা হা! আমিও তাই ঠাউরেছিলেম! অ্যাঁ! নিতান্তই সাধারণ মানুষ!

সন্ন্যাসী

আমার ইচ্ছে আছে, আমি তাকে সেইটে আচ্ছা করে বুঝিয়ে দেব। সে যে রাজার পোশাক প'রে ফাঁকি দিয়ে অন্য পাঁচজনের চেয়ে নিজেকে মস্ত একটা কিছু ব'লে মনে করে, আমি তার সেই ভুলটা একেবারে ঘুচিয়ে দেব।

রাজা

তাই দিয়ো ঠাকুর, তাই দিয়ো।

সন্ন্যাসী

তার ভণ্ডামি আমার কাছে তো কিছু ঢাকা নেই। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম বৃষ্টি হলে পর বীজ বোনবার আগে তার রাজ্যে একটা মহোৎসব হয়। সেদিন সব চাষি গৃহস্থরা বনে গিয়ে সীতার পূজা ক'রে সকলে মিলে বনভোজন করে। সেই চাষাদের সঙ্গে একসঙ্গে পাত পেড়ে খাবার জন্যে বিজয়াদিত্যের প্রাণটা কাঁদে। রাজাই হোক আর যাই হোক, ভিতরে যে চাষাটা আছে সেটা যাবে কোথায়! সেবারে তো সে রাজবেশ ছেড়ে ওদের সঙ্গে বসে যাবার জন্যে খেপে উঠেছিল। কিন্তু ওর মন্ত্রী আর চাকর-বাকরদের মনে রাজাগিরির উচ্চ ভাব ওর চেয়ে অনেক বেশি আছে। তারা হাতে পায়ে ধরে বললে, এ কখনোই হতে পারে না। অর্থাৎ তাদের এই ভয়টা আছে যে, ঐ ছদ্মবেশটা খুলে ফেললেই আসল মানুষটা ধরা পড়ে যাবে। এইজন্যে বিজয়াদিত্যকে নিয়ে তারা বড়ো ভয়ে ভয়েই থাকে—কোন্ দিন তার সমস্ত ফাঁস হয়ে যায় এই এক বিষম ভাবনা।

রাজা

ঠাকুর, তুমি সব ফাঁস করে দাও। ও যে মিথ্যে রাজা, ভুয়ো রাজা, সে যেন আর চাপা না থাকে। ওর বড়ো অহংকার হয়েছে।

সন্ন্যাসী

আমি তো সেই চেষ্টাতেই আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো যতক্ষণ না আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ

হয় আমি সহজে ছাড়ব না।

রাজা

প্রণাম।

[প্রস্থান

উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ

ঠাকুর, আমার মনের ভার তো গেল না।

সন্ন্যাসী

কী হল বাবা!

উপনন্দ

মনে করেছিলেম লক্ষেশ্বর যখন আমাকে অপমান করেছে তখন ওর কাছে আমি আর ঋণ স্বীকার করব না। তাই পুঁথিপত্র নিয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেম। সেখানে আমার প্রভুর বীণাটি নিয়ে তার ধুলো ঝাড়তে গিয়ে তারগুলি বেজে উঠল—অমনি আমার মনটার ভিতর যে কেমন হল সে আমি বলতে পারি নে। সেই বীণার কাছে লুটিয়ে পড়ে বুক ফেটে আমার চোখের জল পড়তে লাগল। মনে হল আমার প্রভুর কাছে আমি অপরাধ করেছি। লক্ষেশ্বরের কাছে আমার প্রভু ঋণী হয়ে রইলেন, আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি! ঠাকুর, এ তো আমার কোনোমতেই সহ্য হচ্ছে না। ইচ্ছা করছে আমার প্রভুর জন্যে আজ আমি অসাধ্য কিছু-একটা করি। আমি তোমাকে মিথ্যা বলছি নে, তাঁর ঋণ শোধ করতে যদি আজ প্রাণ দিতে পারি তা হলে আমার খুব আনন্দ হবে—মনে হবে আজকের এই সুন্দর শরতের দিন আমার পক্ষে সার্থক হল।

সন্ন্যাসী

বাবা, তুমি যা বলছ সত্যই বলছ।

উপনন্দ

ঠাকুর, তুমি তো অনেক দেশ ঘুরেছ, আমার মতো অকর্মণ্যকেও হাজার কার্যাপণ দিয়ে কিনতে পারেন এমন মহাত্মা কেউ আছেন? তা হলেই ঋণটা শোধ হয়ে যায়। এ নগরে যদি চেষ্টা করি তা হলে বালক ব'লে, ছোটো জাত ব'লে, সকলে আমাকে খুব কম দাম দেবে।

সন্ন্যাসী

না বাবা, তোমার মূল্য এখানে কেউ বুঝবে না। আমি ভাবছি কী, যিনি তোমার প্রভুকে অত্যন্ত আদর করতেন সেই বিজয়াদিত্য ব'লে রাজাটার কাছে গেলে কেমন হয়।

উপনন্দ

বিজয়াদিত্য? তিনি যে আমাদের সম্রাট!

সন্ন্যাসী

তাই নাকি?

উপনন্দ

তুমি জান না বুঝি?

সন্ন্যাসী

তা হবে। নাহয় তাই হল।

উপনন্দ

আমার মতো ছেলেকে তিনি কি দাম দিয়ে কিনবেন।

সন্ন্যাসী

বাবা, বিনা মূল্যে কেনবার মতো ক্ষমতা তাঁর যদি থাকে তা হলে বিনা মূল্যেই কিনবেন। কিন্তু তোমার ঋণটুকু শোধ করে না দিতে পারলে তাঁর এত ঋণ জমবে যে তাঁর রাজভাণ্ডার লজ্জিত হবে, এ আমি তোমাকে সত্যই বলছি।

উপনন্দ

ঠাকুর, এও কি সম্ভব।

সন্ন্যাসী

বাবা, জগতে কেবল কি এক লক্ষেশ্বরই সম্ভব, তার চেয়ে বড়ো সম্ভাবনা কি আর কিছুই নেই।

উপনন্দ

আচ্ছা, যদি সে সম্ভব হয় তো হবে, কিন্তু আমি ততদিন পুঁথিগুলি নকল করে কিছু কিছু শোধ করতে থাকি—নইলে আমার মনে বড়ো গ্লানি হচ্ছে।

সন্ন্যাসী

ঠিক কথা বলেছ বাবা। বোঝা মাথায় তুলে নাও, কারো প্রত্যাশায় ফেলে রেখে সময় বইয়ে দিয়ো না।

উপনন্দ

তা হলে চললেম ঠাকুর। তোমার কথা শুনে আমি মনে কত যে বল পেয়েছি সে আমি বলে উঠতে পারি নে।

সন্ন্যাসী

তোমাকে দেখে আমিও যে কত বল লাভ করেছি সে কথা কেমন করে বুঝবে। এক কাজ করো বাবা, আমার খেলার দলটি ভেঙে গিয়েছে, আবার তাদের সকলকে ডেকে নিয়ে এসো গে।

উপনন্দ

তা আনছি, কিন্তু ঠাকুর, তোমার দলটিকে আমার পুঁথি নকল করার কাজে লাগালে চলবে না। তারা আমার সব নষ্ট করে দেয়; এত খুশি হয়ে করে যে বারণ করতেও পারি নে।

[প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর

ঠাকুর, অনেক ভেবে দেখলেম—পারব না। তোমার চেলা হওয়া আমার কর্ম নয়। যা পেয়েছি তা অনেক দুঃখে পেয়েছি, তোমার এক কথায় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে শেষকালে হায়-হায় করে মরব! আমার বেশি আশায় কাজ নেই।

সন্ন্যাসী

সে কথাটা বুঝলেই হল।

লক্ষেশ্বর

ঠাকুর, এবার একটুখানি উঠতে হচ্ছে।

সন্ন্যাসী

উঠিয়া

তা হলে তোমার কাছ থেকে ছুটি পাওয়া গেল।

লক্ষেশ্বর

মাটি ও শুষ্কপত্র সরাইয়া কৌটা বাহির করিয়া

ঠাকুর, এইটুকুর জন্যে আজ সকাল থেকে সমস্ত হিসাব-কিতাব ফেলে রেখে এই জায়গাটার চার দিকে ভূতের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি। এই যে গজমোতি, এ আমি তোমাকেই আজ প্রথম দেখালেম। আজ পর্যন্ত কেবলই এটাকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়েছি; তোমাকে দেখাতে পেরে মনটা তবু একটু হালকা হল।

সন্ন্যাসীর হাতের কাছে অগ্রসর করিয়াই

তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া লইয়া

না, হল না! তোমাকে যে এত বিশ্বাস করলেম, তবু এ জিনিস একটিবার তোমার হাতে তুলে দিই এমন শক্তি আমার নেই। এই-যে আলোতে এটাকে তুলে ধরেছি, আমার বুকের ভিতর যেন গুর্‌গুর্‌ করছে। আচ্ছা ঠাকুর, বিজয়াদিত্য কেমন লোক বলো তো। তাকে বিক্রি করতে গেলে সে তো দাম না দিয়ে এটা আমার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেবে না? আমার ঐ এক মুশকিল হয়েছে। আমি এটা বেচতেও পারছি নে, রাখতেও পারছি নে, এর জন্যে আমার রাত্রে ঘুম হয় না।—

বিজয়াদিত্যকে তুমি বিশ্বাস কর?

সন্ন্যাসী

সব সময়েই কি তাকে বিশ্বাস করা যায়।

লক্ষেশ্বর

সেই তো মুশকিলের কথা। আমি দেখছি, এটা মাটিতেই পোঁতা থাকবে, হঠাৎ কোন্‌ দিন মরে যাব, কেউ সন্ধানও পাবে না।

সন্ন্যাসী

রাজাও না, সম্রাটও না, ঐ মাটিই সব ফাঁকি দিয়ে নেবে। তোমাকেও নেবে, আমাকেও নেবে।

লক্ষেশ্বর

তা নিক গে, কিন্তু আমার কেবলই ভাবনা হয় আমি মরে গেলে পর কোথা থেকে কে এসে হঠাৎ হয়তো খুঁড়তে খুঁড়তে ওটা পেয়ে যাবে। যাই হোক ঠাকুর, কিন্তু তোমার মুখে ঐ সোনার পদ্মর কথাটা আমার কাছে বড়ো ভালো লাগল। আমার কেমন মনে হচ্ছে, ওটা তুমি হয়তো খুঁজে বের করতে পারবে। কিন্তু তা হোক গে, আমি তোমার চেলা হতে পারব না। প্রণাম।

[প্রস্থান

ঠাকুরদাদার প্রবেশ

সন্ন্যাসী

ঠাকুরদা, আজ অনেক দিন পরে একটি কথা খুব স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি—সেটি তোমাকে খুলে না বলে থাকতে পারছি নে।

ঠাকুরদাদা

আমার প্রতি ঠাকুরের বড়ো দয়া!

সন্ন্যাসী

আমি অনেক দিন ভেবেছি, জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন। কিছুই ভেবে পাই নি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি—জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে। বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ ক'রে করছে। সেইজন্যেই ধানের খেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেইজন্যেই এত সৌন্দর্য।

ঠাকুরদাদা

এক দিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি কেবলই ঢেলে দিচ্ছেন, আর-এক দিকে কঠিন দুঃখে তারই শোধ চলছে। সেই দুঃখের আনন্দ এবং সৌন্দর্য যে কী সে কথা তোমার কাছে পূর্বেই শুনেছি। প্রভু, কেবল এই দুঃখের জোরেই পাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার ওজন বেশ সমান থেকে যাচ্ছে, মিলনটি এমন সুন্দর হয়ে উঠেছে।

সন্ন্যাসী

ঠাকুরদা, যেখানে আলস্য, যেখানে কৃপণতা, যেখানেই ঋণশোধে ঢিল পড়ে যাচ্ছে, সেইখানেই সমস্ত কুশ্রী, সমস্তই অব্যবস্থা।

ঠাকুরদা

সেইখানেই যে এক পক্ষে কম পড়ে যায়, অন্য পক্ষের সঙ্গে মিলন পুরো হতে পায় না।

সন্ন্যাসী

লক্ষ্মী যখন মানবের মর্ত্যলোকে আসেন তখন দুঃখিনী হয়েই আসেন; তাঁর সেই সাধনার তপস্বিনী-বেশেই ভগবান মুগ্ধ হয়ে আছেন; শত দুঃখেরই দলে তাঁর সোনার পদ্ম সংসারে ফুটে উঠেছে, সে খবরটি আজ ঐ উপনন্দের কাছ থেকে পেয়েছি।

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর

তোমরা চুপিচুপি দুটিতে কী পরামর্শ করছ।

সন্ন্যাসী

আমাদের সেই সোনার পদ্মের পরামর্শ।

লক্ষেশ্বর

অ্যাঁ! এরই মধ্যে ঠাকুরদার কাছে সমস্ত ফাঁস করে বসে আছ? বাবা, তুমি এই ব্যাবসাবুদ্ধি নিয়ে সোনার পদ্মর আমদানি করবে? তবেই হয়েছে! তুমি যেই মনে করলে আমি রাজি হলেম না, অমনি তাড়াতাড়ি অন্য অংশীদার খুঁজতে লেগে গেছ! কিন্তু এ-সব কি ঠাকুরদার কর্ম। ওঁর পুঁজিই বা কী।

সন্ন্যাসী

তুমি খবর পাও নি। কিন্তু একেবারে পুঁজি নেই তা নয়! ভিতরে ভিতরে জমিয়েছে!

লক্ষেশ্বর

ঠাকুরদাদার পিঠ চাপড়াইয়া

সত্যি নাকি ঠাকুরদা। বড়ো তো ফাঁকি দিয়ে আসছ। তোমাকে তো চিনতেম না। লোকে আমাকেই সন্দেহ করে, তোমাকে তো স্বয়ং রাজাও সন্দেহ করে না। তা হলে এতদিনে খানাতল্লাসি পড়ে যেত। আমি তো দাদা, গুপ্তচরের ভয়ে ঘরে চাকরবাকর রাখি নে।

ঠাকুরদাদা

তবে যে আজ সকালে ছেলে তাড়াবার বেলায় ঊর্ধ্বস্বরে চোবে, তেওয়ারি, গির্‌ধারীলালকে হাঁক পাড়ছিলে!

লক্ষেশ্বর

যখন নিশ্চয় জানি হাঁক পাড়লেও কেউ আসবে না, তখন ঊর্ধ্বস্বরের জোরেই আসর গরম করে তুলতে হয়। কিন্তু ব'লে তো ভালো করলেম না। মানুষের সঙ্গে কথা কবার তো বিপদই ঐ। সেইজন্যেই কারো কাছে ঘেঁষি নে। দেখো দাদা, ফাঁস করে দিয়ো না!

ঠাকুরদাদা

ভয় নেই তোমার।

লক্ষেশ্বর

ভয় না থাকলেও তবু ভয় ঘোচে কই। যা হোক ঠাকুর, একা ঠাকুরদাকে নিয়ে অত বড়ো

কাজটা চলবে না। আমরা নাহয় তিন জনেই অংশীদার হব। ঠাকুরদা আমাকে ফাঁকি দিয়ে জিতে নেবে সেটি হচ্ছে না। আচ্ছা ঠাকুর, তবে আমিও তোমার চেলা হতে রাজি হলেম।

ঐ-যে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ আসছে! ঐ দেখছ না দূরে? আকাশে যে ধুলো উড়িয়ে দিয়েছে! সবাই খবর পেয়েছে স্বামী অপূর্বানন্দ এসেছেন। এবার পায়ের ধুলো নিয়ে তোমার পায়ের তেলো হাঁটু পর্যন্ত খইয়ে দেবে। যাই হোক, তুমি যেরকম আলগা মানুষ দেখছি, সেই কথাটা আর কারো কাছে ফাঁস কোরো না—অংশীদার আর বাড়িয়ো না।

কিন্তু ঠাকুরদা, লাভ-লোকসানের ঝুঁকি তোমাকেও নিতে হবে; অংশীদার হলেই হয় না, সব কথা ভেবে দেখো।

[প্রস্থান

সন্ন্যাসী

ঠাকুরদা, আর তো দেরি করলে চলবে না। লোকজন জুটতে আরম্ভ করেছে, 'পুত্র দাও' 'ধন দাও' করে আমাকে একেবারে মাটি করে দেবে। ছেলেগুলিকে এইবেলা ডাকো। তারা ধন চায় না, পুত্র চায় না, তাদের সঙ্গে খেলা জুড়ে দিলেই পুত্রধনের কাঙালরা আমাকে ত্যাগ করবে।

ঠাকুরদাদা

ছেলেদের আর ডাকতে হবে না। ঐ-যে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এল ব'লে।

লক্ষেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ

লক্ষেশ্বর

না বাবা, আমি পারব না। ভালো বুঝতে পারছি নে! ও-সবে আমার কাজ নেই—আমার যা আছে সেই ভালো! কিন্তু, তুমি আমাকে কী যেন মন্ত্র করেছ, তোমার কাছ থেকে না পালালে আমার তো রক্ষে নেই। তুমি ঠাকুরদাকে নিয়েই কারবার করো, আমি চললেম।

[দ্রুত প্রস্থান

ছেলেদের প্রবেশ

ছেলেরা

সন্ন্যাসীঠাকুর! সন্ন্যাসীঠাকুর!

সন্ন্যাসী

কী বাবা।

ছেলেরা

তুমি আমাদের নিয়ে খেলো।

সন্ন্যাসী

সে কি হয় বাবা! আমার কি সে ক্ষমতা আছে। তোমরা আমাকে নিয়ে খেলাও!

ছেলেরা

কী খেলা খেলবে।

সন্ন্যাসী

আমরা আজ শারদোৎসব খেলব।

প্রথম বালক

সে বেশ হবে।

দ্বিতীয় বালক

সে বেশ মজা হবে।

তৃতীয় বালক

সে কী খেলা ঠাকুর।

চতুর্থ বালক

সে কেমন করে খেলতে হয়।

সন্ন্যাসী

তবে এক কাজ করো। ঐ কাশবন থেকে কাশ তুলে নিয়ে এসো। আঁচল ভরে ধানের মঞ্জরী আনতে হবে। আর, তোমরা আজ শিউলিফুলের মালা গেঁথে ঐখানে ফেলে রেখে গেছ, সেগুলো নিয়ে এসো।

প্রথম বালক

কী করতে হবে ঠাকুর।

সন্ন্যাসী

আমাকে তোমরা সাজিয়ে দেবে—আমি হব শারদোৎসবের পুরোহিত।

সকলে

হাততালি দিয়া

হাঁ, হাঁ, হাঁ! সে বড়ো মজাই হবে।

কাশগুচ্ছ প্রভৃতি আনিয়া ছেলেরা সকলে মিলিয়া

সন্ন্যাসীকে সাজাইতে প্রবৃত্ত হইল

একদল লোকের প্রবেশ

প্রথম ব্যক্তি

ওরে ছোঁড়াগুলো, সন্ন্যাসী কোথায় গেল রে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি

কই বাবা, সন্ন্যাসী কই।

বালকগণ

এই-যে আমাদের সন্ন্যাসী।

প্রথম ব্যক্তি

ও তো তোদের খেলার সন্ন্যাসী। সত্যিকার সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন।

সন্ন্যাসী

সত্যিকার সন্ন্যাসী কি সহজে মেলে। আমি এই ছেলেদের সঙ্গে মিলে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী খেলছি।

প্রথম ব্যক্তি

ও তোমার কী রকম খেলা গা!

দ্বিতীয় ব্যক্তি

ওতে যে অপরাধ হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি

ফেলো ফেলো, তোমার জটা ফেলো!

চতুর্থ ব্যক্তি

দেখো-না আবার গেরুয়া পরেছে!

সন্ন্যাসী

জটাও ফেলব, গেরুয়াও ছাড়ব, সবই হবে, খেলাটা সম্পূর্ণ হয়ে যাক।

প্রথম ব্যক্তি

তবে যে আমাদের কে একজন বললে, কোথাকার কোন্ একজন স্বামী এসেছে!

সন্ন্যাসী

যদি-বা এসে থাকে, তাকে দিয়ে তোমাদের কোনো কাজ হবে না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি

কেন, সে ভণ্ড নাকি?

সন্ন্যাসী

তা নয় তো কী।

তৃতীয় ব্যক্তি

বাবা, তোমার চেহারাটি কিন্তু ভালো। তুমি মন্ত্রতন্ত্র কিছু শিখেছ?

সন্ন্যাসী

শেখবার ইচ্ছা তো আছে কিন্তু শেখায় কে।

তৃতীয় ব্যক্তি

একটি লোক আছে বাবা, সে থাকে ভৈরবপুরে—লোকটা বেতালসিদ্ধ। একটি লোকের ছেলে মারা যাচ্ছিল, তার বাপ এসে ধরে পড়তেই লোকটা করলে কী, সেই ছেলেটার প্রাণপুরুষকে একটা নেকড়ে বাঘের মধ্যে চালান করে দিলে। বললে বিশ্বাস করবে না, ছেলেটা মোলো বটে কিন্তু নেকড়েটা আজও দিব্যি বেঁচে আছে। না, হাসছ কী? আমার সম্বন্ধী স্বচক্ষে দেখে এসেছে। সেই নেকড়েটাকে মারতে গেলে বাপ লাঠি হাতে ছুটে আসে। তাকে দু বেলা ছাগল খাইয়ে লোকটা ফতুর হয়ে গেল। বিদ্যে যদি শিখতে চাও তো সেই সন্ন্যাসীর কাছে যাও।

প্রথম ব্যক্তি

ওরে, চল্‌ রে, বেলা হয়ে গেল। সন্ন্যাসী-ফন্ন্যাসী সব মিথ্যে। সে কথা আমি তো তখনই বলেছিলেম। আজকালকার দিনে কি আর সেরকম যোগবল আছে!

দ্বিতীয় ব্যক্তি

সে তো সত্যি। কিন্তু আমাকে যে কালুর মা বললে, তার ভাগনে নিজের চক্ষে দেখে এসেছে, সন্ন্যাসী এক টান গাঁজা টেনে কল্কেটা যেমনি উপুড় করলে অমনি তার মধ্যে থেকে একভাঁড় মদ আর একটা আস্ত মড়ার মাথার খুলি বেরিয়ে পড়ল!

তৃতীয় ব্যক্তি

বল কী, নিজের চক্ষে দেখেছে!

দ্বিতীয় ব্যক্তি

হাঁ রে, নিজের চক্ষে বৈকি।

তৃতীয় ব্যক্তি

আছে রে আছে, সিদ্ধপুরুষ আছে; ভাগ্যে যদি থাকে তবে তো দর্শন পাব। তা চল্‌-না ভাই, কোন্‌ দিকে গেল একবার দেখে আসি গে।

[প্রস্থান

সন্ন্যাসী

বালকদের প্রতি

বাবা, আজ যে তোমাদের সব সোনার রঙের কাপড় পরতে হবে।

ছেলেরা

সোনার রঙের কাপড় কেন ঠাকুর।

সন্ন্যাসী

বাইরে যে আজ সোনা ঢেলে দিয়েছে। তারই সঙ্গে আমাদেরও আজ অন্তরে-বাইরে মিলে যেতে হবে তো— নইলে এই শরতের উৎসবে আমরা যোগ দিতে পারব কী করে। আজ এই আলোর সঙ্গে আকাশের সঙ্গে মিলব বলেই তো উৎসব।

ছেলেরা

সোনার রঙের কাপড় কোথায় পাব ঠাকুর।

সন্ন্যাসী

ঐ বেতসিনীর ধার দিয়ে যাও, যেখানে বটতলায় পোড়ো মন্দিরটা আছে সেই মন্দিরটায় সমস্ত সাজানো আছে। ঠাকুরদা, তুমি এদের সাজিয়ে আনো গে!

ঠাকুরদাদা

তবে চলো সবাই।

[প্রস্থান

সন্ন্যাসীর গান

রামকেলি। কাওয়ালি

নব কুন্দধবলদল সুশীতলা,
অতি সুনির্মলা, সুখসমুজ্জ্বলা,
শুভ সুবর্ণ-আসনে অচঞ্চলা
স্মিত উদয়ারুণ-কিরণ-বিলাসিনী,
পূর্ণসিতাংশু-বিভাস-বিকাশিনী
নন্দনলক্ষ্মী সুমঙ্গলা।

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর

দেখো ঠাকুর, তোমার মন্তর যদি ফিরিয়ে না নাও তো ভালো হবে না বলছি। কী মুশকিলেই ফেলেছ, আমার হিসেবের খাতা মাটি হয়ে গেল। একবার মনটা বলে যাই সোনার পদ্মর খোঁজে, আবার বলি থাক্ গে ও-সব বাজে কথা। একবার মনে ভাবি এবার বুঝি তবে ঠাকুরদাই জিতলে বা, আবার ভাবি মরুক গে ঠাকুরদা! ঠাকুর, এ তো ভালো কথা নয়। চেলা-ধরা ব্যাবসা দেখছি তোমার! কিন্তু সে হবে না, কোনোমতেই হবে না। চুপ করে হাসছ কী। আমি বলছি আমাকে পারবে না—আমার শক্ত হাড়। লক্ষেশ্বর কোনোদিন তোমার চেলাগিরিতে ভিড়বে না।

[প্রস্থান

ফুল লইয়া ছেলেদের প্রবেশ

সন্ন্যাসী

এবার অর্ঘ্য সাজানো যাক। এ যে টগর, এই বুঝি মালতী, শেফালিকাও অনেক এনেছ দেখছি! সমস্তই শুভ্র, শুভ্র, শুভ্র! বাবা, এইবার সব দাঁড়াও। একবার পূর্ব আকাশে দাঁড়িয়ে বেদমন্ত্র পড়ে নিই।

বেদমন্ত্র

অক্ষি দুঃখোত্থিতস্যেব সুপ্রসন্নে কনীনিকে।
আংক্তে চাদ্‌গণং নাস্তি ঋভূনাং তন্নিবোধত।
কনকাভানি বাসাংসি অহতানি নিবোধত।
অন্নমশ্নীত মৃজ্মীত অহং বো জীবনপ্রদঃ।
এতা বাচঃ প্রযুজ্যন্তে শরদ্‌যত্রোপদৃশ্যতে।

এবারে সকলে মিলে তোমাদের শারদোৎসবের আবাহন-গানটি গাইতে গাইতে বনপথ প্রদক্ষিণ করে এসো। ঠাকুরদা, তুমি গানটি ধরিয়ে দাও। তোমাদের উৎসবের গানে বনলক্ষ্মীদের

জাগিয়ে দিতে হবে।

গান

মিশ্র রামকেলি। একতালা

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালিমালা।
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এসো নির্মল নীল পথে,
এসো ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল
বনগিরি-পর্বতে।
এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল-শিশির-ঢালা।
ঝরা মালতীর ফুলে
আসন বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণমূলে।
গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার
সোনার বীণার তারে
মৃদু মধু ঝংকারে,
হাসিঢালা সুর গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুধারে।
রহিয়া রহিয়া যে পরশমণি
ঝলকে অলককোণে
পলকের তরে সকরুণ করে
বুলায়ো বুলায়ো মনে—
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা,
আঁধার হইবে আলা।

সন্ন্যাসী

পৌঁচেছে, তোমাদের গান আজ একেবারে আকাশের পারে গিয়ে পৌঁচেছে। দ্বার খুলেছে

তাঁর। দেখতে পাচ্ছ কি, শারদা বেরিয়েছেন। দেখতে পাচ্ছ না! দূরে দূরে, সে অনেক দূরে, বহু বহু দূরে। সেখানে চোখ যে যায় না। সেই জগতের সকল আরম্ভের প্রান্তে, সেই উদয়াচলের প্রথমতম শিখরটির কাছে, যেখানে প্রতিদিন উষার প্রথম পদক্ষেপটি পড়লেও তবু তাঁর আলো চোখে এসে পৌঁছোয় না, অথচ ভোরের অন্ধকারের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে— সেই অনেক অনেক দূরে। সেইখানে হৃদয়টি মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকো, ধীরে ধীরে একটু একটু করে দেখতে পাবে। আমি ততক্ষণ আগমনীর গানটি গাইতে থাকি।

গান

ভৈরবী। একতালা

লেগেছে অমল ধবল পালে
মন্দ মধুর হাওয়া।
দেখি নাই কভু দেখি নাই
এমন তরণী বাওয়া।
কোন্ সাগরের পার হতে আনে
কোন্ সুদূরের ধন!
ভেসে যেতে চায় মন—
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া।

পিছনে ঝরিছে ঝরো ঝরো জল,
গুরু গুরু দেয়া ডাকে—
মুখে এসে পড়ে অরুণকিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কে গো তুমি, কার
হাসিকান্নার ধন—
ভেবে মরে মোর মন—
কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র,
কী মন্ত্র হবে গাওয়া!

এবারে আর দেখতে পাই নি বলবার জো নেই।

প্রথম বালক

কই ঠাকুর, দেখিয়ে দাও-না।

সন্ন্যাসী

ঐ-যে সাদা মেঘ ভেসে আসছে।

দ্বিতীয় বালক

হাঁ হাঁ, ভেসে আসছে।

তৃতীয় বালক

হাঁ, আমিও দেখেছি।

সন্ন্যাসী

ঐ-যে আকাশ ভরে গেল।

প্রথম বালক

কিসে।

সন্ন্যাসী

কিসে! এই তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আলোতে, আনন্দে। বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্ছ না?

দ্বিতীয় বালক

হাঁ, পাচ্ছি।

সন্ন্যাসী

তবে আর-কি! চক্ষু সার্থক হয়েছে, শরীর পবিত্র হয়েছে, মন প্রশান্ত হয়েছে। এসেছেন, এসেছেন, আমাদের মাঝখানেই এসেছেন। দেখছ না বেতসিনী নদীর ভাবটা! আর, ধানের খেত কী রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গাও গাও, ঠাকুরদা, বরণের গানটা গাও!

ঠাকুরদাদার গান

আলেয়া। একতালা

আমার নয়ন-ভুলানো এলে!
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!

সন্ন্যাসী

যাও বাবা, তোমরা সমস্ত বনে বনে নদীর ধারে ধারে গেয়ে এসো গে।

[ছেলেদের গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

ঠাকুরদাদা

প্রভু, আমি যে একেবারে ডুবে গিয়েছি। ডুবে গিয়ে তোমার এই পায়ের তলাটিতে এসে ঠেকেছি। এখান থেকে আর নড়তে পারব না।

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

ঠাকুরদাদা

এ কী হল! লখা, গেরুয়া ধরেছ যে!

লক্ষেশ্বর

সন্ন্যাসীঠাকুর, এবার আর কথা নেই। আমি তোমারই চেলা। এই নাও আমার গজমোতির

কৌটো, এই আমার মণিমাণিক্যের পেটিকা তোমারই কাছে রইল। দেখো ঠাকুর, সাবধানে রেখো।

সন্ন্যাসী

তোমার এমন মতি কেন হল লক্ষেশ্বর।

লক্ষেশ্বর

সহজে হয় নি প্রভু। সম্রাট্ বিজয়াদিত্যের সৈন্য আসছে। এবার আমার ঘরে কি আর কিছু থাকবে। তোমার গায়ে তো কেউ হাত দিতে পারবে না, এ সমস্ত তোমার কাছেই রাখলেম। তোমার চেলাকে তুমি রক্ষা কোরো বাবা, আমি তোমার শরণাগত।

রাজার প্রবেশ

রাজা

সন্ন্যাসীঠাকুর।

সন্ন্যাসী

বোসো, বোসো, তুমি যে হাঁপিয়ে পড়েছ! একটু বিশ্রাম করো।

রাজা

বিশ্রাম করবার সময় নেই। ঠাকুর, চরের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বিজয়াদিত্যের পতাকা দেখা দিয়েছে, তাঁর সৈন্যদল আসছে।

সন্ন্যাসী

বল কী। বোধ হয় শরৎকালের আনন্দে তাঁকে আর ঘরে টিকতে দেয় নি। তিনি রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন।

রাজা

কী সর্বনাশ! রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন।

সন্ন্যাসী

বাবা, এতে দুঃখিত হলে চলবে কেন। তুমিও তো রাজ্যবিস্তার করবার জন্যে বেরোবার উদ্যোগে ছিলে।

রাজা

না, সে হল স্বতন্ত্র কথা। তাই ব'লে আমার এই রাজ্যটুকুতে—তা সে যাই হোক, আমি তোমার শরণাগত। এই বিপদ হতে আমাকে বাঁচাতেই হবে, বোধ হয় কোনো দুষ্টলোক তাঁর কাছে লাগিয়েছে যে আমি তাঁকে লঙঘন করতে ইচ্ছা করছি। তুমি তাঁকে বোলো সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা! সর্বৈব মিথ্যা! আমি কি এমনি উন্মত্ত! আমার রাজচক্রবর্তী হবার দরকার কী! আমার শক্তিই-বা এমন কী আছে!

সন্ন্যাসী

ঠাকুরদা।

ঠাকুরদা

কী প্রভু।

সন্ন্যাসী

দেখো, আমি কৌপীন প'রে এবং গুটিকতক ছেলেকে মাত্র নিয়ে শারদোৎসব কেমন জমিয়ে তুলেছিলেম, আর ঐ চক্রবর্তী-সম্রাট্‌টা তার সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে এমন দুর্লভ উৎসব কেবল নষ্টই করতে পারে! লোকটা কিরকম দুর্ভাগা দেখেছ!

রাজা

চুপ করো, চুপ করো ঠাকুর! কে আবার কোন্‌ দিক থেকে শুনতে পাবে।

সন্ন্যাসী

ঐ বিজয়াদিত্যের 'পরে আমার—

রাজা

আরে, চুপ চুপ! তুমি সর্বনাশ করবে দেখছি! তাঁর প্রতি তোমার মনের ভাব যাই থাক্‌ সে তুমি মনেই রেখে দাও।

সন্ন্যাসী

তোমার সঙ্গে পূর্বেও তো সে বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়ে গেছে।

রাজা

কী মুশকিলেই পড়লেম! সে-সব কথা কেন ঠাকুর, সে এখন থাক্‌-না। —ওহে লক্ষেশ্বর, তুমি এখানে বসে বসে কী শুনছ! এখান থেকে যাও-না।

লক্ষেশ্বর

মহারাজ, যাই এমন আমার সাধ্য কি আছে! একেবারে পাথর দিয়ে চেপে রেখেছে। যমে না নড়ালে আমার আর নড়চড় নেই। নইলে মহারাজের সামনে আমি যে ইচ্ছাসুখে বসে থাকি এমন আমার স্বভাবই নয়।

বিজয়াদিত্যের অমাত্যগণের প্রবেশ

জয় হোক মহারাজাধিরাজচক্রবর্তী বিজয়াদিত্য!

ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

রাজা

আরে করেন কী, করেন কী! আমাকে পরিহাস করছেন নাকি! আমি বিজয়াদিত্য নই। আমি তাঁর চরণাশ্রিত সামন্ত সোমপাল।

মন্ত্রী

মহারাজ, সময় তো অতীত হয়েছে, এক্ষণে রাজধানীতে ফিরে চলুন।

সন্ন্যাসী

ঠাকুরদা, পূর্বেই তো বলেছিলেম পাঠশালা ছেড়ে পালিয়েছি, কিন্তু গুরুমশায় পিছন পিছন তাড়া করেছেন।

ঠাকুরদাদা

প্রভু, এ কী কাণ্ড! আমি তো স্বপ্ন দেখছি নে!

সন্ন্যাসী

স্বপ্ন তুমিই দেখছ কি এঁরাই দেখছেন তা নিশ্চয় ক'রে কে বলবে।

ঠাকুরদাদা

তবে কি—

সন্ন্যাসী

হাঁ, এঁরা কয়েকজনে আমাকে বিজয়াদিত্য বলেই তো জানেন।

ঠাকুরদাদা

প্রভু, আমিই তো তবে জিতেছি। এই কয় দণ্ডে আমি তোমার যে পরিচয়টি পেয়েছি তা এঁরা পর্যন্ত পান নি! কিন্তু বড়ো সংকটে ফেললে তো ঠাকুর।

লক্ষেশ্বর

আমিও বড়ো সংকটে পড়েছি মহারাজ। আমি সম্রাটের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সন্ন্যাসীর হাতে ধরা দিয়েছি, এখন আমি যে কার হাতে আছি সেটা ভেবেই পাচ্ছি নে।

রাজা

মহারাজ, দাসকে কি পরীক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন!

সন্ন্যাসী

না সোমপাল, আমি নিজের পরীক্ষাতেই বেরিয়েছিলেম।

রাজা

জোড়হস্তে

এই অপরাধীর প্রতি মহারাজের কী বিধান।

সন্ন্যাসী

বিশেষ কিছুই না। তোমার কাছে যে কয়টা বিষয়ে প্রতিশ্রুত আছি সে আমি সেরে দিয়ে যাব।

রাজা

আমার কাছে আবার প্রতিশ্রুত!

সন্ন্যাসী

তার মধ্যে একটা তো উদ্ধার করেছি। বিজয়াদিত্য যে তোমাদের সকলের সমান, সে যে নিতান্ত সাধারণ মানুষ, সেটা তো ফাঁস হয়েই গেছে। নিজের এই পরিচয়টুকু পাবার জন্যেই

রাজতক্ত ছেড়ে সন্ন্যাসী সেজে সকল লোকের মাঝখানে নেবে এসেছিলেম। এখন তোমার একটা কিছু কাজ ক'রে দিয়ে যাব এই প্রতিশ্রুতিটি রক্ষা করতে হবে। বিজয়াদিত্যকে তোমার সভায় আজই হাজির ক'রে দেব—তাকে দিয়ে তোমার কোন্ কাজ করাতে চাও বলো।

রাজা

নতশিরে

তাঁকে দিয়ে আমার অপরাধ মার্জনা করাতে চাই।

সন্ন্যাসী

তা বেশ কথা। আমাকে যদি সম্রাট্ ব'লে মানো তবে আমার সম্বন্ধে তোমার যা কিছু অপরাধ সে রাজ-কার্যেরই ত্রুটি। সেরকম যদি কিছু ঘ'টে থাকে তবে আমি কয়েক দিন তোমার রাজ্যে থেকে সে সমস্তই স্বহস্তে মার্জনা ক'রে দিয়ে যাব।

রাজা

মহারাজ, আপনি যে শরতের বিজয়যাত্রায় বেরিয়েছেন আজ তার পরিচয় পাওয়া গেল। আজ এমন হার আনন্দে হেরেছি, কোনো যুদ্ধে এমনটি ঘটতে পারত না। আমি যে আপনার অধীন এই গৌরবই আমার সকল যুদ্ধজয়ের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। কী করলে আমি রাজত্ব করবার উপযুক্ত হব সেই উপদেশটি চাই।

সন্ন্যাসী

উপদেশটি কথায় ছোটো, কাজে অত্যন্ত বড়ো। রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই।

রাজা

উপদেশটি মনে রাখব, পেরে উঠব ব'লে ভরসা হয় না।

লক্ষেশ্বর

আমাকেও, ঠাকুর—না, না, মহারাজ ঐরকম একটা কী উপদেশ দিয়েছিলেন, সে আমি পেরে উঠলেম না, বোধ করি মনে রাখতেও পারব না।

সন্ন্যাসী

উপদেশে বোধ করি তোমার বিশেষ প্রয়োজন নেই।

লক্ষেশ্বর

আজ্ঞা, না।

উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ

ঠাকুর! এ কী, রাজা যে! এরা সব কারা!

পলায়নোদ্যম

সন্ন্যাসী

এসো এসো, বাবা, এসো, কী বলছিলে বলো।

উপনন্দ নিরুত্তর

এঁদের সামনে বলতে লজ্জা করছ? আচ্ছা, তবে সোমপাল, একটু অবসর নাও। তোমরাও—

উপনন্দ

সে কী কথা। ইনি যে আমাদের রাজা, এঁর কাছে আমাকে অপরাধী কোরো না। আমি তোমাকে বলতে এসেছিলেম এই ক'দিন পুঁথি লিখে আজ তার পারিশ্রমিক তিন কাহন পেয়েছি। এই দেখো।

সন্ন্যাসী

আমার হাতে দাও বাবা! তুমি ভাবছ এই তোমার বহুমূল্য তিন কার্ষাপণ আমি লক্ষেশ্বরের হাতে ঋণশোধের জন্যে দেব? এ আমি নিজে নিলেম। আমি এখানে শারদার উৎসব করেছি, এ আমার তারই দক্ষিণা। কী বলো বাবা।

উপনন্দ

ঠাকুর, তুমি নেবে!

সন্ন্যাসী

নেব বৈকি! তুমি ভাবছ সন্ন্যাসী হয়েছি বলেই আমার কিছুতে লোভ নেই? এ-সব জিনিসে আমার ভারি লোভ।

লক্ষেশ্বর

সর্বনাশ! তবেই হয়েছে! ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ ক'রে বসে আছি দেখছি!

সন্ন্যাসী

ওগো শ্রেষ্ঠী!

শ্রেষ্ঠী

আদেশ করুন।

সন্ন্যাসী

এই লোকটিকে হাজার কার্ষাপণ গুণে দাও।

শ্রেষ্ঠী

যে আদেশ।

উপনন্দ

তবে ইনিই কি আমাকে কিনে নিলেন।

সন্ন্যাসী

উনি তোমাকে কিনে নেন ওঁর এমন সাধ্য কী। তুমি আমার!

উপনন্দ

পা জড়াইয়া ধরিয়া

আমি কোন্ পুণ্য করেছিলেম যে আমার এমন ভাগ্য হল!

সন্ন্যাসী

ওগো সুভূতি!

মন্ত্রী

আজ্ঞা!

সন্ন্যাসী

আমার পুত্র নেই ব'লে তোমরা সর্বদা আক্ষেপ করতে। এবারে সন্ন্যাসধর্মের জোরে এই পুত্রটি লাভ করেছি।

লক্ষেশ্বর

হায় হায়, আমার বয়স বেশি হয়ে গেছে ব'লে কী সুযোগটাই পেরিয়ে গেল।

মন্ত্রী

বড়ো আনন্দ! তা, ইনি কোন্ রাজগৃহে—

সন্ন্যাসী

ইনি যে গৃহে জন্মেছেন সে গৃহে জগতের অনেক বড়ো বড়ো বীর জন্মগ্রহণ করেছেন— পুরাণ ইতিহাস খুঁজে সে আমি তোমাকে পরে দেখিয়ে দেব। লক্ষেশ্বর!

লক্ষেশ্বর

কী আদেশ।

সন্ন্যাসী

বিজয়াদিত্যের হাত থেকে তোমার মণিমাণিক্য আমি রক্ষা করেছি, এই তোমাকে ফিরে দিলেম।

লক্ষেশ্বর

মহারাজ, যদি গোপনে ফিরিয়ে দিতেন তা হলেই যথার্থ রক্ষা করতেন, এখন রক্ষা করে কে!

সন্ন্যাসী

এখন বিজয়াদিত্য স্বয়ং রক্ষা করবেন, তোমার ভয় নেই। কিন্তু, তোমার কাছে আমার কিছু প্রাপ্য আছে।

লক্ষেশ্বর

সর্বনাশ করলে!

সন্ন্যাসী

ঠাকুরদা সাক্ষী আছেন।

লক্ষেশ্বর

এখন সকলেই মিথ্যে সাক্ষ্য দেবে।

সন্ন্যাসী

আমাকে ভিক্ষা দিতে চেয়েছিলে। তোমার কাছে এক মুঠো চাল পাওনা আছে। রাজার মুষ্টি

কি ভরাতে পারবে।

লক্ষেশ্বর

মহারাজ, আমি সন্ন্যাসীর মুষ্টি দেখেই কথাটা পেড়েছিলেম।

সন্ন্যাসী

তবে তোমার ভয় নেই, যাও।

লক্ষেশ্বর

মহারাজ, ইচ্ছে করেন যদি তবে এইবার কিছু উপদেশ দিতে পারেন।

সন্ন্যাসী

এখনো দেরি আছে।

লক্ষেশ্বর

তবে প্রণাম হই। চার দিকে সকলেই কৌটোটার দিকে বড্ড তাকাচ্ছে।

[প্রস্থান

সন্ন্যাসী

রাজা সোমপাল, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

রাজা

সে কী কথা! সমস্তই মহারাজের, যে আদেশ করবেন—

সন্ন্যাসী

তোমার রাজ্য থেকে আমি একটি বন্দী নিয়ে যেতে চাই।

রাজা

যাকে ইচ্ছা নাম করুন, সৈন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি। নাহয় আমি নিজেই যাব।

সন্ন্যাসী

বেশি দূরে পাঠাতে হবে না।

ঠাকুরদাদাকে দেখাইয়া

তোমার এই প্রজাটিকে চাই।

রাজা

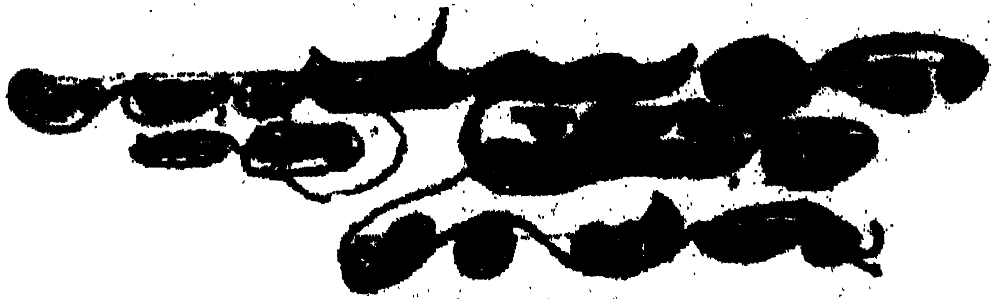
কেবলমাত্র এঁকে! মহারাজ যদি ইচ্ছা করেন তবে আমার রাজ্যে যে শ্রুতিধর স্মৃতিভূষণ আছেন তাঁকে আপনার সভায় নিয়ে যেতে পারেন।

সন্ন্যাসী

না, অত বড়ো লোককে নিয়ে আমার সুবিধা হবে না, আমি এঁকেই চাই। আমার প্রাসাদে অনেক জিনিস আছে, কেবল বয়স্য নেই।

ঠাকুরদাদা

বয়সে মিলবে না প্রভু, গুণেও না; তবে কিনা ভক্তি দিয়ে সমস্ত অমিল ভরিয়ে তুলতে পারব এই ভরসা আছে।



মুকুট

প্রথম পরিচ্ছেদ

ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র রাজধর সেনাপতি ইশা খাঁকে বলিলেন, "দেখো সেনাপতি, আমি বার বার বলিতেছি, তুমি আমাকে অসম্মান করিয়ো না।"

পাঠান ইশা খাঁ কতগুলি তীরের ফলা লইয়া তাহাদের ধার পরীক্ষা করিতেছিলেন। রাজধরের কথা শুনিয়া কিছুই বলিলেন না, কেবল মুখ তুলিয়া ভুরু উঠাইয়া একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। আবার তখনই মুখ নত করিয়া তীরের ফলার দিকে মনোযোগ দিলেন।

রাজধর বলিলেন, "ভবিষ্যতে যদি তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাকো, তবে আমি তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করিব।"

বৃদ্ধ ইশা খাঁ সহসা মাথা তুলিয়া বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বটে!"

রাজধর তাঁহার তলোয়ারের খাপের আগা মেঝের পাথরের উপরে ঠক্ করিয়া ঠুকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ।"

ইশা খাঁ বালক রাজধরের বুক ফুলানোর ভঙ্গি ও তলোয়ারের আস্ফালন দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না, হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রাজধরের সমস্ত মুখ, চোখের সাদাটা পর্যন্ত লাল হইয়া উঠিল।

ইশা খাঁ উপহাসের স্বরে হাসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "মহামহিম মহারাজাধিরাজকে কী বলিয়া ডাকিতে হইবে? হুজুর, জনাব, জাঁহাপনা, শাহেন্ শা—"

রাজধর তাঁহার স্বাভাবিক কর্কশ স্বর দ্বিগুণ কর্কশ করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার ছাত্র বটে কিন্তু আমি রাজকুমার—তাহা তোমার মনে নাই!"

ইশা খাঁ তীব্র স্বরে কহিলেন, "বস্! চুপ! আর অধিক কথা কহিয়ো না। আমার অন্য কাজ আছে।"

বলিয়া পুনরায় তীরের ফলার প্রতি মন দিলেন।

এমন সময় ত্রিপুরার দ্বিতীয় রাজপুত্র ইন্দ্রকুমার তাঁহার দীর্ঘ প্রশস্ত বলিষ্ঠ দেহ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। মাথা হেলাইয়া হাসিয়া বলিলেন, "খাঁ সাহেব, আজিকার ব্যাপারটা কী।"

ইন্দ্রকুমারের কণ্ঠ শুনিয়া বৃদ্ধ ইশা খাঁ তীরের ফলা রাখিয়া সস্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন; হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শোনো তো বাবা, বড়ো তামাসার কথা। তোমার এই কনিষ্ঠটিকে, মহারাজচক্রবর্তীকে, জাঁহাপনা জনাব বলিয়া না ডাকিলে উহার অপমান বোধ হয়।"

বলিয়া আবার তীরের ফলা লইয়া পড়িলেন।

"সত্য নাকি!"—বলিয়া ইন্দ্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রাজধর বিষম ক্রোধে বলিলেন, "চুপ করো দাদা!"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "রাজধর তোমাকে কী বলিয়া ডাকিতে হইবে। জাঁহাপনা! হা হা হা হা!"

রাজধর কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "দাদা চুপ করো বলিতেছি।"

ইন্দ্রকুমার আবার হাসিয়া বলিলেন, "জনাব!"

রাজধর অধীর হইয়া বলিলেন, "দাদা, তুমি নিতান্ত নির্বোধ।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া রাজধরের পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "ঠাণ্ডা হও ভাই, ঠাণ্ডা হও। তোমার বুদ্ধি তোমার থাক্, আমি তোমার বুদ্ধি কাড়িয়া লইতেছি না।"

ইশা খাঁ কাজ করিতে করিতে আড়চোখে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "উহার বুদ্ধি সম্প্রতি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "নাগাল পাওয়া যায় না!"

রাজধর গস্ গস্ করিয়া চলিয়া গেলেন। চলনের দাপে খাপের মধ্যে তলোয়ারখানা ঝন্ ঝন্ করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজকুমার রাজধরের বয়স উনিশ বৎসর। শ্যামবর্ণ, বেঁটে, দেহের গঠন বলিষ্ঠ। সেকালে অন্য রাজপুত্রেরা যেমন বড়ো বড়ো চুল রাখিতেন, ইঁহার তেমন ছিল না। ইঁহার সোজা সোজা মোটা চুল ছোটো করিয়া ছাঁটা। ছোটো ছোটো চোখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দাঁতগুলি কিছু বড়ো। গলার আওয়াজ ছেলেবেলা হইতেই কেমন কর্কশ। রাজধরের বুদ্ধি অত্যন্ত বেশি এইরূপ সকলের বিশ্বাস, তাঁহার নিজের বিশ্বাসও তাই। এই বুদ্ধির বলে তিনি আপনার দুই দাদাকে অত্যন্ত হেয়জ্ঞান করিতেন। রাজধরের প্রবল প্রতাপে বাড়িসুদ্ধ সকলে অস্থির। আবশ্যক থাক্ না থাক্, একখানা তলোয়ার মাটিতে ঠুকিয়া ঠুকিয়া তিনি বাড়িময় কর্তৃত্ব করিয়া বেড়ান। রাজবাটির চাকর-বাকরেরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া, মহারাজ বলিয়া, হাত জোড় করিয়া সেলাম করিয়া, প্রণাম করিয়া, কিছুতেই নিস্তার পায় না। সকল জিনিসেই তাঁহার হাত, সকল জিনিসই তিনি নিজে দখল করিতে চান। সে বিষয়ে তাঁহার চক্ষুলজ্জাটুকু পর্যন্ত নাই। একবার যুবরাজ চন্দ্রনারায়ণের একটা ঘোড়া তিনি রীতিমত দখল করিয়াছিলেন; দেখিয়া যুবরাজ ঈষৎ হাসিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। আর একবার কুমার ইন্দ্রকুমারের রূপার-পাত-লাগানো একটা ধনুক অম্লানবদনে অধিকার করিয়াছিলেন; ইন্দ্রকুমার চটিয়া বলিলেন, 'দেখো, যে জিনিস লইয়াছ উহা আমি আর ফিরাইয়া লইতে চাহি না, কিন্তু ফের যদি তুমি আমার জিনিসে হাত দাও তবে আমি এমন করিয়া দিব যে, ও হাতে আর জিনিস তুলিতে পারিবে না।' কিন্তু রাজধর দাদাদের

কথা বড়ো গ্রাহ্য করিতেন না। লোকে তাঁহার আচরণ দেখিয়া আড়ালে বলিত, 'ছোটোকুমারের রাজার ঘরে জন্ম বটে কিন্তু রাজার ছেলের মতো কিছুই দেখি না।"

কিন্তু মহারাজ অমরমাণিক্য রাজধরকে কিছু বেশি ভালোবাসিতেন। রাজধর তাহা জানিতেন। আজ পিতার কাছে গিয়া ইশা খাঁর নামে নালিশ করিলেন।

রাজা ইশা খাঁকে ডাকাইয়া আনিলেন। বলিলেন, "সেনাপতি, রাজকুমারদের এখন বয়স হইয়াছে। এখন উহাদিগকে যথোচিত সম্মান করা উচিত।"

"মহারাজ বাল্যকালে যখন আমার কাছে যুদ্ধ শিক্ষা করিতেন, তখন মহারাজকে যেরূপ সম্মান করিতাম—রাজকুমারগণকে তাহা অপেক্ষা কম সম্মান করি না।"

রাজধর বলিলেন, "আমার অনুরোধ, তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়ো না।"

ইশা খাঁ বিদ্যুদ্‌বেগে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "চুপ করো বৎস! আমি তোমার পিতার সহিত কথা কহিতেছি। মহারাজ, মার্জনা করিবেন, আপনার এ কনিষ্ঠ পুত্রটি রাজপরিবারের উপযুক্ত হয় নাই। ইহার হাতে তলোয়ার শোভা পায় না। এ বড়ো হইলে মুন্‌শির মতো কলম চালাইতে পারিবে—আর কোনো কাজে লাগিবে না।"

এমন সময়ে চন্দ্রনারায়ণ ও ইন্দ্রকুমার সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইশা খাঁ তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চাহিয়া দেখুন মহারাজ, এই তো যুবরাজ বটে! এই তো রাজপুত্র বটে!"

রাজা রাজধরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রাজধর, খাঁ-সাহেব কী বলিতেছেন। তুমি অস্ত্রবিদ্যায় উহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারো নাই?"

রাজধর বলিলেন, "মহারাজ, "রাজধর, খাঁ-সাহেব কী বলিতেছেন। তুমি অস্ত্রবিদ্যায় উহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারো নাই?"

রাজধর বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করুন—পরীক্ষায় যদি আমি সর্বশ্রেষ্ঠ না হই তবে আমাকে পরিত্যাগ করিবেন। আমি রাজবাটি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।"

রাজা বলিলেন, "আচ্ছা আগামী সপ্তাহে পরীক্ষা হইবে। তোমাদের মধ্যে যিনি উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাকে আমার হীরকখচিত তলোয়ার পুরস্কার দিব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রকুমার ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ ছিলেন। শুনা যায় একবার তাঁহার এক অনুচর প্রাসাদের ছাদের উপর হইতে একটা মোহর নীচে ফেলিয়া দেয়, সেই মোহর মাটিতে পড়িতে না পড়িতে তীর মারিয়া কুমার তাহাকে শত হাত দূরে ফেলিয়াছিলেন।—রাজধর রাগের মাথায় পিতার সম্মুখে দম্ভ করিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু মনের ভিতর বড়ো ভাবনা পড়িয়া গেল। যুবরাজ চন্দ্রনারায়ণের জন্য বড়ো ভাবনা নাই, তীর ছোঁড়া বিদ্যা তাঁহার ভালো আসিত না, কিন্তু ইন্দ্রকুমারের সঙ্গে আঁটিয়া উঠা দায়। রাজধর অনেক ভাবিয়া অবশেষে একটা ফন্দি ঠাওরাইলেন। হাসিয়া মনে

মনে বলিলেন, 'তীর ছুঁড়িতে পারি না-পারি, আমার বুদ্ধি তীরের মতো—তাহাতে সকল লক্ষ্যই ভেদ হয়।"

কাল পরীক্ষার দিন। যে জায়গাতে পরীক্ষা হইবে, যুবরাজ, ইশা খাঁ ও ইন্দ্রকুমার সেই জমি তদারক করিতে গিয়াছেন। রাজধর আসিয়া বলিলেন, "দাদা, আজ পূর্ণিমা আছে— আজ রাত্রে যখন বাঘ গোমতী নদীতে জল খাইতে আসিবে, তখন নদীতীরে বাঘ শিকার করিতে গেলে হয় না?"

ইন্দ্রকুমার আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "কী আশ্চর্য, রাজধরের যে আজ শিকারে প্রবৃত্তি হইল! এমন তো কখনো দেখা যায় না।"

ইশা খাঁ রাজধরের প্রতি ঘৃণার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "উনি আবার শিকারী নন? উনি জাল পাতিয়া ঘরের মধ্যে শিকার করেন। উঁহার বড়ো ভয়ানক শিকার। রাজসভায় একটি জীব নাই যে উহার ফাঁদে একবার-না-একবার পড়িয়াছে।"

চন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন, কথাটা রাজধরের মনে লাগিয়াছে; ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "সেনাপতি-সাহেব, তোমার তলোয়ারও যেমন তোমার কথাও তেমনি, উভয়ই শাণিত—যাহার উপরে গিয়া পড়ে তাহার মর্মচ্ছেদ করে।"

রাজধর হাসিয়া বলিলেন, "না দাদা, আমার জন্য বেশি ভাবিয়ো না। খাঁ-সাহেব অনেক শান দিয়া কথা কহেন বটে, কিন্তু আমার কানের মধ্যে পালকের মতো প্রবেশ করে।"

ইশা খাঁ হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া পাকা গোঁফের চাড়া দিয়া বলিলেন, "তোমার কান আছে নাকি। তা যদি থাকিত তাহা হইলে একদিনে তোমাকে সিধা করিতে পারিতাম।"

বৃদ্ধ ইশা খাঁ কাহাকেও বড়ো মান্য করিতেন না।

ইন্দ্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। চন্দ্রনারায়ণ গম্ভীর হইয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না। যুবরাজ বিরক্ত হইয়াছেন বুঝিয়া ইন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ হাসি থামাইয়া তাঁহার কাছে গেলেন; মৃদুভাবে বলিলেন, "দাদা, তোমার কী মত, আজ রাত্রে শিকার করিতে যাইবে কি।"

চন্দ্রনারায়ণ কহিলেন, "তোমার সঙ্গে ভাই, শিকার করিতে যাওয়া মিথ্যা—তাহা হইলে নিতান্ত নিরামিষ শিকার করিতে হয়। তুমি বনে গিয়া যত জন্তু মারিয়া আনো, আর আমরা কেবল লাউ কুমড়া কচু কাঁঠাল শিকার করিয়া আনি।"

ইশা খাঁ পরম হৃষ্ট হইয়া হাসিতে লাগিলেন; সস্নেহে ইন্দ্রকুমারের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "যুবরাজ ঠিক কথা বলিতেছেন পুত্র। তোমার তীর সকলের আগে গিয়া ছোটে এবং নির্ঘাত গিয়া লাগে। তোমার সঙ্গে কে পারিয়া উঠিবে!"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "না না দাদা, ঠাট্টা নয়— যাইতে হইবে। তুমি না গেলে কে শিকার করিতে যাইবে!"

যুবরাজ বলিলেন, "আচ্ছা, চলো। আজ রাজধরের শিকারের ইচ্ছা হইয়াছে উহাকে নিরাশ করিব না।"

সহাস্য ইন্দ্রকুমার চকিতের মধ্যে ম্লান হইয়া বলিলেন, "কেন দাদা, আমার ইচ্ছা হইয়াছে বলিয়া কি যাইতে নাই।"

চন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "সেকি কথা ভাই, তোমার সঙ্গে তো রোজই শিকারে যাইতেছি।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "তাই সেটা পুরাতন হইয়া গেছে।"

চন্দ্রনারায়ণ বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, "তুমি আমার কথা এমন করিয়া ভুল বুঝিলে বড়ো ব্যথা লাগে।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না, দাদা, আমি ঠাট্টা করিতেছিলাম। শিকারে যাইব না তো কী। চলো, তার আয়োজন করি গে।"

ইশা খাঁ মনে মনে কহিলেন, "ইন্দ্রকুমার বুকে দশটা বাণ সহিতে পারে, কিন্তু দাদার একটু সামান্য অনাদর সহিতে পারে না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিকারের বন্দোবস্ত সমস্ত স্থির হইলে পরে রাজধর আস্তে আস্তে ইন্দ্রকুমারের স্ত্রী কমলাদেবীর কক্ষে গিয়া উপস্থিত। কমলাদেবী হাসিয়া বলিলেন, "এ কী ঠাকুরপো! একেবারে তীরধনুক বর্মচর্ম লইয়া যে! আমাকে মারিবে নাকি!"

রাজধর বলিলেন, "ঠাকুরানী, আমরা আজ তিন ভাই শিকার করিতে যাইব, তাই এই বেশ।"

কমলাদেবী আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "তিন ভাই! তুমিও যাইবে নাকি। আজ তিন ভাই একত্র হইবে! এ তো ভালো লক্ষণ নয়। এ যে ত্র্যহস্পর্শ হইল।"

যেন বড়ো ঠাট্টা হইল এইভাবে রাজধর হা-হা করিয়া হাসিলেন, কিন্তু বিশেষ কিছু বলিলেন না।

কমলাদেবী কহিলেন, "না না, তাহা হইবে না—রোজ রোজ শিকার করিতে যাইবেন আর আমি ঘরে বসিয়া ভাবিয়া মরি।"

রাজধর কহিলেন, "আজ আবার রাত্রে শিকার।"

কমলাদেবী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সে কখনোই হইবে না। দেখিব আজ কেমন করিয়া যান।"

রাজধর বলিলেন, "ঠাকুরানী, এক কাজ করো, ধনুকবাণগুলি লুকাইয়া রাখো।"

কমলাদেবী কহিলেন, "কোথায় লুকাইব।"

রাজধর। আমার কাছে দাও, আমি লুকাইয়া রাখিব।

কমলাদেবী হাসিয়া কহিলেন, "মন্দ কথা নয়। সে বড়ো রঙ্গ হইবে।"

কিন্তু মনে-মনে বলিলেন, 'তোমার একটা কি মতলব আছে। তুমি যে কেবল আমার উপকার করিতে আসিয়াছ তাহা বোধ হয় না।'

"এসো, অস্ত্রশালায় এসো" বলিয়া কমলাদেবী রাজধরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। চাবি লইয়া ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালার দ্বার খুলিয়া দিলেন। রাজধর যেমন ভিতরে প্রবেশ করিলেন অমনি কমলাদেবী দ্বারে তালা লাগাইয়া দিলেন। রাজধর ঘরের মধ্যে বন্ধ হইয়া রহিলেন। কমলাদেবী বাহির হইতে হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, আমি তবে আজ আসি।"

বলিয়া চলিয়া গেলেন।

এ দিকে সন্ধ্যার সময়ে ইন্দ্রকুমার অন্তঃপুরে আসিয়া অস্ত্রশালার চাবি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছেন না। কমলাদেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁগা, আমাকে খুঁজিতেছ বুঝি, আমি তো হারাই নাই!"

শিকারের সময় বহিয়া যায় দেখিয়া ইন্দ্রকুমার দ্বিগুণ ব্যস্ত হইয়া খোঁজ করিতে লাগিলেন। কমলাদেবী তাঁহাকে বাধা দিয়া আবার তাঁহার মুখের কছে গিয়া দাঁড়াইলেন; হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁগা, দেখিতে কি পাও না। চোখের সম্মুখে তবু ঘরময় বেড়াইতেছ?"

ইন্দ্রকুমার কিঞ্চিত কাতরস্বরে কহিলেন, "দেবী, এখন বাধা দিও না—আমার একটা বড়ো আবশ্যকের জিনিস হারাইয়াছে।"

কমলা কহিলেন, "আমি জানি তোমার কী হারাইয়াছে, আমার একটি কথা যদি রাখো তো খুঁজিয়া দিতে পারি।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "আচ্ছা রাখিব।"

কমলাদেবী বলিলেন, "তবে শোনো। আজ তুমি শিকার করিতে যাইতে পারিবে না। এই লও তোমার চাবি।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "সে হয় না, এ কথা রাখিতে পারি না।"

কমলাদেবী বলিলেন, "চন্দ্রবংশে জন্মিয়া এই বুঝি তোমার আচরণ! একটা সামান্য প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারো না?"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার কথাই রহিল। আজ আমি শিকারে যাইব না।"

কমলাদেবী। তোমার আর কিছু হারাইয়াছে? মনে করিয়া দেখো দেখি।

ইন্দ্রকুমার। কই মনে পড়ে না তো।

কমলাদেবী। তোমাদের সাত-রাজার ধন মানিক? তোমাদের সোনার চাঁদ?

ইন্দ্রকুমার মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন। কমলাদেবী কহিলেন, "তবে এসো, দ্যাখো-' সে।"

বলিয়া অস্ত্রশালার দ্বারে গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। কুমার দেখিলেন, রাজধর ঘরের মেঝেতে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন; দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—"এ কী রাজধর অস্ত্রশালায় যে!"

কমলাদেবী বলিলেন, "উনি আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, তা বটে, উনি সকল অস্ত্রের চেয়ে তীক্ষ্ণ।"

রাজধর মনে-মনে বলিলেন, 'তোমাদের জিহ্বার চেয়ে নয়।' রাজধর ঘর হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলেন।

তখন কমলাদেবী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "না কুমার, তুমি শিকার করিতে যাও। আমি তোমার সত্য ফিরাইয়া লইলাম।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "শিকার করিব? আচ্ছা।"

বলিয়া ধনুকে তীর যোজনা করিয়া অতি ধীরে কমলাদেবীর দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তীর তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল; কুমার বলিলেন, "আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল।"

কমলাদেবী বলিলেন, "না, পরিহাস না। তুমি শিকারে যাও।"

ইন্দ্রকুমার কিছু বলিলেন না। ধনুর্বাণ ঘরের মধ্যে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। যুবরাজকে বলিলেন, "দাদা, আজ শিকারের সুবিধা হইল না।"

চন্দ্রনারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আজ পরীক্ষার দিন। রাজবাটীর বাহিরের মাঠে বিস্তর লোক জড়ো হইয়াছে। রাজার ছত্র ও সিংহাসন প্রভাতে আলোতে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। জায়গাটা পাহাড়ে, উঁচুনিচু— লোকে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, চারি দিকে যেন মানুষের মাথার ঢেউ উঠিয়াছে। ছেলেগুলো গাছের উপর চড়িয়া বসিয়াছে। একটা ছেলে গাছের ডাল হইতে আস্তে আস্তে হাত বাড়াইয়া একজন মোটা মানুষের মাথা হইতে পাগড়ি তুলিয়া আর-একজনের মাথায় পরাইয়া দিয়াছে। যাহার পাগড়ি সে ব্যক্তি চটিয়া ছেলেকে গ্রেফতার করিবার জন্য নিষ্ফল প্রয়াস পাইতেছে, অবশেষে নিরাশ হইয়া সজোরে গাছের ডালে নাড়া দিতেছে, ছোঁড়াটা মুখভঙ্গি করিয়া ডালের উপর বাঁদরের মতো নাচিতেছে। মোটা মানুষের দুর্দশা ও রাগ দেখিয়া সে দিকে একটা হো-হো হাসি পড়িয়া গিয়াছে। একজন এক-হাঁড়ি দই মাথায় করিয়া বাড়ি যাইতেছিল, পথে জনতা দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল—হঠাৎ দেখে তাহার মাথায় হাঁড়ি নাই, হাঁড়িটা মুহূর্তের মধ্যে হাতে হাতে কত দূর চলিয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই—দইওয়ালা খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। একজন বলিল, 'ভাই, তুমি দইয়ের বদলে ঘোল খাইয়া গেলে, কিঞ্চিৎ লোকসান হইল বৈ তো নয়।' দইওয়ালা পরম সান্ত্বনা পাইয়া গেল। হারু নাপিতের 'পরে গাঁ-সুদ্ধ লোক চটা ছিল। তাহাকে ভিড়ের মধ্যে দেখিয়া লোকে তাহার নামে ছড়া কাটিতে লাগিল। সে যত খেপিতে লাগিল খেপাইবার দল তত বাড়িয়া উঠিল—চারি দিকে চট্‌পট্ হাততালি পড়িতে লাগিল। আটান্ন প্রকার আওয়াজ বাহির উইতে লাগিল। সে ব্যক্তি মুখ চক্ষু লাল করিয়া, চটিয়া গলদঘর্ম হইয়া, চাদর ভূমিতে লুটাইয়া, একপাটি চটিজুতা ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া, বিশ্বের লোককে অভিশাপ দিতে দিতে বাড়ি ফিরিয়া গেল। ঠাসাঠাসি ভিড়ের মাঝে মাঝে এক-একটা ছোটো ছেলে আত্মীয়ের কাঁধের উপর চড়িয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। এমন কত জায়গায় কত কলরব

উঠিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। হঠাৎ নহবৎ বাজিয়া উঠিল। সমস্ত কোলাহল ভাসাইয়া দিয়া জয়-জয় শব্দে আকাশ প্লাবিত হইয়া গেল। কোলের ছেলে যতগুলো ছিল ভয়ে সমস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় কুকুরগুলো ঊর্ধ্বমুখ হইয়া খেউ খেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। পাখি যেখানে যত ছিল ভয়ে গাছের ডাল ছাড়িয়া আকাশে উড়িল। কেবল গোটাকতক বুদ্ধিমান কাক সুদূরে গাম্ভারী গাছের ডালে বসিয়া দক্ষিণে ও বামে ঘাড় হেলাইয়া একাগ্রচিত্তে অনেক বিবেচনা করিতে লাগিল এবং একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ অসন্দিগ্ধচিত্তে কা কা করিয়া ডাকিয়া উঠিতে লাগিল।

রাজা আসিয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন। পাত্রমিত্র সভাসদ্গণ আসিয়াছেন। রাজকুমারগণ ধনুর্বাণ হস্তে আসিয়াছেন। নিশান লইয়া নিশানধারী আসিয়াছে। ভাট আসিয়াছে। সৈন্যগণ পশ্চাতে কাতর দিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাজনদারগণ মাথা নাড়াইয়া, নাচিয়া, সবলে পরমোৎসাহে ঢোল পিটাইতেছে। মহা ধুম পড়িয়া গিয়াছে। পরীক্ষার সময় যখন হইল, ইশা খাঁ রাজকুমারগণকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন। ইন্দ্রকুমার যুবরাজকে কহিলেন, "দাদা, আজ তোমাকে জিতিতে হইবে, তাহা না হইলে চলিবে না।"

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, "চলিবে না ত কী। আমার একটা ক্ষুদ্র তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেও জগৎসংসার যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিবে। আর যদিই-বা না চলিত তবু আমার জিতিবার কোনো সম্ভাবনা দেখিতেছি না।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "দাদা, তুমি যদি হারো তো আমিও ইচ্ছাপূর্বক লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব।"

যুবরাজ ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া কহিলেন, "না ভাই, ছেলেমানুষি করিয়ো না—ওস্তাদের নাম রক্ষা করিতে হইবে।"

রাজধর বিবর্ণ শুষ্ক চিন্তাকুল মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ইশা খাঁ আসিয়া কহিলেন, "যুবরাজ, সময় হইয়াছে ধনুক গ্রহণ করো।"

যুবরাজ দেবতার নাম করিয়া ধনুক গ্রহণ করিলেন। প্রায় দুই শত হাত দূরে গোটা পাঁচ-ছয় কলাগাছের গুঁড়ি একত্র বাঁধিয়া স্থাপিত হইয়াছে। মাঝে একটা কচুর পাতা চোখের মতো করিয়া বসানো আছে। তাহার ঠিক মাঝখানে চোখের তারার আকারে কালো চিহ্ন অঙ্কিত। সেই চিহ্নই লক্ষ্যস্থল। দর্শকেরা অর্ধচন্দ্র আকারে মাঠ ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—যে দিকে লক্ষ্য স্থাপিত সে দিকে যাওয়া নিষেধ।

যুবরাজ ধনুকে বাণ যোজনা করিলেন। লক্ষ্য স্থির করিলেন। বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বাণ লক্ষ্যের উপর দিয়া চলিয়া গেল। ইশা খাঁ তাঁহার গোঁফ-সুদ্ধ দাড়ি-সুদ্ধ মুখ বিকৃত করিলেন, পাকা ভুরু কুঞ্চিত করিলেন। কিন্তু কিছু বলিলেন না। ইন্দ্রকুমার বিষণ্ণ হইয়া এমন ভাব ধারণ করিলেন যেন তাঁহাকেই লজ্জিত করিবার জন্য দাদা ইচ্ছা করিয়া এই কীর্তিটি করিলেন। অস্থিরভাবে ধনুক নাড়িতে নাড়িতে ইশা খাঁকে বলিলেন, "দাদা মন দিলেই সমস্ত পারেন, কিন্তু কিছুতেই মন দেন না।"

ইশা খাঁ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'তোমার দাদার বুদ্ধি আর সকল জায়গাতেই খেলে, কেবল তীরের আগায় খেলে না; তাহার কারণ, বুদ্ধি তেমন সূক্ষ্ম নয়।"



ইন্দ্রকুমার ভারি চটিয়া একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন। ইশা খাঁ বুঝিতে পারিয়া দ্রুত সরিয়া গিয়া রাজধরকে বলিলেন, "কুমার, এবার তুমি লক্ষ্যভেদ করো, মহারাজা দেখুন।"

রাজধর বলিলেন, "আগে দাদার হউক।"

ইশা খাঁ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "এখন উত্তর করিবার সময় নয়। আমার আদেশ পালন করো।"

রাজধর চটিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। ধনুর্বাণ তুলিয়া লইলেন। লক্ষ্য স্থির করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তীর মাটিতে বিদ্ধ হইল। যুবরাজ রাজধরকে কহিলেন, "তোমার বাণ অনেকটা নিকটে গিয়াছে; আর-একটু হইলেই লক্ষ্য বিদ্ধ হইত।"

রাজধর অম্লানবদনে কহিলেন, "লক্ষ্য তো বিদ্ধ হইয়াছে, দূর হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না।"

যুবরাজ কহিলেন, "না রাজধর, তোমার দৃষ্টির ভ্রম হইয়াছে, লক্ষ্য বিদ্ধ হয় নাই।"

রাজধর কহিলেন, "হ্যাঁ, বিদ্ধ হইয়াছে। কাছে গেলেই দেখা যাইবে।"

যুবরাজ আর কিছু বলিলেন না।

অবশেষে ঈশা খাঁর আদেশক্রমে ইন্দ্রকুমার নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে ধনুক তুলিয়া লইলেন। যুবরাজ তাঁহার কাছে গিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "ভাই, আমি অক্ষম—আমার উপর রাগ করা অন্যায়—তুমি যদি আজ লক্ষ্যভেদ করিতে না পারো, তবে তোমার ভ্রষ্টলক্ষ্য তীর আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিবে ইহা নিশ্চয় জানিয়ো।"

ইন্দ্রকুমার যুবরাজের পদধূলি লইয়া কহিলেন, "দাদা, তোমার আশীর্বাদে আজ লক্ষ্যভেদ করিব, ইহার অন্যথা হইবে না।"

ইন্দ্রকুমার তীর নিক্ষেপ করিলেন, লক্ষ্য বিদ্ধ হইল। বাজনা বাজিল। চারি দিকে জয়ধ্বনি উঠিল। যুবরাজ যখন ইন্দ্রকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন, আনন্দে ইন্দ্রকুমারের চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া আসিল; ইশা খাঁ পরম স্নেহে কহিলেন, "পুত্র, আল্লার কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া থাকো।"

মহারাজা যখন ইন্দ্রকুমারকে পুরস্কার দিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় রাজধর গিয়া কহিলেন, "মহারাজা, আপনাদের ভ্রম হইয়াছে। আমার তীর লক্ষ্যভেদ করিয়াছে।

মহারাজ কহিলেন, "কখনোই না।"

রাজধর কহিলেন, "মহারাজ, কাছে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন।"

সকলে লক্ষ্যের কাছে গেলেন। দেখিলেন, যে তীর মাটিতে বিদ্ধ তাহার ফলায় ইন্দ্রকুমারের নাম খোদিত, আর যে তীর লক্ষ্যে বিদ্ধ তাহাতে রাজধরের নাম খোদিত।

রাজধর কহিলেন, "বিচার করুন মহারাজ।"

ইশা খাঁ কহিলেন, "নিশ্চয়ই তূণ বদল হইয়াছে।"

কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, তূণ বদল হয় নাই। সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন।

ইশা খাঁ কহিলেন, "পুনর্বার পরীক্ষা করা হউক।"

রাজধর বিষম অভিমান করিয়া কহিলেন, "তাহাতে আমি সম্মত হইতে পারি না। আমার প্রতি এ বড়ো অন্যায় অবিশ্বাস। আমি তো পুরস্কার চাই না, মধ্যমকুমার-বাহাদুরকে পুরস্কার দেওয়া হউক।"

বলিয়া পুরস্কারের তলোয়ার ইন্দ্রকুমারের দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন। ইন্দ্রকুমার দারুণ ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ধিক্! তোমার হাত হইতে এ পুরস্কার গ্রাহ্য করে কে। এ তুমি লও।"

বলিয়া তলোয়ারখানা ঝন্ ঝন্ করিয়া রাজধরের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। রাজধর হাসিয়া নমস্কার করিয়া তাহা তুলিয়া লইলেন।

তখন ইন্দ্রকুমার কম্পিতস্বরে পিতাকে কহিলেন, "মহারাজ, আরাকানপতির সহিত শীঘ্রই যুদ্ধ হইবে। সেই যুদ্ধে গিয়া আমি পুরস্কার আনিব। মহারাজ, আদেশ করুন।"

ইশা খাঁ ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া কঠোরস্বরে কহিলেন, "তুমি আজ মহারাজের অপমান করিয়াছ। উহার তলোয়ার লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছ। ইহার সমুচিত শাস্তি আবশ্যক।"

ইন্দ্রকুমার সবলে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, "বৃদ্ধ আমাকে স্পর্শ করিও না।"

বৃদ্ধ ইশা খাঁ সহসা বিষণ্ণ হইয়া ক্ষুব্ধ স্বরে কহিলেন, "পুত্র, একি পুত্র! আমার 'পরে এই ব্যবহার। তুমি আজ আত্মবিস্মৃত হইয়াছ বৎস!"

ইন্দ্রকুমারের চোখে জল উথলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "সেনাপতিসাহেব, আমাকে মাপ করো, আমি আজ যথার্থই আত্মবিস্মৃত হইয়াছি।"

যুবরাজ স্নেহের স্বরে কহিলেন, "শান্ত হও, ভাই—গৃহে ফিরিয়া চলো।"

ইন্দ্রকুমার পিতার পদধূলি লইয়া কহিলেন, "পিতা। অপরাধ মার্জনা করুন।"

গৃহে ফিরিবার সময় যুবরাজকে কহিলেন, "দাদা, আজ আমার যথার্থই পরাজয় হইয়াছে।"

রাজধর যে কেমন করিয়া জিতিলেন তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজধর পরীক্ষাদিনের পূর্বে যখন কমলাদেবীর সাহায্যে ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখনই ইন্দ্রকুমারের তূণ হইতে ইন্দ্রকুমারের নামাঙ্কিত একটি তীর নিজের তূণে তুলিয়া লইয়াছিলেন এবং নিজের নামাঙ্কিত তীর ইন্দ্রকুমারের তূণে এমন স্থানে এমন ভাবে স্থাপিত করিয়াছিলেন, যাহাতে সেইটিই সহজে ও সর্বাগ্রে তাঁহার হাতে উঠিতে পারে। রাজধর যাহা মনে করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। ইন্দ্রকুমার দৈবক্রমে রাজধরের স্থাপিত তীরই তুলিয়া লইয়াছিলেন—সেই জন্যই পরীক্ষাস্থলে এমন গোলমাল হইয়াছিল। কালক্রমে যখন সমস্ত শান্তভাব ধারণ করিল তখন ইন্দ্রকুমার রাজধরের চাতুরী কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন,

কিন্তু সে কথা আর কাহাকেও কিছু বলিলেন না—কিন্তু রাজধরের প্রতি তাঁহার ঘৃণা আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

ইন্দ্রকুমার মহারাজের কাছে বার বার বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আরাকানপতির সহিত যুদ্ধে আমাদিগকে পাঠান।"

মহারাজ অনেক বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

আমরা যে সময়ের গল্প বলিতেছি সে আজ প্রায় তিনশো বৎসরের কথা। তখন ত্রিপুরা স্বাধীন ছিল এবং চট্টগ্রাম ত্রিপুরার অধীন ছিল। আরাকান চট্টগ্রামের সংলগ্ন। আরাকানপতি মাঝে মাঝে চট্টগ্রাম আক্রমণ করিতেন। এই জন্য আরাকানের সঙ্গে ত্রিপুরার মাঝে মাঝে বিবাদ বাধিত। অমরমাণিক্যের সহিত আরাকানপতির সম্প্রতি সেইরূপ একটি বিবাদ বাধিয়াছে। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া ইন্দ্রকুমার যুদ্ধে যাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। রাজা অনেক বিবেচনা করিয়া অবশেষে সম্প্রতি দিলেন। তিনি ভাইয়ে পাঁচ হাজার করিয়া পনেরো হাজার সৈন্য লইয়া চট্টগ্রাম-অভিমুখে চলিলেন। ইশা খাঁ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া গেলেন।

কর্ণফুলি নদীর পশ্চিম ধারে শিবির স্থাপিত হইল। আরাকানের সৈন্য কতক নদীর ও পারে কতক এ পারে। আরাকানপতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া নদীর পরপারে আছেন। এবং তাঁহার বাইশ হাজার সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আক্রমণের প্রতীক্ষায় নদীর পশ্চিম পারে অপেক্ষা করিয়া আছে।

যুদ্ধের ক্ষেত্র পর্বতময়। সমুখা-সমুখি দুই পাহাড়ের উপর দুই পক্ষের সৈন্য স্থাপিত হইয়াছে। উভয় পক্ষ যদি যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয় তবে মাঝের উপত্যকায় দুই সৈন্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে। পবতের চারি দিকে হরীতকী আমলকী শাল ও গাম্ভারীর বন। মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদের শূন্য গৃহ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা ঘর ছাড়িয়া পলাইয়াছে। মাঝে মাঝ শশ্যক্ষেত্র। পাহাড়েরা যেখানে ধান কাপাস তরমুজ আলু একত্রে রোপণ করিয়া গিয়াছে। আবার এক-এক জায়গায় জুমিয়া চাষারা এক-একটা পাহাড় সমস্ত দগ্ধ করিয়া কালো করিয়া রাখিয়াছে, বর্ষার পর সেখানে শস্যবপন হইবে। দক্ষিণে কর্ণফুলি, বামে দুর্গম পর্বত।

এইখানে প্রায় এক সপ্তাহকাল উভয় পক্ষ পরস্পরের আক্রমণ-প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। ইন্দ্রকুমার যুদ্ধের জন্য অস্থির হইয়াছেন, কিন্তু যুবরাজের ইচ্ছা বিপক্ষ পক্ষেরা আগে আসিয়া আক্রমণ করে। সেই জন্য বিলম্ব করিতেছেন—কিন্তু তাহারাও নড়িতে চাহে না, স্থির হইয়া আছে। অবশেষে আক্রমণ করাই স্থির হইল।

সমস্ত রাত্রি আক্রমণের আয়োজন চলিতে লাগিল। রাজধর প্রস্তাব করিলেন, "দাদা, তোমরা দুইজনে তোমাদের দশ হাজার সৈন্য লইয়া আক্রমণ করো। আমার পাঁচ হাজার হাতে থাক্, আবশ্যকের সময় কাজে লাগিবে।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন, "রাজধর তফাতে থাকিতে চান।"

যুবরাজ কহিলেন, "না, হাসির কথা নয়। রাজধরের প্রস্তাব আমার ভালো বোধ হইতেছে।"

ইশা খাঁও তাহাই বলিলেন। রাজধরের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল।

যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমারের অধীনে দশ হাজার সৈন্য পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইল। প্রত্যেক ভাগে দুই হাজার করিয়া সৈন্য রহিল। স্থির হইল, একেবারে শত্রুব্যূহের পাঁচ জায়গায় আক্রমণ করিয়া ব্যূহভেদ করিবার চেষ্টা করা হইবে। সর্বপ্রথম সারে ধানুকীরা রহিল তার পরে তলোয়ার বর্শা প্রভৃতি লইয়া অন্য পদাতিকেরা রহিল এবং সর্বশেষে অশ্বারোহীরা সার বাঁধিয়া চলিল।

আরাকানের মগ সৈন্যেরা দীর্ঘ এক বাঁশবনের পশ্চাতে ব্যূহ রচনা করিয়াছিল। প্রথম দিনের আক্রমণে কিছুই হইল না। ত্রিপুরার সৈন্য ব্যূহ ভেদ করিতে পারিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় দিন সমস্ত দিন নিষ্ফল যুদ্ধ-অবসানে রাত্রি যখন নিশীথ হইল, যখন উভয় পক্ষের সৈন্যেরা বিশ্রামলাভ করিতেছে, দুই পাহাড়ের উপর দুই শিবিরে স্থানে স্থানে কেবল এক-একটা আগুন জ্বলিতেছে, শৃগালেরা রণক্ষেত্রে ছিন্ন হস্ত পদ ও মৃত দেহের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া দলে দলে কাঁদিয়া উঠিতেছে—তখন শিবিরের দুই ক্রোশ দূরে রাজধর তাঁহার পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া সারবন্দী নৌকা বাঁধিয়া কর্ণফুলি নদীর উপরে নৌকার সেতু নির্মাণ করিয়াছেন। একটি মশাল নাই, শব্দ নাই, সেতুর উপর দিয়া অতি সাবধানে সৈন্য পার করিতেছেন। নীচে দিয়া যেমন অন্ধকারে নদীর স্রোত বহিয়া যাইতেছে তেমনি উপর দিয়া মানুষের স্রোত অবিচ্ছিন্ন বহিয়া যাইতেছে। নদীতে ভাঁটা পড়িয়াছে। পরপারের পর্বতময় দুর্গম পাড় দিয়া সৈন্যেরা অতি কষ্টে উঠিতেছে। রাজধরের প্রতি সৈন্যাধ্যক্ষ ইশা খাঁর আদেশ ছিল যে, রাজধর রাত্রিযোগে তাঁহার সৈন্যদের লইয়া নদী বাহিয়া উত্তর দিতে যাত্রা করিবেন—তীরে উঠিয়া বিপক্ষ সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগে লুক্কায়িত থাকিবেন। প্রভাতে যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার সম্মুখ ভাগে আক্রমণ করিবেন—বিপক্ষেরা যুদ্ধে শ্রান্ত হইলে পর সংকেত পাইলে রাজধর সহসা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবেন। সেইজন্যই এত নৌকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু রাজধর ইশা খাঁর আদেশ কই পালন করিলেন? তিনি তো সৈন্য লইয়া নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি আর-এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলেন নাই। তিনি নিঃশব্দে আরাকানের রাজার শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। চতুর্দিকে পর্বত, মাঝে উপত্যকা, রাজার শিবির তাহারই মাঝখানে অবস্থিত। শিবিরে নির্ভয়ে সকলে নিদ্রিত। মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা দেখিয়া দূর হইতে শিবিরের স্থান-নির্ণয় হইতেছে। পর্বতের উপর হইতে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া রাজধরের পাঁচ হাজার সৈন্য অতি সাবধানে উপত্যকার দিকে নামিতে লাগিল—বর্ষাকালে যেমন পর্বতের সর্বাঙ্গ দিয়া গাছের শিকড় ধুইয়া ঘোলা হইয়া জলধারা নামিতে থাকে— তেমনি পাঁচ সহস্র মানুষ, পাঁচ সহস্র তলোয়ার, অন্ধকারের ভিতর দিয়া গাছের নিচে দিয়া সহস্র পথে আঁকিয়া-বাঁকিয়া যেন নিম্নাভিমুখে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু শব্দ নাই, মন্দ গতি। সহসা পাঁচ সহস্র সৈন্যের ভীষম চীৎকার উঠিল—ক্ষুদ্র শিবির যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং তাহার ভিতর হইতে মানুষগুলা কিল্‌কিল্ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কেহ মনে করিল দুঃস্বপ্ন, কেহ মনে করিল প্রেতের উৎপাত, কেহ কিছু মনে করিতে পারিল না।

রাজা বিনা রক্তপাতে বন্দী হইলেন। রাজা বলিলেন, "আমাকে বন্দী করিলে বা বধ করিলে যুদ্ধের অবসান হইবে না। আমি বন্দী হইবামাত্র সৈন্যেরা আমার ভাই হামচুপামুকে রাজা করিবে। যুদ্ধ যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিবে। আমি বরঞ্চ পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিই, আমার বন্ধন মোচন করিয়া দিন।"

রাজধর তাহাতেই সম্মত হইলেন। আরাকান রাজ পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিলেন। একটি হস্তিদন্ত-নির্মিত মুকুট, পাঁচ শত মণিপুরি ঘোড়া ও তিনটে বড়ো হাতি উপহার দিলেন। এইরূপ নানাব্যবস্থা করিতে করিতে প্রভাত হইল—বেলা হইয়া গেল। সুদীর্ঘ রাত্রে সমস্তই ভূতের ব্যাপার বলিয়া মনে হইয়াছিল, দিনের বেলা আরাকানের সৈন্যগণ আপনাদের অপমান স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিল। চারি দিকে বড়ো বড়ো পাহাড় সূর্যলোকে সহস্রচক্ষু হইয়া তাহাদিগের দিকে তাকাইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজধর আরাকানপতিকে কহিলেন, "আর বিলম্ব নয়, শীঘ্র যুদ্ধ নিবারণ করিবার এক আদেশপত্র আপনার সেনাপতির নিকট পাঠাইয়া দিন। ও পারে এতক্ষণে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেছে।"

কতকগুলি সৈন্য-সহিত দূতের হস্তে আদেশপত্র পাঠানো হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অতি প্রত্যুষেই, অন্ধকার দূর হইতে না হইতেই, যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার দুই ভাগে পশ্চিম ও পূর্বে মগদিগকে আক্রমণ করিতে চলিয়াছেন। সৈন্যের অল্পতা লইয়া রূপনারায়ণ হাজারি দুঃখ করিতেছিলেন। তিনি বলিতেছেন —আর পাঁচ হাজার লইয়া আসিলেই ভাবনা ছিল না। ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "ত্রিপুরারির অনুগ্রহ যদি হয় তবে এই কয় জন সৈন্য লইয়াই জিতিব, আর যদি না হয় তবে বিপদ আমাদের উপর দিয়াই যাক, ত্রিপুরাবাসী যত কম মরে ততই ভালো। কিন্তু হরের-কৃপায় আজ আমরা জিতবই।"

এই বলিয়া হর হর বোম্ বোম্ রব তুলিয়া কৃপাণ বর্ষা লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বিপক্ষদের অভিমুখে ছুটিলেন—তাঁহার দীপ্ত উৎসাহ তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণা বাতাসে খড়ের চালের উপর দিয়া আগুন যেমন ছোটে তাঁহার সৈন্যেরা তেমনি ছুটিতে লাগিল। কেহই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। বিপক্ষদের দক্ষিণ দিকের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। হাতাহাতি যুদ্ধ বাধিল। মানুষের মাথা ও দেহ কাটা শস্যের মতো শস্যক্ষেত্রের উপর গিয়া পড়িতে লাগিল। ইন্দ্রকুমারের ঘোড়া কাটা পড়িল। তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। রব উঠিল তিনি মারা পড়িয়াছেন। কুঠারাঘাতে এক মগ অশ্বারোহীকে অশ্বচ্যুত করিয়া ইন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ তাহার ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিলেন। রেকাবের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার রক্তাক্ত তলোয়ার আকাশে সূর্যলোকে উঠাইয়া বজ্রস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "হর হর বোম্ বোম্"—যুদ্ধের আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল।

এই-সকল ব্যাপার দেখিয়া মগদিগের বাম দিকের ব্যূহের সৈন্যগণ আক্রমণের প্রতীক্ষা না

করিয়া সহসা বাহির হইয়া যুবরাজের সৈন্যের উপর গিয়া পড়িল। যুবরাজের সৈন্যেরা সহসা এরূপ আক্রমণ প্রত্যাশা করে নাই। তাহারা মুহূর্তের মধ্যে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তাহাদের নিজের অশ্ব নিজের পদাতিকের উপর গিয়া পড়িল, কোন্ দিকে যাইবে ঠিকানা পাইল না। যুবরাজ ও ইশা খাঁ অসম সাহসের সহিত সৈন্যদের সংযত করিয়া লইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। অদূরে রাজধরের সৈন্য লুক্কায়িত আছে কল্পনা করিয়া সংকেতস্বরূপে বার বার তূরীনিনাদ করিলেন, কিন্তু রাজধরের সৈন্যের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। ইশা খাঁ বলিলেন, "তাহাকে ডাকা বৃথা। সে শৃগাল, দিনের বেলা গর্ত হইতে বাহির হইবে না।"

ইশা খাঁ ঘোড়া হইতে মাটিতে লাফাইয়া পড়িলেন। পশ্চিম-মুখ করিয়া সত্বর নামাজ পড়িয়া লইলেন। মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া 'মরিয়া' হইয়া লড়িতে লাগিলেন। চারি দিকে মৃত্যু যতই ঘেরিতে লাগিল, দুর্দান্ত যৌবন ততই যেন তাঁহার দেহে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময় ইন্দ্রকুমার শত্রুদের এক অংশ সম্পূর্ণ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, যুবরাজের একদল অশ্বারোহী ছিন্নভিন্ন হইয়া পলাইতেছে, তিনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইলেন। বিদ্যুৎ-বেগে যুবরাজের সাহায্যার্থে আসিলেন, কিনতু সে বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছুই কূল-কিনারা পাইলেন না। ঘূর্ণা বাতাসে মরুভূমির বালুকারাশি যেমন ঘুরিতে থাকে, উপত্যকার মাঝখানে যুদ্ধ তেমনি পাক খাইতে লাগিল। রাজধরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বার বার তূরীধ্বনি উঠিল, কিন্তু তাহার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

সহসা কী মন্ত্রবলে সমস্ত থামিয়া গেল, যে যেখানে ছিল স্থির হইয়া দাঁড়াইল—আহতের আর্তনাদ ও অশ্বের হ্রেষা ছাড়া আর শব্দ রহিল না। সন্ধির নিশান লইয়া লোক আসিয়াছে। মগের রাজা পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। হর হর বোম্ বোম্ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল। মগসৈন্যগণ আশ্চর্য হইয়া পরস্পরের মুখ চাহিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

রাজধর যখন জয়োপহার লইয়া আসিলেন তখন তাঁহার মুখে এত হাসি যে, তাঁহার ছোটো চোখ দুটা বিন্দুর মতো হইয়া পিট্ পিট্ করিতে লাগিল। হাতির দাঁতের মুকুট বাহির করিয়া ইন্দ্রকুমারকে দেখাইয়া কহিলেন, "এই দেখো, যুদ্ধের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই পুরস্কার পাইয়াছি।

ইন্দ্রকুমার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "যুদ্ধ! যুদ্ধ তুমি কোথায় করিলে! এ পুরস্কার তোমার নহে। এ মুকুট যুবরাজ পরিবেন।"

রাজধর কহিলেন, "আমি জয় করিয়া আনিয়াছি। এ মুকুট আমি পরিব।"

যুবরাজ কহিলেন, "রাজধর ঠিক কথা বলিতেছেন, এ মুকুট রাজধরেরই প্রাপ্য।"

ইশা খাঁ চটিয়া রাজধরকে বলিলেন, "তুমি মুকুট পরিযা দেশে যাইবে! তুমি সৈন্যাধ্যক্ষের

আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যুদ্ধ হইতে পলাইলে, এ কলঙ্ক একটা মুকুটে ঢাকা পড়িবে না। তুমি একটা ভাঙা হাঁড়ির কানা পরিয়া দেশে যাও, তোমাকে সাজিবে ভালো।"

রাজধর বলিলেন, "খাঁ-সাহেব, এখন তো তোমার মুখে খুব বোল ফুটিতেছে, কিন্তু আমি না থাকিলে এতক্ষণে থাকিতে কোথায়।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "যেখানেই থাকি, যুদ্ধ ছাড়িয়া গর্তের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতাম না।"

যুবরাজ বলিলেন, "ইন্দ্রকুমার, তুমি অন্যায় বলিতেছ। সত্য কথা বলিতে কী রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের বিপদ হইত।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের কোন বিপদ হইত না। রাজধর না থাকিলে মুকুট আমি যুদ্ধ করিয়া আনিতাম—রাজধর চুরি করিয়া আনিয়াছে। দাদা, এ মুকুট আনিয়া আমি তোমাকে পরাইয়া দিতাম, নিজে পরিতাম না।"

যুবরাজ মুকুট হাতে লইয়া রাজধরকে বলিলেন, "ভাই, তুমিই আজ জিতিয়াছ। তুমি না থাকিলে অল্প সৈন্য লইয়া আমাদের কী বিপদ হইত জানি না। এ মুকুট আমি তোমাকে পরাইয়া দিতেছি।"

বলিয়া রাজধরের মাথায় মুকুট পরাইয়া দিলেন।

ইন্দ্রকুমারের বক্ষ যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল—তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "দাদা, রাজধর শৃগালের মতো গোপনে রাত্রিযোগে চুরি করিয়া এই রাজমুকুট পুরস্কার পাইল; আর আমি যে প্রাণপণে যুদ্ধ করিলাম—তোমার মুখ হইতে একটা প্রশংসার বাক্যও শুনিতে পাইলাম না। কেন দাদা, আমি কি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার চোখের সামনে যুদ্ধ করি নাই—আমি কি যুদ্ধ ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিলাম—আমি কখনো ভীরুতা দেখাইয়াছি। আমি কি শত্রুসৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তোমার সাহায্যের জন্য আসি নাই। কী দেখিয়া তুমি বলিলে যে, তোমার পরম স্নেহের রাজধর ব্যতীত কেহ তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত না।"

যুবরাজ একান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "ভাই, আমি নিজের বিপদের কথা বলিতেছি না"—

কথা শেষে হইতে না হইতে অভিমানে ইন্দ্রকুমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ইশা খাঁ যুবরাজকে বলিলেন, "যুবরাজ, এ মুকুট তোমার কাহাকেও দিবার অধিকার নাই। আমি সেনাপতি, এ মুকুট আমি যাহাকে দিব তাহারই হইবে।" বলিয়া ইশা খাঁ রাজধরের মাথা হইতে মুকুট তুলিয়া যুবরাজের মাথায় দিতে গেলেন।

যুবরাজ সরিয়া গিয়া বলিলেন, "না, এ আমি গ্রহণ করিতে পারি না।"

ইশা খাঁ বলিলেন, "তবে থাক্। এ মুকুট কেহ পাইবে না।"

বলিয়া পদাঘাতে মুকুট কর্ণফুলি নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন, "রাজধর যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন—রাজধর শাস্তির যোগ্য।

দশম পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রকুমার তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া আহতহৃদয়ে শিবির হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। যুদ্ধ অবসান হইয়া গিয়াছে, ত্রিপুরার সৈন্য শিবির তুলিয়া দেশে ফিরিবার উপক্রম করিতেছি। এমন সময় সহসা এ ব্যাঘাত ঘটিল।

ইশা খাঁ যখন মুকুট কাড়িয়া লইলেন রাজধর মনে-মনে কহিলেন, 'আমি না থাকিলে তোমরা কেমন করিয়া উদ্ধার পাও একবার দেখিব।'

তাহার পরদিন রাজধর গোপনে আরাকানপতির শিবিরে এক পত্র পাঠাইয়া দিলেন। সেই পত্রে তিনি ত্রিপুরার সৈন্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদের সংবাদ দিয়া আরাকানপতিকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

ইন্দ্রকুমার যখন স্বতন্ত্র হইয়া সৈন্যসমেত স্বদেশাভিমুখে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং যুবরাজের সৈন্যেরা শিবির তুলিয়া গৃহের অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন, তখন সহসা মগেরা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিল—রাজধর সৈন্য লইয়া কোথায় সরিয়া পড়িলেন তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

যুবরাজের হতাবশিষ্ট তিন সহস্র সৈন্য প্রায় তাহার চতুর্গুণ মগসৈন্য-কর্তৃক হঠাৎ বেষ্টিত হইল। ইশা খাঁ যুবরাজকে বলিলেন, "আজ আর পরিত্রাণ নাই। যুদ্ধের ভার আমার উপর দিয়া তুমি পলায়ন করো।"

যুবরাজ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "পলাইলেও তো একদিন মরিতে হইবে।" চারি দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পলাইবই বা কোথা। এখানে মরিবার যেমন সুবিধা পলাইবার তেমন সুবিধা নাই। হে ঈশ্বর, সকলই তোমার ইচ্ছা।"

ইশা খাঁ বলিলেন, "তবে আইস, আজ সমারোহ করিয়া মরা যাক।"—বলিয়া প্রাচীর-বৎ শত্রুসৈন্যের এক দুর্বল অংশ লক্ষ্য করিয়া সমস্ত সৈন্য বিদ্যুৎ-বেগে ছুটাইয়া দিলেন। পলাইবার পথ রুদ্ধ দেখিয়া সৈন্যেরা উন্মত্তের ন্যায় লড়িতে লাগিল। ইশা খাঁ দুই হাতে দুই তলোয়ার লইলেন—তাঁহার চতুষ্পার্শে একটি লোক তিষ্ঠিতে পারিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে এক স্থানে একটি ক্ষুদ্র উৎস উঠিতেছিল, তাহার জল রক্তে লাল হইয়া উঠিল।

ইশা খাঁ শত্রুব্যূহ ভাঙিয়া ফেলিয়া লড়িতে লড়িতে প্রায় পর্বতের শিখর পর্যন্ত উঠিয়াছেন, এমন সময় এক তীর আসিয়া তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। তিনি আল্লার নাম উচ্চারণ করিয়া ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া গেলেন।

যুবরাজের জানুতে এক তীর, পৃষ্ঠে এক তীর এবং তাঁহার বাহন হাতির পঞ্জরে এক তীর বিদ্ধ হইল। মাহুত হত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। হাতি যুদ্ধক্ষেত্র ফেলিয়া উন্মাদের মতো ছুটিতে লাগিল। যুবরাজ তাহাকে ফিরাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন, সে ফিরিল না। অবশেষে যন্ত্রণায় ও রক্তপাতে দুর্বল হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অনেক দূরে কর্ণফুলি নদীর তীরে হাতির পিঠ হইতে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আজ রাত্রে চাঁদ উঠিয়াছে। অন্যদিন রাত্রে সে সবুজ মাঠের উপরে চাঁদের আলো বিচিত্রবর্ণ ছোটো ছোটো বনফুলের উপর আসিয়া পড়িল, আজ সেখানে সহস্র সহস্র মানুষের হাত পা কাটা-মুণ্ডু ও মৃতদেহের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—সে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ উৎসের জলে সমস্ত রাত ধরিয়া চন্দ্রের প্রতিবিম্ব নৃত্য করিত, সে উৎস মৃত অশ্বের দেহে প্রায় রুদ্ধ—তাহার জল রক্তে লাল হইয়া গেছে। কিন্তু দিনের বেলা মধ্যাহ্নের রৌদ্রে যেখানে মৃত্যুর ভীষণ উৎসব হইতেছিল, ভয় ক্রোধ নিরাশা হিংসা সহস্র হৃদয় হইতে অনবরত ফেনাইয়া উঠিতেছিল—অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্‌, উন্মাদের চীৎকার, আহতের আর্তনাদ, অশ্বের হ্রেষা, রণশঙ্খের ধ্বনিতে নীল আকাশ যেন মন্থিত হইতেছিল—রাত্রে চাঁদের আলোতে সেখানে কী অগাধ শান্তি, কী সুগভীর বিষাদ! মৃত্যুর নৃত্য যেন ফুরাইয়া গেছে, কেবল প্রকাণ্ড নাট্যশালার চারি দিকে উৎসবের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। সাড়াশব্দ নাই, প্রাণ নাই, চেতনা নাই, হৃদয়ের তরঙ্গ স্তব্ধ। এক দিকে পর্বতের সুদীর্ঘ ছায়া পড়িয়াছে, এক দিকে চাঁদের আলো। মাঝে মাঝে পাঁচ-ছয়টা করিয়া বড়ো বড়ো গাছ ঝাঁকড়া মাথা লইয়া শাখা প্রশাখা জটাজুট আঁধার করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ইন্দ্রকুমার যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ পাইয়া যখন যুবরাজকে খুঁজিতে আসিয়াছেন, তখন যুবরাজ কর্ণফুলি নদীর তীরে ঘসের শয্যার উপর শুইয়া আছেন। মাঝে মাঝে অঞ্জলি পুরিয়া জল পান করিতেছেন, মাঝে মাঝে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া চোখ বুজিয়া আসিতেছে। দূর সমুদ্রের দিক হইতে বাতাস আসিতেছে। কানের কাছে কুল্‌কুল্‌ করিয়া নদীর জল বাহিয়া যাইতেছে। জনপ্রাণী নাই। চারি দিকে বিজন পর্বত দাঁড়াইয়া আছে—বিজন অরণ্য ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে—আকাশে চন্দ্র একাকী, জ্যোৎস্নালোকে অনন্ত নীলাকাশ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এমন সময় ইন্দ্রকুমার যখন বিদীর্ণ হৃদয়ে 'দাদা' বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন, তখন আকাশ পাতাল যেন শিহরিয়া উঠিল। চন্দ্রনারায়ণ চমকিয়া জাগিয়া 'এসো ভাই' বলিয়া আলিঙ্গনের জন্য দুই হাত তুলিয়া দিলেন। ইন্দ্রকুমার দাদার আলিঙ্গনের মধ্যে বদ্ধ হইয়া শিশুর মতো কাঁদিতে লাগিল।

চন্দ্রনারায়ণ ধীরে-ধীরে বলিলেন, "আঃ, বাঁচিলাম ভাই! তুমি আসিবে জানিয়াই এতক্ষণ কোনো মতে আমার প্রাণ বাহির হইতেছিল না। ইন্দ্রকুমার, তুমি আমার উপরে অভিমান করিয়াছিলে, তোমার সেই অভিমান লইয়া কি আমি মরিতে পারি। আজ আমার দেখা হইল, তোমার প্রেম আবার ফিরিয়া পাইলাম—এখন মরিতে আর কোনো কষ্ট নাই।"

বলিয়া দুই হাতে তাঁহার তীর উৎপাটন করিলেন। রক্ত ছুটিয়া পড়িল, তাঁহার শরীর হিম হইয়া আসিল। মৃদুস্বরে বলিলেন, "মরিলাম তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু আমাদের পরাজয় হইল।"

ইন্দ্রকুমার কাঁদিয়া কহিলেন, "পরাজয় তোমার হয় নাই দাদা, পরাজয় আমারই হইয়াছে।"

চন্দ্রনারায়ণ ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া হাত জোড় করিয়া কহিলেন, "দয়াময়, ভবের খেলা শেষ করিয়া আসিলাম, এমন তোমার কোলে স্থান দাও!"—বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

ভোরের বেলা নদীর পশ্চিম পাড়ে চন্দ্র যখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিল, চন্দ্রনারায়ণের মুদ্রিতনেত্র মুখচ্ছবিও তখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবন অস্তমিত হইল।

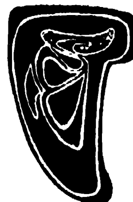
পরিশিষ্ট

বিজয়ী মগ-সৈন্যরা সমস্ত চট্টগ্রাম ত্রিপুরার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর পর্যন্ত লুণ্ঠন করিল। অমরমাণিক্য দেওঘাটে পলাইয়া গিয়া অপমানে আত্মহত্যা করিয়া মরিলেন। ইন্দ্রকুমার মগদের সহিত যুদ্ধ করিয়াই মরেন—জীবন ও কলঙ্ক লইয়া দেশে ফিরিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

রাজধর রাজা হইয়া কেবল তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন—তিনি গোমতীর জলে ডুবিয়া মরেন।

ইন্দ্রকুমার যখন যুদ্ধে যান তখন তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহারই পুত্র কল্যাণমাণিক্য রাজধরের মৃত্যুর পরে রাজা হন। তিনি পিতার ন্যায় বীর ছিলেন। যখন সম্রাট শাজাহানের সৈন্য ত্রিপুরা আক্রমণ করে, তখন কল্যাণমাণিক্য তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১২৯২



ছবি | সুব্রত মাজী

রাজর্ষি

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভুবনেশ্বরী-মন্দিরের পাথরের ঘাট গোমতী নদীতে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য একদিন গ্রীষ্মকালের প্রভাতে স্নান করিতে আসিয়াছেন, সঙ্গে তাঁহার ভাই নক্ষত্ররায়ও আসিয়াছেন। এমন সময়ে একটি ছোটো মেয়ে তাহার ছোটো ভাইকে সঙ্গে করিয়া সেই ঘাটে আসিল। রাজার কাপড় টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

রাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "মা, আমি তোমার সন্তান।"

মেয়েটি বলিল, "আমাকে পূজার ফুল পাড়িয়া দাও-না।"

রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, চলো।"

অনুচরগণ অস্থির হইয়া উঠিল। তাহারা বলিল, "মহারাজ, আপনি কেন যাইবেন, আমরা পাড়িয়া দিতেছি।"

রাজা বলিলেন, "না, আমাকে যখন বলিয়াছে আমিই পাড়িয়া দিব।"

রাজা সেই মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সেদিনকার বিমল উষার সঙ্গে তাহার মুখের সাদৃশ্য ছিল। রাজার হাত ধরিয়া যখন সে মন্দিরসংলগ্ন ফুলবাগানে বেড়াইতেছিল তখন চারি দিকের শুভ্র বেলফুলগুলির মতো তাহার ফুটফুটে মুখখানি হইতে যেন একটি বিমল সৌরভের ভাব উত্থিত হইয়া প্রভাতের কাননে ব্যাপ্ত হইতেছিল। ছোটো ভাইটি দিদির কাপড় ধরিয়া দিদির সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছিল। সে কেবল একমাত্র দিদিকেই জানে, রাজার সঙ্গে তাহার বড়ো একটা ভাব হইল না।

রাজা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী, মা?"

মেয়ে বলিল, "হাসি।"

রাজা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী?"

ছেলেটি বড়ো বড়ো চোখ মেলিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিছু উত্তর করিল না।

হাসি তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিল, "বল্-না ভাই, আমার নাম তাতা।"

ছেলেটি তাহার অতি ছোটো দুইখানি ঠোঁট একটুখানি খুলিয়া গম্ভীরভাবে দিদির কথার প্রতিধ্বনির মতো বলিল, "আমার নাম তাতা।" বলিয়া দিদির কাপড় আরো শক্ত করিয়া ধরিল।

হাসি রাজাকে বুঝাইয়া বলিল, "ও কিনা ছেলেমানুষ, তাই ওকে সকলে তাতা বলে।"

ছোটো ভাইটির দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "আচ্ছা, বল্ দেখি মন্দির।"

ছেলেটি দিদির দিকে চাহিয়া কহিল, "লদন্দ।"

হাসি হাসিয়া উঠিল কহিল, "তাতা মন্দির বলিতে পারে না, বলে লদন্দ—আচ্ছা, বল্ দেখি কড়াই।"

ছেলেটি গম্ভীর হইয়া বলিল, "বলাই।"

হাসি আবার হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তাতা আমাদের কড়াই বলিতে পারে না, বলে বলাই!" বলিয়া তাতাকে ধরিয়া চুমো খাইয়া খাইয়া অস্থির করিয়া দিল।

তাতা সহসা দিদির এত হাসি ও এত আদরের কোনোই কারণ খুঁজিয়া পাইল না, সে কেবল মস্ত চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল। বাস্তবিকই মন্দির এবং কড়াই শব্দ উচ্চারণ সম্বন্ধে তাতার সম্পূর্ণ ত্রুটি ছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। তাতার বয়সে হাসি মন্দিরকে কখনোই লদন্দ বলিত না, সে মন্দিরকে বলিত পালু; আর সে কড়াইকে বলাই বলিত কি না জানি না, কিন্তু কড়িকে বলিত ঘয়ি, সুতরাং তাতার এরূপ বিচিত্র উচ্চারণ শুনিয়া তাহার যে অত্যন্ত হাসি পাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কী? তাতা সম্বন্ধে নানা ঘটনা সে রাজাকে বলিতে লাগিল। একবার একজন বুড়োমানুষ কম্বল জড়াইয়া আসিয়াছিল, তাতা তাহাকে ভাল্লুক বলিয়াছিল, এমনি তাতার মন্দ বুদ্ধি। আর একবার তাতা গাছের আতাফলগুলিকে পাখি মনে করিয়া মোটা মোটা ছোটো দুটি হাতে তালি দিয়া তাহাদিগকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাতা যে হাসির চেয়ে অনেক ছেলেমানুষ, ইহা তাতার দিদি বিস্তর উদাহরণদ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিয়াছিল। তাতা নিজের বুদ্ধির পরিচয়ের কথা সম্পূর্ণ অবিচলিতচিত্তে শুনিতেছিল, যতটুকু বুঝিতে পারিল তাহাতে ক্ষোভের কারণ কিছুই দেখিতে পাইল না। এইরূপে সেদিনকার সকালে ফুল-তোলা শেষ হইল। ছোটো মেয়েটির আঁচল ভরিয়া যখন ফুল দিলেন তখন রাজার মনে হইল, যেন তাঁহার পূজা শেষ হইল; এই দুইটি সরল প্রাণের স্নেহের দৃশ্য দেখিয়া, এই পবিত্র হৃদয়ের আশ মিটাইয়া ফুল তুলিয়া দিয়া তাঁহার যেন দেবপূজার কাজ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিন হইতে ঘুম ভাঙিলে সূর্য উঠিলেও রাজার প্রভাত হইত না, ছোটো দুটি ভাইবোনের মুখ দেখিলে তবে তাঁহার প্রভাত হইত। প্রতিদিন তাহাদিগকে ফুল তুলিয়া দিয়া তবে তিনি স্নান করিতেন; দুই ভাইবোনে ঘাটে বসিয়া তাঁহার স্নান দেখিত। যেদিন সকালে এই দুটি ছেলেমেয়ে না আসিত সেদিন তাঁহার সন্ধ্যা-আহ্নিক যেন সম্পূর্ণ হইত না।

হাসি ও তাতার বাপ মা কেহ নাই। কেবল একটি কাকা আছে। কাকার নাম কেদারেশ্বর। এই দুটি ছেলেমেয়েই তাহার জীবনের একমাত্র সুখ ও সম্বল।

এক বৎসর কাটিয়া গেল। তাতা এখন মন্দির বলিতে পারে, কিন্তু এখনো কড়াই বলিতে বলাই বলে। অধিক কথা সে কয় না। গোমতী নদীর ধারে নাগকেশর গাছের তলায় পা

ছড়াইয়া তাহার দিদি তাহাকে যে-কোনো গল্পই বলিত সে তাহাই ড্যাবড্যাবা চোখে অবাক হইয়া শুনিত। সে গল্পের কোনো মাথামুণ্ড ছিল না; কিন্তু সে যে কী বুঝিত সেই জানে; গল্প শুনিয়া সেই গাছের তলায়, সেই সূর্যের আলোতে, সেই মুক্ত সমীরণে একটি ছোটো ছেলের ছোটো হৃদয়টুকুতে যে কত কথা কত ছবি উঠিত তাহা আমরা কী জানি। তাতা আর-কোনো ছেলের সঙ্গে খেলা করিত না, কেবল তাহার দিদির সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো বেড়াইত।

আষাঢ় মাস। সকাল হইতে ঘন মেঘ করিয়া রহিয়াছে। এখনো বৃষ্টি পড়ে নাই, কিন্তু বাদলা হইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। দূর-দেশের বৃষ্টির কণা বহিয়া শীতল বাতাস বহিতেছে। গোমতী নদীর জলে এবং গোমতী নদীর উভয় পারের অরণ্যে অন্ধকার আকাশের ছায়া পড়িয়াছে। কাল রাত্রে অমাবস্যা ছিল, কাল ভুবনেশ্বরীর পূজা হইয়া গিয়াছে।

যথাসময়ে হাসি ও তাতার হাত ধরিয়া রাজা স্নান করিতে আসিয়াছেন। একটি রক্তস্রোতের রেখা শ্বেতপ্রস্তরের ঘাটের সোপান বাহিয়া জলে গিয়া শেষ হইয়াছে। কাল রাত্রে যে এক-শো-এক মহিষ বলি হইয়াছে তাহারই রক্ত।

হাসি সেই রক্তের রেখা দেখিয়া সহসা একপ্রকার সংকোচে সরিয়া গিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কিসের দাগ, বাবা"?

রাজা বলিলেন, "রক্তের দাগ, মা।"

সে কহিল, "এত রক্ত কেন?"

এমন একপ্রকার কাতর স্বরে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল 'এত রক্ত কেন' যে, রাজারও হৃদয়ের মধ্যে ক্রমাগত এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল 'এত রক্ত কেন'। তিনি সহসা শিহরিয়া উঠিলেন।

বহুদিন ধরিয়া প্রতিবৎসর রক্তের স্রোত দেখিয়া আসিতেছেন, একটি ছোটো মেয়ের প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল 'এত রক্ত কেন'। তিনি উত্তর দিতে ভুলিয়া গেলেন। অন্যমনে স্নান করিতে করিতে ঐ প্রশ্নই ভাবিতে লাগিলেন।

হাসি জলে আঁচল ভিজাইয়া সিঁড়িতে বসিয়া ধীরে ধীরে রক্তের রেখা মুছিতে লাগিল, তাহার দেখাদেখি ছোটো হাতদুটি দিয়া তাতাও তাহাই করিতে লাগিল। হাসির আঁচলখানি রক্তে লাল হইয়া গেল। রাজার যখন স্নান হইয়া গেল তখন দুই ভাইবোনে মিলিয়া রক্তের দাগ মুছিয়া ফেলিয়াছে।

সেইদিন বাড়ি ফিরিয়া গিয়া হাসির জ্বর হইল। তাতা কাছে বসিয়া দুটি ছোটো আঙুলে দিদির মুদিত চোখের পাতা খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া মাঝে মাঝে ডাকিতেছে, "দিদি।" দিদি অমনি সচকিতে একটুখানি জাগিয়া উঠিতেছে। "কী তাতা" বলিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইতেছে, আবার তাহার চোখ ঢুলিয়া পড়িতেছে। তাতা অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, কোনো কথাই বলে না। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে দিদির গলা জড়াইয়া দিদির মুখের কাছে মুখ দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "দিদি, তুই উঠবি নে?" হাসি চমকিয়া জাগিয়া তাতাকে বুকে চাপিয়া কহিল, "কেন উঠব না, ধন!" কিন্তু

দিদির উঠিবার আর সাধ্য নাই। তাতার ক্ষুদ্র হৃদয় যেন অত্যন্ত অন্ধকার হইয়া গেল; তাতার সমস্ত দিনের খেলাধুলা আনন্দের আশা একেবারে ম্লান হইয়া গেল। আকাশ অত্যন্ত অন্ধকার, ঘরের চালের উপর ক্রমাগতই বৃষ্টির শব্দ শুনা যাইতেছে, প্রাঙ্গণের তেঁতুল গাছ জলে ভিজিতেছে, পথে পথিক নাই। কেদারেশ্বর একজন বৈদ্যকে সঙ্গে করিয়া আনিল। বৈদ্য নাড়ী টিপিয়া অবস্থা দেখিয়া ভালো বোধ করিল না।

তাহার পরদিন স্নান করিতে আসিয়া রাজা দেখিলেন, মন্দিরে দুইটি ভাইবোন তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া নাই। মনে করিলেন, এই ঘোরতর বর্ষায় তাহারা আসিতে পারে নাই। স্নান-তর্পণ শেষ করিয়া শিবিকায় চড়িয়া বাহকদিগকে কেদারেশ্বরের কুটিরে যাইতে আজ্ঞা দিলেন। অনুচরেরা সকলে আশ্চর্য হইয়া গেল, কিন্তু রাজাজ্ঞার উপরে আর কথা কহিতে পারিল না।

রাজার শিবিকা প্রাঙ্গণে গিয়া পৌঁছিলে কুটিরে অত্যন্ত গোলযোগ পড়িয়া গেল। সে গোলমালে রোগীর রোগের কথা সকলেই ভুলিয়া গেল। কেবল তাতা নড়িল না, সে অচেতন দিদির কোলের কাছে বসিয়া দিদির কাপড়ের এক প্রান্ত মুখের ভিতর পুরিয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

রাজাকে ঘরে আসিতে দেখিয়া তাতা জিজ্ঞাসা করিল, "কী হয়েছে?"

উদ্‌বিগ্নহৃদয় রাজা কিছুই উত্তর দিলেন না। তাতা ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "দিদির নেগেছে?"

খুড়ো কেদারেশ্বর কিছু বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল, "হাঁ, লেগেছে।"

অমনি তাতা দিদির কাছে গিয়া দিদির মুখ তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া গলা জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, তোমার কোথায় নেগেছে?" মনের অভিপ্রায় এই যে, সেই জায়গাটাতে ফুঁ দিয়া, হাত বুলাইয়া দিদির সমস্ত বেদনা দূর করিয়া দিবে। কিন্তু যখন দিদি কোনো উত্তর দিল না, তখন তাহার আর সহ্য হইল না— ছোটো দুটি ঠোঁট উত্তরোত্তর ফুলিতে লাগিল, অভিমানে কাঁদিয়া উঠিল। কাল হইতে বসিয়া আছে, একটি কথা নাই কেন? তাতা কী করিয়াছে যে তাহার উপর এত অনাদর? রাজার সম্মুখে তাতার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া কেদারেশ্বর অত্যন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে বিরক্ত হইয়া তাতার হাত ধরিয়া অন্য ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। তবুও দিদি কিছু বলিল না।

রাজবৈদ্য আসিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়া গেল। রাজা সন্ধ্যাবেলায় আবার হাসিকে দেখিতে আসিলেন। তখন বালিকা প্রলাপ বকিতেছে। বলিতেছে, "মা গো, এত রক্ত কেন!"

রাজা কহিলেন, "মা, এ রক্তস্রোত আমি নিবারণ করিব।"

বালিকা বলিল, "আয় ভাই তাতা, আমরা দুজনে এ রক্ত মুছে ফেলি।"

রাজা কহিলেন, "আয় মা, আমিও মুছি।"

সন্ধ্যার কিছু পরেই হাসি একবার চোখ খুলিয়াছিল। একবার চারিদিকে চাহিয়া কাহাকে যেন খুঁজিল। তখন তাতা অন্য ঘরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কাহাকে যেন না দেখিতে পাইয়া হাসি চোখ বুজিল। চক্ষু আর খুলিল না। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রাজার কোলে

হাসির মৃত্যু হইল।

হাসিকে যখন চিরদিনের জন্য কুটির হইতে লইয়া গেল তখন তাতা অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইতেছিল। সে যদি জানিতে পাইত তবে সেও বুঝি দিদির সঙ্গে সঙ্গে ছোটো ছায়াটির মতো চলিয়া যাইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজার সভা বসিয়াছে। ভুবনেশ্বরী-দেবী-মন্দিরের পুরোহিত কার্যবশত রাজদর্শনে আসিয়াছেন।

পুরোহিতের নাম রঘুপতি। এ দেশে পুরোহিতকে চোন্তাই বলিয়া থাকে। ভুবনেশ্বরী দেবীর পূজার চোদ্দ দিন পরে গভীর রাত্রে চতুর্দশদেবতার এক পূজা হয়। এই পূজার সময় এক দিন দুই রাত্রি কেহ ঘরের বাহির হইতে পারে না, রাজাও না। রাজা যদি বাহির হন, তবে চোন্তাইয়ের নিকটে তাঁহাকে অর্থদণ্ড দিতে হয়। প্রবাদ আছে, এই পূজার রাত্রে মন্দিরে নরবলি হয়। এই পূজা-উপলক্ষে সর্বপ্রথমে যে সকল পশু বলি হয় তাহা রাজবাড়ির দান বলিয়া গৃহীত হয়। এই বলির পশু গ্রহণ করিবার জন্য চোন্তাই রাজসমীপে আসিয়াছেন। পূজার আর বারো দিন বাকি আছে।

রাজা বলিলেন, "এ বৎসর হইতে মন্দিরে জীববলি আর হইবে না।"

সভাসুদ্ধ লোক অবাক হইয়া গেল। রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়ের মাথার চুল পর্যন্ত দাঁড়াইয়া উঠিল।

চোন্তাই রঘুপতি বলিলেন, "আমি এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি!"

রাজা বলিলেন, "না ঠাকুর, এতদিন আমরা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, আজ আমাদের চেতনা হইয়াছে। একটি বালিকার মূর্তি ধরিয়া মা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, করুণাময়ী জননী হইয়া মা তাঁহার জীবের রক্ত আর দেখিতে পারেন না।"

রঘুপতি কহিলেন, "মা তবে এতদিন ধরিয়া জীবের রক্ত পান করিয়া আসিয়াছেন কী করিয়া?"

রাজা কহিলেন, "না, পান করেন নাই। তোমরা যখন রক্তপাত করিতে তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া থাকিতেন।"

রঘুপতি বলিলেন, "মহারাজ, রাজকার্য আপনি ভালো বুঝেন সন্দেহ নাই, কিন্তু পূজা সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না। দেবীর যদি কিছুতে অসন্তোষ হইত আমিই আগে জানিতে পারিতাম।"

নক্ষত্ররায় অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "হাঁ, এ ঠিক কথা। দেবীর যদি কিছুতে অসন্তোষ হইত ঠাকুরমহাশয়ই আগে জানিতে পাইতেন।"

রাজা বলিলেন, "হৃদয় যার কঠিন হইয়া গিয়াছে দেবীর কথা সে শুনিতে পায় না।"

নক্ষত্ররায় পুরোহিতের মুখের দিকে চাহিলেন—ভাবটা এই যে, এ কথার একটা উত্তর দেওয়া আবশ্যক।

রঘুপতি আগুন হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি পাষণ্ড নাস্তিকের মতো কথা কহিতেছেন।"

নক্ষত্ররায় মৃদু প্রতিধ্বনির মতো বলিলেন, "হাঁ, নাস্তিকের মতো কথা কহিতেছেন।"

গোবিন্দমাণিক্য উদ্দীপ্তমূর্তি পুরোহিতের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, রাজসভায় বসিয়া আপনি মিথ্যা সময় নষ্ট করিতেছেন। মন্দিরের কাজ বহিয়া যাইতেছে, আপনি মন্দিরে যান। যাইবার সময় পথে প্রচার করিয়া দিবেন যে, আমার রাজ্যে যে ব্যক্তি দেবতার নিকট জীব বলি দিবে তাহার নির্বাসনদণ্ড হইবে।"

তখন রঘুপতি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পইতা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তবে তুমি উচ্ছন্ন যাও।" চারিদিক হইতে হাঁ হাঁ করিয়া সভাসদ্‌গণ পুরোহিতের উপর গিয়া পড়িলেন। রাজা ইঙ্গিতে সকলকে নিষেধ করিলেন, সকলে সরিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুপতি বলিতে লাগিলেন, "তুমি রাজা, তুমি ইচ্ছা করিলে প্রজার সর্বস্ব হরণ করিতে পার, তাই বলিয়া তুমি মায়ের বলি হরণ করিবে! বটে! কী তোমার সাধ্য! আমি রঘুপতি—মায়ের সেবক থাকিতে কেমন তুমি পূজার ব্যাঘাত কর দেখিব।"

মন্ত্রী রাজার স্বভাব বিলক্ষণ অবগত আছেন। তিনি জানেন সংকল্প হইতে রাজাকে শীঘ্র বিচলিত করা যায় না। তিনি ধীরে ধীরে সভয়ে কহিলেন, "মহারাজ, আপনার স্বর্গীয় পিতৃপুরুষগণ বরাবর দেবীর নিকটে নিয়মিত বলি দিয়া আসিতেছেন। কখনো এক দিনের জন্য ইহার অন্যথা হয় নাই।"

মন্ত্রী থামিলেন। রাজা চুপ করিয়া রহিলেন। মন্ত্রী বলিলেন, "আজ এত দিন পরে আপনার পিতৃপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত সেই প্রাচীন পূজার ব্যাঘাত সাধন করিলে স্বর্গে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইবেন।"

মহারাজ ভাবিতে লাগিলেন। নক্ষত্ররায় বিজ্ঞতাসহকারে বলিলেন, "হাঁ, স্বর্গে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইবেন।"

মন্ত্রী আবার বলিলেন, "মহারাজ, এক কাজ করুন, যেখানে সহস্র বলি হইয়া থাকে সেইখানে একশত বলির আদেশ করুন।"

সভাসদেরা বজ্রাহতের মতো অবাক হইয়া রহিল, গোবিন্দমাণিক্যও বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ পুরোহিত অধীর হইয়া সভা হইতে উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

এমন সময়ে কেমন করিয়া প্রহরীদের হাত এড়াইয়া খালি-গায়ে খালি-পায়ে একটি ছোটো ছেলে সভায় প্রবেশ করিল। রাজসভার মাঝখানে দাঁড়াইয়া রাজার মুখের দিকে বড়ো বড়ো চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কোথায়?"

বৃহৎ রাজসভার সমস্ত যেন সহসা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। দীর্ঘ গৃহে কেবল একটি ছেলের কণ্ঠধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল "দিদি কোথায়"।

রাজা তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে নামিয়া ছেলেকে কোলে করিয়া দৃঢ়স্বরে মন্ত্রীকে বলিলেন, "আজ হইতে আমার রাজ্যে বলিদান হইতে পারিবে না। ইহার উপর আর কথা কহিয়ো না।"

মন্ত্রী কহিলেন, "যে আজ্ঞে।"

তাতা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার দিদি কোথায়?"

রাজা বলিলেন, "মায়ের কাছে।"

তাতা অনেকক্ষণ মুখে আঙুল দিয়া চুপ করিয়া রহিল, একটা যেন ঠিকানা পাইল এমনি তাহার মনে হইল। আজ হইতে রাজা তাতাকে নিজের কাছে রাখিলেন। খুড়ো কেদারেশ্বর রাজবাড়িতে স্থান পাইল।

সভাসদেরা আপনা-আপনি বলাবলি করিতে লাগিল, "এ যে মগের মুল্লুক হইয়া দাঁড়াইল। আমরা তো জানি বৌদ্ধ মগেরাই রক্তপাত করে না, অবশেষে আমাদের হিন্দুদের দেশেও কি সেই নিয়ম চলিবে নাকি!"

নক্ষত্ররায়ও তাহাদের মতে সম্পূর্ণ মত দিয়া কহিলেন, "হাঁ, শেষে হিন্দুদের দেশেও কি সেই নিয়ম চলিবে নাকি!"

সকলেই ভাবিল, অবনতির লক্ষণ ইহা হইতে আর কী হইতে পারে! মগে হিন্দুতে তফাত রহিল কী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভুবনেশ্বরী-দেবী-মন্দিরের ভৃত্য জয়সিংহ জাতিতে রাজপুত, ক্ষত্রিয়। তাঁহার বাপ সুচেতসিংহ ত্রিপুরার রাজবাটীর একজন পুরাতন ভৃত্য ছিলেন। সুচেতসিংহের মৃত্যুকালে জয়সিংহ নিতান্ত বালক ছিলেন। এই অনাথ বালককে রাজা মন্দিরের কাজে নিযুক্ত করেন। জয়সিংহ মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতির দ্বারাই পালিত ও শিক্ষিত হইয়াছেন। ছেলেবেলা হইতে মন্দিরে পালিত হইয়া জয়সিংহ মন্দিরকে গৃহের মতো ভালোবাসিতেন; মন্দিরের প্রত্যেক সোপান, প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ডের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার মা ছিলেন না, ভুবনেশ্বরী-প্রতিমাকেই তিনি মায়ের মতো দেখিতেন। প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া তিনি কথা কহিতেন, তাঁহার একলা বোধ হইত না। তাঁহার আরো সঙ্গী ছিল। মন্দিরের বাগানের অনেকগুলি গাছকে তিনি নিজের হাতে মানুষ করিয়াছেন—তাঁহার চারিদিকে প্রতিদিন তাঁহার গাছগুলি বাড়িতেছে, লতাগুলি জড়াইতেছে, শাখা পুষ্পিত হইতেছে, ছায়া বিস্তৃত হইতেছে, শ্যামল বল্লরীর পল্লবস্তবকে যৌবনগর্বে নিকুঞ্জ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু জয়সিংহের এ-সকল প্রাণের কথা ভালোবাসার কথা বড়ো একটা কেহ জানিত না; তাঁহার বিপুল বল ও সাহসের জন্যই তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

মন্দিরের কাজকর্ম শেষ করিয়া জয়সিংহ তাঁহার কুটিরের দ্বারে বসিয়া আছেন। সম্মুখে মন্দিরের কানন। বিকাল হইয়া আসিয়াছে, অত্যন্ত ঘন মেঘ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। নববর্ষার জলে জয়সিংহের গাছগুলি স্নান করিতেছে, বৃষ্টিবিন্দুর নৃত্যে পাতায় পাতায় উৎসব পড়িয়া গিয়াছে, বর্ষাজলের ছোটো ছোটো শত শত প্রবাহ ঘোলা হইয়া কলকল করিয়া গোমতী

নদীতে গিয়া পড়িতেছে—জয়সিংহ পরমানন্দে তাঁহার কাননের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। চারিদিকে মেঘের স্নিগ্ধ অন্ধকার, বনের ছায়া, ঘনপল্লবের শ্যামশ্রী, ভেকের কোলাহল, বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ঝরঝর শব্দ—কাননের মধ্যে এইরূপ নববর্ষার ঘোরঘটা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ জুড়াইয়া যাইতেছে।

ভিজিতে ভিজিতে রঘুপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জয়সিংহ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পা ধুইবার জল ও শুকনো কাপড় আনিয়া দিলেন।

রঘুপতি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমাকে কাপড় আনিতে কে বলিল?" বলিয়া কাপড়গুলা লইয়া ঘরের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন।

জয়সিংহ পা ধুইবার জল লইয়া অগ্রসর হইলেন। রঘুপতি বিরক্তির স্বরে কহিলেন, "থাক্ থাক্, তোমার ও জল রাখিয়া দাও।" বলিয়া পা দিয়া জলের ঘটি ঠেলিয়া ফেলিলেন।

জয়সিংহ সহসা এরূপ ব্যবহারের কারণ বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইলেন—কাপড় ভূমি হইতে তুলিয়া যথাস্থানে রাখিতে উদ্যত হইলেন, রঘুপতি পুনশ্চ বিরক্তভাবে কহিলেন, "থাক্ থাক্, ও কাপড়ে তোমার হাত দিতে হইবে না।"—বলিয়া নিজে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া আসিলেন। জল লইয়া পা ধুইলেন।

জয়সিংহ ধীরে ধীরে কহিলেন, "প্রভু, আমি কি কোনো অপরাধ করিয়াছি?"

রঘুপতি কিঞ্চিৎ উগ্র স্বরে কহিলেন, "কে বলিতেছে যে তুমি অপরাধ করিয়াছ?"

জয়সিংহ ব্যথিত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

রঘুপতি অস্থিরভাবে কুটিরের দাওয়ায় বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে রাত্রি অনেক হইল; ক্রমাগত বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। অবশেষে রঘুপতি জয়সিংহের পিঠে হাত দিয়া কোমল স্বরে কহিলেন, "বৎস, শয়ন করিতে যাও, রাত্রি অনেক হইল।"

জয়সিংহ রঘুপতির স্নেহের স্বরে বিচলিত হইয়া কহিলেন, "প্রভু আগে শয়ন করিতে যান, তার পরে আমি যাইব।"

রঘুপতি কহিলেন, "আমার বিলম্ব আছে। দেখো পুত্র, তোমার প্রতি আমি আজ কঠোর ব্যবহার করিয়াছি, কিছু মনে করিয়ো না। আমার মন ভালো ছিল না। সবিশেষ বৃত্তান্ত তোমাকে কাল প্রভাতে বলিব। আজ তুমি শয়ন করো গে।"

জয়সিংহ কহিলেন, "যে আজ্ঞে।" বলিয়া শয়ন করিতে গেলেন। রঘুপতি সমস্ত রাত বেড়াইতে লাগিলেন।

প্রভাতে জয়সিংহ গুরুকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুপতি কহিলেন, "জয়সিংহ, মায়ের বলি বন্ধ হইয়াছে।"

জয়সিংহ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কী কথা প্রভু।"

রঘুপতি। রাজার এইরূপ আদেশ।

জয়সিংহ। কোন্ রাজার?

রঘুপতি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "এখানে রাজা আবার কয় গণ্ডা আছে? মহারাজ

গোবিন্দমাণিক্য আদেশ করিয়াছেন, মন্দিরে জীববলি হইতে পারিবে না।"

জয়সিংহ। নরবলি?

রঘুপতি। আঃ, কী উৎপাত! আমি বলিতেছি জীববলি, তুমি শুনিতেছ নরবলি।

জয়সিংহ। কোনো জীববলিই হইতে পারিবে না?

রঘুপতি। না।

জয়সিংহ। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য এইরূপ আদেশ করিয়াছেন?

রঘুপতি। হাঁ গো, এক কতা কতবার বলিব।

জয়সিংহ অনেকক্ষণ কিছুই বলিলেন না, কেবল আপন মনে বলিতে লাগিলেন 'মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য'। গোবিন্দমাণিক্যকে জয়সিংহ ছেলেবেলা হইতে দেবতা বলিয়া জানিতেন। আকাশের পূর্ণচন্দ্রের প্রতি শিশুদের যেমন একপ্রকার আসক্তি আছে, গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি জয়সিংহের সেইরূপ মনের ভাব ছিল, গোবিন্দমাণিক্যের প্রশান্ত সুন্দর মুখ দেখিয়া জয়সিংহ প্রাণ-বিসর্জন করিতে পারিতেন।

রঘুপতি কহিলেন, "ইহার একটা তো প্রতিবিধান করিতে হইবে?"

জয়সিংহ কহিলেন, "তা অবশ্য। আমি মহারাজের কাছে যাই, তাঁকে মিনতি করিয়া বলি—"

রঘুপতি। সে চেষ্টা বৃথা।

জয়সিংহ। তবে কী করিতে হইবে?

রঘুপতি কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "সে কাল বলিব। কাল তুমি প্রভাতে কুমার নক্ষত্ররায়ের নিকটে গিয়া তাঁহাকে গোপনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিবে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রভাতে নক্ষত্ররায় আসিয়া রঘুপতিকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, কী আদেশ করেন?"

রঘুপতি কহিলেন, "তোমার প্রতি মায়ের আদেশ আছে। আগে মাকে প্রণাম করিবে চলো।"

উভয়ে মন্দিরে গেলেন। জয়সিংহও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। নক্ষত্ররায় ভুবনেশ্বরী-প্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন।

রঘুপতি নক্ষত্ররায়কে কহিলেন, "কুমার, তুমি রাজা হইবে?

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আমি রাজা হইব! ঠাকুরমশায় যে কী বলেন তার ঠিক নাই।" বলিয়া নক্ষত্ররায় অত্যন্ত হাসিতে লাগিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "আমি বলিতেছি, তুমি রাজা হইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আপনি বলিতেছেন, আমি রাজা হইব!" বলিয়া রঘুপতির মুখের

দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "আমি কি মিথ্যা কথা বলিতেছি?"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আপনি কি মিথ্যা কথা বলিতেছেন? সে কেমন করিয়া হইবে? দেখুন ঠাকুরমশায়, আমি কাল ব্যাঙের স্বপ্ন দেখিয়াছি। আচ্ছা, ব্যাঙের স্বপ্ন দেখিলে কি হয় বলুন দেখি।"

রঘুপতি হাস্য সম্বরণ করিয়া কহিলেন, "কেমনতরো ব্যাঙ বলো দেখি। তাহার মাথায় দাগ আছে তো?"

নক্ষত্ররায় সগর্বে কহিলেন, "তাহার মাথায় দাগ আছে বৈকি। দাগ না থাকিলে চলিবে কেন?"

রঘুপতি কহিলেন, "বটে! তবে তো তোমার রাজটিকা লাভ হইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "তবে আমার রাজটিকা লাভ হইবে! আপনি বলিতেছেন, আমার রাজটিকা লাভ হইবে! আর, যদি না হয়?"

রঘুপতি কহিলেন, "আমার কথা ব্যর্থ হইবে! বল কী?"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "না না, সে কথা হইতেছে না। আপনি কিনা বলিতেছেন, আমার রাজটিকা লাভ হইবে, মনে করুন যদিই না হয়। দৈবাৎ কি এমন হয় না যে—"

রঘুপতি কহিলেন, "না, না, ইহার অন্যথা হইবে না।"

নক্ষত্ররায়। ইহার অন্যথা হইবে না! আপনি বলিতেছেন, ইহার অন্যথা হইবে না! দেখুন ঠাকুরমশায়, আমি রাজা হইলে আপনাকে মন্ত্রী করিব।

রঘুপতি। মন্ত্রিত্বের পদে আমি পদাঘাত করি।

নক্ষত্ররায় উদারভাবে কহিলেন, "আচ্ছা, জয়সিংহকে মন্ত্রী করিব।"

রঘুপতি কহিলেন, "সে কথা পরে হইবে। রাজা হইবার আগে কী করিতে হইবে সেটা শোনো আগে। মা রাজরক্ত দেখিতে চান, স্বপ্নে আমার প্রতি এই আদেশ হইয়াছে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "মা রাজরক্ত দেখিতে চান, স্বপ্নে আপনার প্রতি এই আদেশ হইয়াছে! এ তো বেশ কথা।"

রঘুপতি কহিলেন, "তোমাকে গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত আনিতে হইবে।"

নক্ষত্ররায় খানিকটা হাঁ করিয়া রহিলেন। এ কথাটা তত 'বেশ' বলিয়া মনে হইল না।

রঘুপতি তীব্র স্বরে কহিলেন, "সহসা ভ্রাতৃস্নেহের উদয় হইল নাকি!"

নক্ষত্ররায় কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, "হাঃ হাঃ, ভ্রাতৃস্নেহ! ঠাকুরমশায় বেশ বলিলেন যা-হোক, ভ্রাতৃস্নেহ!"

এমন মজার কথা, এমন হাসিবার কথা যেন আর হয় না। ভ্রাতৃস্নেহ! কি লজ্জার বিষয়! কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, নক্ষত্ররায়ের প্রাণের ভিতরে ভ্রাতৃস্নেহ জাগিতেছে, তা হাসিয়া উড়াইবার জো নাই।

রঘুপতি কহিলেন, "তা হইলে কী করিবে বলো।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "কী করিব বলুন।"

রঘুপতি। কথাটা ভালো করিয়া শোনো। তোমাকে গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত মায়ের দর্শনার্থ আনিতে হইবে।

নক্ষত্ররায় মন্ত্রের মতো বলিয়া গেলেন, "গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত মায়ের দর্শনার্থ আনিতে হইবে।"

রঘুপতি নিতান্ত ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "না, তোমার দ্বারা কিছু হইবে না।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "কেন হইবে না? যাহা বলিবেন তাহাই হইবে। আপনি তো আদেশ করিতেছেন?"

রঘুপতি। হাঁ, আমি আদেশ করিতেছি।

নক্ষত্ররায়। কী আদেশ করিতেছেন?

রঘুপতি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "মায়ের ইচ্ছা, তিনি রাজরক্ত দর্শন করিবেন। তুমি গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত দেখাইয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবে, এই আমার আদেশ।"

নক্ষত্ররায়। আমি আজই গিয়া ফতে খাঁকে এই কাজে নিযুক্ত করিব।

রঘপতি। না না, আর কোনো লোককে ইহার বিন্দুবিসর্গ জানাইয়ো না। কেবল জয়সিংহকে তোমার সাহায্যে নিযুক্ত করিব। কালি প্রাতে আসিয়ো, কী উপায়ে এ কার্য সাধন করিতে হইবে কাল বলিব।

নক্ষত্ররায় রঘুপতির হাত এড়াইয়া বাঁচিলেন। যত শীঘ্র পারিলেন বাহির হইয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্ররায় চলিয়া গেলে জয়সিংহ কহিলেন, "গুরুদেব, এমন ভয়ানক কথা কখনো শুনি নাই। আপনি মায়ের সম্মুখে মায়ের নাম করিয়া ভাইকে দিয়া ভ্রাতৃহত্যার প্রস্তাব করিলেন, আর আমাকে তাই দাঁড়াইয়া শুনিতে হইল!"

রঘুপতি বলিলেন, "আর কী উপায় আছে বলো।"

জয়সিংহ কহিলেন, "উপায়! কিসের উপায়!"

রঘুপতি। তুমিও যে নক্ষত্ররায়ের মতো হইলে দেখিতেছি। এতক্ষণ তবে কী শুনিলে।

জয়সিংহ। যাহা শুনিলাম তাহা শুনিবার যোগ্য নহে, তাহা শুনিলে পাপ আছে।

রঘুপতি। পাপ পুণ্যের তুমি কী বুঝ!

জয়সিংহ। এতকাল আপনার কাছে শিক্ষা পাইলাম, পাপপুণ্যের কিছুই বুঝি না কি!

রঘুপতি। শোনো বৎস, তোমাকে তবে আর-এক শিক্ষা দিই।

পাপপুণ্য কিছুই নাই। কেই বা পিতা, কেই বা ভ্রাতা, কেই বা কে? হত্যা যদি পাপ হয়

তো সকল হত্যাই সমান। কিন্তু কে বলে হত্যা পাপ? হত্যা তো প্রতিদিনই হইতেছে। কেহ বা মাথায় একখণ্ড পাথর পড়িয়া হত হইতেছে, কেহ বা বন্যায় ভাসিয়া গিয়া হত হইতেছে, কেহ বা মড়কের মুখে পড়িয়া হত হইতেছে, কেহ বা মনুষ্যের ছুরিকাঘাতে হত হইতেছে। কত পিপীলিকা আমরা প্রত্যহ পদতলে দলন করিয়া যাইতেছি, আমরা তাহাদের অপেক্ষা এমনই কি বড়ো! এই-সকল ক্ষুদ্র প্রাণীদের জীবন-মৃত্যু খেলা বৈ তো নয়, মহাশক্তির মায়া বৈ তো নয়। কালরূপিণী মহামায়ার নিকটে প্রতিদিন এমন কত লক্ষ কোটি প্রাণীর বলিদান হইতেছে—জগতের চতুর্দিক হইতে জীবনশোণিতের স্রোত তাঁহার মহাখর্পরে আসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে—আমিই নাহয় সেই স্রোতে আর-একটি কণা যোগ করিয়া দিলাম। তাঁহার বলি তিনিই এক কালে গ্রহণ করিতেন, আমি নাহয় মাঝখানে থাকিয়া উপলক্ষ হইলাম।

তখন জয়সিংহ প্রতিমার দিকে ফিরিয়া কহিতে লাগিলেন, "এই জন্যই কি তোকে সকলে মা বলে মা—তুই এমন পাষাণী! রাক্ষসী, সমস্ত জগৎ হইতে রক্ত নিষ্পেষণ করিয়া লইয়া উদরে পুরিবার জন্য তুই ঐ লোল জিহ্বা বাহির করিয়াছিস! স্নেহ প্রেম মমতা সৌন্দর্য ধর্ম সমস্তই মিথ্যা, সত্য কেবল তোর ঐ অনন্ত রক্ততৃষা! তোরই উদর পূরণের জন্য মানুষ মানুষের গলায় ছুরি বসাইবে, ভাই ভাইকে খুন করিবে, পিতাপুত্রে কাটাকাটি করিবে! নিষ্ঠুর, সত্যসত্যই এই যদি তোর ইচ্ছা তবে মেঘ রক্তবর্ষণ করে না কেন! করুণাস্বরূপিণী নদী রক্তস্রোত লইয়া রক্তসমুদ্রে গিয়া পড়ে না কেন! না না মা, তুই প্রকাশ করিয়া বল্—এ শিক্ষা মিথ্যা, এ শাস্ত্র মিথ্যা—আমার মাকে মা বলে না, সন্তান রক্তপিপাসু রাক্ষসী বলে, এ কথা আমি সহিতে পারিব না।"

জয়সিংহের চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল—তিনি নিজের কথা লইয়া নিজেই ভাবিতে লাগিলেন। এত কথা ইতিপূর্বে কখনো তাঁহার মনে হয় নাই, রঘুপতি যদি তাঁহাকে নূতন শাস্ত্র শিক্ষা দিতে না আসিতেন তবে কখনোই তাঁহার এত কথা মনেই আসিত না।

রঘুপতি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তবে তো বলিদানের পালা একেবারে উঠাইয়া দিতে হয়।"

জয়সিংহ অতি শৈশবকাল হইতেই প্রতিদিন বলিদান দেখিয়া আসিতেছেন। এইজন্য মন্দিরে যে বলিদান কোনো কালে বন্ধ হইতে পারে কিম্বা বন্ধ হওয়া উচিত এ কথা কিছুতেই তাঁহার মনে লাগে না। এমন-কি, এ কথা মনে করিতে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগে। এইজন্য রঘুপতির কথার উত্তরে জয়সিংহ বলিলেন, "সে স্বতন্ত্র কথা। তাহার অন্য কোনো অর্থ আছে। তাহাতে তো কোনো পাপ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ভাইকে ভাই হত্যা করিবে? তাই বলিয়া মহারাজ গোবিন্দ-মাণিক্যকে—প্রভু, আপনার পায় ধরিয়া জিজ্ঞাসা করি, আমাকে প্রবঞ্চনা করিবেন না, সত্যই কি মা স্বপ্নে কহিয়াছেন রাজরক্ত নহিলে তাঁর তৃপ্তি হইবে না?"

রঘুপতি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "সত্য নহিলে কি মিথ্যা কহিতেছি? তুমি কি আমাকে অবিশ্বাস কর?"

জয়সিংহ রঘুপতির পদধূলি লইয়া কহিলেন, "গুরুদেবের প্রতি আমার বিশ্বাস শিথিল না হয় যেন। কিন্তু নক্ষত্ররায়েরও তো রাজকুলে জন্ম।"

রঘুপতি কহিলেন, "দেবতাদের স্বপ্ন ইঙ্গিতমাত্র ; সকল কথা শুনা যায় না, অনেকটা বুঝিয়া লইতে হয়। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে গোবিন্দ-মাণিক্যের প্রতি দেবীর অসন্তোষ হইয়াছে, অসন্তোষের সম্পূর্ণ কারণও জন্মিয়াছে। অতএব দেবী যখন রাজরক্ত চাহিয়াছেন তখন বুঝিতে হইবে তাহা গোবিন্দমাণিক্যেরই রক্ত।"

জয়সিংহ কহিলেন, "তা যদি সত্য হয় তবে আমিই রাজরক্ত আনিব —নক্ষত্ররায়কে পাপে লিপ্ত করিব না।"

রঘুপতি কহিলেন, "দেবীর আদেশ পালন করিতে কোনো পাপ নাই।"

জয়সিংহ। পুণ্য আছে তো প্রভু! সে পুণ্য আমি উপার্জন করিব।

রঘুপতি কহিলেন, "তবে সত্য করিয়া বলি বৎস! আমি তোমাকে শিশুকাল হইতে পুত্রের অধিক যত্নে প্রাণের অধিক ভালোবাসিয়া পালন করিয়া আসিয়াছি, আমি তোমাকে হারাইতে পারিব না। নক্ষত্ররায় যদি গোবিন্দমাণিক্যকে বধ করিয়া রাজা হয় তবে কেহ তাহাকে একটি কথা কহিবে না, কিন্তু তুমি যদি রাজার গায়ে হাত তোল তো তোমাকে আর আমি ফিরিয়া পাইব না।"

জয়সিংহ কহিলেন, "আমার স্নেহে—পিতা, আমি অপদার্থ—আমার স্নেহে তুমি একটি পিপীলিকারও হানি করিতে পাইবে না। আমার প্রতি স্নেহে তুমি যদি পাপে লিপ্ত হও তবে তোমার সে স্নেহ আমি বেশি দিন ভোগ করিতে পারিব না; সে স্নেহের পরিণাম কখনোই ভালো হইবে না।"

রঘুপতি তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, সে কথা পরে হইবে। কাল নক্ষত্ররায় আসিলে যা হয় একটা ব্যবস্থা হইবে।"

জয়সিংহ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'আমিই রাজরক্ত আনিব। মায়ের নামে গুরুদেবের নামে ভ্রাতৃহত্যা ঘটিতে দিব না।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জয়সিংহের সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। গুরুর সহিত যে কথা লইয়া আলোচনা হইয়াছিল দেখিতে দেখিতে তাহার শাখা-প্রশাখা বাহির হইতে লাগিল। অধিকাংশ সময়েই আরম্ভ আমাদের আয়ত্ত, শেষ আমাদের আয়ত্ত নহে। চিন্তা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। জয়সিংহের মনে অনিবার্য বেগে এমন-সকল কথা উঠিতে লাগিল যা তাঁহার আশৈশব বিশ্বাসের মূলে অবিশ্রাম আঘাত করিতে লাগিল। জয়সিংহ পীড়িতক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন।

কিন্তু দুঃস্বপ্নের মতো ভাবনা কিছুতেই ক্ষান্ত হইতে চায় না। যে দেবীকে জয়সিংহ এতদিন

মা বলিয়া জানিতেন গুরুদেব আজ কেন তাঁহার মাতৃত্ব অপহরণ করিলেন, কেন তাঁহাকে হৃদয়হীন শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন? 'শক্তির সন্তোষই কী আর অসন্তোষই কী? শক্তির চক্ষুই বা কোথায় কর্ণই বা কোথায়? শক্তি তো মহারথের ন্যায় তাহার সহস্র চক্রের তলে জগৎ কর্ষিত করিয়া ঘর্ঘর শব্দে চলিয়া যাইতেছে; তাহাকে অবলম্বন করিয়া কে চলিল, তাহার তলে পড়িয়া কে চূর্ণ হইল, তাহার উপরে উঠিয়া কে উৎসব করিতেছে, তাহার নিম্নে পড়িয়া কে আর্তনাদ করিতেছে, সে তাহার কী জানিবে? তাহার সারথি কি কেহ নাই? পৃথিবীর নিরীহ অসহায় ভীরু জীবদিগের রক্ত বাহির করিয়া কালরূপিণী নিষ্ঠুর শক্তির তৃষা নির্বাণ করিতে হইবে, এই কি আমার ব্রত? কেন? সে তো আপনার কাজ আপনিই করিতেছে—তাহার দুর্ভিক্ষ আছে, বন্যা আছে, ভূমিকম্প আছে, জরা মারী অগ্নিদাহ আছে, নির্দয় মানব-হৃদয়স্থিত হিংসা আছে, ক্ষুদ্র আমাকে তাহার আবশ্যক কী?'

তাহার পরদিন যে প্রভাত হইল তাহা অতি মনোহর প্রভাত। বৃষ্টির শেষ হইয়াছে। পূর্বদিকে মেঘ নাই। সূর্যকিরণ যেন বর্ষার জলে ধৌত ও স্নিগ্ধ। বৃষ্টিবিন্দু ও সূর্যকিরণে দশ দিক ঝলমল করিতেছে। শুভ আনন্দপ্রভা আকাশে প্রান্তরে অরণ্যে নদীস্রোতে বিকশিত শ্বেত শতদলের ন্যায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নীল আকাশে চিল ভাসিয়া যাইতেছে। ইন্দ্রধনুর তোরণের নীচে দিয়া বকের শ্রেণী উড়িয়া চলিয়াছে। কাঠবিড়ালিরা গাছে গাছে ছুটাছুটি করিতেছে। দুই-একটি অতি ভীরু খরগোশ সচকিতে ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আবার আড়াল খুঁজিতেছে। ছাগশিশুরা অতি দুর্গম পাহাড়ে উঠিয়া ঘাস ছিঁড়িয়া খাইতেছে। গোরুগুলি আজ মনের আনন্দে মাঠময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাখাল গান ধরিয়াছে; কলসকক্ষ মায়ের আঁচল ধরিয়া আজ ছেলেমেয়েরা বাহির হইয়াছে। বৃদ্ধ পূজার জন্য ফুল তুলিতেছে। স্নানের জন্য নদীতে আজ অনেক লোক সমবেত হইয়াছে, কলকলস্বরে তাহারা গল্প করিতেছে—নদীর কলধ্বনিরও বিরাম নাই। আষাঢ়ের প্রভাতে এই জীবময়ী আনন্দময়ী ধরণীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জয়সিংহ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

জয়সিংহ প্রতিমার দিকে চাহিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, "কেন মা, আজ এত অপ্রসন্ন কেন? একদিন তোমার জীবের রক্ত তুমি দেখিতে পাও নাই বলিয়া এত ভ্রূকুটি? আমাদের হৃদয়মধ্যে চাহিয়া দেখো, ভক্তির কি কিছু অভাব দেখিতেছ? ভক্তের হৃদয় পাইলেই কি তোমার তৃপ্তি হয় না, নিরপরাধের শোণিত চাই? আচ্ছা মা, সত্য করিয়া বল্ দেখি, পুণ্যের শরীর গোবিন্দমাণিক্যকে পৃথিবী হইতে অপসৃত করিয়া এখানে দানবের রাজত্ব স্থাপন করাই কি তোর অভিপ্রায়? রাজরক্ত কি নিতান্তই চাই? তোর মুখের উত্তর না শুনিলে আমি কখনোই রাজহত্যা ঘটিতে দিব না, আমি ব্যাঘাত করিব। বল্, হাঁ কি না।"

সহসা বিজন মন্দিরে শব্দ উঠিল, "হাঁ।"

জয়সিংহ চমকিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, মনে হইল যেন ছায়ার মতো কী একটা কাঁপিয়া গেল। স্বর শুনিয়া প্রথমেই তাঁহার মনে হইয়াছিল, যেন তাঁর গুরুর কণ্ঠস্বর। পরে মনে করিলেন, মা তাঁহাকে তাঁহার গুরুর কণ্ঠস্বরেই আদেশ করিলেন

ইহাই সম্ভব। তাঁহার গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিমাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া সশস্ত্রে বাহির হইয়া পড়িলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গোমতী নদীর দক্ষিণ দিকের এক স্থানের পাড় অতিশয় উচ্চ। বর্ষার ধারা ও ছোটো ছোটো স্রোত এই উন্নত ভূমিকে নানা গুহাগহ্বরে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার কিছু দূরে প্রায় অর্ধচন্দ্রাকারে বড়ো বড়ো শাল ও গাম্ভারি গাছে এই শতধাবিদীর্ণ ভূমিখণ্ডকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু মাঝখানের এই জমিটুকুর মধ্যে বড়ো গাছ একটিও নাই। কেবল স্থানে স্থানে ঢিবির উপর ছোটো ছোটো শালগাছ বাড়িতে পারিতেছে না, কেবল বাঁকিয়া কালো হইয়া পড়িয়াছে। বিস্তর পাথর ছড়ানো। এক হাত দুই হাত প্রশস্ত ছোটো ছোটো জলস্রোত কত শত আঁকাবাঁকা পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া, মিলিয়া, বিভক্ত হইয়া নদীতে গিয়া পড়িতেছে। এই স্থান অতি নির্জন, এখানকার আকাশ গাছের দ্বারা অবরুদ্ধ নহে। এখান হইতে গোমতী নদী ও তাহার পরপারের বিচিত্রবর্ণ শস্যক্ষেত্রসকল অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। প্রতিদিন প্রাতে রাজা গোবিন্দমাণিক্য এইখানে বেড়াইতে আসিতেন, সঙ্গে একটি সঙ্গী বা অনুচরও আসিত না। জেলেরা কখনো কখনো গোমতীতে মাছ ধরিতে আসিয়া দূর হইতে দেখিতে পাইত তাহাদের সৌম্যমূর্তি রাজা যোগীর ন্যায় স্থিরভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখে প্রভাতের জ্যোতি কি তাঁহার আত্মার জ্যোতি বুঝা যাইত না। আজকাল বর্ষার দিনে প্রতিদিন এখানে আসিতে পারিতেন না, কিন্তু বর্ষা উপশমে যেদিন আসিতেন, সেদিন ছোটো তাতাকে সঙ্গে করিয়া আনিতেন।

তাতাকে আর তাতা বলিতে ইচ্ছা করে না। একমাত্র যাহার মুখে তাতা সম্বোধন মানাইত সে তো আর নাই। পাঠকের কাছে তাতা শব্দের কোনো অর্থ নাই। কিন্তু হাসি যখন সকালবেলায় শালবনে দুষ্টুমি করিয়া শালগাছের আড়ালে লুকাইয়া তাহার সুমিষ্ট তীক্ষ্ণ স্বরে তাতা বলিয়া ডাকিত এবং তাহার উত্তরে গাছে গাছে দোয়েল ডাকিয়া উঠিত, দূর কানন হইতে প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিত, তখন সেই তাতা শব্দ অর্থে পরিপূর্ণ হইয়া কানন ব্যাপ্ত করিত, তখন সেই তাতা সম্বোধন একটি বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অতি কোমল স্নেহনীড় পরিত্যাগ করিয়া পাখির মতো স্বর্গের দিকে উড়িয়া যাইত—তখন সেই একটি স্নেহসিক্ত মধুর সম্বোধন প্রভাতের সমুদয় পাখির গান লুটিয়া লইত, প্রভাতপ্রকৃতির আনন্দময় সৌন্দর্যের সহিত একটি ক্ষুদ্র বালিকার আনন্দময় স্নেহের ঐক্য দেখাইয়া দিত। এখন সে বালিকা নাই— বালকটি আছে কিন্তু তাতা নাই। বালকটি এ সংসারের সহস্র লোকের সহস্র বিষয়ের, কিন্তু তাতা কেবলমাত্র সেই বালিকারই। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য এই বালককে ধ্রুব বলিয়া ডাকিতেন, আমরাও তাহাই বলিয়া ডাকিব।

মহারাজ পূর্বে একা গোমতীতীরে আসিতেন, এখন ধ্রুবকে সঙ্গে করিয়া আনেন। তাহার পবিত্র সরল মুখচ্ছবিতে তিনি দেবলোকের ছায়া দেখিতে পান। মধ্যাহ্নে সংসারের আবর্তের

মধ্যে রাজা যখন প্রবেশ করেন তখন বৃদ্ধ বিজ্ঞ মন্ত্রীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, তাঁহাকে পরামর্শ দেয়—আর প্রভাত হইলে একটি শিশু তাঁহাকে সংসারের বাহিরে লইয়া আসে—তাহার বড়ো বড়ো দুটি নীরব চক্ষুর সম্মুখে বিষয়ের সহস্র কুটিলতা সংকুচিত হইয়া যায়—শিশুর হাত ধরিয়া মহারাজ বিশ্বজগতের মধ্যবর্তী অনন্তের দিকে প্রসারিত একটি উদার সরল বিস্তৃত রাজপথে গিয়া দাঁড়ান। সেখানে অনন্ত সুনীল আকাশ চন্দ্রাতপের নিম্নস্থিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাসভা দেখিতে পাওয়া যায়; ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোক সপ্তলোকের সংগীতের আভাস শুনা যায়; সেখানে সরল পথে সকলই সরল সহজ শোভন বলিয়া বোধ হয়; কেবলই অগ্রসর হইতে উৎসাহ হয়—উৎকট ভাবনা-চিন্তা অসুখ-অশান্তি দূর হইয়া যায়। মহারাজ সেই প্রভাতে, নির্জনে, বনের মধ্যে নদীর তীরে, মুক্ত আকাশে, একটি শিশুর প্রেমে নিমগ্ন হইয়া অসীম প্রেম-সমুদ্রের পথ দেখিতে পান।

গোবিন্দমাণিক্য ধ্রুবকে কোলে করিয়া লইয়া তাহাকে ধ্রুবোপাখ্যান শুনাইতেছেন, সে যে বড়ো একটা কিছু বুঝিতেছে তাহা নহে—কিন্তু রাজার ইচ্ছা ধ্রুবের মুখে আধো-আধো স্বরে এই ধ্রুবোপাখ্যান আবার ফিরিয়া শুনেন।

গল্প শুনিতে শুনিতে ধ্রুব বলিল, "আমি বনে যাব।"

রাজা বলিলেন, "কী করতে বনে যাবে?"

ধ্রুব বলিল, "হরিকে দেখতে যাব।"

রাজা বলিলেন, "আমরা তো বনে এসেছি, হরিকে দেখতে এসেছি।"

ধ্রুব। হরি কোথায়?

রাজা। এইখানেই আছেন।

ধ্রুব কহিল, "দিদি কোথায়" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া পিছনে চাহিয়া দেখিল; তাহার মনে হইল, দিদি যেন আগেকার মতো পিছন হইতে সহসা তাহার চোখ টিপিবার জন্য আসিতেছে, কাহাকেও না পাইয়া ঘাড় নামাইয়া চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কোথায়?"

রাজা কহিলেন, "হরি তোমার দিদিকে ডেকে নিয়েছেন।"

ধ্রুব কহিল, "হরি কোথায়?"

রাজা কহিলেন, "তাঁকে ডাকো বৎস। তোমাকে সেই-যে শ্লোক শিখিয়ে দিয়েছিলেম সেইটে বলো।"

ধ্রুব দুলিয়া দুলিয়া বলিতে লাগিল—

হরি, তোমায় ডাকি, বালক একাকী,
আঁধার অরণ্যে ধাই হে।
গহন তিমিরে নয়নের নীরে
পথ খুঁজে নাহি পাই হে।
সদা মনে হয় কী করি, কী করি,

কখন আসিবে কাল-বিভাবরী,
তাই ভয়ে মরি, ডাকি হরি হরি,
হরি বিনা কেহ নাই হে।
নয়নের জল হবে না বিফল,
তোমায় সবে বলে ভকতবৎসল,
সেই আশা মনে করেছি সম্বল,
বেঁচে আছি আমি তাই হে।
আঁধারেতে জাগে তোমার আঁখিতারা,
তোমার ভক্ত কভু হয় না পথহারা,
ধ্রুব তোমায় চাহে তুমি ধ্রুবতারা,
আর কার পানে চাই হে।

'র'য়ে 'ল'য়ে 'ড'য়ে 'দ'য়ে উলটপালট করিয়া, অর্ধেক কথা মুখের মধ্যে রাখিয়া, অর্ধেক কথা উচ্চারণ করিয়া, ধ্রুব দুলিয়া দুলিয়া সুধাময় কণ্ঠে এই শ্লোক পাঠ করিল। শুনিয়া রাজার প্রাণ আনন্দে নিমগ্ন হইয়া গেল, প্রভাত দ্বিগুণ মধুর হইয়া উঠিল, চারি দিকে নদী কানন তরুলতা হাসিতে লাগিল; কনকসুধাসিক্ত নীলাকাশে তিনি কাহার অনুপম সুন্দর সহাস্য মুখচ্ছবি দেখিতে পাইলেন। ধ্রুব যেমন তাঁহার কোলে বসিয়া আছে তাঁহাকেও তেমনি কে যেন বাহুপাশের মধ্যে, কোলের মধ্যে তুলিয়া লইল। তিনি আপনাকে, আপনার চারি দিকের সকলকে, বিশ্বচরাচরকে, কাহার কোলের উপর দেখিতে পাইলেন। তাঁহার আনন্দ ও প্রেম সূর্যকিরণের ন্যায় দশ দিকে বিকিরিত হইয়া আকাশ পূর্ণ করিল।

এমন সময় সশস্ত্র জয়সিংহ গুহাপথ দিয়া সহসা রাজার সম্মুখে আসিয়া উত্থিত হইলেন।

রাজা তাঁহাকে দুই হাত বাড়াইয়া দিলেন; কহিলেন, "এসো জয়সিংহ, এসো।" রাজা তখন শিশুর সহিত মিশিয়া শিশু হইয়াছেন, তাঁহার রাজমর্যাদা কোথায়!

জয়সিংহ রাজাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। জয়সিংহ কহিলেন, "মহারাজ, এক নিবেদন আছে।"

রাজা কহিলেন, "কী, বলো।"

জয়সিংহ। মা আপনার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন।

রাজা। কেন, আমি তাঁর অসন্তোষের কাজ কী করিয়াছি?

জয়সিংহ। মহারাজ বলি বন্ধ করিয়া দেবীর পূজার ব্যাঘাত করিয়াছেন।

রাজা বলিয়া উঠিলেন, "কেন জয়সিংহ, কেন এ হিংসার লালসা! মাতৃক্রোড়ে সন্তানের রক্তপাত করিয়া তুমি মাকে প্রসন্ন করিতে চাও।"

জয়সিংহ ধীরে ধীরে রাজার পায়ের কাছে বসিলেন। ধ্রুব তাঁহার তলোয়ার লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

জয়সিংহ কহিলেন, "কেন মহারাজ, শাস্ত্রে তো বলিদানের ব্যবস্থা আছে।"

রাজা কহিলেন, "শাস্ত্রের যথার্থ বিধি কেই বা পালন করে? আপনার প্রবৃত্তি অনুসারে সকলেই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। যখন দেবীর সম্মুখে বলির সকর্দম রক্ত সর্বাঙ্গে মাখিয়া সকলে উৎকট চীৎকারে ভীষণ উল্লাসে প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতে থাকে তখন কি তাহারা মায়ের পূজা করে, না, নিজের হৃদয়ের মধ্যে যে হিংসারাক্ষসী আছে সেই রাক্ষসীটার পূজা করে? হিংসার নিকটে বলিদান দেওয়া শাস্ত্রের বিধি নহে, হিংসাকে বলি দেওয়াই শাস্ত্রের বিধি।"

জয়সিংহ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। কল্য রাত্রি হইতে তাঁহার মনেও এমন অনেক কথা তোলপাড় হইয়াছে।

অবশেষে বলিলেন, "আমি মায়ের স্বমুখে শুনিয়াছি—এ বিষয়ে আর কোনো সংশয় থাকিতে পারে না। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, তিনি মহারাজের রক্ত চান।" বলিয়া জয়সিংহ প্রভাতের মন্দিরের ঘটনা রাজাকে বলিলেন।

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "এ তো মায়ের আদেশ নয়, এ রঘুপতির আদেশ। রঘুপতিই অন্তরাল হইতে তোমার কথার উত্তর দিয়াছিলেন।"

রাজার মুখে এই কথা শুনিয়া জয়সিংহ একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনেও এইরূপ সংশয় একবার চকিতের মতো উঠিয়াছিল, কিন্তু আবার বিদ্যুতের মতো অন্তর্হিত হইয়াছিল। রাজার কথায় সেই সন্দেহে আবার আঘাত লাগিল।

জয়সিংহ অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "না মহারাজ, আমাকে ক্রমাগত সংশয় হইতে সংশয়ান্তরে লইয়া যাইবেন না—আমাকে তীর হইতে ঠেলিয়া সমুদ্রে ফেলিবেন না—আপনার কথায় আমার চারি দিকের অন্ধকার কেবল বাড়িতেছে। আমার যে বিশ্বাস যে ভক্তি ছিল তাই থাক্—তাহার পরিবর্তে এ কুয়াশা আমি চাই না। মায়ের আদেশই হউক আর গুরুর আদেশই হউক, সে একই কথা—আমি পালন করিব।" বলিয়া বেগে উঠিয়া তাঁহার তলোয়ার খুলিলেন—তলোয়ার রৌদ্রকিরণে বিদ্যুতের মতো চক্‌মক্ করিয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া ধ্রুব উর্ধ্বস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, তাহার ছোটো দুইটি হাতে রাজাকে জড়াইয়া রাজাকে প্রাণপণে আচ্ছাদন করিয়া ধরিল—রাজা জয়সিংহের প্রতি লক্ষ না করিয়া ধ্রুবকেই বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

জয়সিংহ তলোয়ার দূরে ফেলিয়া দিলেন। ধ্রুবের পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "কোনো ভয় নেই, বৎস, কোনো ভয় নেই। আমি এই চলিলাম, তুমি ওই মহৎ আশ্রয়ে থাকো, ওই বিশাল বক্ষে বিরাজ করো—তোমাকে কেহ বিচ্ছিন্ন করিবে না।" বলিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

সহসা আবার কী ভাবিয়া ফিরিয়া কহিলেন, "মহারাজকে সাবধান করিয়া দিই, আপনার ভ্রাতা নক্ষত্ররায় আপনার বিনাশের পরামর্শ করিয়াছেন। ২৯ শে আষাঢ় চতুর্দশ দেবতার পূজার রাত্রে আপনি সতর্ক থাকিবেন।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "নক্ষত্র কোনোমতেই আমাকে বধ করিতে পারিবে না, সে আমাকে ভালোবাসে

জয়সিংহ বিদায় হইয়া গেলেন।

রাজা ধ্রুবের দিকে চাহিয়া ভক্তিভাবে কহিলেন, "তুমিই আজ রক্তপাত হইতে ধরণীকে রক্ষা করিলে, সেই উদ্দেশেই তোমার দিদি তোমাকে রাখিয়া গিয়াছেন।"

বলিয়া ধ্রুবের অশ্রুসিক্ত দুইটি কপোল মুছাইয়া দিলেন।

ধ্রুব গম্ভীরমুখে কহিল, "দিদি কোথায়"?

এমন সময় মেঘ আসিয়া সূর্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, নদীর উপর কালো ছায়া পড়িল। দূরের বনান্ত মেঘের মতোই কালো হইয়া উঠিল। বৃষ্টিপাতের লক্ষণ দেখিয়া রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

মন্দির অনেক দূরে নয়। কিন্তু জয়সিংহ বিজন নদীর ধার দিয়া অনেক ঘুরিয়া ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে চলিলেন। বিস্তর ভাবনা তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। এক জায়গায় নদীর তীরে গাছের তলায় বসিয়া পড়িলেন। দুই হস্তে মুখ আচ্ছাদন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছি, অথচ সংশয় যাইতেছে না। আজ হইতে কেই বা আমার সংশয় ঘুচাইবে? কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ আজ হইতে কে তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিবে? সংসারের সহস্র কোটি পথের মোহানায় দাঁড়াইয়া কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব কোন্‌টা যথার্থ পথ? প্রান্তরের মধ্যে আমি অন্ধ একাকী দাঁড়াইয়া আছি, আজ আমার যষ্টি ভাঙিয়া গেছে।'

জয়সিংহ যখন উঠিলেন তখন বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে মন্দিরের দিকে চলিলেন। দেখিলেন, বিস্তর লোক কোলাহল করিতে করিতে মন্দিরের দিক হইতে দল বাঁধিয়া চলিয়া আসিতেছে।

বুড়া বলিতেছে, "বাপ-পিতামহর কাল থেকে এই তো চলে আসছে জানি, আজ রাজার বুদ্ধি কি তাঁদের সকলকেই ছাড়িয়ে উঠল?"

যুবা বলিতেছে, "এখন আর মন্দিরে আসতে ইচ্ছে করে না, পূজার সে ধুম নেই।"

কেহ বলিল, "এ যে নবাবের রাজত্ব হয়ে দাঁড়ালো!" তাহার ভাব এই যে, বলিদান সম্বন্ধে দ্বিধা একজন মুসলমানের মনেই জন্মাইতে পারে, কিন্তু একজন হিন্দুর মনে জন্মানো অত্যন্ত আশ্চর্য।

মেয়েরা বলিতে লাগিল, "এ রাজ্যের মঙ্গল হবে না।"

একজন কহিল, "পুরুত-ঠাকুর তো স্বয়ং বললেন যে, মা স্বপ্নে বলেছেন, তিন মাসের মধ্যে এ দেশ মড়কে উচ্ছন্ন যাবে।"

হারু বলিল, "এই দেখো-না কেন, মোধো আজ দেড় বছর ধরে ব্যামো ভুগে বরাবর বেঁচে এসেছে, যেই বলি বন্ধ হল অমনি সে মারা গেল।"

ক্ষান্ত বলিল, "তা কেন, আমার ভাশুরপো, সে যে মরবে এ কে জানত? তিন দিনের জ্বর।

যেমনি কবিরাজের বড়িটি খাওয়া অমনি চোখ উল্টে গেল।" ভাশুরপোর শোকে এবং রাজ্যের অমঙ্গল-আশঙ্কায় ক্ষান্ত কাতর হইয়া পড়িল।

তিনকড়ি কহিল, "সেদিন মথুরহাটির গঞ্জে আগুন লাগল, একখানা চালাও বাকি রইল না।"

চিন্তামণি চাষা তাহার একজন সঙ্গী চাষাকে কহিল, "অত কথায় কাজ কী, দেখো না কেন, এ বছর যেমন ধান সস্তা হয়েছে এমন অন্য কোনো বছর হয় নি। এ বছর চাষার কপালে কী আছে কে জানে।"

বলিদান বন্ধ হইবার পরে এবং পূর্বেও যাহার যাহা-কিছু ক্ষতি হইয়াছে, সর্বসম্মতিক্রমে ওই বলি বন্ধ হওয়াই তাহার একমাত্র কারণ নির্দিষ্ট হইল। এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই ভালো এইরূপ সকলের মত হইল। এ মত কিছুতেই পরিবর্তিত হইল না বটে কিন্তু দেশেই সকলে বাস করিতে লাগিল।

জয়সিংহ অন্যমনস্ক ছিলেন। ইহাদের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া তিনি মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন পূজা শেষ করিয়া রঘুপতি মন্দিরের বাহিরে বসিয়া আছেন।

দ্রুতগতি রঘুপতির নিকট গিয়াই জয়সিংহ কাতর অথচ দৃঢ় স্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব, মায়ের আদেশ গ্রহণ করিবার জন্য আজ প্রভাতে আমি যখন মাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কেন তাহার উত্তর দিলেন?"

রঘুপতি একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, "মা তো আমার দ্বারাই তাঁহার আদেশ প্রচার করিয়া থাকেন। তিনি নিজমুখে কিছু বলেন না।"

জয়সিংহ কহিলেন, "আপনি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন না কেন? অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া আমাকে ছলনা করিলেন কেন?"

রঘুপতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "চুপ করো। আমি কী ভাবিয়া কী করি তুমি তাহার কী বুঝিবে। বাচালের মতো যাহা মুখে আসে তাহাই বলিয়ো না। আমি যাহা আদেশ করিব তুমি কেবল তাহাই পালন করিবে, কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়ো না।"

জয়সিংহ চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার সংশয় বাড়িল বৈ কমিল না। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "আজ প্রাতে আমি মায়ের কাছে বলিয়াছিলাম যে, তিনি যদি স্বমুখে আমাকে আদেশ না করেন তবে আমি কখনোই রাজহত্যা ঘটিতে দিব না, তাহার ব্যাঘাত করিব। যখন স্থির বুঝিলাম মা আদেশ করেন নাই তখন মহারাজের নিকট নক্ষত্ররায়ের সংকল্প প্রকাশ করিয়া দিতে হইল, তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলাম।"

রঘুপতি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। উদ্‌বেল ক্রোধ দমন করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "মন্দিরে প্রবেশ করো।"

উভয়ে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করো, বলো যে, ২৯শে আষাঢ়ের মধ্যে আমি রাজরক্ত আনিয়া এই চরণে উপহার দিব।"

জয়সিংহ ঘাড় হেঁট করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে একবার গুরুর মুখের দিকে একবার প্রতিমার মুখের দিকে চাহিলেন। প্রতিমা স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "২৯শে আষাঢ়ের মধ্যে আমি রাজরক্ত আনিয়া এই চরণে উপহার দিব।"

দশম পরিচ্ছেদ

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মহারাজ নিয়মিত রাজকার্য সমাপন করিলেন। প্রাতঃকালের সূর্যালোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে; মেঘের ছায়ায় দিন আবার অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। মহারাজ অত্যন্ত বিমনা আছেন। অন্যদিন রাজসভায় নক্ষত্ররায় উপস্থিত থাকিতেন, আজ তিনি উপস্থিত ছিলেন না। রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; তিনি ওজর করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার শরীর অসুস্থ। রাজা স্বয়ং নক্ষত্ররায়ের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নক্ষত্র মুখ তুলিয়া রাজার মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না। একখানা লিখিত কাগজ লইয়া ব্যস্ত আছেন এমনি ভান করিলেন। রাজা বলিলেন, "নক্ষত্র, তোমার কি অসুখ করিয়াছে?"

নক্ষত্র কাগজের এ-পিঠ ও-পিঠ উল্টাইয়া, হাতের অঙ্গুরী নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "অসুখ? না, অসুখ ঠিক নয়—এই একটুখানি কাজ ছিল—হাঁ, হাঁ, অসুখ হয়েছিল—কতকটা অসুখের মতন বটে।"

নক্ষত্ররায় নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। গোবিন্দমাণিক্য অতিশয় বিষণ্ণমুখে নক্ষত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"হায় হায়, স্নেহের নীড়ের মধ্যেও হিংসা ঢুকিয়াছে, সে সাপের মতো লুকাইতে চায়, মুখ দেখাইতে চায় না। আমাদের অরণ্যে কি হিংস্র পশু যথেষ্ট নাই, শেষে কি মানুষেও মানুষকে ভয় করিবে, ভাইও ভাইয়ের পাশে গিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বসিতে পাইবে না। এ সংসারে হিংসা-লোভই এত বড়ো হইয়া উঠিল, আর স্নেহ-প্রেম কোথাও ঠাঁই পাইল না। এই আমার ভাই, ইহার সহিত প্রতিদিন এক গৃহে বাস করি, একাসনে বসিয়া থাকি, হাসিমুখে কথা কই—এও আমার পাশে বসিয়া মনের মধ্যে ছুরি শানাইতেছে।' গোবিন্দমাণিক্যের নিকট তখন সংসার হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যের মতো বোধ হইতে লাগিল। ঘন অন্ধকারের মধ্যে কেবল চারি দিকে দন্ত ও নখরের ছটা দেখিতে পাইলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মহারাজ মনে করিলেন, 'এই স্নেহ প্রেম-হীন হানাহানির রাজ্যে বাঁচিয়া থাকিয়া আমি আমার স্বজাতির, আমার ভাইদের মনে কেবলই হিংসা লোভ ও দ্বেষের অনল জ্বালাইতেছি—আমার সিংহাসনের চারি দিকে আমার প্রাণাধিক আত্মীয়েরা আমার দিকে চাহিয়া মনে মনে মুখ বক্র করিতেছে, দন্ত ঘর্ষণ করিতেছে, শৃঙ্খলবন্ধ ভীষণ কুক্কুরের মতো চারি দিক হইতে আমার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িবার অবসর খুঁজিতেছে। ইহা অপেক্ষা ইহাদের খরনখরাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া, ইহাদের রক্তের তৃষা মিটাইয়া, এখান হইতে অপসৃত হওয়াই ভালো।' প্রভাত-আকাশে গোবিন্দমাণিক্য যে প্রেমচ্ছবি দেখিয়াছিলেন তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহারাজ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "নক্ষত্র, আজ অপরাহ্নে গোমতীতীরের নির্জন অরণ্যে আমরা দুইজনে বেড়াইতে যাইব।"

রাজার এই গম্ভীর আদেশবাণীর বিরুদ্ধে নক্ষত্রের মুখে কথা সরিল না, কিন্তু সংশয়ে ও আশঙ্কায় তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, মহারাজ এতক্ষণ নীরবে দুই চক্ষু তাঁহারই মনের দিকে নিবিষ্ট করিয়া বসিয়া ছিলেন—সেখানে অন্ধকার গর্তের মধ্যে যে ভাবনাগুলো কীটের মতো কিল্‌বিল্‌ করিতেছিল সেগুলো যেন সহসা আলো দেখিয়া অস্থির হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভয়ে ভয়ে নক্ষত্ররায় রাজার মুখের দিকে একবার চাহিলেন; দেখিলেন, তাঁহার মুখে কেবল সুগভীর বিষণ্ন শান্তির ভাব, সেখানে রোষের রেখামাত্র নাই। মানবহৃদয়ের কঠিন নিষ্ঠুরতা দেখিয়া কেবল সুগভীর শোক তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল।

বেলা পড়িয়া আসিল। তখনো মেঘ করিয়া আছে। নক্ষত্ররায়কে সঙ্গে লইয়া মহারাজ পদব্রজে অরণ্যের দিকে চলিলেন। এখনো সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে, কিন্তু মেঘের অন্ধকারে সন্ধ্যা বলিয়া ভ্রম হইতেছে— কাকেরা অরণ্যের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া অবিশ্রাম চীৎকার করিতেছে, কিন্তু দুই-একটা চিল এখনো আকাশে সাঁতার দিতেছে। দুই ভাই যখন নির্জন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন নক্ষত্ররায়ের গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। বড়ো বড়ো প্রাচীন গাছ জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহারা একটি কথা কহে না, কিন্তু স্থির হইয়া যেন কীটের পদশব্দটুকু পর্যন্তও শোনে; তাহারা কেবল নিজের ছায়ার দিকে, তলস্থিত অন্ধকারের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকে। অরণ্যের সেই জটিল রহস্যের ভিতরে পদক্ষেপ করিতে নক্ষত্ররায়ের পা যেন আর উঠে না—চারি দিকে সুগভীর নিস্তব্ধতার ভ্রূকুটি দেখিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইতে লাগিল; নক্ষত্ররায়ের অত্যন্ত সন্দেহ ও ভয় জন্মিল; ভীষণ অদৃষ্টের মতো নীরব রাজা এই সন্ধ্যাকালে এই পৃথিবীর অন্তরাল দিয়া তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন কিছুই ঠাহর পাইলেন না। নিশ্চয় মনে করিলেন, রাজার কাছে ধরা পড়িয়াছেন, এবং গুরুতর শাস্তি দিবার জন্যই রাজা তাঁহাকে এই অরণ্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। নক্ষত্ররায় ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইতে পারিলে বাঁচেন, কিন্তু মনে হইল কে যেন তাঁহার হাত-পা বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে—কিছুতেই আর পরিত্রাণ নাই।

অরণ্যের মধ্যস্থলে কতকটা ফাঁকা। একটি স্বাভাবিক জলাশয়ের মতো আছে, বর্ষাকালে তাহা জলে পরিপূর্ণ। সেই জলাশয়ের ধারে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রাজা বলিলেন, "দাঁড়াও!"

নক্ষত্ররায় চমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল, রাজার আদেশ শুনিয়া সেই মুহূর্তে কালের স্রোত যেন বন্ধ হইল—সেই মুহূর্তেই যেন অরণ্যের বৃক্ষগুলি যে যেখানে ছিল ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল—নীচে হইতে ধরণী এবং উপর হইতে আকাশ যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কাকের কোলাহল থামিয়া গেছে, বনের মধ্যে একটি শব্দ নাই। কেবল সেই 'দাঁড়াও' শব্দ অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন গম্‌গম্‌ করিতে লাগিল— সেই 'দাঁড়াও' শব্দ যেন তড়িৎপ্রবাহের মতো বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, শাখা হইতে প্রশাখায় প্রবাহিত হইতে লাগিল,

অরণ্যের প্রত্যেক পাতাটা যেন সেই শব্দের কম্পনে রী রী করিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ও যেন গাছের মতোই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা তখন নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে মর্মভেদী স্থির বিষণ্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "নক্ষত্র, তুমি আমাকে মারিতে চাও?"

নক্ষত্র বজ্রাহতের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন, উত্তর দিবার চেষ্টাও করিতে পারিলেন না।

রাজা কহিলেন, "কেন মারিবে ভাই? রাজ্যের লোভে? তুমি কি মনে কর, রাজ্য কেবল সোনার সিংহাসন, হীরার মুকুট ও রাজছত্র? এই মুকুট, এই রাজছত্র, এই রাজদণ্ডের ভার কত তাহা জান? শতসহস্র লোকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি। রাজ্য পাইতে চাও তো সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করো, সহস্র লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ করো, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন করো—এ যে করে সেই রাজা, সে পর্ণকুটিরেই থাক্ আর প্রাসাদেই থাক্। যে ব্যক্তি সকল লোককে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে সকল লোক তো তাহারই। পৃথিবীর দুঃখহরণ যে করে সেই পৃথিবীর রাজা। পৃথিবীর রক্ত ও অর্থ শোষণ যে করে সে তো দস্যু—সহস্র অভাগার অশ্রুজল তাহার মস্তকে অহর্নিশি বর্ষিত হইতেছে, সেই অভিশাপধারা হইতে কোনো রাজছত্র তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। তাহার প্রচুর রাজভোগের মধ্যে শত শত উপবাসীর ক্ষুধা লুকাইয়া আছে, অনাথের দারিদ্র্য গলাইয়া সে সোনার অলংকার করিয়া পরে, তাহার ভূমিবিস্তৃত রাজবস্ত্রের মধ্যে শত শত শীতাতুরের মলিন ছিন্ন কন্থা আছে। রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলে না ভাই, পৃথিবীকে বশ করিয়াই রাজা হইতে হয়।"

গোবিন্দমাণিক্য থামিলেন। চারি দিকে গভীর স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

নক্ষত্ররায় মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

মহারাজ খাপ হইতে তরবারি খুলিলেন। নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "ভাই, এখানে লোক নাই, সাক্ষ্য নাই, কেহ নাই— ভাইয়ের বক্ষে ভাই যদি ছুরি মারিতে চায় তাহার স্থান এই, সময় এই—এখানে কেহ তোমাকে নিবারণ করিবে না, কেহ তোমাকে নিন্দা করিবে না। তোমার শিরায় আর আমার শিরায় একই রক্ত বহিতেছে—একই পিতা, একই পিতামহের রক্ত—তুমি সেই রক্তপাত করিতে চাও করো, কিন্তু মনুষ্যের আবাসস্থলে করিয়ো না। কারণ, যেখানে এই রক্তের বিন্দু পড়িবে সেখানে অলক্ষ্যে ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে। পাপের শেষ কোথায় গিয়া হয় কে জান! পাপের একটি বীজ যেখানে পড়ে সেখানে দেখিতে দেখিতে গোপনে কেমন করিয়া সহস্র বৃক্ষ জন্মায় কেমন করিয়া অল্পে অল্পে সুশোভন মানবসমাজ অরণ্যে পরিণত হইয়া যায় তাহা কেহ জানিতে পারে না। অতএব নগরে গ্রামে যেখানে নিশ্চিন্তচিত্তে পরম স্নেহে ভাইয়ে ভাইয়ে গলাগলি করিয়া আছে সেই ভাইদের নীড়ের মধ্যে ভাইয়ের রক্তপাত করিয়ো না। এইজন্যই তোমাকে আজ অরণ্যে ডাকিয়া আনিয়াছি!"

এই বলিয়া রাজা নক্ষত্ররায়ের হাতে তরবারি দিলেন। নক্ষত্ররায়ের হাত হইতে তরবারি

ভূমিতে পড়িয়া গেল। নক্ষত্ররায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "দাদা, আমি দোষী নই—এ কথা আমার মনে কখনো উদয় হয় নাই—"

রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আমি তাহা জানি। তুমি কি কখনো আমাকে আঘাত করিতে পার—তোমাকে পাঁচজনে মন্দ পরামর্শ দিয়াছে।"

নক্ষত্ররায় বলিলেন, "আমাকে রঘুপতি কেবল এই উপদেশ দিতেছে।"

রাজা বলিলেন, "রঘুপতির কাছ হইতে দূরে থাকিয়ো।"

নক্ষত্ররায় বলিলেন, "কোথায় যাইব বলিয়া দিন। আমি এখানে থাকিতে চাই না। আমি এখান হইতে—রঘুপতির কাছ হইতে—পালাইতে চাই।"

রাজা বলিলেন, "তুমি আমারই কাছে থাকো, আর কোথাও যাইতে হইবে না—রঘুপতি তোমার কী করিবে!"

নক্ষত্ররায় রাজার হাত দৃঢ় করিয়া ধরিলেন, রঘুপতি তাঁহাকে টানিয়া লইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্ররায় রাজার হাত ধরিয়া অরণ্যের মধ্যে দিয়া যখন গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন তখনো আকাশ হইতে অল্প অল্প আলো আসিতেছিল, কিন্তু অরণ্যের নীচে অত্যন্ত অন্ধকার হইয়াছে। যেন অন্ধকারের বন্যা আসিয়াছে, কেবল গাছগুলোর মাথা উপরে জাগিয়া আছে। ক্রমে তাহাও ডুবিয়া যাইবে—তখন অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া আকাশে পৃথিবীতে এক হইয়া যাইবে।

প্রাসাদের পথে না গিয়া রাজা মন্দিরের দিকে গেলেন। মন্দিরের সন্ধ্যা-আরতি সমাপন করিয়া একটি দীপ জ্বালিয়া রঘুপতি ও জয়সিংহ কুটিরে বসিয়া আছেন। উভয়েই নীরবে আপন আপন ভাবনা লইয়া আছেন। দীপের ক্ষীণ আলোকে কেবল তাঁহাদের দুইজনের মুখের অন্ধকার দেখা যাইতেছে। নক্ষত্ররায় রঘুপতিকে দেখিয়া মুখ তুলিতে পারিলেন না; রাজার ছায়ায় দাঁড়াইয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিলেন—রাজা তাঁহাকে পাশে টানিয়া লইয়া দৃঢ়রূপে তাহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইলেন ও স্থিরনেত্রে রঘুপতির মুখের দিকে একবার চাহিলেন; রঘুপতি তীব্র দৃষ্টিতে নক্ষত্ররায়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। অবশেষে রাজা রঘুপতিকে প্রণাম করিলেন, নক্ষত্ররায়ও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। রঘুপতি প্রণাম গ্রহণ করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "জয়োস্তু—রাজ্যের কুশল?"

রাজা একটুখানি থামিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আশীর্বাদ করুন, রাজ্যের অকুশল না ঘটুক। এ রাজ্যে মায়ের সকল সন্তান যেন সদ্ভাবে প্রেমে মিলিয়া থাকে, এ রাজ্যে ভাইয়ের কাছ হইতে ভাইকে কেহ যেন কাড়িয়া না লয়, যেখানে প্রেম আছে সেখানে কেহ যেন হিংসার প্রতিষ্ঠা না করে। রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়াই আসিয়াছি। পাপ-সংকল্পের সংঘর্ষণে দাবানল জ্বলিয়া উঠিতে পারে—নির্বাণ করুন, শান্তির বারি বর্ষণ করুন, পৃথিবী শীতল করুন।"

রঘুপতি কহিলেন, "দেবতার রোষানল জ্বলিয়া উঠিলে কে তাহা নির্বাণ করিবে। এক অপরাধীর জন্য সহস্র নিরপরাধ সে অনলে দগ্ধ হয়।"

রাজা বলিলেন, "সেই তো ভয়, সেইজন্যই তো কাঁপিতেছি। সে কথা কেহ বুঝিয়াও বোঝে না কেন। আপনি কি জানেন না, এ রাজ্যে দেবতার নাম করিয়া দেবতার নিয়ম লঙ্ঘন করা হইতেছে? সেই জন্যই অমঙ্গল-আশঙ্কায় আজ সন্ধ্যাবেলায় এখানে আসিয়াছি — এখানে পাপের বৃক্ষ রোপণ করিয়া আমার এই ধনধান্যময় সুখের রাজ্যে দেবতার বজ্র আহ্বান করিয়া আনিবেন না। আপনাকে এই কথা বলিয়া গেলাম, এই কথা বলিবার জন্যই আমি আজ আসিয়াছিলাম।" বলিয়া মহারাজ রঘুপতির মুখের উপর তাঁহার মর্মভেদী দৃষ্টি স্থাপন করিলেন। রাজার সুগম্ভীর দৃঢ় স্বর রুদ্ধ ঝটিকার মতো কুটিরের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল। রঘুপতি একটি উত্তর দিলেন না, পইতা লইয়া নাড়িতে লাগিলেন। রাজা প্রণাম করিয়া নক্ষত্ররায়ের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে জয়সিংহও বাহির হইলেন। ঘরের মধ্যে কেবল একটি দীপ, রঘুপতি এবং রঘুপতির বৃহৎ ছায়া রহিল।

তখন আকাশের আলো নিভিয়া গেছে। মেঘের মধ্যে তারা নিমগ্ন। আকাশের কানায় কানায় অন্ধকার। পুবে বাতাসে সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে কোথা হইতে কদম ফুলের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে এবং অরণ্যের মর্মরশব্দ শুনা যাইতেছে। ভাবনায় নিমগ্ন হইয়া পরিচিত পথ দিয়া রাজা চলিতেছেন, সহসা পশ্চাৎ হইতে শুনিলেন কে ডাকিল "মহারাজ"।

রাজা ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

পরিচিত স্বর কহিল, "আমি আপনার অধম সেবক, আমি জয়সিংহ। মহারাজ, আপনি আমার গুরু, আমার প্রভু। আপনি ছাড়া আমার আর কেহ নাই। যেমন আপনি আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার হাত ধরিয়া অন্ধকারের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতেছেন তেমনি আমারও হাত ধরুন, আমাকেও সঙ্গে লইয়া যান; আমি গুরুতর অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়াছি। আমার কিসে ভালো হইবে, কিসে মন্দ হইবে কিছুই জানি না। আমি একবার বামে যাইতেছি, একবার দক্ষিণে যাইতেছি, আমার কর্ণধার কেহ নাই।"

সেই অন্ধকারে অশ্রু পড়িতে লাগিল, কেহ দেখিতে পাইল না, কেবল আবেগভরে জয়সিংহের আর্দ্র স্বর কাঁপিতে কাঁপিতে রাজার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। স্তব্ধস্থির অন্ধকার বায়ুচঞ্চল সমুদ্রের মতো কাঁপিতে লাগিল। রাজা জয়সিংহের হাত ধরিয়া বলিলেন, "চলো, আমার সঙ্গে প্রাসাদে চলো।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিন যখন জয়সিংহ মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন তখন পূজার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। রঘুপতি বিমর্ষমুখে একাকী বসিয়া আছেন। ইহার পূর্বে কখনো এরূপ অনিয়ম হয় নাই।

জয়সিংহ আসিয়া গুরুর কাছে না গিয়া তাঁহার বাগানের মধ্যে গেলেন। তাঁহার গাছপালাগুলির মধ্যে গিয়া বসিলেন। তাহারা তাঁহার চারি দিকে কাঁপিতে লাগিল, নড়িতে লাগিল, ছায়া নাচাইতে লাগিল। তাঁহার চারি দিকে পুষ্পখচিত পল্লবের স্তর, শ্যামল স্তরের উপর স্তর, ছায়াপূর্ণ সুকোমল স্নেহের আচ্ছাদন, সুমধুর আহ্বান, প্রকৃতির প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন। এখানে সকলে অপেক্ষা করিয়া থাকে— কথা জিজ্ঞসা করে না, ভাবনার ব্যাঘাত করে না, চাহিলে তবে চায়, কথা কহিলে তবে কথা কয়। এই নীরব শুশ্রূষার মধ্যে, প্রকৃতির এই অন্তঃপুরের মধ্যে বসিয়া জয়সিংহ ভাবিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাকে যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় ধীরে ধীরে রঘুপতি আসিয়া তাঁহার পিঠে হাত দিলেন। জয়সিংহ সচকিত হইয়া উঠিলেন। রঘুপতি তাঁহার পাশে বসিলেন। জয়সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিতস্বরে কহিলেন, "বৎস, তোমার এমন ভাব দেখিতেছি কেন? আমি তোমার কী করিয়াছি যে, তুমি অল্পে অল্পে আমার কাছ হইতে সরিয়া যাইতেছ?"

জয়সিংহ কী বলিতে চেষ্টা করিলেন, রঘুপতি তাহাতে বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন, "একমুহূর্তের জন্য কি আমার স্নেহের অভাব দেখিয়াছ? আমি কি তোমার কাছে কোনো অপরাধ করিয়াছি জয়সিংহ? যদি করিয়া থাকি তবে আমি তোমার গুরু, তোমার পিতৃতুল্য, আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছি, আমাকে মার্জনা করো।"

জয়সিংহ বজ্রাহতের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন, গুরুর চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, বলিলেন, "পিতা, আমি কিছুই জান্‌নে না, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, আমি কোথায় যাইতেছি দেখিতে পাইতেছি না।"

রঘুপতি জয়সিংহের হাত ধরিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি তোমাকে তোমার শৈশব হইতে মাতার ন্যায় স্নেহে পালন করিয়াছি, পিতার অধিক যত্নে শাস্ত্রশিক্ষা দিয়াছি, তোমার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সখার ন্যায় তোমাকে আমার সমুদয় মন্ত্রণার সহযোগী করিয়াছি। আজ তোমাকে কে আমার পাশ হইতে টানিয়া লইতেছে, এতদিনকার স্নেহমমতার বন্ধন কে বিচ্ছিন্ন করিতেছে? তোমার উপর আমার যে দেবদত্ত অধিকার জন্মিয়াছে সে পবিত্র অধিকারে কে হস্তক্ষেপ করিয়াছে? বলো বৎস, সে মহাপাতকীর নাম বলো।"

জয়সিংহ বলিলেন, "প্রভু, আপনার কাছ হইতে আমাকে কেহ বিচ্ছিন্ন করে নাই— আপনিই আমাকে দূর করিয়া দিয়াছেন। আমি ছিলাম গৃহের মধ্যে, আপনি সহসা আমাকে পথের মধ্যে বাহির করিয়া দিয়াছেন। আপনি বলিয়াছেন, কেই বা পিতা, কেই বা মাতা, কেই বা ভ্রাতা। আপনি বলিয়াছেন, পৃথিবীতে কোনো বন্ধন নাই, স্নেহ-প্রেমের পবিত্র অধিকার নাই। যাহাকে মা বলিয়া জানিতাম আপনি তাঁহাকে বলিয়াছেন শক্তি। যে যেখানে হিংসা করিতেছে, যে যেখানে রক্তপাত করিতেছে, যেখানেই ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, যেখানেই দুইজন মানুষে যুদ্ধ, সেইখানেই এই তৃষিত শক্তি রক্তলালসায় তাঁহার খর্পর লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আপনি মায়ের কোল হইতে আমাকে এ কী রাক্ষসীর দেশে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছেন!"

রঘুপতি অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তবে তুমি স্বাধীন হইলে, বন্ধনমুক্ত হইলে, তোমার উপর হইতে আমার সমস্ত অধিকার আমি প্রত্যাহরণ করিলাম, তাহাতেই যদি তুমি সুখী হও তবে তাই হউক।" বলিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিলেন।

জয়সিংহ তাঁহার পা ধরিয়া বলিলেন, "না না না, প্রভু, আপনি আমাকে ত্যাগ করিলেও আমি আপনাকে ত্যাগ করিতে পারি না। আমি রহিলাম—আপনার পদতলেই রহিলাম, আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন। আপনার পথ ছাড়া আমার অন্য পথ নাই।"

রঘুপতি তখন জয়সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন, তাঁহার অশ্রু প্রবাহিত হইয়া জয়সিংহের স্কন্ধে পড়িতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মন্দিরে অনেক লোক জমা হইয়াছে। খুব কোলাহল উঠিয়াছে। রঘুপতি রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কী করিতে আসিয়াছ?"

তাহারা নানা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমরা ঠাকরুন-দর্শন করিতে আসিয়াছি!"

রঘুপতি বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকরুন কোথায়! ঠাকরুন এ রাজ্য থেকে চলে গেছেন। তোরা ঠাকরুনকে রাখতে পারলি কই! তিনি চলে গেছেন।"

ভারি গোলমাল উঠিল—নানা দিক হইতে নানা কথা শুনা যাইতে লাগিল।

"সে কী কথা ঠাকুর?"

"আমরা কী অপরাধ করেছি ঠাকুর?"

"মা কি কিছুতেই প্রসন্ন হবেন না?"

"আমার ভাইপোর ব্যামো ছিল বলে আমি ক'দিন পুজো দিতে আসি নি।" — তার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারই উপেক্ষা সহিতে না পারিয়া দেবী দেশ ছাড়িতেছেন।

"আমার পাঁঠা-দুটি ঠাকরুনকে দেব মনে করেছিলুম, বিস্তর দূর বলে আসতে পারি নি।"—দুটো পাঁঠা দিতে দেরি করিয়া রাজ্যের যে এরূপ অমঙ্গল ঘটিল, ইহাই মনে করিয়া সে কাতর হইতেছিল।

" গোবর্ধন যা মানত করেছিল তা মাকে দেয় নি বটে, কিন্তু মাও তো তেমনি তাকে শাস্তি দিয়েছেন। তার পিলে বেড়ে ঢাক হয়েছে, সে আজ ছ'মাস বিছানায় প'ড়ে।"—গোবর্ধন তাহার প্লীহার আতিশয্য লইয়া চুলায় যাক, মা দেশে থাকুন, এইরূপ সে মনে মনে প্রার্থনা করিল। সকলেই অভাগা গোবর্ধনের প্লীহার প্রচুর উন্নতিকামনা করিতে লাগিল।

ভিড়ের মধ্যে একটি দীর্ঘ লোক ছিল, সে সকলকে ধমক দিয়া থামাইল এবং রঘুপতিকে জোড়হস্তে কহিল, "ঠাকুর, মা কেন চলিয়া গেলেন, আমাদের কী অপরাধ হইয়াছিল?"

রঘুপতি কহিলেন, " তোরা মায়ের জন্য এক ফোঁটা রক্ত দিতে পারিস নে, এই তো তোদের ভক্তি!"

সকলে চুপ করিয়া রহিল। অবশেষে কথা উঠিতে লাগিল। অস্পষ্ট স্বরে কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "রাজার নিষেধ, আমরা কী করিব?"

জয়সিংহ প্রস্তরের পুত্তলিকার মতো স্থির হইয়া বসিয়া ছিলেন। 'মায়ের নিষেধ' এই কথা তড়িদ্‌বেগে তাঁহার রসনাগ্রে উঠিয়াছিল—কিন্তু তিনি আপনাকে দমন করিলেন, একটি কথা কহিলেন না।

রঘুপতি তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "রাজা কে? মায়ের সিংহাসন কি রাজার সিংহাসনের নীচে! তবে এই মাতৃহীন দেশে তোদের রাজাকে লইয়াই তোরা থাক্। দেখি তোদের কে রক্ষা করে!"

জনতার মধ্য গুন্ গুন্ শব্দ উঠিল। সকলেই সবাধানে কথা কহিতে লাগিল।

রঘুপতি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "রাজাকেই বড়ো করিয়া লইয়া তোদের মাকে তোরা রাজ্য হইতে অপমান করিয়া বিদায় করিলি! সুখে থাকিবি মনে করিস নে। আর তিন বৎসর পরে এতবড়ো রাজ্যে তোদের ভিটের চিহ্ন থাকিবে না—তোদের বংশে বাতি দিবার কেহ থাকিবে না।"

জনতার মধ্যে সাগরের গুন্ গুন্ শব্দ ক্রমশ স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল। জনতাও ক্রমে বাড়িতেছে। সেই দীর্ঘ লোকটি জোড়হাত করিয়া রঘুপতিকে কহিল, "সন্তান যদি অপরাধ করে থাকে তবে মা তাকে শাস্তি দিন; কিন্তু মা সন্তানকে একেবারে পরিত্যাগ করে যাবেন একি কখনো হয়! প্রভু, বলে দিন কী করলে মা ফিরে আসবেন।"

রঘুপতি কহিলেন, "তোদের এই রাজা যখন এ রাজ্য হইতে বাহির হইয়া যাইবেন মাও তখন এই রাজ্যে পুনর্বার পদার্পণ করিবেন।"

এই কথা শুনিয়া জনতার গুন্ গুন্ শব্দ হঠাৎ থামিয়া গেল। হঠাৎ চতুর্দিক সুগভীর নিস্তব্ধ হইয়া গেল, অবশেষে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল; কেহ সাহস করিয়া কথা কহিতে পারিল না।

রঘুপতি মেঘগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তবে তোরা দেখিবি? আয় আমার সঙ্গে আয়। অনেক দূর হতে অনেক আশা করিয়া তোরা ঠাকরুনকে দর্শন করিতে আসিয়াছিস—চল্, একবার মন্দিরে চল্।"

সকলে সভয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া সমবেত হইল। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ ছিল; রঘুপতি ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ কাহারো মুখে বাক্যস্ফূর্তি হইল না। প্রতিমার মুখ দেখা যাইতেছে না, প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ দর্শকের দিকে স্থাপিত। মা বিমুখ হইয়াছেন। সহসা জনতার মধ্য হইতে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল,"একবার ফিরে দাঁড়া মা! আমরা কী অপরাধ করেছি?" চারি দিকে "মা কোথায়" "মা কোথায়" রব উঠিল। প্রতিমা পাষাণ বলিয়াই ফিরিল না। অনেকে মূর্ছা গেল। ছেলেরা কিছু

না বুঝিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বৃদ্ধেরা মাতৃহারা শিশুসন্তানের মতো ডাকিতে লাগিল, "মা, ওমা!" স্ত্রীলোকদের ঘোমটা খুলিয়া গেল, অঞ্চল খসিয়া পড়িল, তাহারা বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। যুবকেরা কম্পিত ঊর্ধ্বস্বরে বলিতে লাগিল, "মা, তোকে আমরা ফিরিয়ে আনব, তোকে আমরা ছাড়ব না।" একজন পাগল গাহিয়া উঠিল—

"মা আমার পাষাণের মেয়ে
সন্তানে দেখলি নে চেয়ে।"

মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সমস্ত রাজ্য যেন "মা মা" করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, কিন্তু প্রতিমা ফিরিল না। মধ্যাহ্নের সূর্য প্রখর হইয়া উঠিল, প্রাঙ্গণে উপবাসী জনতার বিলাপ থামিল না।

তখন জয়সিংহ কম্পিত পদে আসিয়া রঘুপতিকে কহিলেন, "প্রভু, আমি কি একটা কথাও কহিতে পাইব না?"

রঘুপতি কহিলেন, "না, একটি কথাও না!"

জয়সিংহ কহিলেন, "সন্দেহের কি কোনো কারণ নাই?"

রঘুপতি দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "না।"

জয়সিংহ দৃঢ়রূপে মুষ্টি বদ্ধ করিয়া কহিলেন, "সমস্তই কি বিশ্বাস করিব?"

রঘুপতি জয়সিংহকে সুতীব্র দৃষ্টি-দ্বারা দগ্ধ করিয়া কহিলেন, "হাঁ।"

জয়সিংহ বক্ষে হাত দিয়া কহিলেন, "আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।" তিনি জনতার মধ্য হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিন ২৯শে আষাঢ়। আজ রাত্রে চতুর্দশ দেবতার পূজা। আজ প্রভাতে, তালবনের আড়ালে সূর্য যখন উঠিতেছে তখন পূর্ব দিকে মেঘ নাই। কনককিরণপ্লাবিত আনন্দমগ্ন কাননের মধ্যে গিয়া জয়সিংহ যখন বসিলেন তখন তাঁহার পুরাতন স্মৃতিসকল মনে উঠিতে লাগিল। এই বনের মধ্যে, এই পাষাণমন্দিরের পাষাণসোপানাবলীর মধ্যে, এই গোমতীতীরে, সেই বৃহৎ বটের ছায়ায়, সেই ছায়া দিয়া ঘেরা পুকুরের ধারে তাঁহার বাল্যকাল—সুমধুর স্বপ্নের মতো মন পড়িতে লাগিল। যে-সকল মধুর দৃশ্য তাঁহার বাল্যকালকে সস্নেহে ঘিরিয়া থাকিত তাহারা আজ হাসিতেছে, তাঁহাকে আবার আহ্বান করিতেছে; কিন্তু তাঁহার মন বলিতেছে, 'আমি যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি, আমি বিদায় লইয়াছি, আমি আর ফিরিব না।' শ্বেত পাষাণের মন্দিরের উপরে সূর্যকিরণ পড়িয়াছে এবং তাহার বাম দিকের ভিত্তিতে বকুলশাখার কম্পিত ছায়া পড়িয়াছে। ছেলেবেলায় এই পাষাণ মন্দিরকে যেমন সচেতন বোধ হইত, এই সোপানের মধ্যে একলা বসিয়া যখন খেলা করিতেন তখন এই সোপানগুলির মধ্যে যেমন সঙ্গ পাইতেন, আজ প্রভাতের সূর্যকিরণে মন্দিরকে তেমনি সচেতন, তাহার সোপানগুলিকে তেমনি শৈশবের চক্ষে

দেখিতে লাগিলেন—মন্দিরের ভিতরে মাকে আজ আবার মা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু অভিমানে তাঁহার হৃদয় পুরিয়া গেল, তাঁহার দুই চক্ষু ভাসিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রঘুপতিকে আসিতে দেখিয়া জয়সিংহ চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন। গুরুকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুপতি কহিলেন, "আজ পূজার দিন। মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া কী শপথ করিয়াছিলে মনে আছে?"

জয়সিংহ কহিলেন, "আছে।"

রঘুপতি। শপথ পালন করিবে তো?

জয়সিংহ। হাঁ।

রঘুপতি। দেখিয়ো, বৎস, সাবধানে কাজ করিয়ো। বিপদের আশঙ্কা আছে। আমি তোমাকে রক্ষা করিবার জন্যই প্রজাদিগকে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছি।

জয়সিংহ চুপ করিয়া রঘুপতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিছুই উত্তর করিলেন না। রঘুপতি তাঁহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "আমার আশীর্বাদে নির্বিঘ্নে তুমি তোমার কার্য সাধন করিতে পারিবে, মায়ের আদেশ পালন করিতে পারিবে।" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

অপরাহ্নে একটি ঘরে বসিয়া রাজা ধ্রুবের সহিত খেলা করিতেছেন। ধ্রুবের আদেশমতে একবার মাথার মুকুট খুলিতেছেন, একবার পরিতেছেন; ধ্রুব মহারাজের এই দুর্দশা দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইতেছে। রাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমি অভ্যাস করিতেছি। তাঁহার আদেশে এ মুকুট যেমন সহজে পরিতে পারিয়াছি তাঁহার আদেশে এ মুকুট যেন তেমনি সহজে খুলিতে পারি। মুকুট পরা শক্ত, কিন্তু মুকুট ত্যাগ করা আরো কঠিন।"

ধ্রুবের মনে সহসা একটা ভাবোদয় হইল—কিয়ৎক্ষণ রাজার মুখের দিকে চাহিয়া মুখে আঙুল দিয়া বলিল, "তুমি আজা।" রাজা শব্দ হইতে 'র' অক্ষর একেবারে সমূলে লোপ করিয়া দিয়াও ধ্রুবের মনে কিছুমাত্র অনুতাপের উদয় হইল না। রাজার মুখের সামনে রাজাকে আজা বলিয়া সে সম্পূর্ণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিল।

রাজা ধ্রুবের এই ধৃষ্টতা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, "তুমি আজা।"

ধ্রুব বলিল, "তুমি আজা।"

এ বিষয়ে তর্কের শেষ হইল না। কোনো পক্ষে কোনো প্রমাণ নাই, তর্ক কেবলই গায়ের জোরে। অবশেষে রাজা নিজের মুকুট লইয়া ধ্রুবের মাথায় চড়াইয়া দিলেন। তখন ধ্রুবের আর কথাটি কহিবার জো রহিল না, সম্পূর্ণ হার হইল—ধ্রুবের মুখের আধখানা সেই মুকুটের নীচে ডুবিয়া গেল। মুকুট সমেত মস্ত মাথা দুলাইয়া ধ্রুব মুকুটহীন রাজার প্রতি আদেশ করিল, "একটা গল্প বলো।"

রাজা বলিলেন, "কী গল্প বলিব?"

ধ্রুব কহিল, "দিদির গল্প বলো।"

গল্পমাত্রকেই ধ্রুব দিদির গল্প বলিয়া জানিত। সে জানিত, দিদি যে-সকল গল্প বলিত তাহা

ছাড়া পৃথিবীতে আর গল্প নাই। রাজা তখন মস্ত এক পৌরাণিক গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "হিরণ্যকশিপু নামে এক রাজা ছিল।"

রাজা শুনিয়া ধ্রুব বলিয়া উঠিল, "আমি আজা।" মস্ত ঢিলে মুকুটের জোরে হিরণ্যকশিপুর রাজপদ সে একেবারে অগ্রাহ্য করিল।

চাটুভাষী সভাসদের ন্যায় গোবিন্দমাণিক্য সেই কিরীটী শিশুকে সন্তুষ্ট কবিরার জন্য বলিলেন, "তুমিও আজা, সেও আজা।"

ধ্রুব তাহাতেও সুস্পষ্ট অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল, "না, আমি আজা।"

অবশেষে মহারাজ যখন বলিলেন, "হিরণ্যকশিপু আজা নয়, সে আক্কস", তখন ধ্রুব তাহাতে আপত্তি করিবার কিছুই দেখিল না।

এমন সময়ে নক্ষত্ররায় গৃহে প্রবেশ করিলেন; কহিলেন, "শুনিলাম রাজকার্যোপলক্ষে মহারাজ আমাকে ডাকিয়াছেন। আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি।"

রাজা কহিলেন, "আর-একটু অপেক্ষা করো, গল্পটা শেষ করিয়া লই।" বলিয়া গল্পটা সমস্ত শেষ করিলেন। "আক্কস দুষ্টু"—গল্প শুনিয়া সংক্ষেপে ধ্রুব এইরূপ মত প্রকাশ করিল।

ধ্রুবের মাথায় মুকুট দেখিয়া নক্ষত্ররায়ের ভালো লাগে নাই। ধ্রুব যখন দেখিল নক্ষত্ররায়ের দৃষ্টি তাহার দিকে স্থাপিত রহিয়াছে তখন সে নক্ষত্ররায়কে গম্ভীরভাবে জানাইয়া দিল, "আমি আজা।"

নক্ষত্র বলিলেন, "ছি, ও কথা বলিতে নাই।" বলিয়া ধ্রুবের মাথা হইতে মুকুট তুলিয়া লইয়া রাজার হাতে দিতে উদ্যত হইলেন। ধ্রুব মুকুটহরণের সম্ভাবনা দেখিয়া সত্যকার রাজাদের মতো চীৎকার করিয়া উঠিল। গোবিন্দমাণিক্য তাহাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন, নক্ষত্রকে নিবারণ করিলেন।

অবশেষে গোবিন্দমাণিক্য নক্ষত্ররায়কে কহিলেন, "শুনিয়াছি রঘুপতি ঠাকুর অসৎ উপায়ে প্রজাদের অসন্তোষ উদ্রেক করিয়া দিতেছেন। তুমি স্বয়ং নগরের মধ্যে গিয়া এ বিষয়ে তদারক করিয়া আসিবে এবং সত্য মিথ্যা অবধারণ করিয়া আমাকে জানাইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "যে আজ্ঞে।" বলিয়া চলিয়া গেলেন—কিন্তু ধ্রুবের মাথার মুকুট তাঁহার কিছুতেই ভালো লাগিল না।

প্রহরী আসিয়া কহিল, "পুরোহিত-ঠাকুরের সেবক জয়সিংহ সাক্ষাৎপ্রার্থনায় দ্বারে দাঁড়াইয়া।"

রাজা তাহাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

জয়সিংহ মহারাজকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে কহিলেন, "মহারাজ, আমি বহুদূর দেশে চলিয়া যাইতেছি। আপনি আমার রাজা, আমার গুরু, আপনার আশীর্বাদ লইতে আসিয়াছি।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইবে জয়সিংহ?"

জয়সিংহ বলিলেন, "জানি না মহারাজ! কোথায় তাহা কেহ বলিতে পারে না।" রাজা কথা কহিতে উদ্যত দেখিয়া জয়সিংহ কহিলেন, "নিষেধ করিবেন না মহারাজ! আপনি নিষেধ করিলে আমার যাত্রা শুভ হইবে না। আশীর্বাদ করুন, এখানে আমার যে-সকল সংশয় ছিল

সেখানে যেন সে-সকল সংশয় দূর হইয়া যায়। এখানকার মেঘ সেখানে যেন কাটিয়া যায়। যেন আপনার মতো রাজার রাজত্বে যাই, যেন শান্তি পাই।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে যাইবে?"

জয়সিংহ কহিলেন, "আজ সন্ধ্যাকালে। অধিক সময় নাই মহারাজ, আজ আমি তবে বিদায় হই।" বলিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া রাজার পদধূলি লইলেন, রাজার চরণে দুই ফোঁটা অশ্রু পড়িল।

জয়সিংহ উঠিয়া যখন যাইতে উদ্যত হইলেন তখন ধ্রুব ধীরে ধীরে গিয়া তাঁহার কাপড় টানিয়া কহিল, "তুমি যেয়ো না।"

জয়সিংহ হাসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া কহিলেন, "কার কাছে থাকিব বৎস? আমার কে আছে?"

ধ্রুব কহিল, "আমি আজা।"

জয়সিংহ কহিলেন, "তোমরা রাজার রাজা, তোমরাই সকলকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ।" ধ্রুবকে কোল হইতে নামাইয়া জয়সিংহ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মহারাজ গম্ভীরমুখে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

চতুর্দশী তিথি। মেঘও করিয়াছে, চাঁদও উঠিয়াছে। আকাশের কোথাও আলো কোথাও অন্ধকার। কখনো চাঁদ বাহির হইতেছে কখনো চাঁদ লুকাইতেছে। গোমতীতীরের অরণ্যগুলি চাঁদের দিকে চাহিয়া তাহাদের গভীর অন্ধকাররাশির মর্ম ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে নিশ্বাস ফেলিতেছে।

আজ রাত্রে পথে লোক বাহির হওয়া নিষেধ। রাত্রে পথে লোক কেই-বা বাহির হয়। কিন্তু নিষেধ আছে বলিয়া পথের বিজনতা আজ আরো গভীর বোধ হইতেছে। নগরবাসীরা সকলেই আপনার ঘরের দীপ নিবাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। পথে একটি প্রহরী নাই। চোরও আজ পথে বাহির হয় না। যাহারা শ্মশানে শবদাহ করিতে যাইবে তাহারা মৃতদেহ ঘরে লইয়া প্রভাতের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। ঘরে যাহাদের সন্তান মুমূর্ষু তাহারা বৈদ্য ডাকিতে বাহির হয় না। যে ভিক্ষুক পথপ্রান্তে বৃক্ষতলে শয়ন করিত সে আজ গৃহস্থের গোশালায় আশ্রয় লইয়াছে।

সে রাত্রে শৃগাল কুকুর নগরের পথে পথে বিচরণ করিতেছে, দুই-একটা চিতাবাঘ গৃহস্থের দ্বারের কাছে আসিয়া উঁকি মারিতেছে। মানুষের মধ্যে কেবল একজন মাত্র আজ গৃহের বাহিরে আছে—আর মানুষ নাই। সে একখানা ছুরি লইয়া নদীতীরে পাথরের উপর শান দিতেছে, এবং অন্যমনস্ক হইয়া কী ভাবিতেছে। ছুরির ধার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সে বোধ করি ছুরির সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাতেও শান দিতেছিল, তাই তার শান দেওয়া আর শেষ হইতেছিল না। প্রস্তরের ঘর্ষণে তীক্ষ্ণ ছুরি হিস্ হিস্ শব্দ করিয়া হিংসার লালসায় তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। অন্ধকারের

মধ্যে অন্ধকার নদী বহিয়া যাইতেছিল। জগতের উপর দিয়া অন্ধকার রজনীর প্রহর বহিয়া যাইতেছিল। আকাশের উপর দিয়া অন্ধকারঘন মেঘের স্রোত ভাসিয়া যাইতেছিল।

অবশেষে যখন মূষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল তখন জয়সিংহের চেতনা হইল। তপ্ত ছুরি খাপের মধ্যে পুরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পূজার সময় নিকটবর্তী হইয়াছে। তাঁহার শপথের কথা মনে পড়িয়াছে। আর এক দণ্ডও বিলম্ব করিলে চলিবে না।

মন্দির আজ সহস্র দীপে আলোকিত। ত্রয়োদশ দেবতার মাঝখানে কালী দাঁড়াইয়া নররক্তের জন্য জিহ্বা মেলিয়াছেন। মন্দিরের সেবকদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া চতুর্দশ দেবপ্রতিমা সম্মুখে করিয়া রঘুপতি একাকী মন্দিরে বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে এক দীর্ঘ খাঁড়া। উলঙ্গ উজ্জ্বল খড়্গ দীপালোকে বিভাসিত হইয়া স্থির বজ্রের ন্যায় দেবীর আদেশের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

অর্ধরাত্রে পূজা। সময় নিকটবর্তী। রঘুপতি অত্যন্ত অস্থিরচিত্তে জয়সিংহের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। সহসা ঝড়ের মতো বাতাস উঠিয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। বাতাসে মন্দিরের সহস্র দীপশিখা কাঁপিতে লাগিল, উলঙ্গ খড়্গের উপর বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। চতুর্দশ দেবতা ও রঘুপতির ছায়া যেন জীবন পাইয়া দীপশিখার নৃত্যের তালে তালে মন্দিরের ভিত্তিময় নাচিতে লাগিল। একটা নরকপাল ঝড়ের বাতাসে ঘরময় গড়াইতে লাগিল। মন্দিরের মধ্যে দুইটা চামচিকা আসিয়া শুষ্ক পত্রের মতো ক্রমাগত উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল— দেয়ালে তাহাদের ছায়া উড়িতে লাগিল।

দ্বিপ্রহর হইল। প্রথমে নিকটে, পরে দূর-দূরান্তরে, শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। ঝড়ের বাতাসও তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া হূ হূ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পূজার সময় আসিয়াছে। রঘুপতি অমঙ্গল-আশঙ্কায় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন।

এমন সময়ে জীবন্ত ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুতের মতো জয়সিংহ নিশীথের অন্ধকারের মধ্য হইতে সহসা মন্দিরের আলোকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দীর্ঘ চাদরে দেহ আচ্ছাদিত, সর্বাঙ্গ বাহিয়া বৃষ্টিধারা পড়িতেছে, নিশ্বাস বেগে বহিতেছে, চক্ষুতারকায় অগ্নিকণা জ্বলিতেছে।

রঘুপতি তাঁহাকে ধরিয়া কানের কাছে মুখ দিয়া কহিলেন, "রাজরক্ত আনিয়াছ?"

জয়সিংহ তাঁহার হাত ছাড়াইয়া উচ্চস্বরে কহিলেন, "আনিয়াছি। রাজরক্ত আনিয়াছি! আপনি সরিয়া দাঁড়ান, আমি দেবীকে নিবেদন করি।" শব্দে মন্দির কাঁপিয়া উঠিল।

কালীর প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "সত্যই কি তবে তুই সন্তানের রক্ত চাস মা! রাজরক্ত নহিলে তোর তৃষা মিটিবে না! জন্মাবধি আমি তোকেই মা বলিয়া আসিয়াছি, আমি তোরই সেবা করিয়াছি, আমি আর-কাহারো দিকে চাই নাই, আমার জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। আমি রাজপুত, আমি ক্ষত্রিয়, আমার প্রপিতামহ রাজা ছিলেন, আমার মাতামহবংশীয়েরা আজও রাজত্ব করিতেছেন। এই নে তবে তোর সন্তানের রক্ত, তোর রাজরক্ত এই নে।" গাত্র হইতে চাদর পড়িয়া গেল। কটিবন্ধ হইতে ছুরি বাহির করিলেন—বিদ্যুৎ নাচিয়া উঠিল—চকিতের মধ্যে সেই ছুরি আমূল তাঁহার হৃদয়ে নিহিত

করিলেন, মরণের তীক্ষ্ণ জিহ্বা তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। প্রতিমার পদতলে পড়িয়া গেলেন, পাষাণপ্রতিমা বিচলিত হইল না।

রঘুপতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—জয়সিংহকে তুলিবার চেষ্টা করিলেন, তুলিতে পারিলেন না। তাঁহার মৃতদেহের উপর পড়িয়া রহিলেন। রক্ত গড়াইয়া মন্দিরের শ্বেতপ্রস্তরের উপর প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে দীপগুলি একে একে নিবিয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত রাত্রি একটি প্রাণীর নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় ঝড় থামিয়া চারি দিক নিস্তব্ধ হইয়া গেল। রাত্রি চতুর্থ প্রহরের সময় মেঘের ছিদ্র দিয়া চন্দ্রালোক মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। চন্দ্রালোক জয়সিংহের পাণ্ডুবর্ণ মুখের উপর পড়িল, চতুর্দশ দেবতা শিয়রে দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। প্রভাতে বন হইতে যখন পাখি ডাকিয়া উঠিল তখন রঘুপতি মৃতদেহ ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রাজার আদেশমত প্রজাদের অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধানের জন্য নক্ষত্ররায় স্বয়ং প্রাতঃকালে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার ভাবনা হইতে লাগিল 'মন্দিরে কী করিয়া যাই'। রঘুপতির সম্মুখে পড়িলে তিনি কেমন অস্থির হইয়া পড়েন, আত্মসম্বরণ করিতে পারেন না। রঘুপতির সম্মুখে পড়িতে তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। এইজন্য তিনি স্থির করিয়াছেন, রঘুপতির দৃষ্টি এড়াইয়া গোপনে জয়সিংহের কক্ষে গিয়া তাঁহার নিকট হইতে সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

নক্ষত্ররায় ধীরে ধীরে জয়সিংহের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই মনে করিলেন, ফিরিতে পারিলে বাঁচি। দেখিলেন জয়সিংহের পুঁথি, তাঁহার বসন, তাঁহার গৃহসজ্জা, চারি দিকে ছড়ানো রহিয়াছে; মাঝখানে রঘুপতি বসিয়া। জয়সিংহ নাই। রঘুপতির লোহিত চক্ষু অঙ্গারের ন্যায় জ্বলিতেছে, তাঁহার কেশপাশ বিশৃঙ্খল। তিনি নক্ষত্ররায়কে দেখিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে তাঁহার হাত ধরিলেন। বলপূর্বক তাঁহাকে মাটিতে বসাইলেন। নক্ষত্ররায়ের প্রাণ উড়িয়া গেল। রঘুপতি তাঁহার অঙ্গারনয়নে নক্ষত্ররায়ের মর্মস্থান পর্যন্ত দগ্ধ করিয়া পাগলের মতো বলিলেন, "রক্ত কোথায়?" নক্ষত্ররায়ের হৃৎপিণ্ডে রক্তের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, মুখ দিয়া কথা সরিল না।

রঘুপতি উচ্চস্বরে বলিলেন, "তোমার প্রতিজ্ঞা কোথায়? রক্ত কোথায়?"

নক্ষত্ররায় হাত নাড়িলেন, বামে সরিয়া বসিলেন, কাপড়ের প্রান্ত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, তাঁহার ঘর্ম বহিতে লাগিল, তিনি শুষ্কমুখে বলিলেন, "ঠাকুর—"

রঘুপতি কহিলেন, "এবার মা যে স্বয়ং খড়্গ তুলিয়াছেন, এবার চারি দিকে যে রক্তের স্রোত বহিতে থাকিবে, এবার তোমাদের বংশে একফোঁটা রক্ত যে বাকি থাকিবে না! তখন দেখিব নক্ষত্ররায়ের ভ্রাতৃস্নেহ।"

"ভ্রাতৃস্নেহ! হাঃ হাঃ হাঃ! ঠাকুর"—নক্ষত্ররায়ের হাসি আর বাহির হইল না, গলা শুকাইয়া গেল।

রঘুপতি কহিলেন, "আমি গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত চাই না। পৃথিবীতে গোবিন্দমাণিক্যের যে প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় আমি তাহাকেই চাই। তাহার রক্ত লইয়া আমি গোবিন্দমাণিক্যের গায়ে মাখাইতে চাই—তাহার বক্ষস্থল রক্তবর্ণ হইয়া যাইবে—সে রক্তের চিহ্ন কিছুতেই মুছিবে না। এই দেখো—চাহিয়া দেখো।" বলিয়া উত্তরীয় মোচন করিলেন, তাঁহার দেহ রক্তে লিপ্ত, তাঁহার বক্ষোদেশে স্থানে স্থানে রক্ত জমিয়া আছে।

নক্ষত্ররায় শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাত-পা কাঁপিতে লাগিল। রঘুপতি বজ্রমুষ্টিতে নক্ষত্ররায়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "সে কে? কে গোবিন্দমাণিক্যের প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়? কে বলিয়া গেল গোবিন্দমাণিক্যের চক্ষে পৃথিবী শ্মশান হইয়া যাইবে, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য চলিয়া যাইবে? সকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই কাহার মুখ তাঁহার মনে পড়ে, কাহার স্মৃতি সঙ্গে করিয়া তিনি রাত্রে শয়ন করিতে যান, তাঁহার হৃদয়ের নীড় পরিপূর্ণ করিয়া কে বিরাজ করিতেছে? সে কে? সে কি তুমি?" বলিয়া ব্যাঘ্র লম্ফ দিবার পূর্বে কম্পিত হরিণশিশুর দিকে যেমন একদৃষ্টিতে চায়, রঘুপতি তেমনি নক্ষত্রের দিকে চাহিলেন।

নক্ষত্ররায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন,"না, আমি না"। কিন্তু কিছুতেই রঘুপতির মুষ্টি ছাড়াইতে পারিলেন না।

রঘুপতি বলিলেন, "তবে বলো সে কে?"

নক্ষত্ররায় বলিয়া ফেলিলেন, "সে ধ্রুব।"

রঘুপতি বলিলেন, "ধ্রুব কে?"

নক্ষত্ররায়। সে একটি শিশু—

রঘুপতি বলিলেন, "আমি জানি, তাহাকে জানি। রাজার নিজের সন্তান নাই, তাহাকেই সন্তানের মতো পালন করিতেছেন। নিজের সন্তানকে লোকে কেমন ভালোবাসে জানি না, কিন্তু পালিত সন্তানকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসে তাহা জানি। আপনার সমুদয় সম্পদের চেয়ে তাহার সুখ রাজার বেশি মনে হয়। আপনার মাথায় মুকুটের চেয়ে তাহার মাথায় মুকুট দেখিলে রাজার বেশি আনন্দ হয়।"

নক্ষত্ররায় আশ্চর্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক কথা।"

রঘুপতি কহিলেন, "ঠিক কথা নয় তো কী! রাজা তাহাকে কতখানি ভালোবাসেন তাহা কি আমি জানি না! আমি কি বুঝিতে পারি না! আমি তো তাহাকেই চাই।"

নক্ষত্ররায় হাঁ করিয়া রঘুপতির দিকে চাহিয়া রহিলেন। আপন মনে বলিলেন, 'তাহাকেই চাই।'

রঘুপতি কহিলেন, "তাহাকে আনিতেই হইবে—আজই আনিতে হইবে—আজ রাত্রেই চাই।"

নক্ষত্ররায় প্রতিধ্বনির মতো কহিলেন, "আজ রাত্রেই চাই!"

নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া গলার স্বর নামাইয়া রঘুপতি বলিলেন, "এই শিশুই তোমার শত্রু তাহা জান? তুমি রাজবংশে জন্মিয়াছ—কোথাকার এক অজ্ঞাতকুলশীল

শিশু তোমার মাথা হইতে মুকুট কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে তাহা কি জান? যে সিংহাসন তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল সেই সিংহাসনে তাহার জন্য স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা কি দুটো চক্ষু থাকিতে দেখিতে পাইতেছ না!"

নক্ষত্ররায়ের কাছে এ-সকল কথা নূতন নহে। তিনিও পূর্বে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। সগর্বে বলিলেন, "তা কি আর বলিতে হইবে ঠাকুর! আমি কি আর এইটে দেখিতে পাই না!"

রঘুপতি কহিলেন, "তবে আর কী। তবে আমাকে আনিয়া দাও, তোমার সিংহাসনের বাধা দূর করি। এই ক'টা প্রহর কোনোমতে কাটিবে, তার পর—তুমি কখন আনিবে?"

নক্ষত্ররায়। আজ সন্ধ্যাবেলায়—অন্ধকার হইলে।

পইতা স্পর্শ করিয়া রঘুপতি বহিলেন, "যদি না আনিতে পার তো ব্রাহ্মণের অভিশাপ লাগিবে। তা হইলে যে মুখে তুমি প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিয়া পালন না কর ত্রিরাত্রি না পোহাইতে সেই মুখের মাংস শকুনিতে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইবে।"

শুনিয়া নক্ষত্ররায় চমকিয়া মুখে হাত বুলাইলেন—কোমল মাংসের উপরে শকুনের চঞ্চুপাত-কল্পনা তাঁহার নিতান্ত দুঃসহ বোধ হইল। রঘুপতিকে প্রণাম করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বিদায় লইলেন। সে ঘর হইতে আলোক বাতাস ও জনকোলাহলের মধ্যে গিয়া নক্ষত্ররায় পুনর্জীবন লাভ করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় নক্ষত্ররায়কে দেখিয়া ধ্রুব "কাকা" বলিয়া ছুটিয়া আসিল, দুটি ছোটো হাতে তাহার গলা জড়াইয়া তাঁহার কপোলে কপোল দিয়া মুখের কাছে মুখ রাখিল। চুপিচুপি বলিল, "কাকা!" নক্ষত্র কহিলেন, "ছি, ও কথা বোলো না, আমি তোমার কাকা না।"

ধ্রুব তাঁহাকে এতকাল বরাবর কাকা বলিয়া আসিতেছিল, আজ সহসা বারণ শুনিয়া সে ভারি আশ্চর্য হইয়া গেল। গম্ভীরমুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তার পরে নক্ষত্রের মুখের দিকে বড়ো বড়ো চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আমি তোমার কাকা নই।"

শুনিয়া সহসা ধ্রুবের অত্যন্ত হাসি পাইল; এতবড়ো অসম্ভব কথা সে ইতিপূর্বে আর কখনো শুনে নাই, সে হাসিয়া বলিল, "তুমি কাকা।" নক্ষত্র যত নিষেধ করিতে লাগিলেন সে ততই বলিতে লাগিল, "তুমি কাকা।" তাহার হাসিও ততই বাড়িতে লাগিল। সে নক্ষত্ররায়কে কাকা বলিয়া খেপাইতে লাগিল।

নক্ষত্র বলিলেন, "ধ্রুব, তোমার দিদিকে দেখিতে যাইবে?"

ধ্রুব তাড়াতাড়ি নক্ষত্রের গলা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "দিদি কোথায়?"

নক্ষত্র বলিলেন, "মায়ের কাছে।"

ধ্রুব কহিল, "মা কোথায়?"

নক্ষত্র। মা আছেন এক জায়গায়। আমি সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।

ধ্রুব হাততালি দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কখন নিয়ে যাবে কাকা?"

নক্ষত্র। এখনি।

ধ্রুব আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিয়া সজোরে নক্ষত্রের গলা জড়াইয়া ধরিল; নক্ষত্র তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চাদরে আচ্ছাদন করিয়া গুপ্ত দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

আজ রাত্রেও পথে লোক বাহির হওয়া নিষেধ। এইজন্য পথে প্রহরী নাই। আকাশে পূর্ণচন্দ্র।

মন্দিরে গিয়া নক্ষত্ররায় ধ্রুবকে রঘুপতির হাতে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। রঘুপতিকে দেখিয়া ধ্রুব সবলে নক্ষত্ররায়কে জড়াইয়া ধরিল, কোনোমতে ছাড়িতে চাহিল না। রঘুপতি তাহাকে বলপূর্বক কাড়িয়া লইলেন। ধ্রুব "কাকা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল; নক্ষত্ররায়ের চক্ষে জল আসিল, কিন্তু রঘুপতির কাছে এই হৃদয়ের দুর্বলতা দেখাইতে তাঁহার নিতান্ত লজ্জা করিতে লাগিল। তিনি ভান করিলেন, যেন তিনি পাষাণে গঠিত। তখন ধ্রুব কাঁদিয়া কাঁদিয়া "দিদি" "দিদি" বলিয়া ডাকিতে লাগিল, দিদি আসিল না। রঘুপতি বজ্রস্বরে এক ধমক দিয়া উঠিলেন। ভয়ে ধ্রুবের কান্না থামিয়া গেল। কেবল তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, কান্না ফাটিয়া ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। চতুর্দশ দেবমূর্তি চাহিয়া রহিল।

গোবিন্দমাণিক্য নিশীথে স্বপ্নে ক্রন্দন শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন। সহসা শুনিতে পাইলেন, তাঁহার বাতায়নের নীচে হইতে কে কাতর স্বরে ডাকিতেছে, "মহারাজ! মহারাজ!"

রাজা সত্বর উঠিয়া গিয়া চন্দ্রালেকে দেকিতে পাইলেন, ধ্রুবের পিতৃব্য কেদারেশ্বর। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে?"

কেদারেশ্বর কহিলেন, "মহারাজ, আমার ধ্রুব কোথায়?"

রাজা কহিলেন, "কেন, তাহার শয্যাতে নাই?"

"না।"—কেদারেশ্বর বলিতে লাগিলেন, "অপরাহ্ন হইতে ধ্রুবকে না দেখিতে পাওয়ায় জিজ্ঞাসা করাতে যুবরাজ নক্ষত্ররায়ের ভৃত্য কহিল, ধ্রুব অন্তঃপুরে যুবরাজের কাছে আছে। শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। অনেক রাত হইতে দেখিয়া আমার আশঙ্কা জন্মিল; অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, যুবরাজ নক্ষত্ররায় প্রাসাদে নাই। আমি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ-প্রার্থনার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রহরীরা কিছুতেই আমার কথা গ্রাহ্য করিল না। এইজন্য বাতায়নের নীচে হইতে মহারাজকে ডাকিয়াছি, আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি, আমার এই অপরাধ মার্জনা করিবেন।"

রাজার মনে একটা ভাব বিদ্যুতের মতো চমকিয়া উঠিল। তিনি চারি জন প্রহরীকে ডাকিলেন; কহিলেন, "সশস্ত্রে আমার অনুসরণ করো।"

একজন কহিল, "মহারাজ, আজ রাত্রে পথে বাহির হওয়া নিষেধ।"

রাজা কহিলেন, "আমি আদেশ করিতেছি।"

কেদারেশ্বর সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইলেন, রাজা তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে কহিলেন। বিজন পথে চন্দ্রালোকে রাজা মন্দিরাভিমুখে চলিলেন।

মন্দিরের দ্বার যখন সহসা খুলিয়া গেল, দেখা গেল, খড়্গ সম্মুখে করিয়া নক্ষত্র এবং রঘুপতি মদ্যপান করিতেছেন। আলোক অধিক নাই, একটি দীপ জ্বলিতেছে। ধ্রুব কালী প্রতিমার পায়ের কাছে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার কপোলের অশ্রুরেখা শুকাইয়া গেছে, ঠোঁট দুটি একটু খুলিয়া গেছে, মুখে ভয় নাই, ভাবনা নাই। এ যেন পাষাণশয্যা নয়, যেন সে দিদির কোলের উপরে শুইয়া আছে। দিদি যেন চুমো খাইয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়াছে।

মদ খাইয়া নক্ষত্রের প্রাণ খুলিয়া গিয়াছিল; কিন্তু রঘুপতি স্থির হইয়া বসিয়া পূজার লগ্নের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, নক্ষত্রের প্রলাপে কিছুমাত্র কান দিতেছিলেন না। নক্ষত্র বলিতেছিলেন, "ঠাকুর, তোমার মনে মনে ভয় হচ্ছে। তুমি মনে করছ আমিও ভয় করছি। কিন্তু ভয় নেই ঠাকুর! ভয় কিসের? ভয় কাকে? আমি তোমাকে রক্ষা করব। তুমি কি মনে কর আমি রাজাকে ভয় করি? আমি শাসুজাকে ভয় করি নে, আমি শাজাহানকে ভয় করি নে। ঠাকুর, তুমি বললে না কেন, আমি রাজাকে ধরে আনতুম, দেবীকে সন্তুষ্ট করে দেওয়া যেত। ওইটুকু ছেলের কতটুকুই বা রক্ত!"

এমন সময় সহসা মন্দিরের ভিত্তির উপরে ছায়া পড়িল। নক্ষত্ররায় পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, রাজা। চকিতের মধ্যে নেশা সম্পূর্ণ ছুটিয়া গেল। নিজের ছায়ার চেয়ে নিজে মলিন হইয়া গেলেন। দ্রুতবেগে নিদ্রিত ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া গোবিন্দমাণিক্য প্রহরীদিগকে কহিলেন, "ইহাদের দুজনকে বন্দী করো।"

চারিজন প্রহরী রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের দুই হাত ধরিল। ধ্রুবকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বিজন পথে জ্যোৎস্নালোকে রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় সে রাত্রে কারাগারে রহিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিন বিচার। বিচারশালা লোকে লোকারণ্য। বিচারাসনে রাজা বসিয়াছেন, সভাসদেরা চারি দিকে বসিয়াছেন। সম্মুখে দুইজন বন্দী। কাহারো হাতে শৃঙ্খল নাই, কেবল সশস্ত্র প্রহরী তাঁহাদিগকে ঘেরিয়া আছে; রঘুপতি পাষাণমূর্তি মতো দাঁড়াইয়া আছেন, নক্ষত্ররায়ের মাথা নত।

রঘুপতির দোষ সপ্রমাণ করিয়া রাজা তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার কী বলিবার আছে?"

রঘুপতি কহিলেন, "আমার বিচার করিবার অধিকার আপনার নাই।"

রাজা কহিলেন, "তবে তোমার বিচার কে করিবে?"

রঘুপতি। আমি ব্রাহ্মণ, আমি দেবসেবক, দেবতা আমার বিচার করিবেন।

রাজা। পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার দিবার জন্য জগতে দেবতার সহস্র অনুচর আছে;

আমরাও তাহার একজন। সে কথা লইয়া আমি তোমার সহিত বিচার করিতে চাই না; আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, কাল সন্ধ্যাকালে বলির মানসে তুমি একটি শিশুকে হরণ করিয়াছিলে কি না। রঘুপতি কহিলেন, "হাঁ।"

রাজা কহিলেন, "তুমি অপরাধ স্বীকার করিতেছ?"

রঘুপতি। অপরাধ! অপরাধ কিসের? আমি মায়ের আদেশ পালন করিতেছিলাম, মায়ের কার্য করিতেছিলাম, তুমি তাহার ব্যাঘাত করিয়াছে—অপরাধ তুমি করিয়াছ। আমি মায়ের সমক্ষে তোমাকে অপরাধী করিতেছি, তিনি তোমার বিচার করিবেন।

রাজা তাঁহার কথার কোনো উত্তর না দিয়া কহিলেন, "আমার রাজ্যের নিয়ম এই— যে ব্যক্তি দেবতার উদ্দেশে জীববলি দিবে বা দিতে উদ্যত হইবে তাহার নির্বাসনদণ্ড। সেই দণ্ড আমি তোমার প্রতি প্রয়োগ করিলাম। আট বৎসরের জন্য তুমি নির্বাসিত হইলে। প্রহরীরা তোমাকে আমার রাজ্যের বাহিরে রাখিয়া আসিবে।"

প্রহরীরা রঘুপতিকে সভাগৃহ হইতে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল।

রঘুপতি তাহাদিগকে কহিলেন, "স্থির হও।" রাজার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোমার বিচার শেষ হইল— এখন আমি তোমার বিচার করিব, তুমি অবধান করো। চতুর্দশদেবতা-পূজার দুই রাত্রে যে-কেহ পথে বাহির হইবে পুরোহিতের কাছে সে দণ্ডিত হইবে, এই আমাদের মন্দিরের নিয়ম। সেই প্রাচীন নিয়ম-অনুসারে তুমি আমার নিকটে দণ্ডার্হ।"

রাজা কহিলেন, "আমি তোমার দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।"

সভাসদেরা কহিলেন, "এ অপরাধের কেবল অর্থদণ্ড হইতে পারে।"

পুরোহিত কহিলেন, "আমি তোমার দুই লক্ষ মুদ্রা দণ্ড করিতেছি। এখনি দিতে হইবে।"

রাজা কিয়ৎক্ষণ ভাবিলেন; পরে বলিলেন, "তথাস্তু।" কোষাধ্যক্ষকে ডাকিয়া দুই লক্ষ মুদ্রা আদেশ করিয়া দিলেন। প্রহরীরা রঘুপতিকে বাহিরে লইয়া গেল।

রঘুপতি চলিয়া গেলে নক্ষত্ররায়ের দিকে চাহিয়া রাজা দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "নক্ষত্ররায়, তোমার অপরাধ তুমি স্বীকার কর কি না?"

নক্ষত্ররায় বলিলেন, "মহারাজ, আমি অপরাধী, অমাকে মার্জনা করুন।" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া রাজার পা জড়াইয়া ধরিলেন।

মহারাজ বিচলিত হইলেন; কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্তি হইল না। অবশেষে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "নক্ষত্ররায়, ওঠো, আমার কথা শোনো। আমি মার্জনা করিবার কে? আমি আপনার শাসনে আপনি বন্ধ। বন্দীও যেমন বন্ধ বিচারকও তেমনি বন্ধ। একই অপরাধে আমি একজনকে দণ্ড দিব, একজনকে মার্জনা করিব, এ কী করিয়া হয়? তুমিই বিচার করো।"

সভাসদেরা বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, নক্ষত্ররায় আপনার ভাই, আপনার ভাইকে মার্জনা করুন।"

রাজা দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "তোমরা সকলে চুপ করো। যতক্ষণ আমি এই আসনে আছি ততক্ষণ আমি কাহারো ভাই নহি, কাহারো বন্ধু নহি।"

সভাসদেরা চারি দিকে চুপ করিলেন। সভা নিস্তব্ধ হইল। রাজা গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, "তোমরা সকলেই শুনিয়াছ—আমার রাজ্যে নিয়ম এই যে, যে ব্যক্তি দেবতার উদ্দেশে জীববলি দিবে বা দিতে উদ্যত হইবে তাহার নির্বাসনদণ্ড। কাল সন্ধ্যাকালে নক্ষত্ররায় পুরোহিতের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া বলির মানসে একটি শিশুকে হরণ করিয়াছিলেন। এই অপরাধ সপ্রমাণ হওয়াতে আমি তাঁহার আট বৎসর নির্বাসনদণ্ড বিধান করিলাম।"

প্রহরীরা যখন নক্ষত্ররায়কে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল তখন রাজা আসন হইতে নামিয়া নক্ষত্ররায়কে আলিঙ্গন করিলেন; রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "বৎস, কেবল তোমার দণ্ড হইল না, আমারও দণ্ড হইল। না জানি পূর্বজন্মে কী অপরাধ করিয়াছিলাম। যত দিন তুমি বন্ধুদের কাছ হইতে দূরে থাকিবে দেবতা তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন, তোমার মঙ্গল করুন।"

সংবাদ দেখিতে দেখিতে রাষ্ট্র হইল। অন্তঃপুরে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। রাজা নিভৃত কক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। জোড়হাতে কহিতে লাগিলেন, "প্রভু, আমি যদি কখনো অপরাধ করি আমাকে মার্জনা করিয়ো না, আমাকে কিছুমাত্র দয়া করিয়ো না। আমাকে আমার পাপের শাস্তি দাও। পাপ করিয়া শাস্তি বহন করা যায়, কিন্তু মার্জনাভার বহন করা যায় না প্রভু!"

নক্ষত্ররায়ের প্রেম রাজার মনে দ্বিগুণ জাগিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ের ছেলেবেলাকার মুখ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। সে যে-সকল খেলা করিয়াছে, কথা কহিয়াছে, কাজ করিয়াছে, তাহা একে একে তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল। এক-একটা দিন এক-একটা রাত্রি তাহার সূর্যালোকের মধ্যে, তাহার তারাখচিত আকাশের মধ্যে শিশু নক্ষত্ররায়কে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উদয় হইল। রাজার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

নির্বাসনোদ্যত রঘুপতিকে যখন প্রহরীরা জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর, কোন্‌ দিকে যাইবেন" তখন রঘুপতি উত্তর করিলেন, "পশ্চিম দিকে যাইব।"

নয় দিন পশ্চিমমুখে যাত্রার পর বন্দী ও প্রহরীরা ঢাকা শহরের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিল। তখন প্রহরীরা রঘুপতিকে ছাড়িয়া দিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিল।

রঘুপতি মনে মনে বলিলেন, 'কলিতে ব্রহ্মশাপ ফলে না। দেখা যাক, ব্রাহ্মণের বুদ্ধিতে কতটা হয়। দেখা যাক্‌, গোবিন্দমাণিক্যই বা কেমন রাজা, আর আমিই বা কেমন পুরোহিত ঠাকুর।'

ত্রিপুরার প্রান্তে মন্দিরের কোণে মোগল-রাজ্যের সংবাদ বড়ো পৌঁছিত না। এই নিমিত্ত রঘুপতি ঢাকা শহরে গিয়া মোগলদিগের রীতিনীতি ও রাজ্যের অবস্থা জানিতে কৌতূহলী হইলেন।

তখন মোগল-সম্রাট শাজাহানের রাজত্বকাল। তখন তাঁহার তৃতীয় পুত্র ঔরংজীব দক্ষিণাপথে বিজাপুর আক্রমণে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুজা বাংলার অধিপতি ছিলেন;

রাজমহলে তাঁহার রাজধানী। কনিষ্ঠ পুত্র কুমার মুরাদ গুজরাটের শাসনকর্তা। জ্যেষ্ঠ যুবরাজ দারা রাজধানী দিল্লীতেই বাস করিতেছেন। সম্রাটের বয়স ৬৭ বৎসর। তাঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া দারার উপরেই সাম্রাজ্যের ভার পড়িয়াছে।

রঘুপতি কিয়ৎকাল ঢাকায় বাস করিয়া উর্দুভাষা শিক্ষা করিলেন ও অবশেষে রাজমহল-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজমহলে যখন পৌঁছিলেন তখন ভারতবর্ষে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। সংবাদ রাষ্ট্র হইয়াছে যে, শাজাহান মৃত্যুশয্যায় শয়ান। এই সংবাদ পাইবামাত্র সুজা সৈন্য-সহিত দিল্লী-অভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন। সম্রাটের চারি পুত্রই মুমূর্ষু শাজাহানের মাথার উপর হইতে মুকুটটা একেবারে ছোঁ মারিয়া উড়াইয়া লইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ অরাজক রাজমহল ত্যাগ করিয়া সুজার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন; লোকজন বাহক প্রভৃতিকে বিদায় করিয়া দিলেন। সঙ্গে যে দুই লক্ষ টাকা ছিল তাহা রাজমহলের নিকটবর্তী এক বিজন প্রান্তরে পুঁতিয়া ফেলিলেন। তাহার উপরে এক চিহ্ন রাখিয়া গেলেন। অতি অল্প টাকাই সঙ্গে লইলেন। দগ্ধ কুটির, পরিত্যক্ত গ্রাম, মর্দিত শস্যক্ষেত্র লক্ষ্য করিয়া রঘুপতি অবিশ্রাম অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রঘুপতি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর বেশ সত্ত্বেও আতিথ্য পাওয়া দুর্ঘট। কারণ পঙ্গপালের ন্যায় সৈন্যরা যে পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহার উভয় পার্শ্বে কেবল দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিতেছে। সৈন্যেরা অশ্ব ও হস্তী-পালের জন্য অপক্ব শস্য কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। কৃষকের মরাইয়ে একটি কণা অবশিষ্ট নাই। চারি দিকে কেবল লুণ্ঠনাবশিষ্ট বিশৃঙ্খলা। অধিকাংশ লোক গ্রাম ছাড়িয়া পালাইয়াছে। দৈবাৎ যে দু-একজনকে দেখা যায় তাহাদের মুখে হাস্য নাই। তাহারা চকিত হরিণের ন্যায় সতর্ক, কাহাকেও তাহারা বিশ্বাস করে না, দয়া করে না। বিজন পথের পার্শ্বে গাছের তলায় লাঠি হাতে দুই-চারিজনকে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়; পথিক-শিকারের জন্য তাহারা সমস্ত দিন অপেক্ষা করিয়া আছে। ধূমকেতুর পশ্চাদ্‌বর্তী উল্কারাশির ন্যায় দস্যুরা সৈনিকদের অনুসরণ করিয়া লুণ্ঠনাবশেষ লুঠিয়া লইয়া যায়। এমন-কি, মৃতদেহের উপর শৃগাল-কুকুরের ন্যায় মাঝে মাঝে সৈন্যদলে ও দস্যুদলে লড়াই বাধিয়া যায়। নিষ্ঠুরতা সৈন্যদের খেলা হইয়াছে—পার্শ্ববর্তী নিরীহ পথিকের পেটে খপ্ করিয়া একটা তলোয়ারের খোঁচা বসাইয়া দেওয়া বা তাহার মুণ্ড হইতে পাগড়ি-সমেত খানিকটা খুলি উড়াইয়া দেওয়া তাহারা সামান্য উপহাসমাত্র মনে করে। গ্রামের লোকেরা তাহাদের দেখিয়া ভয় পাইতেছে দেখিলে তাহাদের পরম কৌতুক বোধ হয়। লুণ্ঠনাবশেষে তাহারা গ্রামের লোকদের উৎপীড়ন করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। দুইজন মান্য ব্রাহ্মণকে পিঠে পিঠে সংলগ্ন করিয়া টিকিতে-টিকিতে বাঁধিয়া উভয়ের নাকে নস্য প্রয়োগ করে। দুই ঘোড়ার পিঠে একজন মানুষকে চড়াইয়া ঘোড়াদুটোকে চাবুক মারে, দুই ঘোড়া দুই বিপরীত দিকে ছুটিয়া যায়— মাঝখানে মানুষটা পড়িয়া গিয়া হাত-পা ভাঙে—এইরূপ প্রতিদিন নূতন নূতন খেলা তাহারা আবিষ্কার করে; অকারণে গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া যায়। বলে যে, বাদশাহের সম্মানার্থ বাজি পুড়াইতেছে। সৈন্যদের পথে এইরূপ অত্যাচারের শত শত চিহ্ন

পড়িয়া আছে। এখানে রঘুপতি আতিথ্য পাইবেন কোথায়! কোনোদিন অনাহারে কোনোদিন স্বল্পাহারে কাটিতে লাগিল। রাত্রে অন্ধকারে এক ভগ্ন পরিত্যক্ত কুটিরে শ্রান্তদেহে শয়ন করিয়াছিলেন; সকালে উঠিয়া দেখেন, এক ছিন্নশির মৃতদেহকে সমস্ত রাত্রি বালিশ করিয়া শুইয়াছিলেন। একদিন মধ্যাহ্নে রঘুপতি ক্ষুধিত হইয়া কোনো কুটিরে গিয়া দেখিলেন, একজন লোক তাহার ভাঙা সিন্দুকের উপরে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে, বোধ হয় তাহার লুণ্ঠিত ধনের জন্য শোক করিতেছিল। কাছে গিয়া ঠেলিতেই সে গড়াইয়া পড়িয়া গেল; মৃতদেহ মাত্র—তাহার জীবন অনেক কাল হইল চলিয়া গিয়াছে।

একদিন রঘুপতি এক কুটিরে শুইয়া আছেন। রাত্রি অবসান হয় নাই, কিছু বিলম্ব আছে। এমন সময় ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া গেল। শরতের চন্দ্রালোকের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ছায়া ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল, ফিস্ ফিস্ করিয়া শব্দ শুনা গেল। রঘুপতি চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। তিনি উঠিতেই কতকগুলি স্ত্রীকণ্ঠ সভয়ে বলিয়া উঠিল, "ও মাগো!"

একজন পুরুষ অগ্রসর হইয়া বলিল, "কোন্ হ্যায় রে?"

রঘুপতি কহিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, পথিক। তোমরা কে?"

"আমাদের এই ঘর। আমরা ঘর ছাড়িয়া পালাইয়াছিলাম। মোগল সৈন্য চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া তবে এখানে আসিয়াছি।"

রঘুপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, " মোগল-সৈন্য কোন্ দিকে গিয়াছে?"

তাহারা কহিল, "বিজয়গড়ের দিকে। এতক্ষণ বিজয়গড়ের বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।"

রঘুপতি আর অধিক কিছু না বলিয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বিজয়গড়ের দীর্ঘ বন ঠগীদের আড্ডা। বনের মধ্যে দিয়া যে পথ গিয়াছে সেই পথের দুই পার্শ্বে কত মনুষ্যকঙ্কাল নিহিত আছে, তাহাদের উপরে কেবল বনফুল ফুটিতেছে, আর কোনো চিহ্ন নাই। বনের মধ্যে বট আছে, বাবলা আছে, নিম আছে, শত শত প্রকারের লতা গুল্ম আছে। স্থানে স্থানে ডোবা অথবা পুকুরের মতো দেখা যায়; অবিশ্রাম পাতা পচিয়া পচিয়া তাহার জল একেবারে সবুজ হইয়া উঠিয়াছে। ছোটো ছোটো সুঁড়িপথ এ দিকে ও দিকে আঁকিয়া বাঁকিয়া সাপের মতো অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। গাছের ডালে ডালে পালে পালে হনুমান। বটগাছের ডালের উপর হইতে শত শত শিকড় এবং হনুমানের লেজ ঝুলিতেছে। ভাঙা মন্দিরের প্রাঙ্গণে শিউলি ফুলের গাছ সাদা সাদা ফুল এবং হনুমানের দন্তবিকাশে একেবার আচ্ছন্ন। সন্ধ্যাবেলায় বড়ো বড়ো ঝাঁকড়া গাছের উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখির চীৎকারে বনের ঘোর অন্ধকার যেন দীর্ণবিদীর্ণ হইতে থাকে। আজ এই বৃহৎ বনের মধ্যে প্রায় কুড়ি হাজার সৈন্য প্রবেশ করিয়াছে। এই ডালে-পালায় লতায়-লতায় তৃণে-গুল্মে জড়িত বৃহৎ গোলাকার অরণ্য কুড়ি হাজার খরনখচঞ্চু সৈনিক-বাজপক্ষীদের একটিমাত্র নীড়

বলিয়া বোধ হইতেছে। সৈন্যসমাগম দেখিয়া অসংখ্য কাক কা-কা করিয়া দল বাঁধিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে; সাহস করিয়া ডালের উপর আসিয়া বসিতেছে না। কোনোপ্রকার গোলমাল করিতে সেনাপতির নিষেধ আছে। সৈন্যেরা সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যাবেলায় বনে আসিয়া শুষ্ক কাঠ কুড়াইয়া রন্ধন করিতেছে ও পরস্পর চুপি চুপি কথা কহিতেছে; তাহাদের সেই গুন্ গুন্ শব্দে সমস্ত অরণ্য গম্‌গম্ করিতেছে। সন্ধ্যাবেলায় ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাইতেছে না। গাছের গুঁড়িতে বাঁধা অশ্বেরা মাঝে মাঝে ক্ষুর দিয়া মাটি খুঁড়িতেছে ও হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিতেছে, সমস্ত বনের তাহাতে চমক লাগিতেছে। ভাঙা মন্দিরের কাছে ফাঁকা জায়গায় শাসুজার শিবির পড়িয়াছে। আর সকলের আজ বৃক্ষতলেই অবস্থান।

সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত চলিয়া রঘুপতি বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন রাত্রি হইয়াছে। অধিকাংশ সৈন্য নিস্তব্ধে ঘুমাইতেছে, অল্পমাত্র সৈন্য নীরবে পাহারা দিতেছে। মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় আগুন জ্বলিতেছে, অন্ধকার যেন বহু কষ্টে নিদ্রাক্রান্ত রাঙা চক্ষু মেলিয়াছে। রঘুপতি বনের মধ্যে পা দিয়াই কুড়ি হাজার সৈনিকের নিশ্বাস-প্রশ্বাস যেন শুনিতে পাইলেন। বনের সহস্র গাছ পাখা বিস্তার করিয়া পাহারা দিতেছে। কালপেচক তাহার সদ্যোজাত শাবকের উপর যেমন পক্ষ বিস্তারিত করিয়া বসিয়া থাকে তেমনি অরণ্যের বাহিরকার বিরাট রাত্রি অরণ্যের ভিতরকার গাঢ়তর রাত্রির উপর চাপিয়া ডানা ঝাঁপিয়া নীরবে বসিয়া আছে; অরণ্যের ভিতরে এক রাত্রি মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইয়া আছে, অরণ্যের বাহিরে এক রাত্রি মাথা তুলিয়া জাগিয়া আছে। রঘুপতি সে রাত্রে বনপ্রান্তে শুইয়া রহিলেন।

সকালে গোটা দুই-চার খোঁচা খাইয়া ধড়্‌ফড়্ করিয়া জাগিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, জন-কত পাগড়ি-বাঁধা দাড়ি-পরিপূর্ণ তুরানি সৈন্য বিদেশী ভাষায় তাঁহাকে কী বলিতেছে; শুনিয়া তিনি নিশ্চয় অনুমান করিয়া লইলেন, গালি। তিনিও বঙ্গভাষায় তাহাদের শ্যালক-সম্বন্ধ প্রচার করিয়া দিলেন; তাহারা তাঁহাকে টানাটানি করিতে লাগিল।

রঘুপতি বলিলেন, "ঠাট্টা পেয়েছিস?" কিন্তু তাহাদের আচরণে ঠাট্টার লক্ষণ কিছুমাত্র প্রকাশ পাইল না। বনের মধ্য দিয়া তাহারা তাঁহাকে অকাতরে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

তিনি সবিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "টানাটানি কর কেন? আমি আপনিই যাচ্ছি। এত পথ আমি এলুম কী করতে?"

সৈন্যরা হাসিতে লাগিল ও তাঁহার বাংলা কথা নকল করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার চতুর্দিকে বিস্তর সৈন্য জড়ো হইল, তাঁহাকে লইয়া ভারি গোল পড়িয়া গেল। উৎপীড়নেরও সীমা রহিল না। একজন সৈন্য একটা কাঠবিড়ালের লেজ ধরিয়া তাঁহার মুণ্ডিত মাথায় ছাড়িয়া দিল; দেখিবার ইচ্ছা, ফল মনে করিয়া খায় কি না। একজন সৈন্য তাঁহার নাকের সম্মুখে একটা মোটা বেত বাঁকাইয়া ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল, সেটা ছাড়িয়া দিলে রঘুপতির মুখের উপর হইতে নাকের সমুন্নত মহিমা একেবারে সমূলে লোপ হইবার সম্ভাবনা। সৈন্যদের হাস্যে কানন ধ্বনিত হইতে লাগিল। মধ্যাহ্নে আজ যুদ্ধ করিতে হইবে, সকালে তাই রঘুপতিকে লইয়া তাহাদের ভারি খেলা পড়িয়া গেল। খেলার সাধ মিটিলে পর ব্রাহ্মণকে

সুজার শিবিরে লইয়া গেল।

সুজাকে দেখিয়া রঘুপতি সেলাম করিলেন না। তিনি দেবতা ও স্ববর্ণ ছাড়া আর কাহারো কাছে কখনো মাথা নত করেন নাই। মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; হাত তুলিয়া বলিলেন, "শাহেন-শার জয় হউক।"

সুজা মদের পেয়ালা লইয়া সভাসদ্-সমেত বসিয়াছিলেন; আলস্য-বিজড়িত স্বরে নিতান্ত উপেক্ষাভরে কহিলেন, "কী, ব্যাপার কী?"

সৈন্যেরা কহিল, "জনাব, শত্রুপক্ষের চর গোপনে আমাদের বলাবল জানিতে আসিয়াছিল; আমরা তাকে প্রভুর কাছে ধরিয়া আনিয়াছি।"

সুজা কহিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা। বেচারা দেখিতে আসিয়াছে, উহাকে ভালো করিয়া সমস্ত দেখাইয়া ছাড়িয়া দাও। দেশে গিয়া গল্প করিবে।"

রঘুপতি বদ-হিন্দুস্থানিতে কহিলেন, "সরকারের অধীনে আমি কর্ম প্রার্থনা করি।"

সুজা আলস্যবরে হাত নাড়িয়া তাঁহাকে দ্রুত চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। বলিলেন, "গরম।" যে বাতাস করিতেছিল সে দ্বিগুণ জোরে বাতাস করিতে লাগিল।

দারা তাঁহার পুত্র সুলেমানকে রাজা জয়সিংহের অধীনে সুজার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের বৃহৎ সৈন্যদল নিকটবর্তী হইয়াছে, সংবাদ আসিয়াছে। তাই বিজয়গড়ের কেল্লা অধিকার করিয়া সেইখানে সৈন্য সমবেত করিবার জন্য সুজা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সুজার হাতে কেল্লা এবং সরকারি খাজনা সমর্পণ করিবার প্রস্তাব লইয়া বিজয়গড়ের অধিপতি বিক্রমসিংহের নিকট দূত গিয়াছিল। বিক্রমসিংহ সেই দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি কেবল দিল্লীশ্বর শাজাহান এবং জগদীশ্বর ভবানীপতিকে জানি। সুজা কে? আমি তাহাকে জানি না।"

সুজা জড়িত স্বরে কহিলেন, "ভারি বেআদপ! নাহক আবার লড়াই করিতে হইবে। ভারি হাঙ্গাম।"

রঘুপতি এই-সমস্ত শুনিতে পাইলেন। সৈন্যদের হাত এড়াইবামাত্র বিজয়গড়ের দিকে চলিয়া গেলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

পাহাড়ের উপরে বিজয়গড়। বিজয়গড়ের অরণ্য গড়ের কাছাকাছি গিয়া শেষ হইয়াছে; অরণ্য হইতে বাহির হইয়া রঘুপতি সহসা দেখিলেন, দীর্ঘ পাষাণদুর্গ যেন নীল আকাশে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অরণ্য যেমন তাহার সহস্র তরুজালে প্রচ্ছন্ন, দুর্গ তেমনি তাহার পাষাণের মধ্যে আপনি রুদ্ধ। অরণ্য সাবধানী, দুর্গ সতর্ক। অরণ্য ব্যাঘ্রের মতো গুঁড়ি মারিয়া লেজ পাকাইয়া বসিয়া আছে, দুর্গ সিংহের মতো কেশর ফুলাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অরণ্য মাটিতে কান পাতিয়া শুনিতেছে, দুর্গ আকাশে মাথা তুলিয়া দেখিতেছে।

রঘুপতি অরণ্য হইতে বাহির হইবামাত্র দুর্গ-প্রাকারের উপরে সৈন্যরা সচকিত হইয়া

উঠিল। শৃঙ্গ বাজিয়া উঠিল। দুর্গ যেন সহসা সিংহনাদ করিয়া দাঁত নখ মেলিয়া ভ্রূকুটি করিয়া দাঁড়াইল। রঘুপতি পাইতা দেখাইয়া হাত তুলিয়া ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যরা সতর্ক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রঘুপতি যখন দুর্গপ্রাচীরের কাছাকাছি গেলেন তখন সৈন্যরা জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "তুমি কে?"

রঘুপতি বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, অতিথি।"

দুর্গাধিপতি বিক্রমসিংহ পরম ধর্মনিষ্ঠ। দেবতা ব্রাহ্মণ ও অতিথি সেবায় নিযুক্ত। পইতা থাকিলে দুর্গপ্রবেশের জন্য আর কোনো পরিচয় আবশ্যক ছিল না। কিন্তু আজ যুদ্ধের দিনে কী করা উচিত সৈন্যরা ভাবিয়া পাইতেছিল না।

রঘুপতি কহিলেন, "তোমরা আশ্রয় না দিলে মুসলমানের হাতে আমাকে মরিতে হইবে।"

বিক্রমসিংহের কানে যখন এ কথা গেল, তখন তিনি ব্রাহ্মণকে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় দিতে অনুমতি করিলেন। প্রাচীরের উপর হইতে একটা মই নামানো হইল, রঘুপতি দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দুর্গের মধ্যে যুদ্ধের প্রতীক্ষায় সকলেই নিতান্ত ব্যস্ত। বৃদ্ধ খুড়াসাহেব ব্রাহ্মণ-অভ্যর্থনার ভার স্বয়ং লইলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম খড়্গসিংহ কিন্তু তাঁহাকে কেহ বলে খুড়াসাহেব, কেহ বলে সুবাদার-সাহেব— কেন যে বলে তাহার কোনো কারণ পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নাই, ভাই নাই, তাঁহার খুড়া হইবার কোনো অধিকার বা সুদূর সম্ভাবনা নাই এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যতগুলি তাঁহার সুবা তাহার অপেক্ষা অধিক নহে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেহ তাঁহার উপাধি সম্বন্ধে কোনো প্রকার আপত্তি অথবা সন্দেহ উত্থাপিত করে নাই। যাহারা বিনা ভাইপোয় খুড়া, বিনা সুবায় সুবাদার, সংসারের অনিত্যতা ও লক্ষ্মীর চপলতা-নিবন্ধন তাহাদের পদচ্যুতির কোনো আশঙ্কা নাই।

খুড়াসাহেব আসিয়া কহিলেন, "বাহবা, এই তো ব্রাহ্মণ বটে!" বলিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। রঘুপতির একপ্রকার তেজীয়ান দীপশিখার মতো আকৃতি ছিল যাহা দেখিয়া সহসা পতঙ্গেরা মুগ্ধ হইয়া যাইত।

খুড়াসাহেব জগতের বর্তমান শোচনীয় অবস্থায় বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন, "ঠাকুর, তেমন ব্রাহ্মণ আজকাল ক'টা মেলে?"

রঘুপতি কহিলেন, "অতি অল্প।"

খুড়াসাহেব কহিলেন, "আগে ব্রাহ্মণের মুখে অগ্নি ছিল, এখন সমস্ত অগ্নি জঠরে আশ্রয় লইয়াছে।"

রঘুপতি কহিলেন, "তাও কি আগেকার মতো আছে!"

খুড়াসাহেব মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "ঠিক কথা। অগস্ত্যমুনি যে আন্দাজ পান করিয়াছিলেন সে আন্দাজ যদি আহার করিতেন তাহা হইলে একবার বুঝিয়া দেখুন।"

রঘুপতি কহিলেন, "আরো দৃষ্টান্ত আছে।"

খুড়াসাহেব। হাঁ, আছে বৈকি। জহ্নুমুনির পিপাসার কথা শুনা যায়। তাঁহার ক্ষুধার কথা

কোথাও লেখা নাই, কিন্তু একটা অনুমান করা যাইতে পারে। হর্‌তুকি খাইলেই যে কম খাওয়া হয় তাহা নহে, ক'টা করিয়া হর্‌তুকি তাঁহারা রোজ খাইতেন তাহার একটা হিসাব থাকিলে তবু বুঝিতে পারিতাম।

রঘুপতি ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, "না সাহেব, আহারের প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট মনোযোগ ছিল না।"

খুড়াসাহেব জিভ কাটিয়া বলিলেন, "রাম রাম, বলেন কী ঠাকুর! তাঁহাদের জঠরানল যে অত্যন্ত প্রবল ছিল তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। দেখুন না কেন কালক্রমে আর সকল অগ্নিই নিবিয়া গেল, হোমের অগ্নিও জ্বলে না, কিন্তু—"

রঘুপতি কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "হোমের অগ্নি আর জ্বলিবে কী করিয়া? দেশে ঘি রহিল কই? পাষণ্ডেরা সমস্ত গোরু পার করিয়া দিতেছে, এখন হব্য পাওয়া যায় কোথায়? হোমাগ্নি না জ্বলিলে ব্রহ্মতেজ আর কতদিন টেকে!" বলিয়া রঘুপতি নিজের প্রচ্ছন্ন দাহিকাশক্তি অত্যন্ত অনুভব করিতে লাগিলেন।

খুড়াসাহেব কহিলেন, "ঠিক বলিয়াছেন ঠাকুর, গোরুগুলো মরিয়া আজকাল মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কাছ হইতে ঘি পাইবার প্রত্যাশা করা যায় না। মগজের সম্পূর্ণ অভাব। ঠাকুরের কোথা হইতে আসা হইতেছে?"

রঘুপতি কহিলেন, "ত্রিপুরার রাজবাটী হইতে।"

বিজয়গড়ের বহিঃস্থিত ভারতবর্ষের ভূগোল অথবা ইতিহাস সম্বন্ধে খুড়াসাহেবের অতি সামান্য জানা ছিল। বিজয়গড় ছাড়া ভারতবর্ষে জানিবার যোগ্য যে আর-কিছু আছে, তাহাও তাঁহার বিশ্বাস নহে। সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিলেন, "আহা, ত্রিপুরার রাজা মস্ত রাজা।"

রঘুপতি তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন।

খুড়াসাহেব। ঠাকুরের কী করা হয়?

রঘুপতি। আমি ত্রিপুরার রাজপুরোহিত।

খুড়াসাহেব চোখ বুজিয়া মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "আহা।" রঘুপতির উপরে তাঁহার ভক্তি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

"কী করিতে আসা হইয়াছে?"

রঘুপতি কহিলেন, "তীর্থ দর্শন করিতে।"

ধুম করিয়া আওয়াজ হইল। শত্রুপক্ষ দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে। খুড়াসাহেব হাসিয়া চোখ টিপিয়া কহিলেন, "ও কিছু নয়, ঢেলা ছুড়িতেছে।" বিজয়গড়ের উপরে খুড়াসাহেবের বিশ্বাস যত দৃঢ় বিজয়গড়ের পাষাণ তত দৃঢ় নহে। বিদেশী পথিক দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেই খুড়াসাহেব তাহাকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসেন এবং বিজয়গড়ের মাহাত্ম্য তাহার মনে বদ্ধমূল করিয়া দেন। ত্রিপুরার রাজবাটী হইতে রঘুপতি আসিয়াছেন, এমন অতিথি সচরাচর মেলে না—খুড়াসাহেব অত্যন্ত উল্লাসে আছেন। অতিথির সঙ্গে বিজয়গড়ের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে

আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, ব্রহ্মার অণ্ড এবং বিজয়গড়ের দুর্গ যে প্রায় একই সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ঠিক মনুর পর হইতে মহারাজ বিক্রমসিংহের পূর্বপুরুষেরা যে এই দুর্গ ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন সে বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। এই দুর্গের প্রতি শিবের কী বর আছে এবং এই দুর্গে কার্তবীর্যার্জুন যে কিরূপে বন্দী হইয়াছিলেন তাহাও রঘুপতির অগোচর রহিল না।

সন্ধ্যার সময় সংবাদ পাওয়া গেল, শত্রুপক্ষ দুর্গের কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই। তাহারা কামান পাতিয়াছিল, কিন্তু কামানের গোলা দুর্গে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। খুড়াসাহেব হাসিয়া রঘুপতির দিকে চাহিলেন। মর্ম এই যে, দুর্গের প্রতি শিবের যে অমোঘ বর আছে তাহার এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কী হইতে পারে! বোধ করি নন্দী স্বয়ং আসিয়া কামানের গোলাগুলি লুফিয়া লইয়া গিয়াছে, কৈলাসে গণপতি ও কার্তিকেয় ভাঁটা খেলিবেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

শাসুজাকে কোনোমতে হস্তগত করাই রঘুপতির উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যখন শুনিলেন, সুজা দুর্গ আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন মনে করিলেন, মিত্রভাবে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি কোনোরূপে সুজার দুর্গ-আক্রমণে সাহায্য করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ যুদ্ধবিগ্রহের কোনো ধার ধারেন না, কী করিলে যে সুজার সাহায্য হইতে পারে ভাবিয়া পাইলেন না।

পরদিন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিপক্ষ পক্ষ বারুদ দিয়া দুর্গপ্রাচীরের কিয়দংশ উড়াইয়া দিল, কিন্তু ঘন ঘন গুলিবর্ষণের প্রভাবে দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিল না। ভগ্ন অংশ দেখিতে দেখিতে গাঁথিয়া তোলা হইল। আজ মাঝে মাঝে দুর্গের মধ্যে গোলাগুলি আসিয়া পড়িতে লাগিল, দুই-চারিজন করিয়া দুর্গ-সৈন্য হত ও আহত হইতে লাগিল।

"ঠাকুর, কিছু ভয় নাই, এ কেবল খেলা হইতেছে" বলিয়া খুড়াসাহেব রঘুপতিকে লইয়া দুর্গের চারিদিক দেখাইয়া বেড়াতে লাগিলেন। কোথায় অস্ত্রাগার, কোথায় ভাণ্ডার, কোথায় আহতদের চিকিৎসাগৃহ, কোথায় বন্দীশালা, কোথায় দরবার, এই-সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইতে লাগিলেন ও বার বার রঘুপতির মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। রঘুপতি কহিলেন, "চমৎকার কারখানা! ত্রিপুরার গড় ইহার কাছে লাগিতে পারে না। কিন্তু সাহেব, গোপনে পলায়নের জন্য ত্রিপুরার গড়ে একটি আশ্চর্য সুরঙ্গ-পথ আছে, এখানে সেরূপ কিছুই দেখিতেছি না।"

খুড়াসাহেব কী একটা বলিতে যাইতেছিলেন, সহসা আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন, "না, এ দুর্গে সেরূপ কিছুই নাই।"

রঘুপতি নিতান্ত আশ্চর্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "এত বড়ো দুর্গে একটা সুরঙ্গ-পথ নাই, এ কেমন কথা হইল!"

খুড়াসাহেব কিছু কাতর হইয়া কহিলেন, "নাই, এ কি হইতে পারে? অবশ্যই আছে, তবে

আমরা কেহ জানি না।"

রঘুপতি হাসিয়া কহিলেন, "তবে তো না থাকারই মধ্যে। যখন আপনিই জানেন না তখন আর কেই বা জানে?"

খুড়াসাহেব অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তার পরে সহসা "রাম রাম" বলিয়া তুড়ি দিয়া হাই তুলিলেন, তার পর মুখে গোঁফে দাড়িতে দুই-একবার হাত বুলাইয়া হঠাৎ বলিলেন, "ঠাকুর, পূজা-অর্চনা লইয়া থাকেন, আপনাকে বলিতে কোনো দোষ নাই—দুর্গপ্রবেশের এবং দুর্গ হইতে বাহির হইবার দুইটা গোপন পথ আছে। কিন্তু বাহিরের কোন লোককে তাহা দেখানো নিষেধ।"

রঘুপতি কিঞ্চিৎ সন্দেহের স্বরে কহিলেন, "বটে! তা হবে।"

খুড়াসাহেব দেখিলেন তাঁহারই দোষ, একবার 'নাই' একবার 'আছে' বলিলে লোকের স্বভাবতই সন্দেহ হইতে পারে। বিদেশীর চোখে ত্রিপুরার গড়ের কাছে বিজয়গড় কোনো অংশে খাটো হইয়া যাইবে ইহা খুড়াসাহেবের পক্ষে অসহ্য।

তিনি কহিলেন, "ঠাকুর, বোধ করি আপনার ত্রিপুরা অনেক দূরে এবং আপনি ব্রাহ্মণ, দেবসেবাই আপনার একমাত্র কাজ, আপনার দ্বারা কিছু প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই।"

রঘুপতি কহিলেন, "কাজ কী সাহেব, সন্দেহ হয় তো ও-সব কথা থাক্-না! আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার দুর্গের খবরে কাজ কী?"

খুড়াসাহেব জিভ কাটিয়া কহিলেন, "আরে রাম রাম, আপনাকে আবার সন্দেহ কিসের? চলুন, একবার দেখাইয়া লইয়া আসি।"

এ দিকে সহসা দুর্গের বাহিরে সুজার সেনাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে। অরণ্যের মধ্যে সুজার শিবির ছিল; সুলেমান এবং জয়সিংহের সৈন্য আসিয়া সহসা তাঁহাকে বন্দী করিয়াছে এবং অলক্ষ্যে দুর্গ আক্রমণকারীদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সুজার সৈন্যেরা লড়াই না করিয়া কুড়িটা কামান পশ্চাতে ফেলিয়া ভঙ্গ দিল।

দুর্গের মধ্যে ধুম পড়িয়া গেল। বিক্রমসিংহের নিকট সুলেমানের দূত পৌঁছিতেই তিনি দুর্গের দ্বার খুলিয়া দিলেন, স্বয়ং অগ্রসর হইয়া সুলেমান ও রাজা জয়সিংহকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। দিল্লীশ্বরের সৈন্য ও অশ্ব-গজে দুর্গ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। নিশান উড়িতে লাগিল, শঙ্খ ও রণবাদ্য বাজিতে লাগিল এবং খুড়াসাহেবের শ্বেত গুম্ফের নীচে শ্বেত হাস্য পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

খুড়াসাহেবের কী আনন্দের দিন! আজ দিল্লীশ্বরের রাজপুত সৈন্যেরা বিজয়গড়ের অতিথি হইয়াছে, প্রবলপ্রতাপান্বিত শাসুজা আজ বিজয়গড়ের বন্দী। কার্তবীর্যার্জুনের পর হইতেই বিজয়গড়ে এমন বন্দী আর মেলে নাই। কার্তবীর্যার্জুনের বন্ধনদশা স্মরণ করিয়া নিশ্বাস

ফেলিয়া খুড়াসাহেব রাজপুত সুচেতসিংহকে বলিলেন, "মনে করিয়া দেখো, হাজারটা হাতে শিকলি পরাইতে কী আয়োজনটাই করিতে হইয়াছিল। কলিযুগ পড়িয়া অবধি ধুমধাম বিলকুল কমিয়া গিয়াছে। এখন রাজার ছেলেই হউক আর বাদশাহের ছেলেই হউক বাজারে দুখানার বেশি হাত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; বাঁচিয়া সুখ নাই।"

সুচেতসিংহ হাসিয়া নিজের হাতের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এই দুইখানা হাতই যথেষ্ট।"

খুড়াসাহেব কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন, "তা বটে, সেকালের কাজ ছিল ঢের বেশি। আজকাল কাজ এত কম পড়িয়াছে যে, এই দুইখানা হাতেরই কোনো কৈফিয়ত দেওয়া যায় না। আরো হাত থাকিলে আরো গোঁফে তা দিতে হইত।"

আজ খুড়াসাহেবের বেশভূষার ত্রুটি ছিল না। চিবুকের নীচে হইতে পাকা দাড়ি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহার দুই কানে লটকাইয়া দিয়াছেন। গোঁফজোড়া পাকাইয়া কর্ণরন্ধ্রের কাছাকাছি লইয়া গিয়াছেন। মাথায় বাঁকা পাগড়ি, কটিদেশে বাঁকা তলোয়ার। জরির জুতার সম্মুখভাগ শিঙের মতো বাঁকিয়া পাকাইয়া উঠিয়াছে। আজ খুড়াসাহেবের চলিবার এমনি ভঙ্গি, যেন বিজয়গড়ের মহিমা তাঁহারই সর্বাঙ্গে তরঙ্গিত হইতেছে। আজ এই-সমস্ত সমজদার লোকের নিকটে বিজয়গড়ের মাহাত্ম্য প্রমাণ হইয়া যাইবে, এই আনন্দে তাঁহার আহারনিদ্রা নাই।

সুচেতসিংহকে লইয়া প্রায় সমস্ত দিন দুর্গপর্যবেক্ষণ করিলেন। সুচেতসিংহ যেখানে কোনোপ্রকার আশ্চর্য প্রকাশ না করেন সেখানে খুড়াসাহেব স্বয়ং "বাহবা বাহবা" করিয়া নিজের উৎসাহ রাজপুত বীরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করেন। বিশেষত দুর্গপ্রাকারের গাঁথুনি সম্বন্ধে তাঁহাকে সবিশেষ পরিশ্রম করিতে হইল। দুর্গপ্রাকার যেরূপ অবিচলিত সুচেতসিংহও ততোধিক—তাঁহার মুখে কোনোপ্রকারই ভাব প্রকাশ পাইল না। খুড়াসাহেব ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাকে একবার দুর্গপ্রাকারের বামে একবার দক্ষিণে, একবার উপরে একবার নীচে, আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিলেন—বারবার বলিতে লাগিলেন, "কী তারিফ!" কিন্তু কিছুতেই সুচেতসিংহের হৃদয়দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্ত হইয়া সুচেতসিংহ বলিয়া উঠিলেন, "আমি ভরতপুরের গড় দেখিয়াছি, আর-কোনো গড় আমার চোখে লাগে নাই।"

খুড়াসাহেব কাহারো সঙ্গে কখনো বিবাদ করেন না, নিতান্ত ম্লান হইয়া বলিলেন, "অবশ্য, অবশ্য। এ কথা বলিতে পার বটে।"

নিশ্বাস ফেলিয়া দুর্গ সম্বন্ধে আলোচনা পরিত্যাগ করিলেন। বিক্রমসিংহের পূর্বপুরুষ দুর্গাসিংহের কথা উঠাইলেন। তিনি বলিলেন, "দুর্গাসিংহের তিন পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র চিত্রসিংহের এক আশ্চর্য অভ্যাস ছিল। তিনি প্রতিদিন প্রাতে আধ সের আন্দাজ ছোলা দুধে সিদ্ধ করিয়া খাইতেন। তাঁহার শরীরও তেমনি ছিল। আচ্ছা জি, তুমি যে ভরতপুরের গড়ের কথা বলিতেছে, সে অবশ্য খুব মস্ত গড়ই হইবে— কিন্তু কই, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে তো তাহার কোনো উল্লেখ নাই।"

সুচেতসিংহ হাসিয়া কহিলেন, "তাহার জন্য কাজের কোনো ব্যাঘাত হইতেছে না।"

খুড়াসাহেব কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিলেন, "হা হা হা, তা ঠিক, তা ঠিক। তবে কি জান, ত্রিপুরার গড়ও বড়ো কম নহে, কিন্তু বিজয় গড়ের—"

সুচেতসিংহ। ত্রিপুরা আবার কোন্ মুল্লুকে?

খুড়াসাহেব। সে ভারী মুল্লুক। অত কথায় কাজ কী, সেখানকার রাজপুরোহিত-ঠাকুর আমাদের গড়ে অতিথি আছেন, তুমি তাঁহার মুখে সমস্ত শুনিবে।

কিন্তু ব্রাহ্মণকে আজ কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। খুড়াসাহেবের প্রাণ সেই ব্রাহ্মণের জন্য কাঁদিতে লাগিল। তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 'এই রাজপুত গ্রাম্যগুলোর চেয়ে সে ব্রাহ্মণ অনেক ভালো।' সুচেতসিংহের নিকটে শতমুখে রঘুপতির প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বিজয়গড় সম্বন্ধে রঘুপতির কী মত তাহাও ব্যক্ত করিলেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

খুড়াসাহেবের হাত এড়াইতে সুচেতসিংহকে আর অধিক প্রয়াস পাইতে হইল না। কাল প্রাতে বন্দীসমেত সম্রাট-সৈন্যের যাত্রার দিন স্থির হইয়াছে, যাত্রার আয়োজনে সৈন্যেরা নিযুক্ত হইল। বন্দীশালায় শাসুজা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে কহিতেছেন, 'ইহারা কী বেআদব! শিবির হইতে আমার আলবোলাটা আনিয়া দিবে, তাহাও ইহাদের মনে উদয় হইল না।'

বিজয়গড়ের পাহাড়ের নিম্নভাগে এক গভীর খাল আছে। সেই খালের ধারে একস্থানে একটি বজ্রদগ্ধ অশ্বত্থের গুঁড়ি অছে। সেই গুঁড়ির কাছ-বরাবর রঘুপতি গভীর রাত্রে ডুব দিলেন ও অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

গোপনে দুর্গপ্রবেশের জন্য যে সুরঙ্গপথ আছে এই খালের গভীর তলেই তাহার প্রবেশের মুখ। এই পথ বাহিয়া সুরঙ্গপ্রান্তে পৌঁছিয়া নীচে হইতে সবলে ঠেলিলেই একটি পাথর উঠিয়া পড়ে, উপর হইতে তাহাকে কিছুতেই উঠানো যায় না। সুতরাং যাহারা দুর্গের ভিতরে আছে তাহারা এ পথ দিয়া বাহির হইতে পারে না।

বন্দীশালার পালঙ্কের উপর সুজা নিদ্রিত। পালঙ্ক ছাড়া গৃহে আর কোনো সজ্জা নাই। একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। সহসা গৃহে ছিদ্র প্রকাশ পাইল। অল্পে অল্পে মাথা তুলিয়া পাতাল হইতে রঘুপতি উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ ভিজা। সিক্ত বস্ত্র হইতে জলধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। রঘুপতি ধীরে ধীরে সুজাকে স্পর্শ করিলেন।

সুজা চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু রগড়াহয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন; তার পর আলস্যজড়িত স্বরে কহিলেন, "কী হাঙ্গাম! ইহারা কি আমাকে রাত্রেও ঘুমাইতে দিবে না!—তোমাদের ব্যবহারে আমি আশ্চর্য হইয়াছি।"

রঘুপতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "শাহাজাদা, উঠিতে আজ্ঞা হউক। আমি সেই ব্রাহ্মণ। আমাকে স্মরণ করিয়া দেখুন। ভবিষ্যতেও আমাকে স্মরণে রাখিবেন।"

পরদিন প্রাতে সম্রাট-সৈন্য যাত্রা জন্য প্রস্তুত হইল। সুজাকে নিদ্রা হইতে জাগাইবার জন্য



রাজা জয়সিংহ স্বয়ং বন্দীশালায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সুজা তখনো শয্যা হইতে উঠেন নাই। কাছে গিয়া স্পর্শ করিলেন। দেখিলেন, সুজা নহে, তাঁহার বস্ত্র পড়িয়া আছে। সুজা নাই। ঘরের মেঝের মধ্যে সুরঙ্গ গহ্বর, তাহার প্রস্তর-আবরণ উন্মুক্ত পড়িয়া আছে।

বন্দীর পলায়নবার্তা দুর্গে রাষ্ট্র হইল। সন্ধানের জন্য চারি দিকে লোক ছুটিল। রাজা বিক্রমসিংহের শির নত হইল। বন্দী কিরূপে পালাইল তাহার বিচারের জন্য সভা বসিল।

খুড়াসাহেবের সেই গর্বিত সহর্ষ ভাব কোথায় গেল! তিনি পাগলের মতো 'ব্রাহ্মণ কোথায়' 'ব্রাহ্মণ কোথায়' করিয়া রঘুপতিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। ব্রাহ্মণ কোথাও নাই। পাগড়ি খুলিয়া খুড়াসাহেব কিছুকাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। সুচেতসিংহ পাশে আসিয়া বসিলেন; কহিলেন, "খুড়াসাহেব, কী আশ্চর্য কারখানা! একি সমস্ত ভূতের কাণ্ড?"

খুড়াসাহেব বিষণ্নভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "না, এ ভূতের কাণ্ড নয় সুচেতসিংহ! এ একজন নিতান্ত নির্বোধ বৃদ্ধের কাণ্ড ও আর-একজন বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ডের কাজ।"

সুচেতসিংহ আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "তুমি যদি তাহাদের জানই তবে তাহাদের গ্রেফতার করিয়া দাও-না কেন!"

খড়াসাহেব কহিলেন, "তাহাদের মধ্যে একজন পালাইয়াছে। আর-একজনকে গ্রেফ্‌তার করিয়া রাজসভায় লইয়া যাইতেছি।" বলিয়া পাগড়ি পরিলেন ও রাজসভার বেশ ধারণ করিলেন।

সভায় তখন প্রহরীদের সাক্ষ্য লওয়া হইতেছিল। খুড়াসাহেব নতশিরে সভায় প্রবেশ করিলেন। বিক্রমসিংহের পদতলে তলোয়ার খুলিয়া রাখিয়া কহিলেন, "আমাকে বন্দী করিতে আদেশ করুন, আমি অপরাধী।"

রাজা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "খুড়াসাহেব, ব্যাপার কী?"

খুড়াসাহেব কহিলেন, "সেই ব্রাহ্মণ। এ সমস্ত সেই বাঙালি ব্রাহ্মণের কাজ।"

রাজা জয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

খুড়াসাহেব কহিলেন, "আমি বিজয়গড়ের বৃদ্ধ খুড়াসাহেব।"

জয়সিংহ। তুমি কী করিয়াছ?

খুড়াসাহেব। আমি বিজয়গড়ের সন্ধান ভেদ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছি। আমি নিতান্ত নির্বোধের মতো বিশ্বাস করিয়া বাঙালি ব্রাহ্মণকে সুরঙ্গপথের কথা বলিয়াছিলাম—

বিক্রমসিংহ সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, "খড়্গসিং!"

খুড়াসাহেব চমকিয়া উঠিলেন; তিনি প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার নাম খড়্গসিং।

বিক্রমসিংহ কহিলেন, "খড়্গসিং, এত দিন পরে তুমি কি আবার শিশু হইয়াছ!"

খুড়াসাহেব নতশিরে চুপ করিয়া রহিলেন।

বিক্রমসিংহ। খুড়াসাহেব, তুমি এই কাজ করিলে! তোমার হাতে আজ বিজয়গড়ের অপমান হইল।

খুড়াসাহেব চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার হাত থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কম্পিত হস্তে কপাল স্পর্শ করিয়া মনে মনে কহিলেন 'অদৃষ্ট'!

বিক্রমসিংহ কহিলেন, "আমার দুর্গ হইতে দিল্লীশ্বরের শত্রু পলায়ন করিল!—জান, তুমি আমাকে দিল্লীশ্বরের নিকটে অপরাধী করিয়াছ!"

খুড়াসাহেব কহিলেন, "আমিই একা অপরাধী। মহারাজ অপরাধী এ কথা দিল্লীশ্বর বিশ্বাস করিবেন না।"

বিক্রমসিংহ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি কে! তোমার খবর দিল্লীশ্বর কী রাখেন! তুমি তো আমারই লোক। এ যেন আমি নিজের হাতে বন্দীর বন্ধন মোচন করিয়া দিয়াছি।"

খুড়াসাহেব নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তিনি চোখের জল আর সামলাইতে পারিলেন না।

বিক্রমসিংহ কহিলেন, "তোমাকে কী দণ্ড দিব?"

খুড়াসাহেব। মহারাজের যেমন ইচ্ছা।

বিক্রমসিংহ। তুমি বুড়ামানুষ, তোমাকে অধিক আর কী দণ্ড দিব—নির্বাসনদণ্ডই তোমার পক্ষে যথেষ্ট।

খুড়োসাহেব বিক্রমসিংহের পা জড়াইয়া ধরিলেন; কহিলেন, "বিজয়গড় হইতে নির্বাসন! না মহারাজ—আমি বৃদ্ধ, আমার মতিভ্রম হইয়াছিল। আমাকে বিজয়গড়েই মরিতে দিন। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ করিয়া দিন। এই বুড়া বয়সে শেয়াল-কুকুরের মতো আমাকে বিজয়গড় হইতে খেদাইয়া দিবেন না।"

রাজা জয়সিংহ কহিলেন, "মহারাজ, আমার অনুরোধে ইহার অপরাধ মার্জনা করুন। আমি সম্রাট্‌কে সমস্ত অবস্থা অবগত করিব।"

খুড়াসাহেবের মার্জনা হইল। সভা হইতে বাহির হইবার সময় খুড়াসাহেব কাঁপিয়া পড়িয়া গেলেন। সেদিন হইতে খুড়াসাহেবকে আর বড়ো একটা দেখা যাইত না, তিনি ঘর হইতে বাহির হইতেন না। তাঁহার মেরুদণ্ড যেন ভাঙিয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

গুজুরপাড়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে ক্ষুদ্র গ্রাম। একজন ক্ষুদ্র জমিদার আছেন, নাম পীতাম্বর রায়—বাসিন্দা অধিক নাই। পীতাম্বর আপনার পুরাতন চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আপনাকে রাজা বলিয়া থাকেন। তাঁহার প্রজারাও তাঁহাকে রাজা বলিয়া থাকেন। তাঁহার রাজমহিমা এই আম্র-পিয়ালবন-বেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রামটুকুর মধ্যেই বিরাজমান। তাঁহার যশ এই গ্রামের নিকুঞ্জগুলির মধ্যে ধ্বনিত হইয়া এই গ্রামের সীমানার মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। জগতের বড়ো বড়ো রাজাধিরাজের প্রখর প্রতাপ এই ছায়াময় নীড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না। কেবল তীর্থস্থানের উদ্দেশে নদীতীরে ত্রিপুরার রাজাদের এক বৃহৎ প্রাসাদ আছে, কিন্তু অনেক কাল হইতে রাজা কেহ স্নানে আসেন নাই, সুতরাং ত্রিপুরার রাজার সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট জনশ্রুতি

প্রচলিত আছে মাত্র।

একদিন ভাদ্রমাসের দিনে গ্রামে সংবাদ আসিল, ত্রিপুরার এক রাজকুমার নদীতীরে পুরাতন প্রাসাদে বাস করিতে আসিতেছেন। কিছু দিন পরে বিস্তর পাগড়িবাঁধা লোক আসিয়া প্রাসাদে ভারি ধুম লাগাইয়া দিল। তাহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে হাতি-ঘোড়া লোক-লস্কর লইয়া স্বয়ং নক্ষত্ররায় গুজুরপাড়া গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমারোহ দেখিয়া গ্রামবাসীদের মুখে রা সরিল না। পীতাম্বরকে এতদিন ভারী রাজা বলিয়া মনে হইত; কিন্তু আজ আর তাহা কাহারো মনে হইল না—নক্ষত্ররায়কে দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিল, "হাঁ, রাজপুত্র এইরকমই হয় বটে।"

এইরূপে পীতাম্বর তাঁহার পাকা দালান ও চণ্ডীমণ্ডপ-সুদ্ধ একেবারে লুপ্ত হইয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। নক্ষত্ররায়কে তিনি এমনি রাজা বলিয়া অনুভব করিলেন যে, নিজের ক্ষুদ্র রাজমহিমা নক্ষত্ররায়ের চরণে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া তিনি পরম সুখী হইলেন। নক্ষত্ররায় কদাচিৎ হাতি চড়িয়া বাহির হইলে পীতাম্বর আপনার প্রজাদের ডাকিয়া বলিতেন, "রাজা দেখেছিস? ওই দেখ্, রাজা দেখ্।" মাছ-তরকারি আহার্যদ্রব্য উপহার লইয়া পীতাম্বর প্রতিদিন নক্ষত্ররায়কে দেখিতে আসিতেন—নক্ষত্ররায়ের তরুণ সুন্দর মুখ দেখিয়া পীতাম্বরের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। নক্ষত্ররায়ই গ্রামের রাজা হইয়া উঠিলেন। পীতাম্বর প্রজাদের মধ্যে গিয়া ভর্তি হইলেন।

প্রতিদিন তিন বেলা নহবত বাজিতে লাগিল, গ্রামের পথে হাতি-ঘোড়া চলিতে লাগিল, রাজদ্বারে মুক্ত তরবারির বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল, হাটবাজার বসিয়া গেল। পীতাম্বর এবং তাঁহার প্রজারা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। নক্ষত্র রায় এই নির্বাসনের রাজা হইয়া উঠিয়া সমস্ত দুঃখ ভুলিলেন। এখানে রাজত্বের ভার কিছুমাত্র নাই, অথচ রাজত্বের সুখ সম্পূর্ণ আছে। এখানে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বদেশে তাঁহার এত প্রবল প্রতাপ ছিল না। তাহা ছাড়া এখানে রঘুপতির ছায়া নাই। মনের উল্লাসে নক্ষত্ররায় বিলাসে মগ্ন হইলেন। ঢাকা নগরী হতে নটনটী আসিল, নৃত্যগীতবাদ্যে নক্ষত্ররায়ের তিলেক অরুচি নাই।

নক্ষত্ররায় ত্রিপুরার রাজ অনুষ্ঠান সমস্তই অবলম্বন করিলেন। ভৃত্যদের মধ্যে কাহারো নাম রাখিলেন মন্ত্রী, কাহারো নাম রাখিলেন সেনাপতি, পীতাম্বর দেওয়ানজি নামে চলিত হইলেন। রীতিমত রাজদরবারে বসিয়া নক্ষত্ররায় পরম আড়ম্বরে বিচার করিতেন। নকুড় আসিয়া নালিশ করিল, "মথুর আমায় 'কুত্তো' কয়েছে।" তাহার বিধিমত বিচার বসিল। বিবিধ প্রমাণ-সংগ্রহের পর মথুর দোষী সাব্যস্ত হইলে নক্ষত্ররায় পরম গম্ভীরভাবে বিচারাসন হইতে আদেশ করিলেন—নকুড় মথুরকে দুই কানমলা দেও। এইরূপে সুখে সময় কাটিতে লাগিল। এক-একদিন হাতে নিতান্ত কাজ না থাকিলে সৃষ্টিছাড়া একটা কোনো নূতন আমোদ উদ্‌ভাবনের জন্য মন্ত্রীকে তলব পড়িত। মন্ত্রী রাজসভাসদ্‌দিগকে সমবেত করিয়া নিতান্ত উদ্‌বিগ্ন ব্যাকুল ভাবে নূতন খেলা বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, গভীর চিন্তা ও পরামর্শের অবধি থাকিত না। একদিন সৈন্যসামন্ত লইয়া পীতাম্বরের চণ্ডীমণ্ডপ আক্রমণ করা হইয়াছিল, এবং তাঁহার পুকুর

হইতে মাছ ও তাঁহার বাগান হইতে ডাব ও পালংশাক লুঠের দ্রব্যের স্বরূপ অত্যন্ত ধুম করিয়া বাদ্য বাজাইয়া প্রাসাদে আনা হইয়াছিল। এইরূপ খেলাতে নক্ষত্ররায়ের প্রতি পীতাম্বরের স্নেহ আরো গাঢ় হইত।

আজ প্রাসাদে বিড়াল-শাবকের বিবাহ। নক্ষত্ররায়ের একটি শিশু বিড়ালী ছিল, তাহার সহিত মণ্ডলদের বিড়ালের বিবাহ হইবে। চুড়োমণি ঘটক ঘটকালির স্বরূপ তিন শত টাকা ও একটা শাল পাইয়াছে। গায়ে-হলুদ প্রভৃতি সমস্ত উপক্রমণিকা হইয়া গিয়াছে। আজ শুভ লগ্নে সন্ধ্যার সময় বিবাহ হইবে। এ কয়দিন রাজবাটীতে কাহারো তিলার্ধ অবসর নাই।

সন্ধ্যার সময় পথঘাট আলোকিত হইল, নহবত বসিল। মণ্ডলদের বাড়ি হইতে চতুর্দোলায় চড়িয়া কিংখাবের বেশ পরিয়া পাত্র অতি কাতরস্বরে মিউ মিউ করিতে করিতে যাত্রা করিয়াছে। মণ্ডলদের বাড়ির ছোটো ছেলেটি মিতবরের মতো তাহার গলার দড়িটি ধরিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। উলু-শঙ্খধ্বনির মধ্যে পাত্র সভাস্থ হইল।

পুরোহিতের নাম কেনারাম, কিন্তু নক্ষত্ররায় তাহার নাম রাখিয়াছিলেন রঘুপতি। নক্ষত্ররায় আসল রঘুপতিকে ভয় করিতেন, এইজন্য নকল রঘুপতিকে লইয়া খেলা করিয়া সুখী হইতেন। এমন-কি কথায় কথায় তাহাকে উৎপীড়ন করিতেন; গরিব কেনারাম সমস্ত নীরবে সহ্য করিত। আজ দৈবদুর্বিপাকে কেনারাম সভায় অনুপস্থিত—তাহার ছেলেটি জ্বরবিকারে মরিতেছে।

নক্ষত্ররায় অধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রঘুপতি কোথায়?"

ভৃত্য বলিল, "তাঁহার বাড়িতে ব্যামো।"

নক্ষত্ররায় দ্বিগুণ হাঁকিয়া বলিলেন, "বোলাও উস্‌কো।"

লোক ছুটিল। ততক্ষণ রোরুদ্যমান বিড়ালের সমক্ষে নাচগান চলিতে লাগিল।

নক্ষত্ররায় বলিলেন, "সাহানা গাও।" সাহানা গান আরম্ভ হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভৃত্য আসিয়া নিবেদন করিল, "রঘুপতি আসিয়াছেন।"

নক্ষত্ররায় সরোষে বলিলেন, "বোলাও।"

তৎক্ষণাৎ পুরোহিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। পুরোহিতকে দেখিয়াই নক্ষত্ররায়ের ভ্রুকুটি কোথায় মিলাইয়া গেল, তাঁহার সম্পূর্ণ ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, কপালে ঘর্ম দেখা দিল। সাহানা-গান সারঙ্গ ও মৃদঙ্গ সহসা বন্ধ হইল, কেবল বিড়ালের মিউ-মিউ ধ্বনি নিস্তব্ধ ঘরে দ্বিগুণ জাগিয়া উঠিল।

এ রঘুপতিই বটে। তাহার আর সন্দেহ নাই। দীর্ঘ, শীর্ণ, তেজস্বী, বহুদিনের ক্ষুধিত কুকুরের মতো চক্ষু-দুটো জ্বলিতেছে। ধুলায় পরিপূর্ণ দুই পা তিনি কিংখাব-মছলন্দের উপর স্থাপন করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "নক্ষত্ররায়!"

নক্ষত্ররায় চুপ করিয়া রহিলেন।

রঘুপতি বলিলেন, "তুমি রঘুপতিকে ডাকিয়াছ। আমি আসিয়াছি।"

নক্ষত্ররায় অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন, "ঠাকুর—ঠাকুর!"

রঘুপতি কহিলেন, "উঠিয়া এসো।"

নক্ষত্ররায় ধীরে ধীরে সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। বিড়ালের বিয়ে সাহানা এবং সারঙ্গ একেবারে বন্ধ হইল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

রঘুপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কী হইতেছিল?"

নক্ষত্ররায় মাথা চুলকাইয়া কহিলেন, "নাচ হইতেছিল।"

রঘুপতি ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া কহিলেন, "ছি ছি!"

নক্ষত্ররায় অপরাধীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "কাল এখান হইতে যাত্রা করিতে হইবে। তাহার উদ্যোগ করো।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "কোথায় যাইতে হইবে?"

রঘুপতি। সে কথা পরে হইবে। আপাতত আমার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়ো।

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আমি এখানে বেশ আছি।"

রঘুপতি। 'বেশ আছি'! তুমি রাজবংশে জন্মিয়াছ, তোমার পূর্বপুরুষেরা সকলে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তুমি কিনা আজ এই বনগাঁয়ে শেয়াল-রাজা হইয়া বসিয়াছ আর বলিতেছ 'বেশ আছি'!

রঘুপতি তীব্র বাক্যে ও তীক্ষ্ণ কটাক্ষে প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, নক্ষত্ররায় ভালো নাই। নক্ষত্ররায়ও রঘুপতির মুখের তেজে কতকটা সেইরকমই বুঝিলেন। তিন বলিলেন, "বেশ আর কী এমন আছি! কিন্তু আর কী করিব? উপায় কী আছে?"

রঘুপতি। উপায় ঢের আছে, উপায়ের অভাব নাই। আমি তোমাকে উপায় দেখাইয়া দিব—তুমি আমার সঙ্গে চলো।

নক্ষত্ররায়। একবার দেওয়ানজিকে জিজ্ঞাসা করি।

রঘুপতি। না।

নক্ষত্ররায়। আমার এই-সব জিনিসপত্র—

রঘুপতি। কিছু আবশ্যক নাই।

নক্ষত্ররায়। লোকজন—

রঘুপতি। দরকার নাই।

নক্ষত্ররায়। আমার হাতে এখন যথেষ্ট নগদ টাকা নাই।

রঘুপতি। আমার আছে। আর অধিক ওজর আপত্তি করিয়ো না— আজ শয়ন করিতে যাও, কাল প্রাতঃকালেই যাত্রা করিতে হইবে।

বলিয়া রঘুপতি কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার পরদিন ভোরে নক্ষত্ররায় উঠিয়াছেন। তখন বন্দীরা ললিত রাগিণীতে মধুর গান

গাহিতেছে। নক্ষত্ররায় বহির্ভবনে আসিয়া জানালা হইতে বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন। পূর্বতীরে সূর্যোদয় হইতেছে, অরুণরেখা দেখা দিয়াছে। উভয় তীরের ঘন তরুস্রোতের মধ্য দিয়া, ছোটো ছোটো নিদ্রিত গ্রামগুলির দ্বারের কাছ দিয়া, ব্রহ্মপুত্র তাহার বিপুল জলরাশি লইয়া অবাধে বহিয়া যাইতেছে। প্রাসাদের জানালা হইতে নদীতীরের একটি ছোটো কুটির দেখা যাইতেছে। একটি মেয়ে প্রাঙ্গণ ঝাঁট দিতেছে—একজন পুরুষ তাহার সঙ্গে দুই-একটা কথা কহিয়া, মাথায় চাদর বাঁধিয়া একটা বড়ো বাঁশের লাঠির অগ্রভাগে পুঁটুলি বাঁধিয়া, নিশ্চিন্ত মনে কোথায় বাহির হইল। শ্যামা ও দোয়েল শিস্ দিতেছে, বেনে-বউ বড়ো কাঁঠাল গাছের ঘন পল্লবের মধ্যে বসিয়া গান গাহিতেচে। বাতায়নে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া নক্ষত্ররায়ের হৃদয় হইতে এক গভীর দীর্ঘনিশ্বাস উঠিল, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে রঘুপতি আসিয়া নক্ষত্ররায়কে স্পর্শ করিলেন। নক্ষত্ররায় চমকিয়া উঠিলেন। রঘুপতি মৃদুগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "যাত্রার সমস্ত প্রস্তুত।"

নক্ষত্ররায় জোড়হাতে অত্যন্ত কাতর স্বরে কহিলেন, "ঠাকুর, আমাকে মাপ করো ঠাকুর, আমি কোথাও যাইতে চাহি না। আমি এখানে বেশ আছি।"

রঘুপতি একটি কথা না বলিয়া নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে তাঁহার অগ্নিদৃষ্টি রাখিলেন। নক্ষত্ররায় চোখ নামাইয়া কহিলেন, "কোথায় যাইতে হইবে?"

রঘুপতি। সে কথা এখন হইতে পারে না।

নক্ষত্র। দাদার বিরুদ্ধে আমি কোনো চক্রান্ত করিতে পারিব না।

রঘুপতি জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, "দাদা তোমার কী মহৎ উপকারটা করিয়াছেন শুনি!"

নক্ষত্র মুখ ফিরাইয়া, জানালার উপর আঁচড় কাটিয়া বলিলেন, "আমি জানি, তিনি আমাকে ভালোবাসেন।"

রঘুপতি তীব্র শুষ্ক হাস্যের সহিত কহিলেন, "হরি হরি! কী প্রেম! তাই বুঝি নির্বিঘ্নে ধ্রুবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য মিছা ছুতা করিয়া দাদা তোমাকে রাজ্য হইতে তাড়াইলেন—পাছে রাজ্যের গুরুভারে ননির পুতলি স্নেহের ভাই কখনো ব্যথিত হইয়া পড়ে। সে রাজ্যে আর কি কখনো সহজে প্রবশে করিতে পারিবে? নির্বোধ!"

নক্ষত্ররায় তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আমি কি এই সমান্য কথাটা আর বুঝি না? আমি সমস্তই বুঝি—কিন্তু আমি কী করিব বলো ঠাকুর, উপায় কি?"

রঘুপতি। সেই উপায়ের কথাই তো হইতেছে। সেইজন্যই তো আসিয়াছি। ইচ্ছা হয় তো আমার সঙ্গে চলিয়া আইস, নয় তো এই বাঁশবনের মধ্যে বসিয়া বসিয়া তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী দাদার ধ্যান করো। আমি চলিলাম।

বলিয়া রঘুপতির প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। নক্ষত্ররায় তাড়াতাড়ি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া কহিলেন, "আমিও যাইব ঠাকুর, কিন্তু দেওয়ানজি যদি যাইতে চান তাহাকে আমাদের সঙ্গে লইয়া যাইতে কি আপত্তি আছে?"

রঘুপতি কহিলেন, "আমি ছাড়া আর কেহ সঙ্গে যাইবে না।"

বাড়ি ছাড়িয়া নক্ষত্ররায়ের পা সরিতে চায় না। এই সমস্ত সুখের খেলা ছাড়িয়া, দেওয়ানজিকে ছাড়িয়া, রঘুপতির সঙ্গে একলা কোথায় যাইতে হইবে! কিন্তু রঘুপতি যেন তাঁহার কেশ ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। তাহা ছাড়া নক্ষত্ররায়ের মনে একপ্রকার ভয়মিশ্রিত কৌতুহলও জন্মিতে লাগিল। তাহারো একটা ভীষণ আকর্ষণ আছে।

নৌকা প্রস্তুত আছে। নদীতীরে উপস্থিত হইয়া নক্ষত্ররায় দেখিলেন, কাঁধে গামছা ফেলিয়া পীতাম্বর স্নান করিতে আসিতেছেন। নক্ষত্রকে দেখিয়াই পীতাম্বর হাস্যবিকশিত মুখে কহিলেন, "জয়োস্তু মহারাজ, শুনিলাম নাকি কাল কোথা হইতে এক অলক্ষণমন্ত বিটল ব্রাহ্মণ আসিয়া শুভবিবাহের ব্যাঘাত করিয়াছে।"

নক্ষত্ররায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। রঘুপতি গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "আমিই সেই বিটল ব্রাহ্মণ।"

পীতাম্বর হাসিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "তবে তো আপনার সাক্ষাতে আপনার বর্ণনা করাটা ভালো হয় নাই। জানিলে কোন্ পিতার পুত্র এমন কাজ করিত! কিছু মনে করিবেন না ঠাকুর, অসাক্ষাতে লোকে কী না বলে? আমাকে যাহারা সম্মুখে বলে রাজা, তাহারা আড়ালে বলে পিতু। মুখের সমানে কিছু না বলিলেই হইল, আমি তো এই বুঝি। আসল কথা কী জানেন, আপনার মুখটা কেমন ভারি অপ্রসন্ন দেখাইতেছে, কাহারো এমন মুখের ভাব দেখিলে লোকে তাহার নামে নিন্দা রটায়।—মহারাজ, এত প্রাতে যে নদীতীরে?"

নক্ষত্ররায় কিছু করুণ স্বরে কহিলেন, "আমি যে চলিলাম দেওয়ানজি!"

পীতাম্বর। চলিলেন! কোথায়? ন-পাড়ায় মণ্ডলদের বাড়ি?

নক্ষত্ররায়। না দেওয়ানজি, মণ্ডলদের বাড়ি নয়। অনেক দূর।

পীতাম্বর। অনেক দূর! তবে কি পাইকঘাটায় শিকারে যাইতেছেন?

নক্ষত্ররায় একবার রঘুপতির মুখের দিকে চাহিয়া কেবল বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "বেলা বহিয়া যায়, নৌকায় উঠা হউক।"

পীতাম্বর অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ও ক্রুদ্ধ ভাবে ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিলেন; কহিলেন, "তুমি কে হে ঠাকুর? আমাদের মহারাজকে হুকুম করিতে আসিয়াছ!"

নক্ষত্র ব্যস্ত হইয়া পীতাম্বরকে এক পাশে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "উনি আমাদের গুরুঠাকুর।"

পীতাম্বর বলিয়া উঠিলেন, "হোক-না গুরুঠাকুর। উনি আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে থাকুন, চাল-কলা বরাদ্দ করিয়া দিব, সমাদরে থাকিবেন— মহারাজকে উঁহার কিসের আবশ্যক?"

রঘুপতি। বৃথা সময় নষ্ট হইতেছে—আমি তবে চলিলাম।

পীতাম্বর। যে আজ্ঞে, বিলম্বে ফল কী, মশায় চট্‌পট্ সরিয়া পড়ুন। মহারাজকে লইয়া আমি প্রাসাদে যাইতেছি।

নক্ষত্ররায় একবার রঘুপতির মুখের দিকে চাহিয়া, একবার পীতাম্বরের মুখের দিকে চাহিয়া, মৃদুস্বরে কহিলেন, "না দেওয়ানজি, আমি যাই।"

পীতাম্বর। তবে আমিও যাই, লোকজন সঙ্গে লউন। রাজার মতো চলুন। রাজা যাইবেন,

সঙ্গে দেওয়ানজি যাইবে না?

নক্ষত্ররায় কেবল রঘুপতির মুখের দিকে চাহিলেন। রঘুপতি কহিলেন, "কেহ সঙ্গে যাইবে না।"

পীতাম্বর উগ্র হইয়া কহিলেন, "দেখো ঠাকুর, তুমি—"

নক্ষত্ররায় তাঁহাকে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, "দেওয়ানজি, আমি যাই, দেরি হইতেছে।"

পীতাম্বর ম্লান হইয়া নক্ষত্রের হাত ধরিয়া কহিলেন, "দেখো বাবা, আমি তোমাকে রাজা বলি, কিন্তু আমি তোমাকে সন্তানের মতো ভালোবাসি—আমার সন্তান কেহ নাই। তোমার উপর আমার জোর খাটে না। তুমি চলিয়া যাইতেছ; আমি জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারি না। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ এই আছে, যেখানেই যাও আমি মরিবার আগে ফিরিয়া আসিতে হইবে। আমি স্বহস্তে আমার রাজত্ব সমস্ত তোমার হাতে দিয়া যাইব, আমার এই একটি সাধ আছে।"

নক্ষত্ররায় ও রঘুপতি নৌকায় উঠিলেন। নৌকা দক্ষিণমুখে চলিয়া গেল। পীতাম্বর স্নান ভুলিয়া, গামছা কাঁধে অন্যমনস্কে বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। গুজুরপাড়া যেন শূন্য হইয়া গেল; তাহার আমোদ-উৎসব সমস্ত অবসান। কেবল প্রতিদিন প্রকৃতির নিত্য উৎসব। প্রাতে পাখির গান, পল্লবের মর্মরধ্বনি ও নদীতরঙ্গের করতালির বিরাম নাই।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

দীর্ঘ পথ। কোথাও বা নদী, কোথাও বা ঘন অরণ্য, কোথাও বা ছায়াহীন প্রান্তর—কখনো বা নৌকায়, কখনো বা পদব্রজে, কখনো বা টাটু ঘোড়ায়—কখনো রৌদ্র, কখনো বৃষ্টি, কখনো কোলাহলময় দিন, কখনো নিশীথিনীর নিস্তব্ধ অন্ধকার—নক্ষত্ররায় অবিশ্রাম চলিয়াছেন। কত দেশ, কত বিচিত্র দৃশ্য, কত বিচিত্র লোক—কিন্তু নক্ষত্ররায়ের পার্শ্বে ছায়ার ন্যায় ক্ষীণ, রৌদ্রের ন্যায় দীপ্ত সেই একমাত্র রঘুপতি অবিশ্রাম লাগিয়া আছেন। দিনে রঘুপতি, রাত্রে রঘুপতি, স্বপ্নেও রঘুপতি বিরাজ করেন। পথে পথিকেরা যাতায়াত করিতেছে, পথপার্শ্বে ধুলায় ছেলেরা খেলা করিতেছে, হাটে শত শত লোক কেনাবেচা করিতেছে, গ্রামে বৃদ্ধেরা পাশা খেলিতেছে, ঘাটে মেয়েরা জল তুলিতেছে, নৌকায় মাঝিরা গান গাহিয়া চলিয়াছে—কিন্তু নক্ষত্ররায়ের পার্শ্বে এক শীর্ণ রঘুপতি সর্বদা জাগিয়া আছে। জগতে চারি দিকে বিচিত্র খেলা হইতেছে, বিচিত্র ঘটনা ঘটিতেছে—কিন্তু এই রঙ্গভূমির বিচিত্রলীলার মাঝখান দিয়া নক্ষত্ররায়ের দুরদৃষ্ট তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে—সজন তাঁহার পক্ষে বিজন, লোকালয় কেবল শূন্য মরুভূমি।

নক্ষত্ররায় শ্রান্ত হইয়া তাঁহার পার্শ্ববর্তী ছায়াকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আর কত দূর যাইতে হইবে?'

ছায়া উত্তর করে, 'অনেক দূর।'

'কোথায় যাইতে হইবে?'

তাহার উত্তর নাই। নক্ষত্ররায় নিশ্বাস ফেলিয়া চলিতে থাকেন। তরুশ্রেণীর মধ্যে পাতা দিয়া ছাওয়া নিভৃত পরিচ্ছন্ন কুটির দেখিলে তাঁহার মনে হয়, 'আমি যদি এই কুটিরের অধিবাসী হইতাম।' গোধূলির সময় যখন রাখাল লাঠি কাঁধে করিয়া, মাঠ দিয়া, গ্রামপথ দিয়া ধুলা উড়াইয়া গোরু-বাছুর লইয়া চলে, নক্ষত্ররায়ের মনে হয়, 'আমি যদি ইহার সঙ্গে যাইতে পারিতাম, সন্ধ্যাবেলায় গৃহে গিয়া বিশ্রাম করিতে পাইতাম!' মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড রৌদ্রে চাষী চাষ করিতেছে, তাহাকে দেখিয়া নক্ষত্ররায় মনে করেন, 'আহা, এ কী সুখী!'

পথকষ্টে নক্ষত্ররায় বিবর্ণ শীর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছেন—রঘুপতিকে বলেন, 'ঠাকুর, আমি আর বাঁচিব না।'

রঘুপতি বলেন, 'এখন তোমাকে মরিতে দিবে কে?'

নক্ষত্ররায়ের মনে হইল, রঘুপতি অবকাশ না দিলে তাঁহার মরিবারও সুবিধা নাই। একজন স্ত্রীলোক নক্ষত্ররায়কে দেখিয়া বলিয়াছিল, 'আহা, কাদের ছেলে গো। একে পথে কে বাহির করিয়াছে?' শুনিয়া নক্ষত্ররায়ের প্রাণ গলিয়া গেল, তাঁহার চোখে জল আসিল, তাঁহার ইচ্ছা করিল সেই স্ত্রীলেকাটিকে মা বলিয়া তাহার সঙ্গে তাহার ঘরে চলিয়া যান।

কিন্তু নক্ষত্ররায় রঘুপতির হাতে যতই কষ্ট পাইতে লাগিলেন রঘুপতির ততই বশ হইতে লাগিলেন; রঘুপতির অঙ্গুলির ইঙ্গিতে তাঁহার সমস্ত অস্তিত্ব পরিচালিত হইতে লাগিল।

চলিতে চলিতে ক্রমে নদীর বাহুল্য কমিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে ভূমি দৃঢ় হইয়া আসিল। মৃত্তিকা লোহিতবর্ণ, কঙ্করময়; লোকালয় দূরে দূরে স্থাপিত; গাছপালা বিরল—নারিকেলবনের দেশ ছাড়িয়া দুই পথিক তালবনের দেশে আসিয়া পড়িলেন। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো বাঁধ, শুষ্ক নদীর পথ; দূরে মেঘের মতো পাহাড় দেখা যাইতেছে। ক্রমে শাসুজার রাজধানী রাজমহল নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

অবশেষে রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরাজয় ও পলায়নের পরে সুজা নূতন সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন—— কিন্তু রাজকোষে অধিক অর্থ নাই। প্রজাগণ করভারে পীড়িত। ইতিমধ্যে দারাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছেন সুজা এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। কিন্তু সৈন্যসামন্ত কিছুই প্রস্তুত ছিল না—এইজন্য কিছু সময় হাতে পাইবার আশায় তিনি ছল করিয়া ঔরঙ্গ-জেবের নিকট এক দূত পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া পাঠাইলেন যে, নয়নের জ্যোতি, হৃদয়ের আনন্দ, পরমস্নেহাস্পদ প্রিয়তম ভ্রাতা ঔরঙ্গজেব সিংহাসনলাভে কৃতকার্য হইয়াছেন, ইহাতে সুজা মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন—এক্ষণে সুজার বাংলা-শাসনভার নূতন সম্রাট মঞ্জুর করিলেই আনন্দের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। ঔরঙ্গজেব অত্যন্ত সমাদরের সহিত দূতকে আহ্বান করিলেন। সুজার শরীরমনের স্বাস্থ্য এবং

সুজার পরিবারের মঙ্গল-সংবাদ জানিবার জন্য সবিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন— যখন স্বয়ং সম্রাট শাজাহান সুজাকে বাংলার শাসনকার্যে নিয়োগ করিয়াছেন তখন আর দ্বিতীয় মঞ্জুরী-পত্রের কোনো আবশ্যক নাই।

এই সময় রঘুপতি সুজার সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুজা কৃতজ্ঞতা ও সমাদরের সহিত তাঁহার উদ্ধারকর্তাকে আহ্বান করিলেন। বলিলেন, "খবর কী?"

রঘুপতি বলিলেন, "বাদশাহের কাছে কিছু নিবেদন আছে।"

সুজা মনে মনে ভাবিলেন, 'নিবেদন আবার কিসের? কিছু অর্থ চাহিয়া না বসিলে বাঁচি।'

রঘুপতি কহিলেন, "আমার প্রার্থনা এই যে—"

সুজা কহিলেন, "ব্রাহ্মণ, তোমার প্রার্থনা আমি নিশ্চয় পূরণ করিব। কিন্তু কিছুদিন সবুর করো। এখন রাজকোষে অধিক অর্থ নাই।"

রঘুপতি কহিলেন, "শাহেনশা, রুপা সোনা বা আর কোনো ধাতু চাহি না, আমি এখন শাণিত ইস্পাত চাই। আমার নালিশ শুনুন, আমি বিচার প্রার্থনা করি।"

সুজা কহিলেন, "ভারি মুশকিল! এখন আমার বিচার করিবার সময় নহে। ব্রাহ্মণ, তুমি বড়ো অসময়ে আসিয়াছ।"

রঘুপতি কহিলেন, "শাহজাদা, সময়-অসময় সকলেরই আছে। আপনি বাদশাহ আপনারও আছে, এবং আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমারও আছে। আপনার সময়মত আপনি বিচার করিতে বসিলে আমার সময় থাকে কোথা?"

সুজা হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "ভারি হাঙ্গাম! এত কথা শোনার চেয়ে তোমার নালিশ শোনা ভালো। বলিয়া যাও।"

রঘুপতি কহিলেন, "ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে বিনা অপরাধে নির্বাসিত করিয়াছেন—"

সুজা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি পরের নালিশ লইয়া কেন আমার সময় নষ্ট করিতেছ? এখন এ-সমস্ত বিচার করিবার সময় নয়।"

রঘুপতি কহিলেন, "ফরিয়াদি রাজধানীতে হাজির আছেন।"

সুজা কহিলেন, "তিনি আপনি উপস্থিত থাকিয়া আপনার মুখে যখন নালিশ উত্থাপন করিবেন তখন বিবেচনা করা যাইব।"

রঘুপতি কহিলেন, "তাঁহাকে কবে এখানে হাজির করিব?"

সুজা কহিলেন, "ব্রাহ্মণ কিছুতেই ছাড়ে না! আচ্ছা, এক সপ্তাহ পরে আনিয়ো।"

রঘুপতি কহিলেন, "বাদশাহ যদি হুকুম করেন তো আমি তাঁহাকে কাল আনিব।"

সুজা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, কালই আনিয়ো।"

আজিকার মতো নিষ্কৃতি পাইলেন। রঘুপতি বিদায় হইলেন।

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "নবাবের কাছে যাইব, কিন্তু নজরের জন্য কী লইব?"

রঘুপতি কহিলেন, 'সেজন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না।"

নজরের জন্য তিনি দেড় লক্ষ মুদ্রা উপস্থিত করিলেন।

পরদিন প্রভাতে রঘুপতি কম্পিত হৃদয় নক্ষত্ররায়কে লইয়া সুজার সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যখন দেড় লক্ষ টাকা নবাবের পদতলে স্থাপিত হইল তখন তাঁহার মুখশ্রী তেমন অপ্রসন্ন বোধ হইল না। নক্ষত্ররায়ের নালিশ অতি সহজেই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি কহিলেন, "এক্ষণে তোমাদের কী অভিপ্রায় আমাকে বলো।"

রঘুপতি কহিলেন, "গোবিন্দমাণিক্যকে নির্বাসিত করিয়া তাঁহার স্থলে নক্ষত্ররায়কে রাজা করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক।"

যদিও সুজা নিজের ভ্রাতার সিংহাসনে হস্তক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র সংকুচিত হন না, তথাপি এ স্থলে তাঁহার মনে কেমন আপত্তি উপস্থিত হইল। কিন্তু রঘুপতির প্রার্থনা পূরণ করাই তাঁহার আপাতত সকলের চেয়ে সহজ বোধ হইল—নহিলে রঘুপতি বিস্তর বকাবকি করিবে এই তাঁহার ভয়। বিশেষত দেড় লক্ষ টাকা নজরের উপরেও অধিক আপত্তি করা ভালো দেখায় না, এইরূপ তাঁহার মনে হইল। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, গোবিন্দমাণিক্যের নির্বাসন এবং নক্ষত্ররায়ের রাজ্যপ্রাপ্তির পরোয়ানা-পত্র তোমাদের সঙ্গে দিব, তোমরা লইয়া যাও।"

রঘুপতি কহিলেন, "বাদশাহের কতিপয় সৈন্যও সঙ্গে দিতে হইবে।"

সুজা দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "না, না, না—তাহা হইবে না, যুদ্ধবিগ্রহ করিতে পারিব না।"

রঘুপতি কহিলেন, "যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ আরো ছত্রিশ হাজার টাকা আমি রাখিয়া যাইতেছি। এবং ত্রিপুরায় রাজা হইবামাত্র এক বৎসরের খাজনা সেনাপতির হাত দিয়া পাঠাইয়া দিব।"

এই প্রস্তাব সুজার অতিশয় যুক্তিসংগত বোধ হইল, এবং আমাত্যেরাও তাঁহার সহিত একমত হইল। একদল মোগল সৈন্য সঙ্গে লইয়া রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় ত্রিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এই উপন্যাসের আরম্ভকাল হইতে এখন দুই বৎসর হইয়া গিয়াছে। ধ্রুব তখন দুই বৎসরের বালক ছিল, এখন তাহার বয়স চার বৎসর। এখন সে বিস্তর কথা শিখিয়াছে। এখন তিনি আপনাকে ভারি মস্ত লোক জ্ঞান করেন; সকল কথা যদিও স্পষ্ট বলিতে পারেন না, কিন্তু অত্যন্ত জোরের সহিত বলিয়া থাকেন। রাজাকে প্রায় তিনি 'পুতুল দেব' বলিয়া পরম প্রলোভন ও সান্ত্বনা দিয়া থাকেন, এবং রাজা যদি কোনো প্রকার দুষ্টুমির লক্ষণ প্রকাশ করেন তবে ধ্রুব তাঁকে 'ঘরে বন্দ করে রাখব' বলিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত করিয়া তুলেন। এইরূপে রাজা এখন বিশেষ শাসনে আছেন—ধ্রুবের অনভিমত কোনো কাজ করিতে তিনি বড়ো একটা ভরসা করেন না।

ইতিমধ্যে হঠাৎ ধ্রুবের একটি সঙ্গী জুটিয়া গেল। একটি প্রতিবেশীর মেয়ে, ধ্রুব অপেক্ষা ছয় মাসের ছোটো। মিনিট দশেকের ভিতরে উভয়ের মধ্যে চিরস্থায়ী ভাব হইয়া গেল। মাঝে একটুখানি মনান্তর হইবারও সম্ভাবনা হইয়াছিল। ধ্রুবের হাতে একটা বড়ো বাতাসা ছিল। প্রথম প্রণয়ের

উচ্ছ্বাসে ধ্রুব তাহার দুইটি ছোটো আঙুল দিয়া অতি সাবধানে ক্ষুদ্র একটু কণা ভাঙিয়া একেবারে তাহার সঙ্গিনীর মুখে পুরিয়া দিল ও পরম অনুগ্রহের সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "তুমি কাও।" সঙ্গিনী মিষ্ট পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়া কহিল, "আরো কাব।"

তখন ধ্রুব কিছু কাতর হইয়া পড়িল। বন্ধুত্বের উপরে এত অধিক দাবি ন্যায়সংগত বোধ হইল না; ধ্রুব তাহার স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য ও গৌরবের সহিত ঘাড় নাড়িয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "ছি—আর কেতে নেই—অছুক কোবে, বাবা মা'বে।" বলিয়াই অধিক বিলম্ব না করিয়া সমস্ত বাতাসাটা নিজের মুখের মধ্যে একেবারে পুরিয়া দিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। সহসা বালিকার মুখের মাংসপেশীর মধ্যে পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল; ওষ্ঠাধার ফুলিতে লাগিল, ভ্রূযুগ উপরে উঠিতে লাগিল, আসন্ন ক্রন্দনের সমস্ত লক্ষণ ব্যক্ত হইল।

ধ্রুব কাহারো ক্রন্দন সহিতে পারিত না, তাড়াতাড়ি সুগভীর সান্ত্বনার স্বরে কহিল, "কাল দেব।"

রাজা আসিবামাত্র ধ্রুব অত্যন্ত বিজ্ঞ হইয়া নূতন সঙ্গিনীর প্রতি নির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "একে কিছু বোলো না, এ কাঁদবে। ছি, মারতে নেই, ছি!"

রাজার কোনোপ্রকার দুরভিসন্ধি ছিল না সত্য, তথাপি গায়ে পড়িয়া রাজাকে সাবধান করিয়া দেওয়া ধ্রুব অত্যন্ত আবশ্যক বিবেচনা করিল। রাজা মেয়েটিকে মারিলেন না, ধ্রুব স্পষ্টই দেখিল তাহার উপদেশ নিষ্ফল নহে।

তার পরে ধ্রুব মুরুব্বির ভাব ধারণ করিয়া কোনোপ্রকার বিপদের আশঙ্কা নাই জানাইয়া মেয়েটিকে পরম গাম্ভীর্যের সহিত আশ্বাস দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

তাহারও কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না। কারণ, মেয়েটি আপনা হইতে নির্ভীকভাবে রাজার কাছে গিয়া অত্যন্ত কৌতূহল ও লোভের সহিত তাঁহার হাতের কঙ্কণ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

এইরূপে ধ্রুব কেবলমাত্র নিজের যত্নে ও পরিশ্রমে পৃথিবীতে শান্তি ও প্রেম স্থাপন করিয়া প্রসন্নচিত্তে রাজার মুখের কাছে আপনার বেল ফুলের মতো মোটা গোল কোমল পবিত্র মুখখানি বাড়াইয়া দিল— রাজার সদ্ব্যবহারের পুরস্কার; রাজা চুম্বন করিলেন।

তখন ধ্রুব তাহার সঙ্গিনীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া রাজাকে অনুমতি ও অনুরোধের মাঝামাঝি স্বরে কহিল, "একে চুমো কাও।"

রাজা ধ্রুবের আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহস করিলেন না। মেয়েটি তখন নিমন্ত্রণের কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া নিতান্ত অভ্যস্তভাবে অম্লানবদনে রাজার কোলের উপরে চড়িয়া বসিল।

এতক্ষণ জগতে কোনোপ্রকার অশান্তি বা উচ্ছৃঙ্খলতার লক্ষণ ছিল না, কিন্তু এইবার ধ্রুবের সিংহাসনে টান পড়িতেই তার সার্বভৌমিক প্রেম টলমল করিয়া উঠিল। রাজার কোলের 'পরে তাহার নিজের একামত্র স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা বলবতী হইয়া উঠিল। মুখ অত্যন্ত ভার হইল, মেয়েটিকে দুই-একবার টানিল, এমন-কি, নিজের পক্ষে অবস্থা বিশেষে ছোটো মেয়েকে মারাও ততটা অন্যায় বোধ হইল না।

রাজা তখন মিটমাট করিবার উদ্দেশ্যে ধ্রুবকেও তাঁহার আধখানা কোলে টানিয়া লইলেন। কিন্তু তাহাতেও ধ্রুবের আপত্তি দূর হইল না। অপরার্ধ অধিকার করিবার জন্য নূতন আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিল। এমন সময়ে নূতন রাজপুরোহিত বিল্বন ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন।

রাজা উভয়কেই কোল হইতে নামাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ধ্রুবকে বলিলেন, "ঠাকুরকে প্রণাম করো।" ধ্রুব তাহা আবশ্যক বোধ করিল না—মুখে আঙুল পুরিয়া বিদ্রোহীভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েটি আপনা হইতেই রাজার দেখাদেখি পুরোহিতকে প্রণাম করিল।

বিল্বন ঠাকুর ধ্রুবকে কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এ সঙ্গী জুটিল কোথা হইতে?"

ধ্রুব খানিকক্ষণ ভাবিয়া কহিল, "আমি টক্‌টক্ চ'ব!" টক্‌টক্ অর্থে ঘোড়া।

পুরোহিত কহিলেন, "বাহবা, প্রশ্ন এবং উত্তরের কী সামঞ্জস্য!"

সহসা মেয়েটির দিকে ধ্রুবের চক্ষু পড়িল, তাহার সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আপনার মত ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিল, "ও দুষ্টু, ওকে মা'ব।" বলিয়া আকাশে আপনার ক্ষুদ্র মুষ্টি নিক্ষেপ করিল।

রাজা গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "ছি ধ্রুব।"

একটি ফুঁয়ে যেমন প্রদীপ নিবিয়া যায় তেমনি তৎক্ষণাৎ ধ্রুবের মুখ ম্লান হইয়া গেল। প্রথমে সে অশ্রু-নিবারণের জন্য দুই মুষ্টি দিয়া দুই চক্ষু রগড়াইতে লাগিল, অবশেষে দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র স্ফীত হৃদয় আর ধারণ করিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল।

বিল্বন ঠাকুর তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া, কোলে লইয়া, আকাশে তুলিয়া, ভূমিতে নামাইয়া, অস্থির করিয়া তুলিলেন; উচ্চৈঃস্বরে ও দ্রুত উচ্চারণে বলিলেন, " শোনো শোনো ধ্রুব, শোনো; তোমাকে শ্লোক বলি শোনো—

কলহ কটকটাং কাঠ কাঠিন্য কাঠ্যং
কটন কিটন কীটং কুট্‌নলং খট্টমট্টং।

অর্থাৎ কিনা, যে ছেলে কাঁদে তাকে কলহ কটকটাঙের মধ্যে পুরে খুব করে কাঠ কাঠিন্য কাঠ্যং দিতে হয়, তার পরে এতগুলো কটন কিটন কীটং নিয়ে একেবারে তিন দিন ধরে কুট্‌নলং খট্টমট্টং।"

পুরোহিত ঠাকুর এইরূপ অনর্গল বকিয়া গেলেন। ধ্রুবের ক্রন্দন অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল। সে প্রথমে গোলমালে বিব্রত ও অবাক হইয়া বিল্বন ঠাকুরের মুখের দিকে সজল চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া রহিল। তার পরে তাঁর হাতমুখ নাড়া দেখিয়া তাহার অত্যন্ত কৌতুক বোধ হইল।

সে ভারি খুশি হইয়া বলিল, "আবার বলো।"

পুরোহিত আবার বকিয়া গেলেন। ধ্রুব অত্যন্ত হাসিতে হাসিতে বলিল, "আবার বলো।"

রাজা ধ্রুবের অশ্রুসিক্ত কপোলে এবং হাসিভরা অধরে বারবার চুম্বন করিলেন। তখন রাজা রাজপুরোহিত ও দুটি ছেলেমেয়ে মিলিয়া খেলা পড়িয়া গেল।

বিল্বন ঠাকুর রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ ইহাদের লইয়া বেশ আছেন। দিনরাত প্রখরবুদ্ধিমানদের সঙ্গে থাকিলে বুদ্ধি লোপ পায়। ছুরিতে অবিশ্রাম শান পড়িলে ছুরি ক্রমেই সূক্ষ্ম হইয়া অন্তর্ধান করে, একটা মোটা বাঁট কেবল অবশিষ্ট থাকে।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "এখনো তবে বোধ করি আমার সূক্ষ্ম বুদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই?"

বিল্বন। না। সূক্ষ্ম বুদ্ধির একটা লক্ষণ এই যে, তাহা সহজ জিনিসকে শক্ত করিয়া তুলে। পৃথিবীতে বিস্তর বুদ্ধিমান না থাকিলে পৃথিবীর কাজ অনেকটা সোজা হইত। নানারূপ সুবিধা করিতে গিয়াই নানারূপ অসুবিধা ঘটে। অধিক বুদ্ধি লইয়া মানুষ কী করিবে ভাবিয়া পায় না।

রাজা কহিলেন, পাঁচটা আঙুলেই বেশ কাজ চলিয়া যায়; দুর্ভাগ্যক্রমে সাতটা আঙুল পাইলে ইচ্ছা করিয়া কাজ বাড়াইতে হয়।"

রাজা ধ্রুবকে ডাকিলেন। ধ্রুব তাহার সঙ্গিনীর সহিত পুনরায় শান্তি স্থাপন করিয়া খেলা করিতেছিল। রাজার ডাক শুনিয়া তৎক্ষণাৎ খেলা ছাড়িয়া রাজার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজা তাহাকে সম্মুখে বসাইয়া কহিলেন, "ধ্রুব, সেই নূতন গানটি ঠাকুকে শোনাও।" কিন্তু ধ্রুব নিতান্ত আপত্তির ভাবে ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিল।

রাজা লোভ দেখাইয়া বলিলেন, "তোমাকে টক্‌টক্ চড়তে দেব।"

ধ্রুব তাহার আধো-আধো উচ্চারণে বলিতে লাগিল—

আমায় ছ-জনায় মিলে পথ দেখায় ব'লে
পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানা কথার ছলে নানান মুনি বলে,
সংশয়ে তাই দুলি হে।
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ—
শত লোকের শত বুলি হে।
কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি
আড়াল ক'রে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধুলো তাই নিয়ে আছি—
পাই নে চরণধূলি হে।
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়,
আপনা আপনি বিবাদ বাধায়,
কারে সামালিব এ কী হল দায়—
একা যে অনেকগুলি হে।
আমায় এক করো তোমার প্রেমে বেঁধে,

এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে,
ধাঁধার মাঝে প'ড়ে কত মরি কেঁদে—
চরণেতে লহো তুলি হে।

ধ্রুবের মুখে আধো-আধো স্বরে এই কবিতা শুনিয়া বিল্বন ঠাকুর নিতান্ত বিগলিত হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "আশীর্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হইয়া থাকো।" ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া ঠাকুর অনেক মিনতি করিয়া বলিলেন, "আর-একবার শুনাও।"

ধ্রুব সুদৃঢ় মৌন আপত্তি প্রকাশ করিল। পুরোহিত চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া কহিলেন, "তবে আমি কাঁদি?"

ধ্রুব ঈষৎ বিচলিত হইয়া কহিল, "কাল শোনাব, ছি, কাঁদতে নেই, তুমি একন বায়ি (বাড়ি) যাও। বাবা মা'বে।"

বিল্বন হাসিয়া কহিলেন, "মধুর গলাধাক্কা"। রাজার নিকটে বিদায় লইয়া পুরোহিত ঠাকুর বাহির হইলেন।

পথে দুইজন পথিক যাইতেছিল। একজন আর একজনকে কহিতেছিল, "তিন দিন তার দরজায় মাথা ভেঙে মলুম, এক পয়সা বের করতে পারলুম না—এইবার সে পথে বেরোলে তার মাথা ভাঙব, দেখি তাতে কী হয়।"

পিছন হইতে বিল্বন কহিলেন, "তাতেও কোনো ফল হবে না। দেখতেই তো পাচ্ছ বাপু, মাথার মধ্যে কিছুই থাকে না, কেবল দুর্বুদ্ধি আছে। বরঞ্চ নিজের মাথা ভাঙা ভালো, কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না।"

পথিকদ্বয় শশব্যস্ত ও অপ্রতিভ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিল। বিল্বন কহিলেন, "বাপু, তোমরা যে কথা বলছিলে সে কথাগুলো ভালো নয়।"

পথিকদ্বয় কহিল, "যে আজ্ঞে ঠাকুর, আর এমন কথা বলব না।"

পুরোহিত ঠাকুরকে পথে ছেলেরা ঘিরিল। তিনি কহিলেন, "আজ বিকালে আমার ওখানে যাস, আমি গল্প শোনাব।" আনন্দে ছেলেরা লাফালাফি চেঁচামেচি বাধাইয়া দিল। বিল্বন ঠাকুর এক-এক দিন অপরাহ্নে রাজ্যের ছেলে জড়ো করিয়া তাহাদিগকে সহজ ভাষায় রামায়ণ মহাভারত ও পৌরাণিক গল্প শুনাইতেন। মাঝে মাঝে দুই একটি নীরস কথাও যথাসাধ্য রসসিক্ত করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু যখন দেখিতেন ছেলেদের মধ্যে হাই তোলা সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে তখন তাহাদের মন্দিরের বাগানের মধ্যে ছাড়িয়া দিতেন। সেখানে ফলের গাছ অসংখ্য আছে। ছেলেগুলো আকাশভেদী চীৎকার শব্দে বানরের মতো ডালে ডালে লুটপাট বাধাইয়া দিত—বিল্বন আমোদ দেখিতেন।

বিল্বন কোন্ দেশী লোক কেহ জানে না। ব্রাহ্মণ, কিন্তু উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন। বলিদান প্রভৃতি বন্ধ করিয়া একপ্রকার নূতন অনুষ্ঠানে দেবীপূজা করিয়া থাকেন—প্রথম প্রথম তাহাতে লোকেরা সন্দেহ ও আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু এখন সমস্ত সহিয়া গিয়াছে। বিশেষত

বিল্বনের কথায় সকলে বশ। বিল্বন সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়া সকলের সঙ্গে আলাপ করেন, সকলের সংবাদ লন, এবং রোগীকে যাহা ঔষধ দেন তাহা আশ্চর্য খাটিয়া যায়। বিপদে আপদে সকলেই তাঁহার পরামর্শ-মতে কাজ করে—তিনি মধ্যবর্তী হইয়া কাহারো বিবাদ মিটাইয়া দিলে বা কিছুর মীমাংসা করিয়া দিলে তাহার উপরে আর কেহ কথা কহে না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এই বৎসরে ত্রিপুরায় এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিল। উত্তর হইতে সহসা পালে পালে ইঁদুর ত্রিপুরার শস্যক্ষেত্রে আসিয়া পড়িল। শস্য সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিল, এমন-কি, কৃষকের ঘরে শস্য যত কিছু সঞ্চিত ছিল তাহাও অধিকাংশই খাইয়া ফেলিল—রাজ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বন হইতে ফলমূল আহরণ করিয়া লোকে প্রাণধারণ করিতে লাগিল। বনের অভাব নাই, এবং বনে নানাপ্রকার আহার্য উদ্ভিজ্জও আছে। মৃগয়ালব্ধ মাংস বাজারে মহার্ঘ মূল্যে বিক্রয় হইতে লাগিল। লোকে বুনো মহিষ, হরিণ, খরগোশ, সজারু, কাঠবিড়ালি, বরা, বড়ো বড়ো স্থলকচ্ছপ শিকার করিয়া খাইতে লাগিল। হাতি পাইলে হাতিও খায়। অজগর সাপ খাইতে লাগিল। বনে আহার্য পাখির অভাব নাই; গাছের কোটরের মধ্যে মৌচাক ও মধু পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে নদীর জল বাঁধিয়া তাহাতে মাদক লতা ফেলিয়া দিলে মাছেরা অবশ হইয়া ভাসিয়া উঠে; সেই-সকল মাছ ধরিয়া লোকেরা খাইতে লাগিল এবং শুকাইয়া সঞ্চয় করিল। আহার এখনো কোনোক্রমে চলিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। স্থানে স্থানে চুরি-ডাকাতি আরম্ভ হইল; প্রজারা বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ করিল।

তাহারা বলিতে লাগিল, মায়ের বলি বন্ধ করাতে মায়ের অভিশাপে এই-সব দুর্ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিল্বন ঠাকুর সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি উপহাসচ্ছলে কহিলেন, কৈলাসে কার্তিক-গণেশের মধ্যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, কার্তিকের ময়ূরের নামে গণেশের ইঁদুরগুলো ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরীর কাছে নালিশ করিতে আসিয়াছে। প্রজারা এ কথা নিতান্ত উপহাসের ভাবে গ্রহণ করিল না। তাহারা দেখিল, বিল্বন ঠাকুরের কথামত ইঁদুরের স্রোত যেমন দ্রুতবেগে আসিল তেমনি দ্রুতবেগে সমস্ত শস্য নষ্ট করিয়া কোথায় অন্তর্ধান করিল—তিন দিনের মধ্যে তাহাদের আর চিহ্নমাত্র রহিল না। বিল্বন ঠাকুরের অগাধ জ্ঞানের সম্বন্ধে কাহারো সন্দেহ রহিল না। কৈলাসে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ সম্বন্ধে গান রচিত হইতে লাগিল; মেয়েরা ছেলেরা ভিক্ষুকেরা সেই গান গাহিতে লাগিল, পথে ঘাটে সেই গান প্রচলিত হইল।

কিন্তু রাজার প্রতি বিদ্বেষভাব ভালো করিয়া ঘুচিল না। বিল্বন ঠাকুরের পরামর্শ-মতে গোবিন্দমাণিক্য দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজাদের এক বৎসরের খাজনা মাপ করিলেন। তাহার কতকটা ফল হইল। কিন্তু তবুও অনেকে মায়ের অভিশাপ এড়াইবার জন্য চট্টগ্রামে পার্বত্য প্রদেশে পলায়ন করিল। এমন-কি, রাজার মনে সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল।

তিনি বিল্বনকে ডাকিয়া কহিলেন, "ঠাকুর, রাজার পাপেই প্রজা কষ্ট পায়। আমি কি মায়ের বলি বন্ধ করিয়া পাপ করিয়াছি? তাহারই কি এ শাস্তি?"

বিল্বন সমস্ত কথা একেবারে উড়াইয়া দিলেন। তিনি কহিলেন, "মায়ের কাছে যখন হাজার নরবলি হইত তখন আপনার অধিক প্রজাহানি হইয়াছে, না এই দুর্ভিক্ষে হইয়াছে?"

রাজা নিরুত্তর হইয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার মনের মধ্য হইতে সংশয় সম্পূর্ণ দূর হইল না। প্রজারা তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছে, তাঁহার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে, ইহাতে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে, তাঁহার নিজের প্রতিও নিজের সন্দেহ জন্মিয়াছে। তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "কিছুই বুঝিতে পারি না।"

বিল্বন কহিলেন, "অধিক বুঝিবার আবশ্যক কী! কেন কতকগুলো ইঁদুর আসিয়া শস্য খাইয়া গেল তাহা নাই বুঝিলাম। আমি অন্যায় করিব না, আমি সকলের হিত করিব, এইটুকু স্পষ্ট বুঝিলেই হইল। তার পরে বিধাতার কাজ বিধাতা করিবেন, তিনি আমাদের হিসাব দিতে আসিবেন না।"

রাজা কহিলেন, "ঠাকুর, তুমি গৃহে গৃহে ফিরিয়া অবিশ্রাম কাজ করিতেছ, পৃথিবীর যতটুকু হিত করিতেছ ততটুকুই তোমার পুরস্কার হইতেছে—এই আনন্দে তোমার সমস্ত সংশয় চলিয়া যায়। আমি কেবল দিনরাত্রি একটা মুকুট মাথায় করিয়া সিংহাসনের উপরে চড়িয়া বসিয়া আছি, কেবল কতকগুলো চিন্তা ঘাড়ে করিয়া আছি—তোমার কাজ দেখিলে আমার লোভ হয়।"

বিল্বন কহিলেন, "মহারাজ, আমি তোমারই তো এক অংশ; তুমি ঐ সিংহাসনে বসিয়া না থাকিলে আমি কি কাজ করিতে পারিতাম? তোমাতে আমাতে মিলিয়া আমরা উভয়ে সম্পূর্ণ হইয়াছি।"

এই বলিয়া বিল্বন বিদায় গ্রহণ করিলেন, রাজা মুকুট মাথায় করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। মনে মনে কহিলেন, 'আমার কাজ যথেষ্ট রহিয়াছে, আমি তাহার কিছুই করি না। আমি কেবল আমার চিন্তা লইয়াই নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। সেইজন্যই আমি প্রজাদের বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারি না। রাজ্যশাসনের আমি যোগ্য নই।'

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মোগল-সৈন্যের কর্তা হইয়া নক্ষত্ররায় পথের মধ্যে তেঁতুলে নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রভাতে রঘুপতি আসিয়া কহিলেন, "যাত্রা করিতে হইবে, মহারাজ প্রস্তুত হোন।"

সহসা রঘুপতির মুখে মহারাজ শব্দ অত্যন্ত মিষ্ট শুনাইল। নক্ষত্ররায় উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। তিনি কল্পনায় পৃথিবীসুদ্ধ লোকের মুখ হইতে মহারাজ সম্ভাষণ শুনিতে লাগিলেন—তিনি মনে মনে ত্রিপুরার উচ্চ সিংহাসনে চড়িয়া সভা উজ্জ্বল করিয়া বসিলেন। মনের আনন্দে

বলিলেন, "ঠাকুর, আপনাকে কখনোই ছাড়া হইবে না। আপনাকে সভায় থাকিতে হইবে। আপনি কী চান সেইটে আমাকে বলুন।"

নক্ষত্ররায় মনে মনে রঘুপতিকে তৎক্ষণাৎ বৃহৎ এক খণ্ড জায়গির অবলীলাক্রমে দান করিয়া ফেলিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "আমি কিছু চাহি না।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "সে কী কথা! তা হইবে না ঠাকুর। কিছু লইতেই হইবে। কয়লাসর পরগনা আমি আপনাকে দিলাম, আপনি লেখাপড়া করিয়া লউন।"

রঘুপতি কহিলেন, "সে-সকল পরে দেখা যাইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "পরে কেন, আমি এখনি দিব। সমস্ত কয়লাসর পরগনা আপনারই হইল, আমি এক পয়সা খাজনা লইব না।" বলিয়া নক্ষত্ররায় মাথা তুলিয়া অত্যন্ত সিধা হইয়া বসিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "মরিবার জন্য তিন হাত জমি মিলিলেই সুখী হইব। আমি আর-কিছু চাহি না।" বলিয়া রঘুপতি চলিয়া গেলেন। তাঁহার জয়সিংহকে মনে পড়িয়াছে। জয়সিংহ যদি থাকিত তবে পুরস্কারের স্বরূপ কিছু লইতেন; জয়সিংহ যখন নাই তখন সমস্ত ত্রিপুরারাজ্য মৃত্তিকার সমষ্টি ছাড়া আর-কিছু মনে হইল না।

রঘুপতি এখন নক্ষত্ররায়কে রাজাভিমানে মত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার মনের মধ্য ভয় আছে, পাছে এত আয়াজন করিয়া সমস্ত ব্যর্থ হয়, পাছে দুর্বলস্বভাব নক্ষত্ররায় ত্রিপুরায় গিয়া বিনাযুদ্ধে রাজার নিকট ধরা দেন। কিন্তু দুর্বল হৃদয়ে একবার রাজ্যমদ জন্মিলে আর ভাবনা নাই। রঘুপতি নক্ষত্ররায়ের প্রতি আর অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না, কথায় কথায় তাঁহার সম্মান দেখাইয়া থাকেন। সকল বিষয়ে তাঁহার মৌখিক আদেশ লইয়া থাকেন। মোগল সৈন্যেরা তাঁহাকে মহারাজা-সাহেব বলে, তাঁহাকে দেখিলে শশব্যস্ত হইয়া উঠে—বায়ু বহিলে যেমন সমস্ত শস্যক্ষেত্র নত হইয়া যায় তেমনি নক্ষত্ররায় আসিয়া দাঁড়াইলে সারি সারি মোগল-সেনা একসঙ্গে মাথা নত করিয়া সেলাম করে। সেনাপতি সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করেন। শত শত মুক্ত তরবারির জ্যোতির মধ্যে বৃহৎ হস্তীর পৃষ্ঠে রাজচিহ্ন-অঙ্কিত স্বর্ণমণ্ডিত হাওদায় চড়িয়া তিনি যাত্রা করেন; সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসজনক বাদ্য বাজিতে থাকে, সঙ্গে-সঙ্গে নিশানধারী রাজনিশান ধরিয়া চলে। তিনি যেখান দিয়া যান সেখানকার গ্রামের লোক সৈন্যের ভয়ে ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়া যায়। তাহাদের ত্রাস দেখিয়া নক্ষত্ররায়ের মনে গর্বের উদয় হয়। তাঁহার মনে হয়, 'আমি দিগ্বিজয় করিয়া চলিয়াছি।' ছোটো ছোটো জমিদারগণ নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া আসিয়া তাঁহাকে সেলাম করিয়া যায়; তাহাদিগকে পরাজিত নৃপতি বলিয়া বোধ হয়, মহাভারতের দিগ্বিজয়ী পাণ্ডবদের কথা মনে পড়ে।

একদিন সৈন্যেরা আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল, "মহারাজা-সাহেব!" নক্ষত্ররায় খাড়া হইয়া বসিলেন।

"আমরা মহারাজের জন্য জান দিতে আসিয়াছি, আমরা জানের পরোয়া রাখি না; বরাবর

আমাদের দস্তুর আছে—লড়াইয়ে যাইবার পথে আমরা গ্রাম লুঠ করিয়া যাই, কোনো শাস্ত্রে ইহাতে দোষ লিখে না।"

নক্ষত্ররায় মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "ঠিক কথা, ঠিক কথা।"

সৈন্যেরা কহিল, "ব্রাহ্মণঠাকুর আমাদের লুঠ করিতে বারণ করিয়াছেন। আমরা জান দিতে যাইতেছি, অথচ একটু লুঠ করিতে পারিব না, এ বড়ো অবিচার।"

নক্ষত্ররায় পুনশ্চ মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "ঠিক কথা, ঠিক কথা।"

"মহারাজার যদি হুকুম মিলে তো আমরা ব্রাহ্মণঠাকুরের কথা না মানিয়া লুঠ করিতে যাই।"

নক্ষত্ররায় অত্যন্ত স্পর্ধার সহিত কহিলেন, "ব্রাহ্মণঠাকুর কে? ব্রাহ্মণঠাকুর কী জানে? আমি তোমাদিগকে হুকুম দিতেছি, তোমরা লুঠপাট করিতে যাও।" বলিয়া একবার ইতস্তত চাহিয়া দেখিলেন—কোথাও রঘুপতিকে না দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

কিন্তু রঘুপতিকে এইরূপে অকাতরে লঙ্ঘন করিয়া তিনি মনের মধ্যে অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন। ক্ষমতামদ মদিরার মতো তাঁহার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইতে লাগিল। পৃথিবীকে নূতন চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। কাল্পনিক বেলুনের উপর চড়িয়া পৃথিবীটা যেন অনেক নিম্নে মেঘের মতো মিলাইয়া গেল। এমন-কি, মাঝে মাঝে কদাচ কখনো রঘুপতিকেও নগণ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সহসা বলপূর্বক গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। মনে মনে বার বার করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমাকে নির্বাসন! একটা সামান্য প্রজার মতো আমাকে বিচারসভায় আহ্বান! এবার দেখি কে কাহাকে নির্বাসিত করে। এবার ত্রিপুরাসুদ্ধ লোক নক্ষত্ররায়ের প্রতাপ অবগত হইবে।' নক্ষত্ররায় ভারি উৎফুল্ল ও স্ফীত হইলেন।

নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর অনর্থক উৎপীড়ন ও লুঠপাটের প্রতি রঘুপতির বিশেষ বিরাগ ছিল। নিবারণ করিবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সৈন্যেরা নক্ষত্ররায়ের আজ্ঞা পাইয়া তাঁহাকে অবেহলা করিল। তিনি নক্ষত্ররায়ের কাছে আসিয়া বলিলেন, "অসহায় গ্রামবাসীদের উপর কেন এ অত্যাচার?"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "ঠাকুর, এ-সব বিষয়ে তুমি ভালো বোঝ না! যুদ্ধবিগ্রহের সময় সৈন্যদের লুঠপাটে নিষেধ করিয়া নিরুৎসাহ করা ভালো নয়।"

নক্ষত্ররায়ের কথা শুনিয়া রঘুপতি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। সহসা নক্ষত্ররায়ের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান দেখিয়া তিনি মনে মনে হাসিলেন। কহিলেন, "এখন লুঠপাট করিতে দিলে পরে ইহাদিগকে সামালানো দায় হইবে। সমস্ত ত্রিপুরা লুঠিয়া লইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "তাহাতে হানি কী? আমি তো তাহাই চাই—ত্রিপুরা একবার বুঝুক, নক্ষত্ররায়কে নির্বাসিত করার ফল কী। ঠাকুর, এ-সব বিষয়ে তুমি কিছু বোঝ না, তুমি তো কখনো যুদ্ধ কর নাই।"

রঘুপতি মনে মনে অত্যন্ত আমোদ বোধ করিলেন। কিছু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন। নক্ষত্ররায় নিতান্ত পুত্তলিকার মতো না হইয়া একটু শক্ত মানুষের মতো হন, এই তাঁহার ইচ্ছা ছিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ত্রিপুরায় ইঁদুরের উৎপাত যখন আরম্ভ হয় তখন শ্রাবণ মাস। তখন ক্ষেত্রে কেবল ফলিয়াছিল, এবং পাহাড়ে জমিতে ধান্যক্ষেত্রেও পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তিন মাস কোনোমতে কাটিয়া গেল— অগ্রহায়ণ মাসে নিম্নভূমিতে যখন ধান কাটিবার সময় আসিল তখন দেশে আনন্দ পড়িয়া গেল। চাষারা[১] স্ত্রীলোক বালক বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া দা হাতে লইয়া ক্ষেত্রে গিয়া পড়িল। হৈয়া হৈয়া শব্দে পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতে লাগিল; জুমিয়া রমণীদের গানে মাঠ-বাট ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রাজার প্রতি অসন্তোষ দূর হইয়া গেল, রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। এমন সময় সংবাদ আসিল, নক্ষত্ররায় রাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং অত্যন্ত লুঠপাট উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন—এই সংবাদে সমস্ত রাজ্য শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

এ সংবাদ রাজার বক্ষে ছুরির মতো বিদ্ধ হইল। সমস্ত দিনই তাঁহাকে বিঁধিতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া কেবলই প্রত্যেক বার নূতন করিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, নক্ষত্ররায় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। নক্ষত্ররায়ের সরল সুন্দর মুখ শতবার তাঁহার স্নেহচক্ষের সম্মুখে দেখিতে লাগিলেন এবং সেইসঙ্গেই মনে হইতে লাগিল, তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এক-একবার তাঁহার মনে মনে ইচ্ছা করিতে লাগিল—একটি সৈন্যও না লইয়া নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে বৃহৎ রণক্ষেত্রে একা দাঁড়াইয়া সমস্ত বক্ষঃস্থল অবারিত করিয়া নক্ষত্ররায়ের সহস্র সৈনিকের তরবারি এককালে তাঁহার হৃদয়ে গ্রহণ করেন।

তিনি ধ্রুবকে কাছে টানিয়া বলিলেন, "ধ্রুব, তুইও কি এই মুকুটখানার জন্য আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে পারিস?" বলিয়া মুকুট ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন, একটি বড়ো মুক্তা ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল।

ধ্রুব আগ্রহের সহিত হাত বাড়াইয়া কহিল, "আমি নেব।"

রাজা ধ্রুবের মাথায় মুকুট পরাইয়া তাহাকে কোলে লইয়া কহিলেন, "এই লও, আমি কাহারো সহিত ঝগড়া করিতে চাহি না।" বলিয়া অত্যন্ত আবেগের সহিত ধ্রুবকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন।

তাহার পরে সমস্ত দিন ধরিয়া 'এ কেবল আমারই পাপের শাস্তি' বলিয়া রাজা নিজের সহিত তর্ক করিতে লাগিলেন। নহিলে ভাই কখনো ভাইকে আক্রমণ করে না। ইহা মনে করিয়া তাঁহার কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা হইল। তিনি মনে করিলেন, ইহা ঈশ্বরের বিধান। জগৎপতির দরবার হইতে আদেশ আসিয়াছে, ক্ষুদ্র নক্ষত্ররায় কেবল তাহার মানবহৃদয়ের প্ররোচনায় তাহা লঙ্ঘন করিতে পারে না। এই মনে করিয়া তাঁহার আহত স্নেহ কিছু শান্তি পাইল। পাপ তিনি নিজের স্কন্ধে লইতে রাজি আছেন। নক্ষত্ররায়ের পাপের ভার যেন তাহাতে কতকটা কমিয়া যায়।

বিল্বন আসিয়া কহিলেন, "মহারাজ, এ সময় কি আকাশের দিকে তাকাইয়া ভাবিবার সময়?"

রাজা কহিলেন, "ঠাকুর, এ-সকল আমারই পাপের ফল।"

বিল্বন কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ, এই-সকল কথায় আমার ধৈর্য থাকে না। দুঃখ যে পাপেরই ফল তাহা কে বলিল, পুণ্যের ফলও হইতে পারে। কত ধর্মাত্মা আজীবন দুঃখে কাটাইয়া গিয়াছেন।"

রাজা নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

বিল্বন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ কী পাপ করিয়াছিলেন যাহার ফলে এই ঘটনা ঘটিল?"

রাজা কহিলেন, "আপন ভাইকে নির্বাসিত করিয়াছিলাম।"

বিল্বন কহিলেন, "আপনি ভাইকে নির্বাসিত করেন নাই। দোষীকে নির্বাসিত করিয়াছেন।"

রাজা কহিলেন, "দোষী হইলেও ভাইকে নির্বাসনের পাপ আছেই। তাহার ফল হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। কৌরবেরা দুরাচার হইলেও পাণ্ডবেরা তাহাদিগকে বধ করিয়া প্রসন্নচিত্তে রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। যজ্ঞ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। পাণ্ডবেরা কৌরবদের নিকট হইতে রাজ্য লইলেন, কৌরবেরা মরিয়া গিয়া পাণ্ডবদের রাজ্য হরণ করিলেন। আমি নক্ষত্রকে নির্বাসিত করিয়াছি, নক্ষত্র আমাকে নির্বাসিত করিতে আসিতেছে।"

বিল্বন কহিলেন, "পাণ্ডবেরা পাপের শাস্তি দিবার জন্য কৌরবদের সহিত যুদ্ধ করেন নাই, তাঁহারা রাজ্যলাভের জন্য করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ পাপের শাস্তি দিয়া নিজের সুখদুঃখ উপেক্ষা করিয়া ধর্মপালন করিয়াছিলেন। ইহাতে আমি তো পাপ কিছুই দেখিতেছি না। তবে প্রায়শ্চিত্তের বিধি দিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আমি ব্রাহ্মণ উপস্থিত আছি, আমাকে সন্তুষ্ট করিলেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

রাজা ঈষৎ চুপ করিয়া রহিলেন।

বিল্বন কহিলেন, "সে যাহাই হউক, এখন যুদ্ধের আয়োজন করুন। আর বিলম্ব করিবেন না।"

রাজা কহিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না।"

বিল্বন কহিলেন, "সে হইতেই পারে না। আপনি বসিয়া বসিয়া ভাবুন। আমি ততক্ষণ সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টা করি গে। সকলেই এখন জুমে গিয়াছে, যথেষ্ট সৈন্য পাওয়া কঠিন।" বলিয়া আর-কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বিল্বন চলিয়া গেলেন।

ধ্রুবের সহসা কী মনে হইল; সে রাজার কাছে আসিয়া রাজার মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকা কোথায়?" নক্ষত্ররায়কে ধ্রুব কাকা বলিত।

রাজা কহিলেন, "কাকা আসিতেছেন ধ্রুব।" তাঁহার চোখের পাতা ঈষৎ আর্দ্র হইয়া গেল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিল্বন ঠাকুরের বিস্তর কাজ পড়িয়া গেল। তিনি চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশে নানা উপহার-সমতে দ্রুতগামী দূত পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে কুকি গ্রামপতিদের নিকটে কুকি সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। যুদ্ধের নাম শুনিয়া তাহারা নাচিয়া উঠিল। কুকিদের যত লাল (গ্রামপতি) ছিল তাহারা যুদ্ধের সংবাদস্বরূপ লাল বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা দা দূতহস্তে গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে কুকির স্রোত চট্টগ্রামের শৈলশৃঙ্গ হইতে ত্রিপুরার শৈলশৃঙ্গে আসিয়া পড়িল। তাহাদিগকে কোনো নিয়মের মধ্যে সংযত করিয়া রাখাই দায়। বিল্বন স্বয়ং ত্রিপুরার গ্রামে গ্রামে গিয়া জুম হইতে বাছিয়া বাছিয়া সাহসী যুবাপুরুষদিগকে সৈন্যশ্রেণীতে সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। অগ্রসর হইয়া মোগল-সৈন্যদিগকে আক্রমণ করা বিল্বন ঠাকুর সংগত বিবেচনা করিলেন না। যখন তাহারা সমতলক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্গম শৈলশৃঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইবে তখন অরণ্য পর্বত ও নানা দুর্গম গুপ্তস্থান হইতে তাহাদিগকে সহসা আক্রমণ করিয়া চকিত করিবেন স্থির করিলেন। বড়ো বড়ো শিলাখণ্ডের দ্বারা গোমতীনদীর জল বাঁধিয়া রাখিলেন—নিতান্ত পরাভবের আশঙ্কা দেখিলে সেই বাঁধ ভাঙিয়া দিয়া জলপ্লাবনের দ্বারা মোগল-সৈন্যদিগকে ভাসাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

এদিকে নক্ষত্ররায় দেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে ত্রিপুরার পার্বত্য প্রদেশে আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন জুম কাটা শেষ হইয়া গেছে। জুমিয়ারা সকলেই দা ও তীরধনু হাতে করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। কুকিদলকে উচ্ছ্বাসোন্মুখ জলপ্রপাতের মতো আর বাঁধিয়া রাখা যায় না।

গোবিন্দমাণিক্য বলিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না।"

বিল্বন ঠাকুর কহিলেন, "এ কোনো কাজের কথাই নহে।"

রাজা কহিলেন, "আমি রাজত্ব করিবার যোগ্য নহি, তাহারই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। সেইজন্য আমার প্রতি প্রজাদের বিশ্বাস নাই, সেইজন্যই দুর্ভিক্ষের সূচনা, সেইজন্যই এই যুদ্ধ। রাজ্যপরিত্যাগের জন্য এ-সকল ভগবানের আদেশ।"

বিল্বন কহিলেন, "এ কখনোই ভগবানের আদেশ নহে। ঈশ্বর আপনার উপরে রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছেন; যতদিন রাজকার্য নিঃসংকট ছিল ততদিন আপনার সহজ কর্তব্য অনায়াসে পালন করিয়াছেন, যখনই রাজ্যভার গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে তখনই তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া আপনি স্বাধীন হইতে চাহিতেছেন এবং ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া আপনাকে ফাঁকি দিয়া সুখী করিতে চাহিতেছেন।"

কথাটা গোবিন্দমাণিক্যের মনে লাগিল। তিনি নিরুত্তর হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন; অবশেষে নিতান্ত কাতর হইয়া বলিলেন, "মনে করো-না ঠাকুর, আমার পরাজয় হইয়াছে, নক্ষত্র আমাকে বধ করিয়া রাজা হইয়াছে।"

বিল্বন কহিলেন, "যদি সত্য তাহাই ঘটে, তাহা হইলে আমি মহারাজের জন্য শোক করিব না। কিন্তু মহারাজ যদি কর্তব্যে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন তবেই আমাদের শোকের কারণ ঘটিবে।"

রাজা কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া কহিলেন, "আপন ভাইয়ের রক্তপাত করিব!"

বিল্বন কহিলেন, "কর্তব্যের কাছে ভাই বন্ধু কেহই নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কী উপদেশ দিয়াছিলেন স্মরণ করিয়া দেখুন!"

রাজা কহিলেন, "ঠাকুর, তুমি কি বল আমি স্বহস্তে এই তরবারি লইয়া নক্ষত্ররায়কে আঘাত করিব?"

বিল্বন কহিলেন, "হাঁ।"

সহসা ধ্রুব আসিয়া অত্যন্ত গম্ভীর গলায় কহিল, "ছি, ওকথা বলতে নেই।"

ধ্রুব খেলা করিতেছিল, দুই পক্ষের কী একটা গোলযোগ শুনিয়া সহসা তাহার মনে হইল, দুইজনে অবশ্যই একটা দুষ্টামি করিতেছে— অতএব সময় থাকিতে দুইজনকে কিঞ্চিৎ শাসন করিয়া আসা আবশ্যক। এই-সকল বিবেচনা করিয়া তিনি হঠাৎ আসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "ছি, ও কথা বলতে নেই।"

পুরোহিত-ঠাকুরের অত্যন্ত আমোদবোধ হইল। তিনি হাসিয়া উঠিলেন, ধ্রুবকে কোলে লইয়া চুমো খাইতে লাগিলেন। কিন্তু রাজা হাসিলেন না। তাঁহার মনে হইল, যেন বালকের মুখে তিনি দৈববাণী শুনিলেন।

তিনি অসন্দিগ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুর, আমি স্থির করিয়াছি এ রক্তপাত আমি ঘটিতে দিব না, আমি যুদ্ধ করিব না।"

বিল্বন ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "মহারাজের যদি যুদ্ধ করিতেই আপত্তি থাকে তবে আর-এক কাজ করুন। আপনি নক্ষত্ররায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে বিরত করুন।"

গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, "ইহাতে আমি সম্মত আছি।"

বিল্বন কহিলেন, "তবে সেইরূপ প্রস্তাব লিখিয়া নক্ষত্ররায়ের নিকট পাঠানো হউক।"

অবশেষে তাহাই স্থির হইল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্ররায় সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কোথাও তিলমাত্র বাধা পাইলেন না। ত্রিপুরার যে গ্রামেই তিনি পদার্পণ করিলেন সেই গ্রামই তাঁহাকে রাজা বলিয়া বরণ করিতে লাগিল। পদে পদে রাজত্বের আস্বাদ পাইতে লাগিলেন, ক্ষুধা আরো বাড়িতে লাগিল। চারি দিকের বিস্তৃত ক্ষেত্র গ্রাম পর্বতশ্রেণী নদী সমস্তই 'আমার' বলিয়া মনে হইতে লাগিল এবং সেই অধিকারব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নিজেও যেন অনেকদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া অত্যন্ত প্রশস্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। মোগল-সৈন্যেরা যাহা চায় তিনি তাহাই তাহাদিগকে লইতে আলী-হুকুম দিয়া দিলেন। মনে হইল—'এ সমস্তই আমার এবং ইহারা আমারই রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, ইহাদিগকে কোনো সুখ হইতে বঞ্চিত করা হইবে না'; স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া

মোগলেরা তাঁহার আতিথ্যের ও রাজবৎ উদারতা ও বদান্যতার অনেক প্রশংসা করিবে; বলিবে 'ত্রিপুরার রাজা বড়ো কম রাজা নহে'। মোগল-সৈন্যদের নিকট হইতে খ্যাতি লাভ করিবার জন্য তিনি সততই উৎসুক হইয়া রহিলেন। তাহারা তাহাকে কোনোপ্রকার শ্রুতিমধুর সম্ভাষণ করিলে তিনি নিতান্ত জল হইয়া যান। সর্বদাই ভয় হয়, পাছে কোনো নিন্দার কারণ ঘটে।

রঘুপতি আসিয়া কহিলেন, "যুদ্ধের তো কোনো উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "না ঠাকুর, ভয় পাইয়াছে।" বলিয়া অত্যন্ত হাসিতে লাগিলেন।

রঘুপতি হাসিবার বিশেষ কোনো কারণ দেখিলেন না, কিন্তু তথাপি হাসিলেন।

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "নক্ষত্ররায় নবাবের সৈন্য লইয়া আসিয়াছে। বড়ো সহজ ব্যাপার নহে।"

রঘুপতি কহিলেন, "দেখি এবার কে কাহাকে নির্বাসনে পাঠায়? কেমন?"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আমি ইচ্ছা করিলে নির্বাসনদণ্ড দিতে পারি, কারারুদ্ধ করিতেও পারি—বধের হুকুম দিতেও পারি। এখনো স্থির করি নাই কোন্‌টা করিব।" বলিয়া অতিশয় বিজ্ঞভাবে অনেক বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "অত ভাবিবেন না মহারাজ! এখনো অনেক সময় আছে। কিন্তু আমার ভয় হইতেছে, গোবিন্দমাণিক্য যুদ্ধ না করিয়াই আপনাকে পরাভূত করিবেন।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "সে কেমন করিয়া হইবে?"

রঘুপতি কহিলেন, "গোবিন্দমাণিক্য সৈন্যগুলোকে আড়ালে রাখিয়া বিস্তর ভ্রাতৃস্নেহ দেখাইবেন। গলা ধরিয়া বলিবেন, 'ছোটো ভাই আমার, এসো, ঘরে এসো, দুধ সর খাওসে।' মহারাজ কাঁদিয়া বলিবেন, 'যে আজ্ঞে আমি এখনই যাইতেছি। অধিক বিলম্ব হইবে না।' বলিয়া নাগরা জুতোজোড়াটা পায়ে দিয়া দাদার পিছনে পিছনে মাথা নিচু করিয়া টাট্টু ঘোড়াটির মতো চলিবেন। বাদশাহের মোগল ফৌজ তামাশা দেখিয়া হাসিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইবে।"

নক্ষত্ররায় রঘুপতির মুখে এই তীব্র বিদ্রূপ শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। কিঞ্চিৎ হাসিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "আমাকে কি ছেলেমানুষ পাইয়াছে যে এমনি করিয়া ভুলাইবে! তাহার জো নাই। সে হবে না ঠাকুর! দেখিয়া লইয়ো।"

সেই দিন গোবিন্দমাণিক্যের চিঠি আসিয়া পৌঁছিল। সে চিঠি রঘুপতি খুলিলেন। রাজা অত্যন্ত স্নেহ প্রকাশ করিয়া সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছেন। চিঠি নক্ষত্ররায়কে দেখাইলেন না। দূতকে বলিয়া দিলেন, 'কষ্ট স্বীকার করিয়া গোবিন্দমাণিক্যের এতদূর আসিবার দরকার নাই। সৈন্য ও তরবারি লইয়া মহারাজ নক্ষত্রমাণিক্য শীঘ্রই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। গোবিন্দমাণিক্য এই অল্পকাল যেন প্রিয়ভ্রাতৃবিরহে অধিক কাতর হইয়া না পড়েন। আট বৎসর নির্বাসনে থাকিলে ইহা অপেক্ষা আরো অধিককাল বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ছিল।'

রঘুপতি নক্ষত্ররায়কে গিয়া কহিলেন, "গোবিন্দমাণিক্য নির্বাসিত ছোটো ভাইকে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ একখানি চিঠি লিখিয়াছেন।"

নক্ষত্ররায় পরম উপেক্ষার ভান করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "সত্য না কি? কী চিঠি? কই দেখি।" বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "সে চিঠি মহারাজকে দেখানো আমি আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। তখনই ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। বলিয়াছি, যুদ্ধ ছাড়া ইহার আর কোনো উত্তর নাই।"

নক্ষত্ররায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেশ করিয়াছ ঠাকুর! তুমি বলিয়াছ যুদ্ধ ছাড়া ইহার আর কোনো উত্তর নাই? বেশ উত্তর দিয়াছ।"

রঘুপতি কহিলেন, "গোবিন্দমাণিক্য উত্তর শুনিয়া ভাবিবে যে, যখন নির্বাসন দিয়াছিলাম তখন তো ভাই বেশ সহজে গিয়াছিল, কিন্তু সেই ভাই ঘরে ফিরিয়া আসিবার সময় তো কম গোলযোগ করিতেছে না।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "মনে করিবেন, ভাইটি বড়ো সহজ লোক নয়! মনে করিলেই যে যখন ইচ্ছা নির্বাসন দিব এবং যখন ইচ্ছা ডাকিয়া লইব, সেটি হইবার জো নাই।" বলিয়া অত্যন্ত আনন্দে দ্বিতীয়বার হাসিতে লাগিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্ররায়ের উত্তর শুনিয়া গোবিন্দমাণিক্য অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। বিল্বন মনে করিলেন, এবারে হয়তো মহারাজা আপত্তি প্রকাশ করিবেন না। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য বলিলেন, "এ কথা কখনোই নক্ষত্ররায়ের কথা নহে। এ সেই পুরোহিত বলিয়া পাঠাইয়াছে। নক্ষত্রের মুখ দিয়া এমন কথা কখনোই বাহির হইতে পারে না।"

বিল্বন কহিলেন, "মহারাজ এক্ষণে কী উপায় স্থির করিলেন?"

রাজা কহিলেন, "আমি নক্ষত্রের সঙ্গে কোনোক্রমে একবার দেখা করিতে পাই, তাহা হইলে সমস্ত মিটমাট করিয়া দিতে পারি।"

বিল্বন কহিলেন, "আর, দেখা যদি না হয়?"

রাজা। তাহা হইলে আমি রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইব।

বিল্বন কহিলেন, "আচ্ছা, আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

পাহাড়ের উপর নক্ষত্ররায়ের শিবির। ঘন জঙ্গল। বাঁশবন, বেতবন, খাগড়ার বন। নানাবিধ লতাগুল্মে ভূমি আচ্ছন্ন। সৈন্যেরা বন্য হস্তীদের চড়িবার পথ অনুসরণ করিয়া শিখরে উঠিয়াছে। তখন অপরাহ্ণ। সূর্য পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে হেলিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব প্রান্তে অন্ধকার করিয়াছে। গোধূলির ছায়া ও তরুর ছায়ায় মিলিয়া বনের মধ্যে অকালে সন্ধ্যার আবির্ভাব হইয়াছে। শীতের সায়াহ্নে ভূমিতল হইতে কুয়াশার মতো বাষ্প উঠিতেছে। ঝিল্লির শব্দে নিস্তব্ধ বন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। বিল্বন যখন শিবিরে গিয়া পৌঁছিলেন তখন সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত গেছেন, কিন্তু পশ্চিম আকাশে সুবর্ণরেখা মিলাইয়া যায় নাই। পশ্চিম দিকের সমতল উপত্যকায় স্বর্ণচ্ছায়ায় রঞ্জিত ঘন বন নিস্তব্ধ সবুজ সমুদ্রের মতো দেখাইতেছে। সৈন্যেরা কাল প্রভাতে

যাত্রা করিবে। রঘুপতি একদল সেনা ও সেনাপতিকে সঙ্গে লইয়া পথ-অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন এখনো ফিরিয়া আসেন নাই। যদিও রঘুপতির অজ্ঞাতসারে নক্ষত্ররায়ের নিকটে কোনো লোক আসা নিষেধ ছিল, তথাপি সন্ন্যাসী-বেশধারী বিল্বনকে কেহই বাধা দিল না।

বিল্বন নক্ষত্ররায়কে গিয়া কহিলেন, "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য আপনাকে স্মরণ করিয়া এই পত্র লিখিয়াছেন।" বলিয়া পত্র নক্ষত্ররায়ের হস্তে দিলেন। নক্ষত্ররায় কম্পিত হস্তে পত্র গ্রহণ করিলেন। সে পত্র খুলিতে তাঁহার লজ্জা ও ভয় হইতে লাগিল। যতক্ষণ রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁহার মধ্যে আড়াল করিয়া দাঁড়ায় ততক্ষণ নক্ষত্ররায় বেশ নিশ্চিন্ত থাকেন। তিনি কোনোমতেই গোবিন্দমাণিক্যকে যেন দেখিতে চান না। গোবিন্দমাণিক্যের এই দূত একেবারে নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে নক্ষত্ররায় কেমন যেন সংকুচিত হইয়া পড়িলেন, এবং মনে মনে ঈষৎ বিরক্ত হইলেন। ইচ্ছা হইতে লাগিল, রঘুপতি যদি উপস্থিত থাকিতেন এবং এই দূতকে তাঁহার কাছে আসিতে না দিতেন। মনের মধ্যে নানা ইতস্তত করিয়া পত্র খুলিলেন।

তাহার মধ্যে কিছুমাত্র ভর্ৎসনা ছিল না। গোবিন্দমাণিক্য তাঁহাকে লজ্জা দিয়া একটি কথাও বলেন নাই। ভাইয়ের প্রতি লেশমাত্র অভিমান প্রকাশ করেন নাই। নক্ষত্ররায় যে সৈন্যসামন্ত লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন, সে কথার উল্লেখমাত্র করেন নাই। উভয়ের মধ্যে পূর্বে যেমন ভাব ছিল এখনো অবিকল যেন সেই ভাবই আছে। অথচ সমস্ত পত্রের মধ্যে একটি সুগভীর স্নেহ ও বিষাদ প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে—তাহা কোনো স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত হয় নাই বলিয়া নক্ষত্ররায়ের হৃদয়ে অধিক আঘাত লাগিল।

চিঠি পড়িতে পড়িতে অল্পে অল্পে তাঁহার মুখভাবের পরিবর্তন হইতে লাগিল। হৃদয়ের পাষাণ-আবরণ দেখিতে দেখিতে ফাটিয়া গেল। চিঠি তাহার কম্পমান হাতে কাঁপিতে লাগিল। সে চিঠি লইয়া কিয়ৎক্ষণ মাথায় ধারণ করিয়া রাখিলেন। সে চিঠির মধ্যে ভ্রাতার যে আশীর্বাদ ছিল তাহা যেন শীতল নির্ঝরের মতো তাঁহার তপ্ত হৃদয়ে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্থির হইয়া সুদূর পশ্চিমের সন্ধ্যারাগরক্ত শ্যামল বনভূমির দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। চারি দিকে নিস্তব্ধ সন্ধ্যা অতলস্পর্শ শব্দহীন শান্ত সমুদ্রের মতো জাগিয়া রহিল। ক্রমে তাঁহার চক্ষে জল দেখা দিল, দ্রুতবেগে অশ্রু পড়িতে লাগিল। সহসা লজ্জায় ও অনুতাপে নক্ষত্ররায় দুই হাতে মুখ প্রচ্ছন্ন করিয়া ধরিলেন।

কাঁদিয়া বলিলেন, "আমি এ রাজ্য চাই না। দাদা, আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিয়া আমাকে তোমার পদতলে স্থান দাও, আমাকে তোমার কাছে রাখিয়া দাও, আমাকে দূরে তাড়াইয়া দিয়ো না।"

বিল্বন একটি কথাও বলিলেন না—চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে নক্ষত্ররায় যখন প্রশান্ত হইলেন তখন বিল্বন কহিলেন, "যুবরাজ, আপনার পথ চাহিয়া গোবিন্দমাণিক্য বসিয়া আছেন, আর বিলম্ব করিবেন না।"

নক্ষত্ররায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে তিনি কি মাপ করিবেন?"

বিল্বন কহিলেন, "তিনি যুবরাজের প্রতি কিছুমাত্র রাগ করেন নাই। অধিক রাত্রি হইলে

পথে কষ্ট হইবে। শীঘ্র একটি অশ্ব লউন। পর্বতের নীচে মহারাজের লোক অপেক্ষা করিয়া আছে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আমি গোপনে পলায়ন করি সৈন্যদের কিছু জানাইয়া কাজ নাই। আর তিলমাত্র বিলম্ব করিয়া কাজ নাই, যত শীঘ্র এখান হইতে বাহির হইয়া পড়া যায় ততই ভালো।"

বিল্বন কহিলেন, 'ঠিক কথা।"

তিনমুড়া পাহাড়ে সন্ন্যাসীর সহিত শিবলিঙ্গের পূজা করিতে যাইতেছেন বলিয়া নক্ষত্ররায় বিল্বনের সহিত অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন। অনুচরগণ সঙ্গে যাইতে চাহিল, তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন।

সবে বাহির হইয়াছেন মাত্র, এমন সময় অশ্বের খুরধ্বনি ও সৈন্যদের কোলাহল শুনিতে পাইলেন। নক্ষত্ররায় নিতান্ত সংকুচিত হইয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে রঘুপতি সৈন্য লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "মহারাজ, কোথায় যাইতেছেন?" নক্ষত্ররায় কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না।

নক্ষত্ররায়কে নিরুত্তর দেখিয়া বিল্বন কহিলেন, "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন।"

রঘুপতি বিল্বনের আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিলেন। একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, তার পরে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন, "আজ এমন অসময়ে আমরা আমাদের মহারাজকে বিদায় দিতে পারি না। ব্যস্ত হইবার তো কোনো কারণ নাই। কাল প্রাতঃকালে যাত্রা করিলেই তো হইবে। কী বলেন মহারাজ?"

নক্ষত্ররায় মৃদুস্বরে কহিলেন, "কাল সকালেই যাইব, আজ রাত হইয়া গেছে।"

বিল্বন নিরাশ হইয়া সে রাত্রি শিবিরেই যাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে নক্ষত্ররায়ের নিকট যাইবার চেষ্টা করিলেন, সৈন্যেরা বাধা দিল। দেখিলেন, চতুর্দিকে পাহারা, কোনো দিকে ছিদ্র নাই। অবশেষে রঘুপতির নিকট গিয়া কহিলেন, "যাত্রার সময় হইয়াছে, যুবরাজকে সংবাদ দিন।"

রঘুপতি কহিলেন, "মহারাজ যাইবেন না স্থির করিয়াছেন।"

বিল্বন কহিলেন, "আমি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।"

রঘুপতি। সাক্ষাৎ হইবে না তিনি বলিয়া দিয়াছেন।

বিল্বন কহিলেন, "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের পত্রের উত্তর চাই।"

রঘুপতি। পত্রের উত্তর ইতিপূর্বে আর-একবার দেওয়া হইয়াছে।

বিল্বন। আমি তাঁহার নিজমুখে উত্তর শুনিতে চাই।

রঘুপতি। তাহার কোনো উপায় নাই।

বিল্বন বুঝিলেন, বৃথা চেষ্টা; কেবল সময় ও বাক্য ব্যয়। যাইবার সময় রঘুপতিকে বলিয়া গেলেন, "ব্রাহ্মণ, এ কী সর্বনাশ-সাধনে তুমি প্রবৃত্ত হইয়াছ। এ তো ব্রাহ্মণের কাজ নয়।"

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিল্বন ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন, ইতিমধ্যে রাজা কুকিদের বিদায় করিয়া দিয়াছেন। তাহারা রাজ্যমধ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। সৈন্যদল প্রায় ভাঙিয়া দিয়াছেন। যুদ্ধের উদ্যোগ বড়ো একটা কিছু নাই। বিল্বন ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে সমস্ত বিবরণ বলিলেন।

রাজা কহিলেন, "তবে ঠাকুর, আমি বিদায় হই। নক্ষত্রের জন্য রাজ্য ধন রাখিয়া দিয়া চলিলাম।"

বিল্বন কহিলেন, "অসহায় প্রজাদিগকে পরহস্তে ফেলিয়া দিয়া আপনি পলায়ন করিবেন, ইহা স্মরণ করিয়া আমি কোনোমতেই প্রসন্নমনে বিদায় দিতে পারি না মহারাজ। বিমাতার হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া ভারমুক্ত মাতা শান্তিলাভ করিলেন—ইহা কি কল্পনা করা যায়?"

রাজা কহিলেন, "ঠাকুর, তোমার বাক্য আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া প্রবেশ করে। কিন্তু এবার আমাকে মার্জনা করো, আমাকে আর অধিক কিছু বলিয়ো না। আমাকে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিয়ো না। তুমি জান ঠাকুর, আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম রক্তপাত আর করিব না; সে প্রতিজ্ঞা আমি ভাঙিতে পারি না।"

বিল্বন কহিলেন, "তবে এখন মহারাজ কী করিবেন?"

রাজা কহিলেন, "তবে তোমাকে সমস্ত বলি। আমি ধ্রুবকে সঙ্গে করিয়া বনে যাইব। ঠাকুর, আমার জীবন অত্যন্ত অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহার কিছুই করিতে পারি নাই—জীবনের যতখানি চলিয়া গেছে তাহা ফিরিয়া পাইয়া আর নূতন করিয়া গড়িতে পারিব না—আমার মনে হইতেছে ঠাকুর, অদৃষ্ট যেন আমাদিগকে তীরের মতো নিক্ষেপ করিয়াছে, লক্ষ্য হইতে যদি একবার একটু বাঁকিয়া গিয়া থাকি তবে আর যেন সহস্র চেষ্টায় লক্ষ্যের মুখে ফিরিতে পারি না। জীবনের আরম্ভ-সময়ে আমি সেই যে বাঁকিয়া গিয়াছি জীবনের শেষকালে আমি আর লক্ষ্য খুঁজিয়া পাইতেছি না। যাহা মনে করি তাহা আর হয় না। যে সময়ে জাগিলে আত্মরক্ষা করিতে পারিতাম সে সময়ে জাগি নাই, যে সময়ে ডুবিয়াছি তখন চৈতন্য হইয়াছে! সমুদ্রে পড়িলে লোকে যে ভাবে কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বন করে, আমি বালক ধ্রুবকে সেই ভাবে অবলম্বন করিয়াছি। আমি ধ্রুবের মধ্যে আত্মসমাধান করিয়া ধ্রুবের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করিব। আমি প্রথম হইতে ধ্রুবকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিব। ধ্রুবের সহিত তিলে তিলে আমিই বাড়িতে থাকিব। আমার মানবজন্ম সম্পূর্ণ করিব। ঠাকুর, আমি মানুষের মতো নই, আমি রাজা হইয়া কী করিব?"

শেষ কথাটা রাজা অত্যন্ত আবেগের সহিত উচ্চারণ করিলেন। শুনিয়া ধ্রুব রাজার হাঁটুর উপর তাহার মাথা ঘষিয়া ঘষিয়া কহিল, "আমি আজা।"

বিল্বন হাসিয়া ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইলেন। অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অবশেষে রাজাকে কহিলেন, "বনে কি কখনো মানুষ গড়া যায়? বনে কেবল একটা উদ্ভিদ পালন করিয়া তোলা যাইতে পারে। মানুষ মানুষ্যসমাজেই গঠিত হয়।"

রাজা কহিলেন, "আমি নিতান্তই বনবাসী হইব না—মনুষ্যসমাজ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে থাকিব মাত্র, অথচ সমাজের সহিত সমস্ত যোগ বিচ্ছিন্ন করিব না। এ কেবল দিন-কতকের জন্য।"

এ দিকে নক্ষত্ররায় সৈন্য-সমতে রাজধানীর নিকটবর্তী হইলেন। প্রজাদের ধনধান্য লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রজারা কেবল গোবিন্দমাণিক্যকেই অভিশাপ দিতে লাগিল। তাহারা কহিল, "এ-সমস্তই কেবল রাজার পাপে ঘটিতেছে।"

রাজা একবার রঘুপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। রঘুপতি উপস্থিত হইলে তাঁহাকে কহিলেন, "আর কেন প্রজাদিগকে কষ্ট দিতেছ? আমি নক্ষত্ররায়কে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছি। তোমার মোগল-সৈন্যদের বিদায় করিয়া দাও।"

রঘুপতি কহিলেন, "যে আজ্ঞা, আপনি বিদায় হইলেই আমি মোগল সৈন্যদের বিদায় করিয়া দিব; ত্রিপুরা লুণ্ঠিত হয়, ইহা আমার ইচ্ছা নহে।"

রাজা সেই দিনই রাজ্য ছাড়িয়া যাত্রার উদ্যোগ করিলেন, তাঁহার রাজবেশ ত্যাগ করিলেন, গেরুয়াবসন পরিলেন। নক্ষত্ররায়কে রাজার সমস্ত কর্তব্য স্মরণ করাইয়া এক দীর্ঘ আশীর্বাদ-পত্র লিখিলেন।

অবশেষে রাজা ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া বলিলেন, "ধ্রুব, আমার সঙ্গে বনে যাবে বাছা?"

ধ্রুব তৎক্ষণাৎ রাজার গলা জড়াইয়া কহিল, "যাব।"

এমন সময় রাজার সহসা মনে হইল, ধ্রুবকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইলে তাহার খুড়া কেদারেশ্বরের সম্মতি আবশ্যক। কেদারেশ্বরকে ডাকিয়া রাজা কহিলেন, "কেদারেশ্বর, তোমার সম্মতি পাইলে আমি ধ্রুবকে আমার সঙ্গে লইয়া যাই।"

ধ্রুব দিনরাত্রি রাজার কাছেই থাকিত, তাহার খুড়ার সহিত তাহার বড়ো একটা সম্পর্ক ছিল না, এইজন্য বোধ করি রাজার কখনো মনে হয় নাই যে ধ্রুবকে সঙ্গে লইয়া গেলে কেদারেশ্বরের কোনো আপত্তি হইতে পারে।

রাজার কথা শুনিয়া কেদারেশ্বর কহিল, "সে আমি পারিব না মহারাজ!"

শুনিয়া রাজার চমক ভাঙিয়া গেল। সহসা তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "কেদারেশ্বর, তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো।"

কেদারেশ্বর। না মহারাজ, বনে যাইতে পারিব না।

রাজা কাতর হইয়া কহিলেন, "আমি বনে যাইব না, আমি ধনজন হইয়া লোকালয়ে থাকিব।"

কেদারেশ্বর কহিল, "আমি দেশ ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।"

রাজা কিছু না বলিয়া গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার সমস্ত আশা ম্রিয়মাণ হইয়া গেল। নিমেষের মধ্যে সমস্ত ধরণীর মুখ যেন পরিবর্তিত হইয়া গেল। ধ্রুব আপন মনে খেলা করিতেছিল—অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, অথচ তাহাকে যেন চোখে দেখিতে পাইলেন না। ধ্রুব তাঁহার কাপড়ের প্রান্ত ধরিয়া টানিয়া কহিল, "খেলা করো।"

রাজার সমস্ত হৃদয় গলিয়া অশ্রু হইয়া চোখের কাছে আসিল, অনেক কষ্টে অশ্রুজল দমন করিলেন। মুখ ফিরাইয়া ভগ্নহৃদয়ে কহিলেন , "তবে ধ্রুব রহিল। আমি একাই যাই।" অবশিষ্ট জীবনের সুদীর্ঘ মরুময় পথ যেন নিমেষের মধ্যে বিদ্যুদালোকে তাঁহার চক্ষুতারকায় অঙ্কিত হইল।

কেদারেশ্বর ধ্রুবের খেলা ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে বলিল, "আয়, আমার সঙ্গে আয়।" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিল।

ধ্রুব ক্রন্দনের স্বরে বলিয়া উঠিল, "না।"

রাজা সচকিত হইয়া ধ্রুবের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। ধ্রুব ছুটিয়া আসিয়া রাজাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকাইল। রাজা ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিলেন। বিশাল হৃদয় বিদীর্ণ হইতে চাহিতেছিল, ক্ষুদ্র ধ্রুবকে বুকের কাছে চাপিয়া হৃদয়কে দমন করিলেন। ধ্রুবকে সেই অবস্থায় কোলে রাখিয়া তিনি দীর্ঘ কক্ষে পদচারণ করিতে লাগিলেন; ধ্রুব কাঁধে মাথা রাখিয়া অত্যন্ত স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল।

অবশেষে যাত্রার সময় হইল। ধ্রুব রাজার কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘুমন্ত ধ্রুবকে ধীরে ধীরে কেদারেশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া রাজা যাত্রা করিলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পূর্বদ্বার দিয়া সৈন্যসামন্ত লইয়া নক্ষত্ররায় রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন, কিঞ্চিৎ অর্থ ও গুটিকতক অনুচর লইয়া পশ্চিমদ্বারাভিমুখে গোবিন্দমাণিক্য যাত্রা করিলেন। নগরের লোক বাঁশি বাজাইয়া, ঢাক-ঢোলের শব্দ করিয়া, হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির সহিত নক্ষত্ররায়কে আহ্বান করিল। গোবিন্দমাণিক্য যে পথ দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন সে পথে কেহই তাঁহাকে সমাদর করা আবশ্যক বিবেচনা করিল না। দুই পার্শ্বের কুটিরবাসিনী রমণীরা তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া গালি দিতে লাগিল; ক্ষুধায় ও ক্ষুধিত সন্তানদের ক্রন্দনে তাহাদের জিহ্বা শাণিত হইয়াছে। পরশ্ব গুরুতর দুর্ভিক্ষের সময়ে যে বৃদ্ধা রাজদ্বারে গিয়া আহার পাইয়াছিল এবং রাজা স্বয়ং যাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন সে তাহার শীর্ণ হস্ত তুলিয়া রাজাকে অভিশাপ দিতে লাগিল। ছেলেরা জননীর কাছ হইতে শিক্ষা পাইয়া বিদ্রূপ করিয়া চীৎকার করিতে করিতে রাজার পিছন পিছন চলিল।

দক্ষিণে বামে কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, সম্মুখে চাহিয়া, রাজা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। একজন জুমিয়া ক্ষেত্র হইতে আসিতেছিল, সে রাজাকে দেখিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল। রাজার হৃদয় আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি তাহার নিকটে স্নেহ-আকুল কণ্ঠে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। কেবল এই একটি জুমিয়া তাঁহার সমুদয় সন্তান প্রজাদের হইয়া তাঁহার রাজত্বের অবসানে তাঁহাকে ভক্তিভরে ম্লান হৃদয়ে বিদায় দিল। রাজার পশ্চাতে ছেলের পাল চীৎকার করিতেছে দেখিয়া সে মহাক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে তাড়া করিয়া গেল। রাজা তাহাকে নিষেধ করিলেন।

অবশেষে পথের যে অংশে কেদারেশ্বরের কুটির ছিল রাজা সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন একবার দক্ষিণে ফিরিয়া চাহিলেন। এখন শীতের প্রাতঃকাল। কুয়াশা কাটিয়া সূর্যরশ্মি সবে দেখা দিয়াছে। কুটিরের দিকে চাহিয়া রাজার গত বৎসরের আষাঢ় মাসের এক প্রাতঃকাল মনে পড়িল। তখন ঘনমেঘ ঘনবর্ষা। দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রের ন্যায় বালিকা হাসি অচেতনে শয্যার প্রান্তে মিলাইয়া শুইয়া আছে। ক্ষুদ্র তাতা তাহা কিছুই না বুঝিতে পারিয়া কখনো বা দিদির অঞ্চলের প্রান্ত মুখে পুরিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া আছে, কখনো বা তাহার গোল গোল ছোটো ছোটো মোটা হাত দিয়া আস্তে আস্তে দিদির মুখ চাপড়াইতেছে। আজিকার এই অগ্রহায়ণ মাসের শিশিরসিক্ত শুভ্র প্রাতঃকাল সেই আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। রাজার কি মনে পড়িল যে, যে অদৃষ্ট আজ তাঁহাকে রাজ্যত্যাগী ও অপমানিত করিয়া গৃহ হইতে বিদায় করিয়া দিতেছে সেই অদৃষ্ট এই ক্ষুদ্র কুটিরদ্বারে সেই আষাঢ়ের অন্ধকার প্রাতঃকালে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল? এইখানেই তাহার সহিত সেই প্রথম সাক্ষাৎ। রাজা অন্যমনস্ক হইয়া এই কুটিরের সম্মুখে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। তাঁহার অনুচরগণ ছাড়া তখন পথে আর কেহ লোক ছিল না। জুমিয়ার নিকট তাড়া খাইয়া ছেলেগুলো পালাইয়াছে, কিন্তু জুমিয়া দূরবর্তী হইতেই আবার তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাদের চীৎকারে চেতনালাভ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া, রাজা আবার ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন।

সহসা বালকদিগের চীৎকারের মধ্যে একটি সুমিষ্ট পরিচিত কণ্ঠ তাঁহার কানে আসিয়া প্রবেশ করিল। দেখিলেন, ছোটো ধ্রুব তাহার ছোটো ছোটো পা ফেলিয়া দুই হাত তুলিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিতেছে। কেদারেশ্বর নূতন রাজাকে আগেভাগে সম্মান প্রদর্শন করিতে গিয়াছে, কুটিরে কেবল ধ্রুব এবং এক বৃদ্ধা পরিচারিকা ছিল। গোবিন্দমাণিক্য ঘোড়া থামাইয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলেন। ধ্রুব ছুটিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া একেবারে তাঁহার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ধ্রুব তাঁহার কাপড় ধরিয়া টানিয়া, তাঁহার হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া তাহার প্রথম আনন্দের উচ্ছ্বাস অবসান হইলে পর গম্ভীর হইয়া রাজাকে বলিল, "আমি টক্‌টক্ চ'ব।"

রাজা তাহাকে ঘোড়ায় চড়াইয়া দিলেন। ঘোড়ার উপর চড়িয়া সে রাজার গলা জড়াইয়া ধরিল, এবং তাহার কোমল কপোলখানি রাজার কপোলের উপর নিবিষ্ট করিয়া রহিল। ধ্রুব তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে রাজার মধ্যে কী একটা পরিবর্তন অনুভব করিতে লাগিল। গভীর ঘুম ভাঙাইবার জন্য লোকে যেমন নানারূপ চেষ্টা করে, ধ্রুব তেমনি তাঁহাকে টানিয়া, তাঁহাকে জড়াইয়া তাঁহাকে চুমো খাইয়া, কোনোক্রমে তাঁহার পূর্বভাব ফিরাইয়া আনিবার অনেক চেষ্টা করিল। অবশেষে অকৃতকার্য হইয়া মুখের মধ্যে গোটা দুয়েক আঙুল পুরিয়া দিয়া বসিয়া রহিল। রাজা ধ্রুবের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বারবার চুম্বন করিলেন।

অবশেষে কহিলেন, "ধ্রুব, আমি তবে যাই।"

ধ্রুব রাজার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি যাব।"

রাজা বলিলেন, "তুমি কোথায় যাবে, তুমি তোমার কাকার কাছে থাকো।"

ধ্রুব কহিল, "না, আমি যাব।"

এমন সময় কুটির হইতে বৃদ্ধা পরিচারিকা বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে উপস্থিত হইল, সবেগে ধ্রুবের হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, "চল্।"

ধ্রুব অমনি সভয়ে সবলে দুই হাতে রাজাকে জড়াইয়া রাজার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া রাখিল। রাজা কাতর হইয়া ভাবিলেন বক্ষের শিরা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা যায়, তবু এ দুটি হাতের বন্ধন কি ছেঁড়া যায়? কিন্তু, তাও ছিঁড়িতে হইল। আস্তে আস্তে ধ্রুবের দুই হাত খুলিয়া বলপূর্বক ধ্রুবকে পরিচারিকার হাতে দিলেন। ধ্রুব প্রাণপণে কাঁদিয়া উঠিল; হাত তুলিয়া কহিল, "বাবা, আমি যাব।" রাজা আর পিছনে না চাহিয়া দ্রুত ঘোড়ায় চড়িয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। যত দূর যান ধ্রুবের আকুল ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন; ধ্রুব কেবল তাহার দুই হাত তুলিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা, আমি যাব।" অবশেষে রাজার প্রশান্তচক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি আর পথঘাট কিছুই দেখতে পাইলেন না। বাষ্পজালে সূর্যালোক এবং সমস্ত জগৎ যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ঘোড়া যে দিকে ইচ্ছা ছুটিতে লাগিল।

পথের মধ্যে এক জায়গায় এক-দল মোগল-সৈন্য আসিয়া রাজাকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে লাগিল, এমন-কি, তাঁহার অনুচরদের সহিত কিঞ্চিৎ কঠোর বিদ্রূপ আরম্ভ করিল। রাজার একজন সভাসদ অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন, তিনি এই দৃশ্য দেখিয়া রাজার নিকটে ছুটিয়া আসিলেন। কহিলেন, "মহারাজ, এ অপমান তো আর সহ্য হয় না। মহারাজের এই দীনবেশ দেখিয়া ইহার এরূপ সাহসী হইয়াছে। এই লউন তরবারি, এই লউন উষ্ণীষ। মহারাজ, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমি আমার লোক লইয়া আসিয়া এই বর্বরদিগকে শিক্ষা দিই।"

রাজা কহিলেন, "না নয়নরায়, আমার তরবারি উষ্ণীষে প্রয়োজন নাই। ইহারা আমার কী করিবে? আমি এখন ইহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর অপমান সহ্য করিতে পারি। মুক্ত তরবারি তুলিয়া আমি এ পৃথিবীতে লোকের নিকট হইতে আর সম্মান আদায় করিতে চাহি না। পৃথিবীর সর্বসাধারণে যেরূপ সুসময়ে ও দুঃসময়ে মান অপমান সুখদুঃখ সহ্য করিয়া থাকে আমিও জগদীশ্বরের মুখ চাহিয়া সেইরূপ সহ্য করিব। বন্ধুরা বিপক্ষ হইতেছে, আশ্রিতেরা কৃতঘ্ন হইতেছে, প্রণতেরা দুর্বিনীত হইয়া উঠিতেছে, এককালে হয়তো ইহা আমার অসহ্য হইত, কিন্তু এখন ইহা সহ্য করিয়াই আমি হৃদয়ের মধ্যে আনন্দ লাভ করিতেছি। যিনি আমার বন্ধু তাঁহাকে আমি জানিয়াছি। যাও নয়নরায়, তুমি ফিরিয়া যাও, নক্ষত্রকে সমাদরপূর্বক আহ্বান করিয়া আনো, আমাকে যেমন সম্মান করিতে নক্ষত্রকেও তেমনি সম্মান করিয়ো। তোমরা সকলে মিলিয়া সর্বদা নক্ষত্রকে সুপথে এবং প্রজার কল্যাণে রক্ষা করো, তোমাদের কাছে আমার বিদায়কালের এই প্রার্থনা। দেখিয়ো, ভ্রমেও কখনো যেন আমার কথা উল্লেখ করিয়া বা আমার সহিত তুলনা করিয়া তাহার তিলমাত্র নিন্দা করিয়ো না। তবে আমি বিদায় হই।" বলিয়া রাজা তাঁহার সভাসদের সহিত কোলাকুলি করিয়া অগ্রসর হইলেন, সভাসদ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অশ্রুজল মুছিয়া চলিয়া গেলেন।

যখন রাজা গোমতীতীরের উচ্চ পাড়ের কাছে গিয়া পৌঁছিলেন তখন বিল্বন ঠাকুর অরণ্য হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া অঞ্জলি তুলিয়া কহিলেন, "জয় হউক।"

রাজা অশ্ব হইতে নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

বিল্বন কহিলেন, "আমি আপনার কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

রাজা কহিলেন, "ঠাকুর, তুমি নক্ষত্রের কাছে থাকিয়া তাহাকে সৎপরামর্শ দাও। রাজ্যের হিতসাধন করো।"

বিল্বন কহিলেন, "না। আপনি যেখানে রাজা নহেন সেখানে আমি অকর্মণ্য। এখানে থাকিয়া আমি আর কোনো কাজ করিতে পারিব না।"

রাজা কহিলেন, "তবে কোথায় যাইবে ঠাকুর? আমাকে তবে দয়া করো, তোমাকে পাইলে আমি দুর্বল হৃদয়ে বল পাই।"

বিল্বন কহিলেন, "কোথায় আমার কাজ আছে আমি তাহাই অনুসন্ধান করিতে চলিলাম। আমি কাছে থাকি আর দূরে থাকি, আপনার প্রতি আমার প্রেম কখনো বিচ্ছিন্ন হইবে না জানিবেন। কিন্তু আপনার সহিত বনে গিয়া কী করিব?"

রাজা মৃদুস্বরে কহিলেন, "তবে আমি বিদায় হই।" বলিয়া দ্বিতীয়বার প্রণাম করিলেন। বিল্বন এক দিকে চলিয়া গেলেন, রাজা অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্ররায় ছত্রমাণিক্য নাম ধারণ করিয়া মহাসমারোহে রাজপদ গ্রহণ করিলেন। রাজকোষে অর্থ অধিক ছিল না। প্রজাদের যথাসর্বস্ব হরণ করিয়া প্রতিশ্রুত অর্থ দিয়া মোগল-সৈন্যদের বিদায় করিতে হইল। ঘোরতর দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য লইয়া ছত্রমাণিক্য রাজত্ব করিতে লাগিলেন। চতুর্দিক হইতে অভিশাপ ও ক্রন্দন বর্ষিত হইতে লাগিল।

যে আসনে গোবিন্দমাণিক্য বসিতেন, যে শয্যায় গোবিন্দমাণিক্য শয়ন করিতেন, যে-সকল লোক গোবিন্দমাণিক্যের প্রিয় সহচর ছিল, তাহারা যেন রাত্রিদিন নীরবে ছত্রমাণিক্যকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। ছত্রমাণিক্যের ক্রমে তাহা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তিনি চোখের সম্মুখ হইতে গোবিন্দমাণিক্যের সমস্ত চিহ্ন মুছিতে আরম্ভ করিলেন। গোবিন্দমাণিক্যের ব্যবহার্য সামগ্রী নষ্ট করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার প্রিয় অনুচরদিগকে দূর করিয়া দিলেন। গোবিন্দমাণিক্যের নামগন্ধ তিনি আর সহ্য করিতে পারিতেন না। গোবিন্দমাণিক্যের কোনো উল্লেখ হইলেই তাঁহার মনে হইত সকলে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই এই উল্লেখ করিতেছে। সর্বদা মনে হইত, সকলে তাঁহাকে রাজা বলিয়া যথেষ্ট সম্মান করিতেছে না—এইজন্য সহসা অকারণে ক্ষাপা হইয়া উঠিতেন, সভাসদ্‌দিগকে শশব্যস্ত থাকিতে হইত।

তিনি রাজকার্য কিছুই বুঝিতেন না, কিন্তু কেহ পরামর্শ দিতে আসিলে তিনি চটিয়া উঠিয়া বলিতেন, "আমি আর এইটে বুঝি নে! তুমি কি আমাকে নির্বোধ পাইয়াছ?"

তাঁহার মনে হইত, সকলে তাঁহাকে সিংহাসনে অনধিকারী রাজ্যাপহারক জ্ঞান করিয়া মনে মনে তাচ্ছিল্য করিতেছে, এইজন্য সজোরে অত্যধিক রাজা হইয়া উঠিলেন। যথেচ্ছাচরণ করিয়া সর্বত্র তাঁহার একাধিপত্য প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি যে রাখিলে রাখিতে পারেন মারিলে মারিতে পারেন, ইহা বিশেষরূপে প্রমাণ করিবার জন্য যাহাকে রাখা উচিত নহে তাহাকে রাখিলেন, যাহাকে মারা উচিত নহে তাহাকে মারিলেন। প্রজারা অন্নাভাবে মরিতেছে, কিন্তু তাঁহার দিনরাত্রি সমারোহের শেষ নাই—অহরহ নৃত্যগীতবাদ্য ভোজ। ইতিপূর্বে আর কোনো রাজা সিংহাসনে চড়িয়া বসিয়া রাজত্বের পেখম সমস্তটা ছড়াইয়া দিয়া এমন অপূর্ব নৃত্য করে নাই।

প্রজারা চারি দিকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল—ছত্রমাণিক্য তাহাতে অত্যন্ত জ্বলিয়া উঠিলেন; তিনি অসন্তোষের দ্বিগুণ কারণ জন্মাইয়া দিয়া বলপূর্বক, পীড়নপূর্বক, ভয় দেখাইয়া সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন—সমস্ত রাজ্য নিদ্রিত নিশীথের মতো নীরব হইয়া গেল। সেই শান্ত নক্ষত্ররায় ছত্রমাণিক্য হইয়া যে সহসা এরূপ আচরণ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। অনেক সময়েই দুর্বলহৃদয়েরা প্রভুত্ব পাইলে এইরূপ প্রচণ্ড ও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠে।

রঘুপতির কাজ শেষ হইয়া গেল। শেষ পর্যন্তই যে প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে সমান জাগ্রত ছিল তাহা নহে। ক্রমে প্রতিহিংসার ভাব ঘুচিয়া গিয়া যে কাজে হাত দিয়াছেন সেই কাজটা সম্পন্ন করিয়া তোলাই তাঁহার একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। নানা কৌশলে বাধাবিপত্তি সমস্ত অতিক্রম করিয়া দিনরাত্রি একটা উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি একপ্রকার মাদকসুখ অনুভব করিতেছিলেন। অবশেষে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গেল। পৃথিবীতে আর কোথাও সুখ নাই।

রঘুপতি তাঁহার মন্দিরে গিয়া দেখিলেন, সেখানে জনপ্রাণী নাই। যদিও রঘুপতি বিলক্ষণ জানিতেন যে, জয়সিংহ নাই, তথাপি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া যেন দ্বিতীয়বার নূতন করিয়া জানিলেন যে, জয়সিংহ নাই। এক-একবার মনে হইতে লাগিল যেন আছে, তার পরে স্মরণ হইতে লাগিল যে নাই। সহসা বায়ুতে কপাট খুলিয়া গেল; তিনি চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, জয়সিংহ আসিল না। জয়সিংহ যে ঘরে থাকিত, মনে হইল, সে ঘরে জয়সিংহ থাকিতেও পারে—কিন্তু অনেকক্ষণ সে ঘরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না; মনে ভয় হইতে লাগিল, পাছে গিয়া দেখেন জয়সিংহ সেখানে নাই।

অবশেষে যখন গোধূলির ঈষৎ অন্ধকারে বনের ছায়া গাঢ়তর ছায়ায় মিলাইয়া গেল তখন রঘুপতি ধীরে ধীরে জয়সিংহের গৃহে প্রবেশ করিলেন—শূন্য বিজন গৃহ সমাধিভবনের মতো নিস্তব্ধ। ঘরের মধ্যে এক পাশে একটি কাঠের সিন্দুক এবং সিন্দুকের পার্শ্বে জয়সিংহের একজোড়া খড়ম ধুলিমলিন হইয়া পড়িয়া আছে। ভিত্তিতে জয়সিংহের স্বহস্তে আঁকা কালীমূর্তি। ঘরের পূর্বকোণে একটি ধাতুপ্রদীপ ধাতু-আধারের উপর দাঁড়াইয়া আছে, গত বৎসর হইতে সে প্রদীপ কেহ জ্বালায় নাই—মাকড়সার জালে সে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। নিকটবর্তী

দেয়ালে প্রদীপশিখার কালো দাগ পড়িয়া আছে। গৃহে পূর্বোক্ত কয়েকটি দ্রব্য ছাড়া আর কিছুই নাই। রঘুপতি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। সে নিশ্বাস শূন্য গৃহে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। ক্রমে অন্ধকারে আর কিছুই দেখা যায় না। একটা টিকটিকি মাঝে মাঝে কেবল টিক্‌টিক শব্দ করিতে লাগিল। মুক্ত দ্বার দিয়া ঘরে মধ্যে শীতের বায়ু প্রবেশ করিতে লাগিল। রঘুপতি সিন্দুকের উপর বসিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

এইরূপে একমাস এই বিজন মন্দিরে কাটাইলেন, কিন্তু এমন করিয়া আর দিন কাটে না। পৌরোহিত্য ছাড়িতে হইল। রাজসভায় গেলেন। রাজশাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, অবিচার উৎপীড়ন ও বিশৃঙ্খলা ছত্রমাণিক্য নাম ধরিয়া রাজত্ব করিতেছেন। তিনি রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। ছত্রমাণিক্যকে পরামর্শ দিতে গেলেন।

ছত্রমাণিক্য চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, রাজ্যশাসনকার্যের তুমি কী জান? এ-সব বিষয় তুমি কিছু বুঝ না।"

রঘুপতি রাজার প্রতাপ দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। দেখিলেন, সে নক্ষত্ররায় আর নাই। রঘুপতির সহিত রাজার ক্রমাগত খিটিমিটি বাধিতে লাগিল। ছত্রমাণিক্য মনে করিলেন যে, রঘুপতি কেবলই ভাবিতেছে যে, রঘুপতিই তাঁহাকে রাজা করিয়া দিয়াছে। এইজন্য রঘুপতিকে দেখিলে তাঁহার অসহ্য বোধ হইত।

অবশেষে একদিন স্পষ্ট বলিলেন, "ঠাকুর, তুমি তোমার মন্দিরের কাজ করোগে। রাজসভায় তোমার কোনো প্রয়োজন নাই।"

রঘুপতি ছত্রমাণিক্যের প্রতি জ্বলন্ত তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ছত্রমাণিক্য ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্ররায় যেদিন নগর-প্রবেশ করেন কেদারেশ্বর সেইদিনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়; কিন্তু বহু চেষ্টাতেও সে তাঁহার নজরে পড়িল না। সৈন্যরা ও প্রহরীরা তাহাকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া তাড়া দিয়া, নাড়া দিয়া, বিব্রত করিয়া তুলিল। অবশেষে সে প্রাণ লইয়া পালাইয়া যায়। গোবিন্দমাণিক্যের আমলে সে রাজভোগে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া প্রাসাদে বাস করিত—যুবরাজ নক্ষত্ররায়ের সহিত তাহার বিশেষ প্রণয়ও ছিল। কিছুকাল প্রাসাদচ্যুত হইয়া তাহার জীবনধারণ করা দায় হইয়া উঠিয়াছে; যখন সে রাজার ছায়ায় ছিল তখন সকলে তাহাকে সভয়ে সম্মান করিত, কিন্তু এখন তাহাকে কেহই আর গ্রাহ্য করে না। পূর্বে রাজসভায় কাহারো কিছু প্রয়োজন হইলে আসিয়া তাহাকে হাতে-পায়ে ধরিত, এখন পথ দিয়া চলিবার সময় কেহ তাহার সঙ্গে দুটো কথা কহিবার অবসর পায় না। ইহার উপরে আবার অন্নকষ্টও হইয়াছে। এমন অবস্থায় প্রাসাদে পুনর্বার প্রবেশ করিতে পারিলে তাহার বিশেষ সুবিধা হয়। সে একদিন অবসরমত কিছু ভেট সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ্য রাজ-দরবারে ছত্রমাণিক্যের সহিত দেখা করিতে

গেল। পরম পরিতোষপ্রকাশপূর্বক অত্যন্ত পোষ-মানা বিনীত হাস্য হাসিতে হাসিতে রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাজা তাহাকে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "হাসি কিসের জন্য! তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা পাইয়াছ! তুমি এ কি রহস্য করিতে আসিয়াছ!"

অমনি চোপদার জমাদার বরকন্দাজ মন্ত্রী অমাত্য সকলেই হাঁকার দিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ কেদারেশ্বরের বিকশিত দন্তপঙ্‌ক্তির উপর যবনিকা-পতন হইল।

ছত্রমাণিক্য কহিলেন, "তোমার কী বলিবার আছে শীঘ্র বলিয়া চলিয়া যাও।"

কেদারেশ্বরের কী বলিবার ছিল মনে পড়িল না। অনেক কষ্টে সে মনে মনে যে বক্তৃতাটুকু গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা পেটের মধ্যেই চুরমার হইয়া গেল।

অবশেষে রাজা যখন বলিলেন "তোমার যদি কিছু বলিবার না থাকে তো চলিয়া যাও", তখন কেদারেশ্বর চট্‌পট্ একটা যা হয় কিছু বলা আবশ্যক বিবেচনা করিল।

চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে সহসা প্রচুর পরিমাণে করুণরস সঞ্চার করিয়া বলিল, "মহারাজ, ধ্রুবকে কি ভুলিয়া গিয়াছেন?"

ছত্রমাণিক্য অত্যন্ত আগুন হইয়া উঠিলেন। মুর্খ কেদারেশ্বর কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "সে যে মহারাজের জন্য 'কাকা কাকা' করিয়া কাঁদিয়া সারা হইতেছে।"

ছত্রমাণিক্য কহিলেন, "তোমার আস্পর্ধা তো কম নয় দেখিতেছি! তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে কাকা বলে। তুমি তাহাকে এই শিক্ষা দিয়াছ!"

কেদারেশ্বর অত্যন্ত কাতরভাবে জোড়হস্তে কহিল, "মহারাজ—"

ছত্রমাণিক্য কহিলেন, "কে আছ হে— ইহাকে আর সেই ছেলেটাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দাও তো।"

সহসা স্কন্ধের উপর এতগুলো প্রহরীর হাত আসিয়া পড়িল যে, কেদারেশ্বর তীরের মতো একেবারে বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িল। হাত হইতে তাহার ডালি কাড়িয়া লইয়া প্রহরীরা তাহা ভাগ করিয়া লইল। ধ্রুবকে লইয়া কেদারেশ্বর ত্রিপুরা পরিত্যাগ করিল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

রঘুপতি আবার মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন, কোনো প্রেমপূর্ণ হৃদয় বস্ত্রাদি লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই। পাষাণ মন্দির দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মধ্যে কোথাও হৃদয়ের লেশমাত্র নাই। তিনি গিয়া গোমতীতীরের শ্বেত সোপানের উপর বসিলেন। সোপানের বাম পার্শ্বে জয়সিংহের স্বহস্তে রোপিত শেফালিকা গাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে। এই ফুলগুলি দেখিয়া জয়সিংহের সুন্দর মুখ, সরল হৃদয়, সরল জীবন এবং অত্যন্ত সহজ বিশুদ্ধ উন্নত ভাব তাঁহার স্পষ্ট মনে পড়িতে লাগিল। সিংহের ন্যায় সবল তেজস্বী এবং হরিণশিশুর মতো সুকুমার জয়সিংহ রঘুপতির হৃদয়ে সম্পূর্ণ আবির্ভূত হইল, তাঁহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া

লইল। ইতিপূর্বে তিনি আপনাকে জয়সিংহের চেয়ে অনেক বড়ো জ্ঞান করিতেন, এখন জয়সিংহকে তাঁহার নিজের চেয়ে অনেক বড়ো মনে হইতে লাগিল। তাঁহার প্রতি জয়সিংহের সেই সরল ভক্তি স্মরণ করিয়া জয়সিংহের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভক্তির উদয় হইল, এবং নিজের প্রতি তাঁহার অভক্তি জন্মিল। জয়সিংহকে যে-সকল অন্যায় তিরস্কার করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। তিনি মনে মনে কহিলেন, 'জয়সিংহকে র্ভৎসনার আমি অধিকারী নই; জয়সিংহের সহিত যদি এক মুহূর্তের জন্য একটিবার দেখা হয় তবে আমি আমার হীনত্ব স্বীকার করিয়া তাহার নিকট একবার মার্জনা প্রার্থনা করি।' জয়সিংহ যখন যাহা যাহা বলিয়াছে, করিয়াছে সমস্ত তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। জয়সিংহের সমস্ত জীবন সংহত ভাবে তাঁহার মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি এইরূপ একটি মহৎ চরিত্রের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া সমস্ত বিবাদ বিদ্বেষ ভুলিয়া গেলেন। চারি দিকের গুরুভার সংসার লঘু হইয়া গিয়া তাঁহাকে পীড়ন করিতে বিরত হইল। যে নক্ষত্রমাণিক্যকে তিনিই রাজা করিয়া দিয়াছেন সে যে রাজা হইয়া তাঁহাকেই অপমান করিয়াছে ইহা স্মরণ করিয়া তাঁহার কিছুমাত্র রোষ জন্মিল না। এই মান-অপমান সমস্তই সামান্য মনে করিয়া তাঁহার ঈষৎ হাসি আসিল। কেবল তাঁহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, জয়সিংহ যাহাতে যথার্থ সন্তুষ্ট হয় এমন একটা-কিছু কাজ করেন। অথচ চতুর্দিকে কাজ কিছুই দেখিতে পাইলেন না—চতুর্দিকে শূন্য হাহাকার করিতেছে। এই বিজন মন্দির তাঁহাকে যেন চাপিয়া ধরিল, তাঁহার যেন নিশ্বাস রোধ করিল; একটা-কিছু বৃহৎ কাজ করিয়া তিনি হৃদয়বেদনা শান্ত করিয়া রাখিবেন, কিন্তু এই-সকল নিস্তব্ধ নিরুদ্যম নিরালয় মন্দিরে দিকে চাহিয়া পিঞ্জরবদ্ধ পাখির মতো তাঁহার হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া বনের মধ্যে অধীর ভাবে পদচারণ করিতে লাগিলেন। মন্দিরের ভিতরকার অলস অচেতন অকর্মণ্য জয়প্রতিমাগুলির প্রতি তাঁহার অতিশয় ঘৃণার উদয় হইল। হৃদয় যখন বেগে উদ্‌বেল হইয়া উঠিয়াছে তখন কতকগুলি নিরুদ্যম স্থূল পাষাণমূর্তির নিরুদ্যম সহচর হইয়া চিরদিন অতিবাহিত করা তাঁহার নিকেট অত্যন্ত হেয় বলিয়া বোধ হইল। যখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইল, রঘুপতি চক্‌মকি ঠুকিয়া একটি প্রদীপ জ্বালাইলেন। দীপ-হস্তে চর্তুদশ দেতার মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখিলেন, চতুর্দশ দেবতা সমান ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে, গত বৎসর আষাঢ়ের কালরাত্রে ক্ষীণ দীপালোকে ভক্তের মৃতদেহের সম্মুখে রক্ত প্রবাহের মধ্যে যেমন বুদ্ধিহীন হৃদয়হীনের মতো দাঁড়াইয়া ছিল, আজও তেমনি দাঁড়াইয়া আছে। রঘুপতি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মিথ্যা কথা! সমস্ত মিথ্যা! হা বৎস জয়সিংহ, তোমার অমূল্য হৃদয়ের রক্ত কাহাকে দিলে! এখানে কোনো দেবতা নাই, কোনো দেবতা নাই! পিশাচ রঘুপতি সে রক্ত পান করিয়াছে!" বলিয়া কালীর প্রতিমা রঘুপতি আসন হইতে টানিয়া তুলিয়া লইলেন। মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সবলে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অন্ধকারে পাষাণসোপানের উপর দিয়া পাষাণপ্রতিমা শব্দ করিয়া গড়াইতে গড়াইতে গোমতীর জলের মধ্যে পড়িয়া গেল। অজ্ঞানরাক্ষসী পাষাণ-আকৃতি ধারণ করিয়া এতদিন রক্তপান

করিতেছিল, সে আজ গোমতীগর্ভের সহস্র পাষাণের মধ্যে অদৃশ্য হইল, কিন্তু মানবের কঠিন হৃদয়াসন কিছুতেই পরিত্যাগ করিল না। রঘুপতি দীপ নিবাইয়া দিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেন, সেই রাত্রেই রাজধানী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নোয়াখালির নিজামৎপুরে বিল্বন ঠাকুর কিছুদিন হইতে বাস করিতেছেন। সেখানে ভয়ংকর মড়কের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি একদিন সমস্ত দিন মেঘ করিয়া থাকে, মাঝে মাঝে অল্প অল্প বৃষ্টিও হয়। অবশেষে সন্ধ্যার সময় রীতিমত ঝড় আরম্ভ হয়। প্রথমে পূর্ব দিক হইতে বায়ু বহিতে থাকে। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় উত্তর ও উত্তর-পূর্ব হইতে প্রবল বেগে ঝড় বহিতে লাগিল। অবশেষে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া ঝড়ের বেগ কমিয়া গেল। এমন সময়ে রব উঠিল 'বন্যা আসিতেছে'। কেহ ঘরের চালে উঠিল, কেহ পুষ্করিণীর পাড়ের উপর গিয়া দাঁড়াইল, কেহ বৃক্ষশাখায়, কেহ মন্দিরের চূড়ায় আশ্রয় হইল। অন্ধকার রাত্রি, অবিশ্রাম বৃষ্টি—বন্যার গর্জন ক্রমে নিকটবর্তী হইল, আতঙ্কে গ্রামের লোকেরা দিশাহারা হইয়া গেল। এমন সময়ে বন্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। উপরি-উপরি দুইবার তরঙ্গ আসিল, দ্বিতীয়বারের পরে গ্রামে প্রায় আট হাত জল দাঁড়াইল। পরদিন যখন সূর্য উঠিল এবং জল নামিয়া গেল তখন দেখা গেল—গ্রামে গৃহ অল্পই অবশিষ্ট আছে এবং লোক নাই; অন্য গ্রাম হইতে মানুষ-গোরু-মহিষ-ছাগল এবং শৃগাল-কুকুরের মৃতদেহ ভাসিয়া আসিয়াছে। সুপারির গাছগুলা ভাঙিয়া ভাসিয়া গেছে, গুঁড়ির কিয়দংশ মাত্র অবশিষ্ট আছে। বড়ো বড়ো আম-কাঁঠালের গাছ সমূলে উৎপাটিত হইয়া কাত হইয়া পড়িয়া আছে। অন্য গ্রামের গৃহের চাল ভাসিয়া আসিয়া ভিত্তির শোকে ইতস্তত উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। অনেকগুলো হাঁড়ি-কলসী বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। অধিকাংশ কুটিরই বাঁশঝাড় আম কাঁঠাল মাদার প্রভৃতি বড়ো বড়ো গাছের দ্বারা আবৃত ছিল, এইজন্য অনেকগুলি মানুষ একেবারে ভাসিয়া না গিয়া গাছে আটকাইয়া গিয়াছিল। কেহ-বা সমস্ত রাত্রি বন্যাবেগে দোদুল্যমান বাঁশঝাড়ে দুলিয়াছে, কেহ-বা মাদারের কন্টকে ক্ষতবিক্ষত, কেহ-বা উৎপাটিত বৃক্ষ সমেত ভাসিয়া গেছে। জল সরিয়া গেলে জীবিত ব্যক্তিরা নামিয়া আসিয়া মৃতের মধ্যে বিচরণ করিয়া আত্মীয়দিগকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। অধিকাংশ মৃতদেহই অপরিচিত এবং ভিন্ন গ্রাম হইতে আগত। কেহই তাহাদিগকে সৎকার করিল না। পালে পালে শকুনি আসিয়া মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে লাগিল। শৃগাল-কুকুরের সহিত তাহাদের কোনো বিবাদ নাই, কারণ শৃগাল-কুকুরও সমস্ত মরিয়া গিয়াছে। বারো-ঘর পাঠান গ্রামে বাস করিত; তাহারা অনেক উচ্চ জমিতে বাস করিত বলিয়া তাহাদের প্রায় কাহারো কোনো ক্ষতি হয় নাই।

অবশিষ্ট জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা গৃহ পাইল তাহারা গৃহে আশ্রয় লইল, যাহারা পাইল না তাহারা আশ্রয়-অন্বেষণে অন্যত্র গেল। যাহারা বিদেশে ছিল তাহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া নূতন গৃহ নির্মাণ করিল। ক্রমে অল্পে অল্পে পুনশ্চ লোকের বসতি আরম্ভ হইল; এই সময়ে মৃতদেহে পুষ্করিণীর জল দূষিত হইয়া এবং অন্যান্য নানা কারণে গ্রামে মড়ক আরম্ভ হইল। পাঠানদের পাড়ায় মড়কের প্রথম আরম্ভ হইল। মৃতদেহের গোর দিবার বা পরস্পরকে সেবা করিবার অবসর কাহারো রহিল না। হিন্দুরা কহিল, মুসলমানেরা গোহত্যা-পাপের ফল ভোগ করিতেছে। জাতিবৈরিতায় এবং জাতিচ্যুতিভয়ে কোনো হিন্দু তাহাদিগকে জল দিল না বা কোনোপ্রকার সাহায্য করিল না। বিল্বন ঠাকুর যখন গ্রামে আসিলেন তখন গ্রামের এইরূপ অবস্থা। বিল্বনের কতকগুলি চেলা জুটিয়াছিল, মড়কের ভয়ে তাহারা পালাইবার চেষ্টা করিল। বিল্বন ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে বিরত করিলেন। তিনি পীড়িত পাঠানদিগকে সেবা করিতে লাগিলেন। তাহাদিগকে পথ্য পানীয় ঔষধ এবং তাহাদের মৃতদেহ গোর দিতে লাগিলেন। হিন্দুরা হিন্দু সন্ন্যাসীর অনাচার দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। বিল্বন কহিতেন, 'আমি সন্ন্যাসী, আমর কোনো জাত নাই। আমার জাত মানুষ। মানুষ যখন মরিতেছে তখন কিসের জাত? ভগবানের সৃষ্ট মানুষ যখন মানুষের প্রেম চাহিতেছে তখনই বা কিসের জাত?' হিন্দুরা বিল্বনের অনাসক্ত পরহিতৈষণা দেখিয়া তাঁহাকে ঘৃণা বা নিন্দা করিতে যেন সাহস করিল না। বিল্বনের কাজ ভালো কি মন্দ তাহারা স্থির করিতে পারিল না। তাহাদের অসম্পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞান সন্দিগ্ধভাবে বলিল 'ভালো নহে', কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের ভিতরে যে মনুষ্য বাস করিতেছে সে বলিল 'ভালো'। যাহা হউক, বিল্বন অন্য লোকের ভালোমন্দর দিকে না তাকাইয়া কাজ করিতে লাগিলেন। মুমূর্ষু পাঠানেরা তাঁহাকে দেবতা জ্ঞান করিতে লাগিল। পাঠানের ছোটো ছোটো ছেলেদের তিনি মড়ক হইতে দূরে রাখিবার জন্য হিন্দুদের কাছে লইয়া গেলেন। হিন্দুরা বিষম শশব্যস্ত হইয়া উঠিল, কেহ তাহাদিগকে আশ্রয় দিল না। তখন বিল্বন একটা বড়ো পরিত্যক্ত ভাঙা মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ছেলের পাল সেইখানে রাখিলেন। প্রাতে উঠিয়া বিল্বন তাঁহার ছেলেদের জন্য ভিক্ষা করিতে বাহির হইতেন। কিন্তু ভিক্ষা কে দিবে? দেশে শস্য কোথায়? অনাহারে কত লোক মরিবার উপক্রম করিতেছে। গ্রামের মুসলমান জমিদার অনেক দূরে বাস করিতেন। বিল্বন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। বহুকষ্টে তাঁহাকে রাজি করিয়া তিনি ঢাকা হইতে চাউল আমদানি করিতে লাগিলেন। তিনি পীড়িতদের সেবা করিতেন এবং তাঁহার চেলারা চাউল বিতরণ করিত। মাঝে মাঝে বিল্বন ছেলেদের সঙ্গে গিয়া খেলা করিতেন। তাহারা তাঁহাকে দেখিলে তুমুল কোলাহল উত্থাপন করিত—সন্ধ্যার সময় মন্দিরের পাশ দিয়া গেলে মনে হইত যেন মন্দিরে সহস্র টিয়াপাখি বাসা করিয়াছে। বিল্বনের এস্রাজের আকারের একপ্রকার যন্ত্র ছিল; যখন অত্যন্ত শ্রান্ত হইতেন তখন তাহাই বাজাইয়া গান করিতেন। ছেলেগুলো তাঁহাকে ঘিরিয়া কেহ-বা গান শুনিত, কেহ-বা যন্ত্রের তার টানিত, কেহ-বা তাঁহার অনুকরণে গান করিবার চেষ্টা করিয়া বিষম চীৎকার করিত।

অবশেষে মড়ক মুসলমানপাড়া হইতে হিন্দুপাড়ায় আসিল। গ্রামে একপ্রকার অরাজকতা উপস্থিত হইল—চুরিডাকাতির শেষ নাই, যে যাহা পায় লুঠ করিয়া লয়। মুসলমানেরা দল বাঁধিয়া ডাকাতি আরম্ভ করিল। তাহারা পীড়িতদিগকে শয্যা হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া তক্তামাদুর বিছানা পর্যন্ত হরণ করিয়া লইয়া যাইত। বিল্বন প্রাণপণে তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বিল্বনের কথা তাহারা অত্যন্ত মান্য করিত, লঙ্ঘন করিতে সাহস করিত না। এইরূপে বিল্বন যথাসাধ্য গ্রামের শান্তি রক্ষা করিতেন।

একদিন সকাল বিল্বনের এক চেলা আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে একটি ছেলে সঙ্গে লইয়া একজন বিদেশী গ্রামের অশথতলায় আশ্রয় লইয়াছে; তাহাকে মড়কে ধরিয়াছে, বোধ করি সে আর বাঁচিবে না। বিল্বন দেখিলেন, কেদারেশ্বর অচেতন হইয়া পড়িয়া, ধ্রুব ধুলায় শুইয়া ঘুমাইয়া আছে। কেদারেশ্বরের মুমূর্ষু অবস্থা—পথকষ্টে এবং অনাহারে সে দুর্বল হইয়াছিল, এইজন্য পীড়া তাহাকে বলপূর্বক আক্রমণ করিয়াছে, কোনো ঔষধে কিছু ফল হইল না। সেই বৃক্ষতলেই তাহার মৃত্যু হইল। ধ্রুবকে দেখিয়া বোধ হইল যেন বহুক্ষণ অনাহারে ক্ষুধায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিল্বন অতি সাবধানে তাহাকে কোলে তুলিয়া তাঁহার শিশুশালায় লইয়া গেলেন।

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

চট্টগ্রাম এখন আরাকানের অধীন। গোবিন্দমাণিক্য নির্বাসিতভাবে চট্টগ্রামে আসিয়াছেন শুনিয়া আরাকানের রাজা মহাসমারোহপূর্বক তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। বলিয়া পাঠাইলেন, যদি সিংহাসন পুনরায় অধিকার করিতে চান তাহা হইলে আরাকানপতি তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারেন।

গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, "না, আমি সিংহাসন চাই না।"

দূত কহিল, "তবে আরাকান-রাজসভায় পূজনীয় অতিথি হইয়া মহারাজ কিছুকাল বাস করুন।"

রাজা কহিলেন, "আমি রাজসভায় থাকিব না। চট্টগ্রামের এক পার্শ্বে আমাকে স্থান দান করিলে আমি আরাকান-রাজের নিকটে ঋণী হইয়া থাকিব।"

দূত কহিল, "মহারাজের যেখানে অভিরুচি সেইখানেই থাকিতে পারেন। এ-সমস্ত আপনারই রাজ্য মনে করিবেন।"

আরাকান-রাজের কতকগুলি অনুচর রাজার সঙ্গে সঙ্গেই রহিল। গোবিন্দমাণিক্য তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন না; তিনি মনে করিলেন হয়তো বা আরাকানপতি তাঁহাকে সন্দেহ করিয়া তাঁহার নিকট লোক রাখিতে ইচ্ছা করেন।

ময়ানি নদীর ধারে মহারাজ কুটির বাঁধিয়াছেন। স্বচ্ছসলিলা ক্ষুদ্র নদী ছোটো বড়ো শিলাখণ্ডের উপর দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়াছে। দুই পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণের পাহাড় খাড়া হইয়া আছে, কালো পাথরের উপর বিচিত্র বর্ণের শৈবাল ঝুলিতেছে, মাঝে মাঝ ছোটো ছোটো গহ্বর আছে, তাহার

মধ্যে পাখি বাসা করিয়াছে। স্থানে স্থানে দুই পার্শ্বের পাহাড় এত উচ্চ যে, অনেক বিলম্বে সূর্যের দুই-একটি কর নদীর জলে আসিয়া পতিত হয়। বড়ো বড়ো গুল্ম বিবিধ আকারে পল্লব বিস্তর করিয়া পাহাড়ের গাত্রে ঝুলিতেছে। মাঝে মাঝে নদীর দুই তীরে ঘন জঙ্গলের বাহু অনেক দূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। একটা দীর্ঘ শাখাহীন শ্বেত গর্জনবৃক্ষ পাহাড়ের উপরে হেলিয়া রহিয়াছে, নীচে নদীর চঞ্চল জলে তাহার ছায়া নাচিতেছে, বড়ো বড়ো লতা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। ঘন সবুজ জঙ্গলের মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ শ্যামল কদলীবন। মাঝে মাঝে দুই তীর বিদীর্ণ করিয়া ছোটো ছোটো নির্ঝর শিশুদিগের ন্যায় আকুল বাহু, চঞ্চল আবেগ ও কলকল শুভ্রহাস্য লইয়া নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। নদী কিছুদূর সমভাবে গিয়া স্থানে স্থানে শিলাসোপান বাহিয়া ফেনাইয়া নিম্নাভিমুখে ঝরিয়া পড়িতেছে। সেই অবিশ্রাম ঝর্ঝর শব্দ নিস্তব্ধ শৈল প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এই ছায়াশীতল প্রবাহের স্নিগ্ধ ঝর্ঝর শব্দের মধ্যে স্তব্ধ শৈলতলে গোবিন্দমাণিক্য বাস করিতে লাগিলেন। হৃদয় বিস্তারিত করিয়া দিয়া হৃদয়ের মধ্য শান্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন— নির্জন প্রকৃতি সান্ত্বনাময় গভীর প্রেম নানা দিক দিয়া সহস্র নির্ঝরের মতো তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে পড়িতে লাগিল। তিনি আপনার হৃদয়ের গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে ক্ষুদ্র অভিমান-সকল মুছিয়া ফেলিতে লাগিলেন—দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া আপনার মধ্যে বিমল আলোক ও বায়ুর প্রবাহ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কে তাঁহাকে দুঃখ দিয়াছে, ব্যথা দিয়াছে, কে তাঁহার স্নেহের বিনিময় দেয় নাই, কে তাঁহার নিকট হইতে এক হস্তে উপকার গ্রহণ করিয়া অপর হস্তে কৃতঘ্নতা অর্পণ করিয়াছে, কে তাঁহার নিকট সমাদৃত হইয়া তাঁহাকে অপমান করিয়াছে, সমস্ত তিনি ভুলিয়া গেলেন। এই শৈলাসনবাসিনী অতি পুরাতন প্রকৃতির অবিশ্রাম কার্যশীলতা অথচ চিরনিশ্চিন্ত প্রশান্ত নবীনতা দেখিয়া তিনি নিজেও যেন সেইরূপ পুরাতন, সেইরূপ বৃহৎ, সেইরূপ প্রশান্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি যেন সুদূর জগৎ পর্যন্ত আপনার কামনাশূন্য স্নেহ বিস্তারিত করিয়া দিলেন—সমস্ত বাসনা দূর করিয়া দিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, 'হে ঈশ্বর, পতনোন্মুখ সম্পৎশিখর হইতে তোমার ক্রোড়ের মধ্যে ধারণ করিয়া আমাকে এ যাত্রা রক্ষা করিয়াছ। আমি মরিতে বসিয়াছিলাম, আমি বাঁচিয়া গিয়াছি। যখন রাজা হইয়াছিলাম, তখন আমি আমার মহত্ত্ব জানিতাম না, আজ সমস্ত পৃথিবীময় আমার মহত্ত্ব অনুভব করিতেছি।' অবশেষে দুই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল; বলিলেন, 'মহারাজ, তুমি আমার স্নেহের ধ্রুবকে কাড়িয়া লইয়াছ, সে বেদনা এখনো হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ যায় নাই। আজ আমি বুঝিতেছি যে, তুমি ভালোই করিয়াছ। আমি সেই বালকের প্রতি স্বার্থপর স্নেহে আমার সমুদয় কর্তব্য, আমার জীবন বিসর্জন দিতেছিলাম। তুমি আমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ। আমি ধ্রুবকে আমার সমস্ত পুণ্যের পুরস্কার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম—তুমি তাহাকে কাড়িয়া লইয়া শিক্ষা দিতেছ যে, পুণ্যের পুরস্কার পুণ্য। তাই আজ সেই ধ্রুবের পবিত্র বিরহদুঃখকে সুখ বলিয়া, তোমার প্রসাদ বলিয়া, অনুভব করিতেছি। আমি বেতন লইয়া ভৃত্যের মতো কাজ করিব না প্রভু, আমি তোমার প্রেমের বশ হইয়া তোমার সেবা করিব।'

গোবিন্দমাণিক্য দেখিলেন, নির্জনে ধ্যানপরায়ণা প্রকৃতি যে স্নেহধারা সঞ্চয় করিতেছে, সজনে লোকালয়ের মধ্যে তাহা নদীরূপে প্রেরণ করিতেছে—যে তাহা গ্রহণ করিতেছে তাহার তৃষ্ণানিবারণ হইতেছে, যে করিতেছে না তাহার প্রতিও প্রকৃতির কোনো অভিমান নাই। গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, 'আমিও আমার এই বিজনে-সঞ্চিত প্রেম সজনে বিতরণ করিতে বাহির হইব।' বলিয়া তাঁহার পর্বতাশ্রম ছাড়িয়া তিনি বাহির হইলেন।

সহসা রাজত্ব ছাড়িয়া দিয়া উদাসীন হওয়া, লেখায় যতটা সহজ মনে হয় বাস্তবিক ততটা সহজ নহে। রাজবেশ ছাড়িয়া দিয়া গেরুয়া বস্ত্র পরা নিতান্ত অল্প কথা নহে। বরঞ্চ রাজ্য পরিত্যাগ করা সহজ, কিন্তু আমাদের আজন্মকালের ছোটো ছোটো অভ্যাস আমরা অনায়াসে ছাড়িতে পারি না; তাহারা তাহাদের তীব্র ক্ষুধাতৃষ্ণা লইয়া আমাদের অস্থিমাংসের সহিত লিপ্ত হইয়া আছে, তাহাদিগকে নিয়মিত খোরাক না জোগাইলে তাহারা আমাদের রক্তশোষণ করিতে থাকে। কেহ যেন মনে না করেন যে গোবিন্দমাণিক্য যতদিন তাঁহার বিজন কুটিরে বাস করিতেছিলেন ততদিন কেবল অবিচলিত চিত্তে স্থাণুর মতো বসিয়া ছিলেন। তিনি পদে পদে আপনার সহস্র ক্ষুদ্র অভ্যাসের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। যখনই কিছুর অভাবে তাঁহার হৃদয় কাতর হইতেছিল তখনই তিনি তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার মনের সহস্রমুখী ক্ষুধাকে কিছু না খাইতে দিয়া বিনাশ করিতেছিলেন। পদে পদে এই শত শত অভাবের উপর জয়ী হইয়া তিনি সুখ লাভ করিতেছিলেন। যেমন দুরন্ত অশ্বকে দ্রুত বেগে ছুটাইয়া শান্ত করিতে হয়, তেমনি তিনি তাঁহার অভাবকাতর অশান্ত হৃদয়কে অভাবের মরুময় প্রান্তরের মধ্যে অবিশ্রাম দৌড় করাইয়া শান্ত করিতেছিলেন। অনেক দিন পর্যন্ত এক মুহূর্তও তাঁহার বিশ্রাম ছিল না।

পার্বত্য প্রদেশ ছাড়িয়া গোবিন্দমাণিক্য দক্ষিণে সমুদ্রাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। সমস্ত বাসনার দ্রব্য বিসর্জন দিয়া তিনি হৃদয়ের মধ্যে আশ্চর্য স্বাধীনতা অনুভব করিতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে আর বাঁধিতে পারে না, অগ্রসর হইবার সময় কেহ তাঁহাকে আর বাধা দিতে পারে না। প্রকৃতিকে অত্যন্ত বৃহৎ দেখিলেন এবং আপনাকে তাহার সহিত এক বলিয়া মনে হইল। বৃক্ষলতার সে এক নূতন শ্যামল বর্ণ, সূর্যের সে এক নূতন কনককিরণ, প্রকৃতির সে এক নূতন মুখশ্রী দেখিতে লাগিলেন। গ্রামে গিয়া মানবের প্রত্যেক কাজের মধ্যে তিনি এক নূতন সৌন্দর্য দেখিতে লাগিলেন। মানবের হাস্যালাপ ওঠা-বসা চলা-ফেরার মধ্যে তিনি এক অপূর্ব নৃত্যগীতের মাধুরী দেখিতে পাইলেন।

যাহাকে দেখিলেন তাহাকে কাছে ডাকিয়া কথা কহিয়া সুখ পাইলেন—যে তাঁহাকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিল তাহার নিকট হইতে তাঁহার হৃদয় দূরে গমন করিল না। সর্বত্র দুর্বলকে সাহায্য করিতে এবং দুঃখীকে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, 'আমার নিজের সমস্ত বল এবং সমস্ত সুখ আমি পরের জন্যে উৎসর্গ করিলাম, কেননা আমার নিজের কোনো কাজ নাই, কোনো বাসনা নাই।' সচরাচর যে-সকল দৃশ্য কাহারো চোখে পড়ে না তাহা নূতন আকার ধারণ করিয়া তাঁহার চোখে পড়িতে লাগিল। যখন দুই ছেলেকে পথে বসিয়া

খেলা করিতে দেখিতেন—দুই ভাইকে, পিতাপুত্রকে, মাতা ও শিশুকে একত্র দেখিতেন—তাহারা ধূলিলিপ্ত হউক, দরিদ্র হউক, কদর্য হউক, তিনি তাহাদের মধ্যে দূরদূরান্তব্যাপী মানবহৃদয়সমুদ্রের অনন্ত গভীর প্রেম দেখিতে পাইতেন। একটি শিশুক্রোড়া জননীর মধ্যে তিনি যেন অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত মানবশিশুর জননীকে দেখিতে পাইতেন। দুই বন্ধুকে একত্র দেখিলেই তিনি সমস্ত মানবজাতিকে বন্ধুপ্রেমে সহায়বান অনুভব করিতেন। পূর্বে যে পৃথিবীকে মাঝে মাঝে মাতৃহীনা বলিয়া বোধ হইত সেই পৃথিবীকে আনতনয়না চিরজাগ্রত জননীর কোলে দেখিতে পাইলেন। পৃথিবীর দুঃখশোকদারিদ্র্য বিবাদ বিদ্বেষ দেখিলেও তাঁহার মনে আর নৈরাশ্য জন্মিত না। একটিমাত্র মঙ্গলের চিহ্ন দেখিলেই তাঁহার আশা সহস্র অমঙ্গল ভেদ করিয়া স্বর্গাভিমুখে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত। আমাদের সকলের জীবনেই কি কোনো না কোনোদিন এমন এক অভূতপূর্ব নূতন প্রেম ও নূতন স্বাধীনতার প্রভাব উদিত হয় নাই যেদিন সহসা এই হাস্য-ক্রন্দনময় জগৎকে এক সুকোমল নবকুমারের মতো এক অপূর্ব সৌন্দর্য প্রেম ও মঙ্গলের ক্রোড়ে বিকশিত দেখিয়াছি—যেদিন কেহ আমাদিগকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না, কেহ আমাদিগকে জগতের কোনো সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না, কেহ আমাদিগকে কোনো প্রাচীরের মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না—যেদিন এক অপূর্ব বাঁশি বাজিয়া উঠে, এক অপূর্ব বসন্ত জাগিয়া উঠে, চরাচর চিরযৌবনের আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যায়—যেদিন সমস্ত দুঃখ দারিদ্র্য-বিপদকে কিছুই মনে হয় না। নূতন স্বাধীনতার আনন্দে প্রসারিত হৃদয় গোবিন্দমাণিক্যের জীবনে সেই দিন উপস্থিত হইয়াছে।

দক্ষিণ চট্টগ্রামের রামু শহর এখনো দশ ক্রোশ দূরে। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে গোবিন্দমাণিক্য যখন আলমখাল-নামক ক্ষুদ্র গ্রামে গিয়া পৌঁছিলেন তখন গ্রামপ্রান্তবর্তী একটি কুটির হইতে ক্ষীণকণ্ঠ বালকের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয় সহসা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কুটিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, যুবক কুটিরস্বামী একটি শীর্ণ বালককে কোলে করিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছে। বালক থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে এবং থাকিয়া থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদিতেছে। কুটিরস্বামী তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। সন্ন্যাসবেশী গোবিন্দমাণিক্যকে দেখিয়া সে শশব্যস্ত হইয়া পড়িল। কাতরস্বরে কহিল, "ঠাকুর, ইহাকে আশীর্বাদ করো।" গোবিন্দমাণিক্য আপনার কম্বল বাহির করিয়া কম্পমান বালকের চারি দিকে জড়াইয়া দিলেন। বালক একবার কেবল তাহার শীর্ণ মুখ তুলিয়া গোবিন্দমাণিক্যের দিকে চাহিল। তাহার চোখের নীচে কালী পড়িয়াছে; তাহার ক্ষীণ মুখের মধ্যে দুখানি চোখ ছাড়া আর কিছুই নাই যেন। একবার গোবিন্দমাণিক্যকে দেখিয়াই দুইখানি পাণ্ডুবর্ণ পাতলা ঠোঁট নাড়িয়া ক্ষীণ অব্যক্ত শব্দ করিল। আবার তখনই তাহার পিতার স্কন্ধের উপর মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার পিতা তাহাকে কম্বল সমেত ভূমিতে রাখিয়া রাজাকে প্রণাম করিল এবং রাজার পদধূলি লইয়া ছেলের গায়ে মাথায় দিল। রাজা ছেলেকে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটির বাপের নাম কী?" কুটিরস্বামী কহিল, "আমি ইহার বাপ, আমার নাম যাদব। ভগবান একে

একে আমার সকল ক'টিকে লইয়াছেন, কেবল এইটি এখনো বাকি আছে।" বলিয়া গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। রাজা কুটিরস্বামীকে বলিলেন, "আজ রাত্রে আমি তোমার এখানে অতিথি। আমি কিছুই খাইব না, অতএব আমার জন্য আহারাদির উদ্যোগ করিতে হইবে না। কেবল এখানে রাত্রিযাপন করিব।" বলিয়া সে-রাত্রি সেইখানে রহিলেন। অনুচরগণ গ্রামের এক ধনী কায়স্থের বাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। নিকটে একটা পানাপুকুর ছিল, তাহার উপর হইতে বাষ্প উঠিতে লাগিল। গোয়ালঘর হইতে খড় এবং শুষ্ক পত্র জ্বালানোর গুরুভার ধোঁয়া আকাশে উঠিতে পারিল না, গুঁড়ি মারিয়া সম্মুখে বিস্তৃত জলা মাঠকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল। আস্‌শেওড়ার বেড়ার কাছ হইতে কর্কশ স্বরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকিতে লাগিল। বাতাস একেবারে বন্ধ, গাছের পাতাটি নড়িতেছে না। পুকুরের অপর পাড়ে ঘন বাঁশঝাড়ের মধ্য হইতে একটা পাখি থাকিয়া থাকিয়া টিটি করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে। ক্ষীণালোকে গোবিন্দমাণিক্য সেই রুগ্‌ণ বালকের বিবর্ণ শীর্ণ মুখ দেখিতেছেন। তিনি তাহাকে ভালোরূপ কম্বলে আবৃত করিয়া তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে নানাবিধ গল্প শুনাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইল, দূরে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। বালক গল্প শুনিতে শুনিতে রোগের কষ্ট ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। রাজা তাহার পার্শ্বে ঘরে আসিয়া শয়ন করিলেন। রাত্রে তাঁহার ঘুম হইল না। কেবল ধ্রুবকে মনে পড়িতে লাগিল। রাজা কহিলেন, 'ধ্রুবকে হারাইয়া সকল বালককেই আমার ধ্রুব বলিয়া বোধ হয়।'

খানিক রাত্রে শুনিলেন পাশের ঘরে ছেলেটি জাগিয়া উঠিয়া তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বাবা, ও কী বাজে।"

বাপ কহিলেন, "বাঁশি বাজিতেছে।"

ছেলে। বাঁশি কেন বাজে?

বাপ। কাল যে পূজা, বাপ আমার!

ছেলে। কাল পূজা? পূজারদিন আমাকে কিছু দেবে না?

বাপ। কী দেব বাবা?

ছেলে। আমাকে একটা রাঙা শাল দেবে না?

বাপ। আমি শাল কোথায় পাব? আমার যে কিছু নেই, মানিক আমার।

ছেলে। বাবা, তোমার কিছুই নেই বাবা?

বাপ। কিছু নেই বাবা, কেবল তুমি আছ।

ভগ্নহৃদয় পিতার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পাশের ঘর হইতে শুনা গেল।

ছেলে আর-কিছুই বলিল না। বোধ করি বাপকে জড়াইয়া ধরিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি শেষ না হইতে হইতেই গোবিন্দমাণিক্য গৃহস্বামীর নিকট বিদায় না লইয়াই অশ্বারোহণে রামু শহরের অভিমুখে চলিয়া গেলেন। আহার করিলেন না, বিশ্রাম করিলেন না। পথের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নদী ছিল, ঘোড়াসুদ্দ নদী পার হইলেন। প্রখর রৌদ্রের সময় রামুতে গিয়া পৌঁছিলেন; সেখানে অধিক বিলম্ব করিলেন না। আবার সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই যাদবের কুটিরে

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাদবকে আড়ালে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহার ঝুলির মধ্য হইতে একখানি লাল শাল বাহির করিয়া যাদবের হাতে দিয়া কহিলেন, "আজ পূজার দিনে এই শালটি তোমার ছেলেকে দাও।"

যাদব কাঁদিয়া গোবিন্দমাণিক্যের পা জড়াইয়া ধরিল। কহিল, "প্রভু, তুমি আনিয়াছ, তুমিই দাও।"

রাজা কহিলেন, "না, আমি দিব না, তুমি দাও। আমি দিলে কোনো ফল নাই। আমার নাম করিয়ো না। আমি কেবল তোমার ছেলের মুখে আনন্দের হাসি দেখিয়া চলিয়া যাইব।"

রুগ্‌ণ বালকের অতি শীর্ণ ম্লান মুখ প্রফুল্ল দেখিয়া রাজা চলিয়া গেলেন। রাজা বিষণ্ন হইয়া মনে মনে কহিলেন, 'আমি কোনো কাজ করিতে পারি না। আমি কেবল কয়টা বৎসর রাজত্বই করিয়াছি, কিছুই শিক্ষা করি নাই। কী করিলে একটি ক্ষুদ্র বালকের রোগের কষ্ট একটু নিবারণ হইবে তাহা জানি না। আমি কেবল অসহায় অকর্মণ্য ভাবে শোক করিতে জানি। বিল্বন ঠাকুর যদি থাকিতেন তো ইহাদের কিছু উপকার করিয়া যাইতেন। আমি যদি বিল্বন ঠাকুরের মতো হইতাম!'

গোবিন্দমাণিক্য বলিলেন, 'আমি আর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইব না, লোকালয়ের মধ্যে বাস করিয়া কাজ করিতে শিখিব।'

রামুর দক্ষিণে রাজকুলের নিকটে মগদিগের যে দুর্গ আছে আরাকান রাজের অনুমতি লইয়া সেইখানে তিনি বাস করিতে লাগিলেন।

গ্রামবাসীদের যতগুলো ছেলেপিলে ছিল সকলেই দুর্গে গোবিন্দমাণিক্যের নিকট আসিয়া জুটিল। গোবিন্দমাণিক্য তাহাদিগকে লইয়া একটা বড়ো পাঠশালা খুলিলেন। তিনি তাহাদিগকে পড়াইতেন, তাহাদের সহিত খেলিতেন, তাহাদের বাড়িতে গিয়া তাহাদের সহিত বাস করিতেন, পীড়া হইলে তাহাদিগকে দেখিতে যাইতেন। ছেলেরা সাধারণত যে নিতান্তই স্বর্গ হইতে আসিয়াছে এবং তাহারা যে দেবশিশু, তাহা নহে—তাহাদের মধ্যে মানব এবং দানব-ভাবের কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই। স্বার্থপরতা ক্রোধ লোভ দ্বেষ হিংসা তাহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ বলবান, তাহার উপরে আবার বাড়িতে পিতামাতার নিকট হইতেও সকল সময় ভালো শিক্ষা পায় যে তাহা নহে। এইজন্য মগের দুর্গে মগের রাজত্ব হইয়া উঠিল—দুর্গের মধ্যে যেন ঊনপঞ্চাশ বায়ু এবং চৌষট্টি ভূতে একত্র বাসা করিয়াছে। গোবিন্দমাণিক্য এইসকল উপকরণ লইয়া ধৈর্য ধরিয়া মানুষ গড়িতে লাগিলেন। একটি মানুষের জীবন যে কত মহৎ ও কী প্রাণপণ যত্নে পালন ও রক্ষা করিবার দ্রব্য তাহা গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয়ে সর্বদা জাগরূক। তাঁহার চারি দিকে অনন্তফলপরিপূর্ণ মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়, ইহাই দেখিয়া এবং নিজের চেষ্টায় ইহাই সাধন করিয়া গোবিন্দমাণিক্য নিজের অসম্পূর্ণ জীবন বিসর্জন করিতে চান। ইহার জন্য তিনি সকল কষ্ট সকল উপদ্রব সহ্য করিতে পারেন। কেবল মাঝে মাঝে এক-একবার হতাশ্বাস হইয়া দুঃখ করিতেন, 'আমার কার্য আমি নিপুণরূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেছি না। বিল্বন থাকিলে ভালো হইত।'

এইরূপে গোবিন্দমাণিক্য এক শত ধ্রুবকে লইয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

স্টুয়ার্ট-কৃত বাংলার ইতিহাস হইতে এই পরিচ্ছেদ সংগৃহীত

এ দিকে শা সুজা তাঁহার ভ্রাতা ঔরংজীবের সৈন্য কর্তৃক তাড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছেন। এলাহাবাদের নিকট যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার পরাজয় হয়। বিপক্ষ পরাক্রান্ত, এবং বিপদের সময় সুজা স্বপক্ষীয়দেরও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি অপমানিত ও ভীত ভাবে ছদ্মবেশে সামান্য লোকের মতো একাকী পলায়ন করিতে লাগিলেন। যেখানেই যান পশ্চাতে শত্রুসৈন্যের ধূলিধ্বজা ও তাহাদের অশ্বের ক্ষুরধনি তাঁহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। অবশেষে পাটনায় পৌঁছিয়া তিনি পুনর্বার নবাব-বেশে আপন পরিবার ও প্রজাদের নিকটে আগমন-সংবাদ ঘোষণা করিলেন। তিনিও যেমন পাটনায় পৌঁছিয়াছেন তাহার কিছুকাল পরেই ঔরংজীবের পুত্র কুমার মহম্মদ সৈন্য সহিত পাটনার দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। সুজা পাটনা ছাড়িয়া মুঙ্গেরে পালাইলেন।

মুঙ্গেরে তাঁহার বিক্ষিপ্ত দলবল কতক কতক তাঁহার নিকট আসিয়া জুটিল এবং সেখানে তিনি নূতন সৈন্যও সংগ্রহ করিলেন। তেরিয়াগড়ি ও শিক্‌লিগলির দুর্গ সংস্কার করিয়া এবং নদীতীরে পাহাড়ের উপরে প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দৃঢ় হইয়া বসিলেন।

এ দিকে ঔরংজীব তাঁহার বিচক্ষণ সেনাপতি মীরজুম্‌লাকে কুমার মহম্মদের সাহায্যে পাঠাইলেন। কুমার মহম্মদ প্রকাশ্যভাবে মুঙ্গেরের দুর্গের অনতিদূরে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন এবং মীরজুম্‌লা অন্য গোপন পথ দিয়া মুঙ্গের-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যখন সুজা কুমার মহম্মদের সহিত ছোটোখাটো যুদ্ধে ব্যাপৃত আছেন এমন সময় সহসা সংবাদ পাইলেন যে, মীরজুম্‌লা বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া বসন্তপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সুজা ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া মুঙ্গের ছাড়িয়া রাজমহলে পলায়ন করিলেন। সেইখানেই তাঁহার সমস্ত পরিবার বাস করিতেছিল। সম্রাট্‌-সৈন্য অবিলম্বে সেখানেও তাঁহার অনুসরণ করিল। সুজা ছয়দিন ধরিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া শত্রুসৈন্যকে অগ্রসর হইতে দিলেন না। কিন্তু যখন দেখিলেন আর রক্ষা হয় না তখন একদিন অন্ধকার ঝড়ের রাত্রে তাঁহার পরিবারসকল ও যথাসম্ভব ধনসম্পত্তি লইয়া নদী পার হইয়া তোণ্ডায় পলায়ন করিলেন, এবং অবিলম্বে সেখানকার দুর্গ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে ঘনবর্ষা আসিল, নদী অত্যন্ত স্ফীত এবং পথ দুর্গম হইয়া উঠিল। সম্রাট্‌-সৈন্যরা অগ্রসর হইতে পারিল না।

এই যুদ্ধবিগ্রহের পূর্বে কুমার মহম্মদের সহিত সুজার কন্যার বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধের উপদ্রবে সে প্রস্তাব উভয় পক্ষই বিস্মৃত হইয়াছিল।

বর্ষায় যখন যুদ্ধ স্থগিত আছে এবং মীরজুম্‌লা রাজমহল হইতে কিছু দূরে তাঁহার শিবির লইয়া গেছেন, এমন সময় সুজার একজন সৈনিক তোণ্ডার শিবির হইতে আসিয়া গোপনে কুমার মহম্মদের হস্তে একখানি পত্র দিল। কুমার খুলিয়া দেখিলেন, সুজার কন্যা লিখিতেছেন, 'কুমার এই কি আমার অদৃষ্টে ছিল! যাঁহাকে মনে মনে স্বামিরূপে বরণ করিয়া আমার সমগ্র হৃদয় সমর্পণ করিয়াছি, যিনি অঙ্গুরীয়বিনিময় করিয়া আমাকে গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তিনি আজ নিষ্ঠুর তরবারি হস্তে আমার পিতার প্রাণ লইতে আসিয়াছেন, এই কি আমাকে দেখিতে হইল! কুমার, এই কি আমাদের বিবাহ-উৎসব! তাই কি এত সমারোহ! তাই কি আমাদের রাজমহল আজ রক্তবর্ণ! তাই কি কুমার দিল্লী হইতে লোহার শৃঙ্খল হাতে করিয়া আনিয়াছেন! এই কি প্রেমের শৃঙ্খল!'

এই পত্র পড়িয়া সহসা প্রবল ভূমিকম্পে যেন কুমার মহম্মদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি এক মুহূর্ত আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ সাম্রাজ্যের আশা, বাদশাহের অনুগ্রহ, সমস্ত তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন। প্রথম যৌবনের দীপ্ত হুতাশনে তিনি ক্ষতিলাভের বিবেচনা সমস্ত বিসর্জন করিলেন। তাঁহার পিতার সমস্ত কার্য তাঁহার অত্যন্ত অন্যায় ও নিষ্ঠুর বলিয়া বোধ হইল। পিতার ষড়্‌যন্ত্রপ্রবণ নিষ্ঠুর নীতির বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে তিনি পিতার সমক্ষেই আপন মত স্পষ্ট ব্যক্ত করিতেন এবং কখনো কখনো তিনি সম্রাটের বিরাগভাজন হইতেন। আজ তিনি তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে ডাকিয়া সম্রাটের নিষ্ঠুরতা, খলতা ও অত্যাচার সম্বন্ধে বিরাগ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "আমি তোণ্ডায় আমার পিতৃব্যের সহিত যোগ দিতে যাইব। তোমরা যাহারা আমাকে ভালোবাস আমার অনুবর্তী হও।" তাহারা দীর্ঘ সেলাম করিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল, "শাহজাদা যাহা বলিতেছেন তাহা অতি যথার্থ, কালই দেখিবেন অর্ধেক সৈন্য তোণ্ডার শিবিরে শাহজাদার সহিত মিলিত হইবে।" মহম্মদ সেইদিনই নদী পার হইয়া সুজার শিবিরে উপস্থিত হইলেন।

তোণ্ডায় উৎসব পড়িয়া গেল। যুদ্ধবিগ্রহের কথা সকলে একেবারেই ভুলিয়া গেল। এতদিন কেবল পুরুষেরাই ব্যস্ত ছিল, এখন সুজার পরিবারে রমণীদের হাতে কাজের অন্ত রহিল না। সুজা অত্যন্ত স্নেহ ও আনন্দের সহিত মহম্মদকে গ্রহণ করিলেন। অবিশ্রাম রক্তপাতের পরে রক্তের টান যেন আরো বাড়িয়া উঠিল, নৃত্যগীতবাদ্যের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। নৃত্যগীত শেষ হইতে না হইতেই সংবাদ আসিল সম্রাট্-সৈন্য নিকটবর্তী হইয়াছে।

মহম্মদ যেমনি সুজার শিবিরে গেছেন সৈন্যরা অমনি মীরজুম্‌লার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল। একটি সৈন্যও মহম্মদের সহিত যোগ দিল না; তাহারা বুঝিয়াছিল, মহম্মদ ইচ্ছাপূর্বক বিপদ্‌সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন, সেখানে তাঁহার দলভুক্ত হইতে যাওয়া বাতুলতা।

সুজা এবং মহম্মদের বিশ্বাস ছিল যে, সম্রাট্-সৈন্যেরা অধিকাংশই যুদ্ধক্ষেত্রে কুমার মহম্মদের সহিত যোগ দিবে। এই আশায় মহম্মদ নিজের নিশান উড়াইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বৃহৎ এক দল সম্রাট্-সৈন্য তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল। মহম্মদ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। নিকটে আসিয়াই তাহারা মহম্মদের সৈন্যদলের উপর গোলা বর্ষণ করিল। তখন

মহম্মদ সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তখন আর সময় নাই। সৈন্যেরা পলায়নতৎপর হইল। সুজার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুদ্ধে মারা পড়িল।

সেই রাত্রেই হতভাগা সুজা এবং তাঁহার জামাতা সপরিবারের দ্রুতগামী নৌকায় চড়িয়া ঢাকায় পলায়ন করিলেন। মীরজুম্‌লা ঢাকায় সুজার অনুসরণ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। তিনি বিজিত দেশে শৃঙ্খলাস্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন।

দুর্দশার দিনে, বিপদের সময়, যখন বন্ধুরা একে একে বিমুখ হইতে থাকে তখন মহম্মদ ধন প্রাণ মান তুচ্ছ করিয়া সুজার পক্ষাবলম্বন করাতে সুজার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি প্রাণের সহিত মহম্মদকে ভালোবাসিলেন। এমন সময় ঢাকা শহরে ঔরংজীবের একজন পত্রবাহক চর ধরা পড়িল। সুজার হাতে তাহার পত্র গিয়া পড়িল। ঔরংজীব মহম্মদকে লিখিতেছেন, "প্রিয়তম পুত্র মহম্মদ, তুমি তোমার কর্তব্য অবহেলা করিয়া পিতৃবিদ্রোহী হইয়াছ, এবং তোমার অকলঙ্ক যশে কলঙ্ক নিক্ষেপ করিয়াছ। রমণীর ছলনাময় হাস্যে মুগ্ধ হইয়া আপন ধর্ম বিসর্জন দিয়াছ। ভবিষ্যতে সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য শাসনের ভার যাঁহার হস্তে তিনি আজ এক রমণীর দাস হইয়া আছেন! যাহা হউক, ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া মহম্মদ যখন অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন তখন তাঁহাকে মাপ করিলাম। কিন্তু যে কার্যের জন্য গিয়াছেন সেই কার্য সাধন করিয়া আসিলে তবে তিনি আমাদের অনুগ্রহের অধিকারী হইবেন।"

সুজা এই পত্র পাঠ করিয়া বজ্রাহত হইলেন। মহম্মদ বারবার করিয়া বলিলেন, তিনি কখনোই পিতার নিকটে অনুতাপ প্রকাশ করেন নাই। এ সমস্ত তাঁহার পিতার কৌশল। কিন্তু সুজার সন্দেহ দূর হইল না। সুজা তিনদিন ধরিয়া চিন্তা করিলেন। অবশেষে চতুর্থ দিনে কহিলেন, "বৎস, আমাদের মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধন শিথিল হইয়াছে। অতএব আমি অনুরোধ করিতেছি, তুমি তোমার স্ত্রীকে লইয়া প্রস্থান করো, নহিলে, আমাদের মনে আর শান্তি থাকিবে না। আমার রাজকোষের দ্বার মুক্ত করিয়া দিলাম, শ্বশুরের উপহার-স্বরূপ যত ইচ্ছা ধনরত্ন হইয়া যাও।"

মহম্মদ অশ্রুবিসর্জন করিয়া বিদায় হইলেন, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সঙ্গে গেলেন।

সুজা কহিলেন, "আর যুদ্ধ করিব না। চট্টগ্রামের বন্দর হইতে, জাহাজ লইয়া মক্কায় চলিয়া যাইব।" বলিয়া ঢাকা ছাড়িয়া ছদ্মবেশে চলিয়া গেলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

যে দুর্গে গোবিন্দমাণিক্য বাস করিতেন একদিন বর্ষার অপরাহ্নে সেই দুর্গের পথে একজন ফকির সঙ্গে তিনজন বালক ও একজন প্রাপ্তবয়স্ক তল্‌পিদার লইয়া চলিয়াছেন। বালকদের অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাইতেছে। বাতাস বেগে বহিতেছে এবং অবিশ্রাম বর্ষার ধারা পড়িতেছে। সকলের চেয়ে ছোটো বালকটির বয়স চৌদ্দর অধিক হইবে না; সে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে

কাতর স্বরে কহিল, "পিতা, আর তো পারি না।" বলিয়া অধীর ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

ফকির কিছু না বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন।

বড়ো বালকটি ছোটোকে তিরস্কার করিয়া কহিল, "পথের মধ্যে এমন করিয়া কাঁদিয়া ফল কী! চুপ কর্। অনর্থক পিতাকে কাতর করিস নে।"

ছোটো বালকটি তখন তাহার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন দমন করিয়া শান্ত হইল।

মধ্যম বালকটি ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিল, "পিতা, আমরা কোথায় যাইতেছি?"

ফকির কহিলেন, "ওই-যে দুর্গের চূড়া দেখা যাইতেছে, ওই দুর্গে যাইতেছি।"

"ওখানে কে আছে, পিতা?"

"শুনিয়াছি, কোথাকার একজন রাজা সন্ন্যাসী হইয়া ওখানে বাস করেন।"

"রাজা সন্ন্যাসী কেন হইল পিতা?"

ফকির কহিলেন, "জানি না বাছা। হয়তো তাঁহার আপনার সহোদর ভ্রাতা সৈন্য লইয়া তাঁহাকে একটা গ্রাম্য কুকুরের মতো দেশ হইতে দেশান্তরে তাড়া করিয়াছে। রাজ্য ও সুখসম্পৎ হইতে তাঁহাকে পথে বাহির করিয়া দিয়াছে। এখন হয়তো কেবল দারিদ্র্যের অন্ধকার ক্ষুদ্র গহ্বর ও সন্ন্যাসীর গেরুয়াবসন পৃথিবীর মধ্যে তাঁহার একমাত্র লুকাইবার স্থান। আপনার ভ্রাতার বিদ্বেষ হইতে, বিষদন্ত হইতে, আর কোথাও রক্ষা নাই।" বলিয়া ফকির দৃঢ়রূপে আপন ওষ্ঠাধর চাপিয়া হৃদয়ের আবেগ দমন করিলেন।

বড়ো ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল, "পিতা, এই সন্ন্যাসী কোন্ দেশের রাজা ছিল?"

ফকির কহিলেন, "তাহা জানি না বাছা।"

"যদি আমাদের আশ্রয় না দেয়?"

"তবে আমরা বৃক্ষতলে শয়ন করিব।— আর আমাদের স্থান কোথায়?"

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দুর্গে সন্ন্যাসী ও ফকিরে দেখা হইল। উভয়েই উভয়কে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। গোবিন্দমাণিক্য চাহিয়া দেখিলেন, ফকিরকে ফকির বলিয়া বোধ হইল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থপর বাসনা হইতে হৃদয়কে প্রত্যাহরণ করিয়া একমাত্র বৃহৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে স্থাপন করিলে মুখে যে একপ্রকার জ্বালাবিহীন বিমল জ্যোতি প্রকাশ পায় ফকিরের মুখে তাহা দেখিতে পাইলেন না। ফকির সর্বদা সতর্ক সচকিত। তাঁহার হৃদয়ের তৃষিত বাসনাসকল তাঁহার দুই জ্বলন্ত নেত্র হইতে যেন অগ্নিপান করিতেছে। অধীর হিংসা তাঁহার দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর এবং দৃঢ়লগ্ন দন্তের মধ্যে বিফলে প্রতিহত হইয়া পুনরায় যেন হৃদয়ের অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করিয়া আপনাকে আপনি দংশন করিতেছে। সঙ্গে তিনজন বালক; তাহাদের অত্যন্ত সুকুমার সুন্দর শ্রান্ত ক্লিষ্ট দেহ ও একপ্রকার গর্বিতসংকোচ দেখিয়া মনে হইল, যেন তাহারা আজন্মকাল অতি সযত্নে সম্মানের শিকার উপরে তোলা ছিল, এই প্রথম তাহাদের ভূমিতলে পদার্পণ। চলিতে গেলে যে চরণের অঙ্গুলিতে ধূলি লাগে, ইহা যেন পূর্বে তাহাদের প্রত্যক্ষ জানা ছিল না। পৃথিবীর এই ধূলিময় মলিন দারিদ্র্যে প্রতি পদে যেন পৃথিবীর উপরে তাহাদের ঘৃণা

জন্মিতেছে, মছলন্দ ও মাটির প্রভেদ দেখিয়া প্রতি পদে তাহারা যেন পৃথিবীকে তিরস্কার করিতেছে। পৃথিবী যেন তাহাদেরই প্রতি বিশেষ আড়ি করিয়া আপনার বড়ো মছলন্দখানা গুটাইয়া রাখিয়াছে। সকলেই যেন তাহাদের নিকটে অপরাধ করিতেছে। দরিদ্র যে ভিক্ষা করিবার জন্য তাহার মলিন বসন লইয়া তাহাদের কাছে ঘেঁষিতে সাহস করিতেছে এ কেবল তাহার স্পর্ধা; ঘৃণ্য কুকুর পাছে কাছে আসে এইজন্য লোকে যেমন খাদ্যখণ্ড দূর হইতে ছুঁড়িয়া দেয় ইহারাও যেন তেমনি ক্ষুধার্ত মলিন ভিক্ষুককে দেখিলে দূর হইতে মুখ ফিরাইয়া একমুঠা মুদ্রা অনায়াসে ফেলিয়া দিতে পারে। তাহাদের চক্ষে অধিকাংশ পৃথিবীর একপ্রকার যৎসামান্য ভাব ও ছিন্নবস্ত্র অকিঞ্চনতা যেন কেবল একটা মস্ত বেয়াদবি। তাহারা যে পৃথিবীতে সুখী ও সম্মানিত হইতেছে না, এ কেবল পৃথিবীর দোষ।

গোবিন্দমাণিক্য যে ঠিক এতটা ভাবিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি লক্ষণ দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, এই ফকির, এ যে আপনার বাসনাসকল বিসর্জন দিয়া স্বাধীন ও সুস্থ হইয়া জগতের কাজ করিতে বাহির হইয়াছে তাহা নহে, এ কেবল আপনার বাসনা তৃপ্ত হয় নাই বলিয়া রাগ করিয়া সমস্ত জগতের প্রতি বিমুখ হইয়া বাহির হইয়াছে। তিনি যাহা চান তাহাই তাঁহার পাওনা এইরূপ ফকিরের বিশ্বাস—এবং জগৎ তাঁহার নিকটে যাহা চায় তাহা সুবিধামত দিলেই চলিবে এবং না দিলেও কোনো ক্ষতি নাই। ঠিক এই বিশ্বাস-অনুসারে কাজ হয় নাই বলিয়া তিনি জগৎকে এক-ঘরে করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।

গোবিন্দমাণিক্যকে দেখিয়া ফকিরের রাজা বলিয়াও মনে হইল, সন্ন্যাসী বলিয়াও বোধ হইল। তিনি ঠিক এইরূপ আশা করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, হয় একটা লম্বোদর পাগড়ি-পরা স্ফীত মাংসপিণ্ড দেখিবেন, নয়তো একটা দীনবেশধারী মলিন সন্ন্যাসী, অর্থাৎ ভস্মাচ্ছাদিত ধূলিশয্যাশায়ী উদ্ধত স্পর্ধা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু দুয়ের মধ্যে কোনোটাই দেখিতে পাইলেন না। গোবিন্দমাণিক্যকে দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন তবু যেন সমস্তই তাঁহারই। তিনি কিছুই চান না বলিয়াই যেন পাইয়াছেন, তিনি আপনাকে দিয়াছেন বলিয়াই পাইয়াছেন। তিনি যেমন আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তেমনি সমস্ত জগৎ আপন ইচ্ছায় তাঁহার নিকটে ধরা দিয়াছে। কোনোপ্রকার আড়ম্বর নাই বলিয়া তিনি রাজা, এবং সমস্ত সংসারের নিতান্ত নিকটবর্তী হইয়াছেন বলিয়া তিনি সন্ন্যাসী। এইজন্য তাঁহাকে রাজাও সাজিতে হয় নাই, সন্ন্যাসীও সাজিতে হয় নাই।

রাজা তাঁহার অতিথিদিগকে সযত্নে সেবা করিলেন। তাঁহারা তাঁহার সেবপরম অবহেলার সহিত গ্রহণ করিলেন। ইহাতে যেন তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। তাঁহাদের আরামের জন্য কী কী দ্রব্য আবশ্যক তাহাও রাজাকে জানাইয়া দিলেন। রাজা বড়ো ছেলেটিকে স্নেহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "পথশ্রমে অত্যন্ত শ্রান্তিবোধ হইয়াছে কি?"

বালক তাহার ভালোরূপ উত্তর না দিয়া ফকিরের কাছে ঘেঁষিয়া বসিল। রাজা তাহাদের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "তোমাদের এই সুকুমার শরীর তো পথে চলিবার

জন্য নহে। তোমরা আমার এই দুর্গে বাস করো, আমি তোমাদিগকে যত্ন করিয়া রাখিব।"

রাজার এই কথার উত্তর দেওয়া উচিত কি না এবং এই-সকল লোকদের সহিত ঠিক কিরূপ ভাবে ব্যবহার করা কর্তব্য তাহা বালকেরা ভাবিয়া পাইল না—তাহারা ফকিরের অধিকতর কাছে ঘেঁষিয়া বসিল; যেন মনে করিল, কোথাকার এই ব্যক্তি মলিন হাত বাড়াইয়া তাহাদিগকে এখনই আত্মসাৎ করিতে আসিতেছে।

ফকির গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আমরা কিছুকাল তোমার এই দুর্গে বাস করিতে পারি।" রাজাকে যেন অনুগ্রহ করিলেন। মনে মনে কহিলেন, 'আমি কে তহা যদি জানিতে, তবে এই অনুগ্রহে তোমার আর আনন্দের সীমা থাকিত না।'

তিনটি বালককে রাজা কিছুতেই পোষ মানাইতে পারিলেন না এবং ফকির নিতান্ত যেন নির্লিপ্ত হইয়া রহিলেন।

ফকির গোবিন্দমাণিক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনিয়াছি তুমি এক কালে রাজা ছিলে, কোথাকার রাজা?"

গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, "ত্রিপুরার।"

শুনিয়া বালকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ছোটো বিবেচনা করিল। তাহারা কোনো কালে ত্রিপুরার নাম শুনে নাই। কিন্তু ফকির ঈষৎ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার রাজত্ব গেল কী করিয়া।"

গোবিন্দমাণিক্য কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "বাংলার নবাব শা সুজা আমাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছেন।" নক্ষত্ররায়ের কোনো কথা বলিলেন না।

এই কথা শুনিয়া বালকেরা সকলে চমকিয়া উঠিয়া ফকিরের মুখের দিকে চাহিল। ফকিরের মুখ যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি সহসা বলিয়া ফেলিলেন, "এ-সকল বুঝি তোমার ভাইয়ের কাজ? তোমার ভাই বুঝি তোমাকে রাজ্য হইতে তাড়া করিয়া সন্ন্যাসী করিয়াছে?"

রাজা আশ্চর্য হইয়া গেলেন; কহিলেন, "তুমি এত সংবাদ কোথায় পাইলে সাহেব?" পরে মনে করিলেন, আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। কাহারো নিকট হইতে শুনিয়া থাকিবেন।

ফকির তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আমি কিছুই জানি না। আমি কেবল অনুমান করিতেছি।"

রাত্রি হইলে সকলে শয়ন করিতে গেলেন। সে রাত্রে ফকিরের আর ঘুম হইল না। জাগিয়া দুঃস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক শব্দে চমকিয়া উঠিলেন।

পরদিন ফকির গোবিন্দমাণিক্যকে কহিলেন, "বিশেষ প্রয়োজনবশত এখানে আর থাকা হইল না; আমরা আজ বিদায় হই।"

গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, "বালকেরা পথের কষ্টে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, উহাদিগকে

আর-কিছুকাল বিশ্রাম করিতে দিলে ভালো হয়।"

বালকেরা কিছু বিরক্ত হইল; তাহাদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠটি ফকিরের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমরা কিছু নিতান্ত শিশু না, যখন আবশ্যক তখন অনায়াসে কষ্ট সহ্য করিতে পারি।" গোবিন্দমাণিক্যের নিকট হইতে তাহারা স্নেহ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে। গোবিন্দমাণিক্য আর কিছু বলিলেন না।

ফকির যখন যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় দুর্গে আর-একজন অতিথি আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা ও ফকির উভয়ে আশ্চর্য হইয়া গেলেন। ফকির কী করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। রাজা তাঁহার অতিথিকে প্রণাম করিলেন। অতিথি আর কেহ নহেন, রঘুপতি। রাজার প্রণাম গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "জয় হউক।"

রাজা কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নক্ষত্রের নিকট হইতে আসিতেছ ঠাকুর? বিশেষ কোনো সংবাদ আছে?"

রঘুপতি কহিলেন, "নক্ষত্ররায় ভালো আছেন, তাঁহার জন্য ভাবিবেন না।" আকাশের দিকে হাত তুলিয়া কহিলেন, "আমাকে জয়সিংহ তোমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছে। সে বাঁচিয়া নাই। তাহার ইচ্ছা আমি সাধন করিব, নহিলে আমার শান্তি নাই। তোমার কাছে থাকিয়া তোমার সঙ্গী হইয়া তোমার সকল কার্যে আমি যোগ দিব।"

রাজা প্রথমে রঘুপতির ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি একবার মনে করিলেন রঘুপতি বুঝি পাগল হইয়া থাকিবেন। রাজা চুপ করিয়া রহিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "আমি সমস্ত দেখিয়াছি, কিছুতেই সুখ নাই। হিংসা করিয়া সুখ নাই, আধিপত্য করিয়া সুখ নাই, তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ তাহাতেই সুখ। আমি তোমার পরম শত্রুতা করিয়াছি, আমি তোমাকে হিংসা করিয়াছি, তোমাকে আমার কাছে বলি দিতে চাহিয়াছিলাম, আজ আমাকে তোমার কাছে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে আসিয়াছি।"

গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, "ঠাকুর, তুমি আমার পরম উপকার করিয়াছ, আমার শত্রু আমার ছায়ার মতো আমার সঙ্গে সঙ্গেই লিপ্ত হইয়াছিল, তাহার হাত হইতে তুমি আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছ।"

রঘুপতি সে কথায় বড়ো একটা কান না দিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আমি জগতে রক্তপাত করিয়া যে পিশাচীকে এতকাল সেবা করিয়া আসিয়াছি সে অবশেষে আমারই হৃদয়ের সমস্ত রক্ত শোষণ করিয়া পান করিয়াছে। সেই শোণিতপিপাসী জড়তা-মূঢ়তাকে আমি দূর করিয়া আসিয়াছি, সে এখন মহারাজের রাজ্যের দেবমন্দিরে নাই, এখন সে রাজসভায় প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে চড়িয়া বসিয়াছে।"

রাজা কহিলেন, "দেবমন্দির হইতে যদি সে দূর হয় তো ক্রমে মানবের হৃদয় হইতেও দূর হইতে পারিবে।"

পশ্চাৎ হইতে একটি পরিচিত স্বর কহিল, "না মহারাজ, মানব-হৃদয়ই প্রকৃত মন্দির,

সেইখানেই খড়্গ শানিত হয় এবং সেইখানেই শত সহস্র নরবলি হয়। দেবমন্দিরে তাহার সামান্য অভিনয় হয় মাত্র।"

রাজা সচকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন সহাস্য সৌম্যমূর্তি বিল্বন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "আজ আমার কী আনন্দ!"

বিল্বন কহিলেন, "মহারাজ আপনাকে জয় করিয়াছেন বলিয়া সকলকেই জয় করিয়াছেন। তাই আজ আপনার দ্বারে শত্রুমিত্র সকলে একত্র হইয়াছে।"

ফকির অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "মহারাজ, আমিও তোমার শত্রু, আমিও তোমার হাতে ধরা দিলাম।" রঘুপতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, "এই ব্রাহ্মণঠাকুর আমাকে জানেন। আমিই সুজা, বাংলার নবাব, আমিই তোমাকে বিনা অপরাধে নির্বাসিত করিয়াছি এবং সে পাপের শাস্তিও পাইয়াছি— আমার ভ্রাতার হিংসা আজ পথে পথে আমার অনুসরণ করিতেছে, আমার রাজ্যে আমার আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। ছদ্মবেশে আমি আর থাকিতে পারি না, তোমার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া আমি বাঁচিলাম।"

তখন রাজা ও নবাব উভয়ে কোলাকুলি করিলেন। রাজা কেবলমাত্র কহিলেন, "আমার কী সৌভাগ্য!"

রঘুপতি কহিলেন, "মহারাজ, তোমার সহিত শত্রুতা করিলেও লাভ আছে। তোমার শত্রুতা করিতে গিয়াই তোমার কাছে ধরা পড়িয়াছি, নহিলে কোনো কালে তোমাকে জানিতাম না।"

বিল্বন হাসিয়া কহিলেন, "যেমন ফাঁসের মধ্যে পড়িয়া ফাঁস ছিঁড়িতে গিয়া গলায় আরো অধিক বাধিয়া যায়।"

রঘুপতি কহিলেন, "আমার আর দুঃখ নাই, আমি শান্তি পাইয়াছি!"

বিল্বন কহিলেন, "শান্তি সুখ আপনার মধ্যেই আছে, কেবল জানিতে পাই না! ভগবান এ যেন মাটির হাঁড়িতে অমৃত রাখিয়াছেন, অমৃত আছে বলিয়া কাহারো বিশ্বাস হয় না। আঘাত লাগিয়া হাঁড়ি ভাঙিলে তবে অনেক সময়ে সুধার আস্বাদ পাই। হায় হায়, এমন জিনিসও এমন জায়গায় থাকে।"

এমন সময়ে একটা অভ্রভেদী হো হো শব্দ উঠিল। দেখিতে দেখিতে দুর্গের মধ্যে ছোটোবড়ো নানাবিধ ছেলে আসিয়া পড়িল। রাজা বিল্বনকে কহিলেন, "এই দেখো ঠাকুর—আমার ধ্রুব।" বলিয়া ছেলেদের দেখাইয়া দিলেন।

বিল্বন কহিলেন, "যাহার প্রসাদে তুমি এতগুলি ছেলে পাইয়াছ সেও তোমাকে ভোলে নাই, তাহাকে আনিয়া দিই।" বলিয়া বাহিরে গেলেন। কিঞ্চিৎ বিলম্বে ধ্রুবকে কোলে করিয়া আনিয়া রাজার কোলে দিলেন।

রাজা তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ডাকিলেন, "ধ্রুব!"

ধ্রুব কিছুই বলিল না, গম্ভীরভাবে নীরবে রাজার কাঁধে মাথা দিয়া পড়িয়া রহিল। বহুদিন পরে প্রথম মিলনে বালকের ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে যেন একপ্রকার অস্ফুট অভিমান ও লজ্জার

উদয় হইল। রাজাকে জড়াইয়া মুখ লুকাইয়া রহিল।

রাজা বলিলেন, "আর-সব হইল, কেবল নক্ষত্র আমাকে ভাই বলিল না।"

সুজা তীব্রভাবে কহিলেন, "মহারাজ, আর সকলেই অতি সহজেই ভাইয়ের মতো ব্যবহার করে, কেবল নিজের ভাই করে না।"

সুজার হৃদয় হইতে এখনো শেল উৎপাটিত হয় নাই।

উপসংহার

এইখানে বলা আবশ্যক, তিনটি বালক সুজার তিন ছদ্মবেশী কন্যা। সুজা মক্কা যাইবার উদ্দেশে চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গুরুতর বর্ষার প্রাদুর্ভাবে একখানিও জাহাজ পাইলেন না। অবশেষে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবার পথে, গোবিন্দমাণিক্যের সহিত দুর্গে দেখা হয়। কিছুদিন দুর্গে বাস করিয়া সুজা সংবাদ পাইলেন এখনো সম্রাট্-সৈন্য তাঁহাকে সন্ধান করিতেছে। গোবিন্দমাণিক্য যানাদি ও বিস্তর অনুচর-সমেত তাঁহার বন্ধু আরাকান-পতির নিকটে তাঁহাকে প্রেরণ করেন। যাইবার সময় সুজা তাঁহাকে বহুমূল্য তরবারি উপহার-স্বরূপ দান করেন।

ইতিমধ্যে রাজা রঘুপতি ও বিল্বনে মিলিয়া সমস্ত গ্রামকে যেন সচেতন করিয়া তুলিলেন। রাজার দুর্গ সমস্ত গ্রামের প্রাণ হইয়া উঠিল।

এইরূপে ছয় বৎসর কাটিয়া গেলে ছত্রমাণিক্যের মৃত্যু হইল। গোবিন্দমাণিক্যকে সিংহাসনে ফিরাইয়া লইবার জন্য ত্রিপুরা হইতে দূত আসিল।

গোবিন্দমাণিক্য প্রথমে বলিলেন, "আমি রাজ্যে ফিরিব না।"

বিল্বন কহিলেন, " সে হইবে না মহারাজ, ধর্ম যখন স্বয়ং দ্বারে আসিয়া আহ্বান করিতেছেন তখন তাঁহাকে অবহেলা করিবেন না।"

রাজা তাঁহার ছাত্রদের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমার এতদিনকার আশা অসমাপ্ত, এতদিনকার কার্য অসম্পূর্ণ হইবে।"

বিল্বন কহিলেন, "এখানে তোমার কার্য আমি করিব।"

রাজা কহিলেন, "তুমি যদি এখানে থাক তাহা হইলে আমার সেখানকার কার্য অসম্পূর্ণ হইবে।"

বিল্বন কহিলেন, "না মহারাজ, এখন আমাকে আর তোমার আবশ্যক নাই। তুমি এখন আপনার প্রতি আপনি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পার। আমি যদি সময় পাই তো মাঝে মাঝে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।"

রাজা ধ্রুবকে সঙ্গে লইয়া রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। ধ্রুব এখন আর নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। সে বিল্বনের প্রসাদে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া শাস্ত্র অধ্যয়নে মন দিয়াছে। রঘুপতি পুনর্বার

পৌরোহিত্য গ্রহণ করিলেন। এবার মন্দিরে আসিয়া যেন মৃত জয়সিংহকে পুনর্বার জীবিতভাবে প্রাপ্ত হইলেন।

এদিকে বিশ্বাসঘাতক আরাকান-পতি সুজাকে হত্যা করিয়া তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ করেন।

'দুর্ভাগা সুজার প্রতি আরাকান-পতির নৃশংসতা স্মরণ করিয়া গোবিন্দমাণিক্য দুঃখ করিতেন। সুজার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি তরবারের বিনিময়ে বহুতর অর্থ দ্বারা কুমিল্লা নগরীতে একটি উৎকৃষ্ট মসজিদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহ' অদ্যাপি সুজা-মসজিদ বলিয়া বর্তমান আছে।

'গোবিন্দমাণিক্যের যত্নে মেহেরকুল আবাদ হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণগণকে বিস্তর ভূমি তাম্রপত্রে সনন্দ লিখিয়া দান করেন। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য কুমিল্লার দক্ষিণে বাতিসা গ্রামে একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। তিনি অনেক সংকার্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, কিন্তু সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। এইজন্য অনুতাপ করিয়া ১৬৬৯ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।"

শেষ দুই প্যারাগ্রাফ শ্রীযুক্তবাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত
ত্রিপুরা-ইতিহাস হইতে উদ্‌ধৃত

আটটি গল্প

খোকাবাবু | সাক্ষী | কাবুলিওয়ালা | স্বর্ণমৃগ |
দানপ্রতিদান | অনধিকার | প্রবেশ গুপ্তধন | মাষ্টার মশায়

নিবেদন

ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকরূপে গল্পের বইয়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে ইহা আমরা অনুভব করিয়াছি। সেই জন্যই "গল্পগুচ্ছ" হইতে বালকবালিকাদের পাঠোপযোগী আটটি গল্প নির্বাচন করিয়া লইয়া এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন করা হইল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১১

খোকাবাবু

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি। লম্বা চুল, বড় বড় চোখ, শ্যামচিক্কণ ছিপ্‌ছিপে বালক। জাতিতে কায়স্থ। তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের এক বৎসর বয়স্ক একটি শিশুর রক্ষণ ও পালনকার্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল।

সেই শিশুটি কালক্রমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুন্সেফিতে প্রবেশ করিয়াছেন। রাইচরণ এখনো তাঁহার ভৃত্য।

তাহার আর একটি মনিব বাড়িয়াছে, মাঠাকুরানি ঘরে আসিয়াছেন, সুতরাং অনুকূল বাবুর উপর রাইচরণের পূর্বে যতটা অধিকার ছিল তাহার অধিকাংশই নূতন কর্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কর্ত্রী যেমন রাইচরণের পূর্বাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন তেমনি একটি নূতন অধিকার দিয়া অনেকটা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অনুকূলের একটি পুত্রসন্তান অল্পদিন হইল জন্মলাভ করিয়াছে—এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপুণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোনো প্রত্যাশা না করিয়া এমন সকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসংগত প্রশ্ন সুর করিয়া শিশুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে, এই ক্ষুদ্র শিশুটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত, এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিল্‌ খিল্‌ হাস্য-কলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্বে সবিস্ময়ে বলিত, "মা, তোমার ছেলে বড় হ'লে জজ্‌ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।"



পৃথিবীতে আর কোনো মানবসন্তান যে এই বয়সে চৌকাঠ লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজ্‌দের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নহে।

অবশেষে শিশু যখন টলমল করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল সে এক আশ্চর্য ব্যাপার, এবং যখন মাকে মা, পিসিকে পিচি, এবং রাইচরণকে চন্ন বলিয়া সম্ভাষণ করিল, তখন রাইচরণ সেই প্রত্যয়াতীত সংবাদ যাহার তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মাকে মা বলে, পিসিকে পিচি বলে, কিন্তু আমাকে বলে চন্ন। বাস্তবিক শিশুর মাথায় এ বুদ্ধি কি করিয়া জোগাইল বলা শক্ত। নিশ্চয়ই কোনো বয়স্ক লোক কখনই এরূপ অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না, এবং দিলেও তাহার জজের পদপ্রাপ্তি সম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সম্পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছুদিন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। মল্ল সাজিয়া তাহাকে

শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত—আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত। এই সময়ে অনুকূল পদ্মাতীরবর্তী এক জিলায় বদলি হইলেন।

অনুকূল তাঁহার শিশুর জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় একটা জরির টুপি, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দুইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুই বেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক এক গ্রাসে মুখে পূরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড় ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ্‌ঝুপ্ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশদিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুতবেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্রগতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরাহ্নে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালি ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই—মেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল, পরপারে জনহীন বালুকাতীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সূর্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "চন্ন, ফু!"

অনতিদূরে সজল পঙ্কিল ভূমির উপর একটি কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় গুটিকতক কদম্ব-ফুল ফুটিয়াছিল, সেই দিকে শিশুর লুব্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই চারি দিন হইল রাইচরণ কাঠি দিয়া বিদ্ধ করিয়া তাহাকে গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে শিশুর এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে, সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই; ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙিয়া ফুল তুলিতে যাইতে চন্নর প্রবৃত্তি হইল না—তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "দেখ দেখ ও—ই দেখ পাখি—ওই উড়ে—এ গেল! আয়রে পাখি আয় আয়"—এইরূপ অবিশ্রান্ত বিচিত্র কলরব করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ্ হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে, তাহাকে এরূপ সামান্য উপায়ে ভুলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা—বিশেষত চারিদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পাখি লইয়া অধিকক্ষণ কাজ চলে না।

রাইচরণ বলিল, "তবে তুমি গাড়িতে বসে' থাক, আমি চট্ করে' ফুল তুলে আনচি। খবরদার জলের ধারে যেয়ো না।" বলিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ব-বৃক্ষের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু ঐ যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্ব ফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্‌খল্ ছল্‌ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, যেন দুষ্টামি করিয়া কোন এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশুপ্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবশিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধারে গেল—একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল—দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বারবার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়! রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্ব-ফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল কেহ নাই। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কোথাও কাহারো কোনো চিহ্ন নাই।

মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎ-সংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁয়ার মতো হইয়া আসিল। ভাঙা বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, "বাবু—খোকাবাবু, লক্ষ্মি, দাদাবাবু আমার।"

কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল্‌ছল্ খল্‌খল্ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না, এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে উৎকণ্ঠিত জননী চারিদিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লণ্ঠন-হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল, রাইচরণ নিশীথের ঝোড়ো বাতাসের মত সমস্ত ক্ষেত্রময় "বাবু, খোকাবাবু আমার" বলিয়া ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম্ করিয়া মাঠাক্‌রুনের পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে, "জানিনে মা!"

যদিও সকলেই মনে মনে বুঝিল পদ্মারই এই কাজ, তথাপি গ্রামের প্রান্তে যে এক দল বেদের সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সন্দেহ দূর হইল না। এবং মাঠাকুরানির মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে; এমন কি, তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অনুনয়পূর্বক বলিলেন, 'তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে—তুই যত টাকা চাস্ তোকে দেব'।" শুনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। গৃহিণী তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

অনুকূলবাবু তাঁহার স্ত্রীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কী উদ্দেশ্যে করিতে পারে! গৃহিণী বলিলেন, "কেন? তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এতকাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই, হইবার বিশেষ আশাও ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে, বৎসর না যাইতেই তাহার স্ত্রী অধিক বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সংবরণ করিল।

এই নবজাত শিশুটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগ্নী যদি না থাকিত তবে এ শিশুটি পৃথিবীর বায়ু বেশি দিন ভোগ করিতে পাইত না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ছেলেটিও কিছুদিন বাদে চৌকাঠ পার হইতে আরম্ভ করিল, এবং সর্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সকৌতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন কি, ইহার কণ্ঠস্বর হাস্যক্রন্দনধ্বনি অনেকটা সেই শিশুরই মতো। এক-একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত রাইচরণের বুকটা সহসা ধড়াস করিয়া উঠিত, মনে হইত দাদাবাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে।

ফেল্‌না—রাইচরণের ভগ্নী ইহার নাম রাখিয়াছিল ফেল্‌না—যথা সময়ে পিসিকে পিচি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল—তবে ত খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সে ত আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

এই বিশ্বাসের অনুকূলে কতকগুলি অকাট্য যুক্তি ছিল। প্রথমত, সে যাইবার অনতিবিলম্বেই ইহার জন্ম। দ্বিতীয়ত, এতকাল পরে সহসা যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কখনই স্ত্রীর নিজগুণে হইতে পারে না। তৃতীয়ত, এও হামাগুড়ি দেয়, টল্‌মল্‌ করিয়া চলে, এবং পিসিকে পিচি বলে! যে সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জজ্‌ হইবার কথা, তাহার অনেকগুলি ইহাতে বর্তিয়াছে।

তখন মাঠাক্‌রুনের সেই দারুণ সন্দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়িল—আশ্চর্য হইয়া মনে মনে কহিল, "আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে!" —তখন, এতদিন শিশুকে যে অযত্ন করিয়াছে, সেজন্য বড় অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেলনাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে লাগিল যেন সে বড় ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির টুপি আনিল। মৃত স্ত্রীর গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারি হইল। পাড়ার কোনো ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না—রাত্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সঙ্গী হইল। পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইরূপ উন্মত্তবৎ আচরণে আশ্চর্য হইয়া গেল।

ফেল্‌নার যখন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তখন রাইচরণ নিজের জোতজমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতায় লইয়া গেল। সেখানে বহুকষ্টে একটি চাকরির জোগাড় করিয়া ফেল্‌নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিত না। মনে মনে বলিত, বৎস ভালবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোনো অযত্ন হইবে, তা হইবে না।

এম্‌নি করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে শুনে ভালো, এবং দেখিতে শুনিতেও

বেশ, হৃষ্টপুষ্ট উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—কেশবেশ-বিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ কিছু শৌখিন। বাপকে ঠিক বাপের মতো মনে করিতে পারিত না। কারণ, রাইচরণ স্নেহে বাপ, সেবায় ভৃত্য ছিল, এবং তাহার আর একটি দোষ ছিল, সে যে ফেল্‌নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্রনিবাসে ফেল্‌না বাস করিত সেখানকার ছাত্রগণ বাঙাল রাইচরণকে লইয়া সর্বদা কৌতুক করিত এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্‌নাও যে সেই কৌতুকালাপে যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসল-স্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড় ভালবাসিত, এবং ফেল্‌নাও ভালবাসিত, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি ঠিক বাপের মত নহে, তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজ কর্মে সর্বদাই দোষ ধরে। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলি ভুলিয়া যায়—কিন্তু যে ব্যক্তি পূরা বেতন দেয় বার্ধক্যের ওজর সে মানিতে চাহে না। এদিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্‌না আজকাল বসনভূষণের অভাব লইয়া সর্বদা খুঁত খুঁত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন রাইচরণ হঠাৎ কর্মে জবাব দিল এবং ফেল্‌নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল,—আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছুদিনের মতো দেশে যাইতেছি। এই বলিয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকূলবাবু তখন সেখানে মুন্সেফ ছিলেন।

অনুকূলের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গৃহিণী এখনো সেই পুত্রশোক বক্ষের মধ্যে লালন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবু কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কর্ত্রী একটি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্তান কামনায় বহুমূল্যে একটি শিকড় ও আশীর্বাদ কিনিতেছেন—এমন সময় প্রাঙ্গণে শব্দ উঠিল—"জয় হোক মা।"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে রে?"

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—"আমি রাইচরণ।"

বৃদ্ধকে দেখিয়া অনুকূলের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন এবং আবার তাহাকে কর্মে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাইচরণ ম্লান হাস্য করিয়া কহিল,—"মাঠাক্‌রুনকে একবার প্রণাম করিতে চাই।"

অনুকূল তাহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মা-ঠাক্‌রুন রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদর করিলেন না—রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ না করিয়া জোড়হস্তে কহিল—"প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মাও নয়, আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এই আমি"—

অনুকূল বলিয়া উঠিলেন,—"বলিস্ কি রে! কোথায় সে।"

"আজ্ঞা, আমার কাছেই আছে, আমি পরশ্ব আনিয়া দিব।"

সেদিন রবিবার। কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রী-পুরুষে দুই জনে উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্‌নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ উপস্থিত হইল।

অনুকূলের স্ত্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া অতৃপ্ত নয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক ছেলেটি দেখিতে বেশ—বেশভূষা আকার প্রকারে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণ নাই। মুখে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্জ ভাব দেখিয়া অনুকূলের হৃদয়েও সহসা স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোনো প্রমাণ আছে?"

রাইচরণ কহিল—"এমন কাজের প্রমাণ কী করিয়া থাকিবে? আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।"

অনুকূল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলেটিকে পাইবামাত্র তাঁহার স্ত্রী যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন এখন প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করা সুযুক্তি নহে, যেমন হউক, বিশ্বাস করাই ভালো। তা ছাড়া, রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবে? এবং বৃদ্ধ ভৃত্য তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে?—

ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে, সে শিশুকাল হইতে রাইচরণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনো তাহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভৃত্যের ভাব ছিল।

অনুকূল মন হইতে সন্দেহ দূর করিয়া বলিলেন—"কিন্তু রাইচরণ তুই আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পাইবি না।"

রাইচরণ করজোড়ে গদগদ কণ্ঠে বলিল,—"প্রভু, বৃদ্ধবয়সে কোথায় যাইব।"

কর্ত্রী বলিলেন, "আহা থাক! আমার বাছার কল্যাণ হৌক্! ওকে আমি মাপ করিলাম।"

ন্যায়পরায়ণ অনুকূল কহিলেন, "যে কাজ করিয়াছে উহাকে মাপ করা যায় না।"

রাইচরণ অনুকূলের পা জড়াইয়া কহিল, "আমি করি নাই, ঈশ্বর করিয়াছেন।"

নিজের পাপ ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দেখিয়া অনুকূল আরো বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।"

রাইচরণ প্রভুর পা ছাড়িয়া কহিল, "সে আমি নয় প্রভু!"

"তবে কে?"

"আমার অদৃষ্ট!"

কিন্তু এরূপ কৈফিয়তে কোনো শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না।

ফেল্‌না যখন দেখিল সে মুন্সেফের সন্তান, রাইচরণ তাহাকে এতদিন চুরি করিয়া নিজের ছেলে বলিয়া অপমানিত করিয়াছে তখন তাহার মনে মনে কিছু রাগ হইল। কিন্তু তথাপি

উদারভাবে পিতাকে বলিল, "বাবা উহাকে মাপ কর। বাড়িতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া দাও!"

ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল; তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানো কোনো লোক নাই।

সাক্ষী

ডাক্তার যখন জবাব দিয়া গেল তখন গুরুচরণের ভাই রামকানাই রোগীর পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "দাদা, যদি তোমার উইল করিবার ইচ্ছা থাকে ত বল।" গুরুচরণ ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আমি বলি তুমি লিখিয়া লও।" রামকানাই কাগজ কলম লইয়া প্রস্তুত হইলেন। গুরুচরণ বলিয়া গেলেন "আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আমার ধর্মপত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে দান করিলাম।" রামকানাই লিখিলেন—কিন্তু লিখিতে তাঁহার কলম সরিতেছিল না। তাঁহার বড় আশা ছিল, তাঁহার একমাত্র পুত্র নবদ্বীপ অপুত্রক জ্যাঠামহাশয়ের সমস্ত বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। যদিও দুই ভাইয়ে পৃথগন্ন ছিলেন তথাপি এই আশায় নবদ্বীপকে কিছুতেই তিনি চাকরি করিতে দেন নাই—এবং সকাল সকাল বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং শত্রুর মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া বিবাহ নিষ্ফল হয় নাই। তথাপি রামকানাই লিখিলেন এবং সই করিবার জন্য কলমটা দাদার হাতে দিলেন। গুরুচরণ নির্জীবহস্তে যাহা সই করিলেন, তাহা কতকগুলা কম্পিত বক্ররেখা কি তাঁহার নাম, বুঝা দুঃসাধ্য।

উইলের বৃত্তান্ত শুনিয়া নবদ্বীপের মা ছুটিয়া আসিয়া বিষম গোল বাধাইয়া দিল—বলিল—"মরণকালে বুদ্ধিনাশ হয়। এমন সোনারচাঁদ ভাইপো থাকিতে"—

রামকানাই ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "মেজ বৌ, তোমার ত বুদ্ধিনাশের সময় হয় নাই, তবে তোমার এমন ব্যবহার কেন? দাদা গেলেন, এখন আমি ত রহিয়া গেলাম, তোমার যা কিছু বক্তব্য আছে, অবসরমতো আমাকে বলিয়ো, এখন ঠিক সময় নয়—"

নবদ্বীপ সংবাদ পাইয়া যখন আসিল, তখন তাহার জ্যাঠামহাশয়ের কাল হইয়াছে। নবদ্বীপ মৃত ব্যক্তিকে শাসাইয়া কহিল, "দেখিব মুখাগ্নি কে করে—এবং শ্রাদ্ধশান্তি যদি করি ত আমার নাম নবদ্বীপ নয়।" গুরুচরণ লোকটা কিছুই মানিত না। সে ডফ সাহেবের ছাত্র ছিল। শাস্ত্রমতে যেটা সর্বাপেক্ষা অখাদ্য সেইটাতে তার বিশেষ পরিতৃপ্তি। লোকে যদি তাহাকে ক্রীশ্চান বলিত, সে জিভ কাটিয়া বলিত, "রাম, আমি যদি ক্রীশ্চান হই ত গো-মাংস খাই!" জীবিত অবস্থায় যাহার এই দশা, সদ্যোমৃত অবস্থায় সে যে পিণ্ডনাশ আশঙ্কায় কিছুমাত্র বিচলিত হইবে, এমন

সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপস্থিতমতো ইহা ছাড়া আর কোনো প্রতিশোধের পথ ছিল না। নবদ্বীপ একটা সান্ত্বনা পাইল যে লোকটা পরকালে গিয়া মরিয়া থাকিবে। যতদিন ইহলোকে থাকা যায়, জ্যাঠামহাশয়ের বিষয় না পাইলেও কোনোক্রমে পেট চলিয়া যায়, কিন্তু জ্যাঠামহাশয় যে লোকে গেলেন সেখানে ভিক্ষা করিযা পিণ্ড মেলে না। বাঁচিয়া থাকিবার অনেক সুবিধা আছে।

রামকানাই বরদাসুন্দরীর নিকট গিয়া বলিলেন, "বৌ-ঠাকুরানি, দাদা তোমাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া গিয়াছেন। এই তাঁহার উইল। লোহার সিন্ধুকে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিয়ো।"

বাড়ি ফিরিয়া গিয়া নবদ্বীপের মা রামকানাইকে লইয়া পড়িলেন। বোঝাই গাড়ি সমেত খাদের মধ্যে পড়িয়া হতভাগ্য বলদ গাড়োয়ানের সহস্র গুঁতা খাইয়াও অনেকক্ষণ যেমন নিরুপায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, রামকানাই তেমনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া সহ্য করিলেন— অবশেষে কাতরস্বরে কহিলেন, "আমার অপরাধ কি! আমি ত দাদা নই!"

নবদ্বীপের মা ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিলেন—"না, তুমি বড় ভালো মানুষ, তুমি কিছু বোঝো না; দাদা বল্লেন লেখ, ভাই অমনি লিখে গেলেন। তোমরা সবাই সমান।"



এদিকে নবদ্বীপ তাহার বুদ্ধিমান বন্ধুদের সহিত অনেক পরামর্শ করিয়া মাকে আসিয়া বলিল, "কোনো ভাবনা নাই। এ বিষয় আমিই পাইব। কিছুদিনের মতো বাবাকে এখান হইতে স্থানান্তরিত করা চাই। তিনি থাকিলে সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া যাইবে।" নবদ্বীপের বাবার বুদ্ধিশুদ্ধির প্রতি নবদ্বীপের মার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না সুতরাং কথাটা তাঁরও যুক্তিযুক্ত মনে হইল। অবশেষে মার তাড়নায় এই নিতান্ত অনাবশ্যক নির্বোধ কর্মনাশা বাবা একটা যেমন তেমন ছল করিয়া কিছুদিনের মত কাশীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই বরদাসুন্দরী এবং নবদ্বীপচন্দ্র পরস্পরের নামে উইল জালের অভিযোগ করিয়া আদালতে গিয়া উপস্থিত হইল। নবদ্বীপ তাহার নিজের নামে যে উইলখানি বাহির করিয়াছে তাহার নাম সহি দেখিলে গুরুচরণের হস্তাক্ষর স্পষ্ট প্রমাণ হয়; উইলের দুই একজন নিঃস্বার্থ সাক্ষীও পাওয়া গিয়াছে। বরদাসুন্দরীর পক্ষে নবদ্বীপের বাপ একমাত্র সাক্ষী এবং সহি কারো বুঝিবার সাধ্য নাই। তাঁহার গৃহপোষ্য একটি মামাতো ভাই ছিল, সে বলিল, "দিদি, তোমার ভাবনা নাই, আমি সাক্ষ্য দিব এবং আরো সাক্ষ্য জুটাইব।"

ব্যাপারটা যখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিল, তখন নবদ্বীপের মা নবদ্বীপের বাপকে কাশী হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনুগত ভদ্রলোকটি ব্যাগ ও ছাতা হাতে যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

একদিন না যাইতেই রামকানাই সহসা আদালত হইতে এক সাক্ষীর সপিনা পাইলেন। অবাক্ হইয়া যখন তাহার মর্মগ্রহণের চেষ্টা করিতেছেন তখন নবদ্বীপের মা আসিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বলিলেন, "হাড়জ্বালানি ডাকিনী কেবল যে বাছা নবদ্বীপকে তাহার স্নেহশীল জ্যাঠার ন্যায্য উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চায় তাহা নহে, আবার সোনার ছেলেকে জেলে পাঠাইবার আয়োজন করিতেছে।"

অবশেষে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া রামকানাইয়ের চক্ষু স্থির হইয়া গেল। উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তোরা একি সর্বনাশ করিয়াছিস্।" গৃহিণী ক্রমে নিজমূর্তি ধারণ করিয়া বলিলেন—"কেন, এতে নবদ্বীপের দোষ হয়েচে কি? সে তার জ্যাঠার বিষয় নেবে না! অমনি এক কথায় ছেড়ে দেবে!"

হতবুদ্ধি রামকানাই যখন দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রীপুত্র উভয়ে মিলিয়া কখনো-বা তর্জন গর্জন কখনো-বা অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন, তখন ললাটে করাঘাত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন—আহার ত্যাগ করিলেন, জল পর্যন্ত স্পর্শ করিলেন না।

এইরূপে দুইদিন নীরবে অনাহারে কাটিয়া গেল, মকদ্দমার দিন উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে নবদ্বীপ বরদাসুন্দরীর মামাতো ভাইটিকে ভয় প্রলোভন দেখাইয়া এমনি বশ করিয়া লইয়াছে যে, সে অনায়াসে নবদ্বীপের পক্ষে সাক্ষ্য দিল। জয়শ্রী যখন বরদাসুন্দরীকে ত্যাগ করিয়া অন্য পক্ষে যাইবার আয়োজন করিতেছে, তখন রামকানাইকে ডাক পড়িল।

অনাহারে মৃতপ্রায় শুষ্ককণ্ঠ শুষ্করসনা বৃদ্ধ কম্পিত শীর্ণ অঙ্গুলি দিয়া সাক্ষ্যমঞ্চের কাঠগড়া চাপিয়া ধরিলেন। চতুর ব্যারিস্টার অত্যন্ত কৌশলে কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য জেরা

করিতে আরম্ভ করিলেন—বহুদূর হইতে আরম্ভ করিয়া সাবধানে অতি ধীর বক্রগতিতে প্রসঙ্গের নিকটবর্তী হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন রামকানাই জজের দিকে ফিরিয়া জোড় হস্তে কহিলেন, "হুজুর আমি বৃদ্ধ, অত্যন্ত দুর্বল। অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। আমার যা বলিবার সংক্ষেপে বলিয়া লই। আমার দাদা স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্তী মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সে উইল আমি নিজ হস্তে লিখিয়াছি এবং দাদা নিজহস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যে উইল দাখিল করিয়াছেন তাহা মিথ্যা।" এই বলিয়া কামকানাই কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

চতুর ব্যারিস্টার সকৌতুকে পার্শ্ববর্তী অ্যাটর্নিকে বলিলেন, "বাই জোভ্! লোকটাকে কেমন ঠেসে ধরেছিলুম?"

মামাতো ভাই ছুটিয়া গিয়া দিদিকে বলিল—"বুড়ো সমস্ত মাটি করিয়াছিল—আমার সাক্ষ্যে মকদ্দমা রক্ষা পায়।"

দিদি বলিলেন "বটে, বটে? লোক কে চিন্‌তে পারে। আমি বুড়োকে ভালো বলে' জানতুম!"

কারাবরুদ্ধ নবদ্বীপের বুদ্ধিমান বন্ধুরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিল নিশ্চয়ই বৃদ্ধ ভয়ে এই কাজ করিয়া ফেলিয়াছে; সাক্ষীর বাক্‌সের মধ্যে উঠিয়া বুড়া বুদ্ধি ঠিক রাখিতে পারে নাই; এমনতর আস্ত নির্বোধ সমস্ত শহর খুঁজিলে মিলে না।

কাবুলিওয়ালা

আমার পাঁচ বছরের ছোট মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে কেবল একটি বৎসরকাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে সে যতক্ষণ জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না। তাহার মা অনেক সময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমন অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে সে আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। এই জন্য আমার সঙ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে।

সকালবেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসিয়া আরম্ভ করিয়া দিল, "বাবা, রামদয়াল দারোয়ান কাককে কৌয়া বল্‌ছিল, সে কিছু জানে না। না?"

আমি, পৃথিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞানদান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই সে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উপনীত হইল। "দেখ বাবা, ভোলা বল্‌ছিল আকাশে হাতি শুঁড় দিয়ে জল



ফেলে তাই বৃষ্টি হয়। মাগো, ভোলা এত মিছিমিছি বক্‌তে পারে? কেবলি বকে দিনরাত বকে!"

সে পরক্ষণেই আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতি দ্রুত উচ্চারণে আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা!"

ময়লা ঢিলা কাপড়-পরা, পাগড়ি-মাথায়, ঝুলি-ঘাড়ে, হাতে গোটা দুইচার আঙুরের বাক্স, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা মৃদুমন্দ গমনে পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারত্নের কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে ঊর্ধ্বস্বরে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি

ভাবিলাম, এখনি ঝুলি-ঘাড়ে একটা আপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আর শেষ হইবে না।

কিন্তু মিনির চীৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে উর্ধ্বশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মত ছিল যে, ঐ ঝুলিটার ভিতরে সন্ধান করিলে তাহার মত দুটো চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

এদিকে কাবুলিওয়ালা আসিয়া সহাস্যে আমাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল—আমি ভাবিলাম, যদিচ প্রতাপ সিংহ এবং কাঞ্চনমালার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন, তথাপি লোকটাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে কিছু না কেনাটা ভালো হয় না।

কিছু কেনা গেল। তাহার পর পাঁচটা কথা আসিয়া পড়িল। আবদার রহমান, রুশ, ইংরাজ প্রভৃতিকে লইয়া সীমান্তরক্ষানীতি সম্বন্ধে গল্প চলিতে লাগিল।

অবশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, তোমার লড়্‌কী কোথা গেল?"

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম—সে আমার গা ঘেঁষিয়া কাবুলির মুখ এবং ঝুলির দিকে সন্দিগ্ধনেত্রক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিস্‌মিস্‌ খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় আবশ্যকবশত বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চের উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে, কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামত দো-আঁশলা বাংলায় ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চমবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান্‌ শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম-কিস্‌মিসে পরিপূর্ণ। আমি কাবুলিওয়ালাকে কহিলাম, "উহাকে এ-সব কেন দিয়াছ? অমন আর দিয়ো না" বলিয়া পকেট হইতে একটা আধুলি লইয়া তাহাকে দিলাম। সে অসংকোচে আধুলি গ্রহণ করিয়া ঝুলিতে পুরিল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই আধুলিটি লইয়া ষোল আনা গোলযোগ বাঁধিয়া গেছে।

মিনির মা একটা শ্বেত চক্‌চকে গোলাকার পদার্থ লইয়া ভর্ৎসনার স্বরে মিনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুই এ আধুলি কোথায় পেলি?"

মিনি বলিতেছে, "কাবুলিওয়ালা দিয়েচে।"

তাহার মা বলিতেছেন, "কাবুলিওয়ালার কাছ হইতে আধুলি তুই কেন নিতে গেলি!"

মিনি ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া কহিল, "আমি চাইনি, সে আপনি দিল!"

আমি আসিয়া মিনিকে তাহার আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে লইয়া গেলাম।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ, তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তা বাদাম ঘুস দিয়া মিনির ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে—যথা, রহমতকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতরে কি?"

রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, "হাঁতি।"

অর্থাৎ তাহার ঝুলির ভিতরে যে একটা হস্তী আছে এইটেই তাহার পরিহাসের সূক্ষ্ম মর্ম। —খুব যে বেশি সূক্ষ্ম তাহা বলা যায় না, তথাপি এই পরিহাসে উভয়েই বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিত—এবং শরৎকালের প্রভাতে একটি বয়স্ক এবং একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সরল হাস্য দেখিয়া আমারো বেশ লাগিত।

উহাদের মধ্যে আরো একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মিনিকে বলিত, "খোখী, তোমি সসুর-বাড়ি কখুনু যাবে না!"

বাঙালি ঘরের মেয়ে আজন্মকাল "শ্বশুর-বাড়ি" শব্দটার সহিত পরিচিত, কিন্তু আমরা কিছু এ-কেলে ধরনের লোক হওয়াতে শিশু মেয়েকে শ্বশুর-বাড়ি সম্বন্ধে সজ্ঞান করিয়া তোলা হয় নাই। এই জন্য রহমতের অনুরোধটা সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিত না, অথচ কথাটার একটা কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ, সে উল্টিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "তুমি, শ্বশুর-বাড়ি যাবে?"

রহমত কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিত, "হামি সসুরকে মারবে।"

শুনিয়া মিনি শ্বশুর নামক কোনো এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

এখন শুভ্র শরৎকাল। প্রাচীনকালে এই সময়েই রাজারা দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন। আমি কলিকাতা ছাড়িয়া কখনো কোথাও যাই নাই, কিন্তু সেই জন্যই আমার মনটা পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি যেন আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী, বাহিরের পৃথিবীর জন্য আমার সর্বদা মন কেমন করে। একটা বিদেশের নাম শুনিলেই অমনি আমার চিত্ত ছুটিয়া যায়, তেমন বিদেশি লোক দেখিলেই অমনি নদী পর্বত অরণ্যের মধ্যে একটা কুটিরের দৃশ্য মনে উদয় হয়, এবং একটা উল্লাসপূর্ণ স্বাধীন জীবনযাত্রার কথা কল্পনায় জাগিয়া উঠে।

এদিকে আবার আমি এমনি উদ্ভিজ্জ-প্রকৃতি যে আমার কোণটুকু ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গেলে মাথায় বজ্রাঘাত হয়। এই জন্য সকালবেলায় আমার ছোট ঘরে টেবিলের সাম্‌নে বসিয়া এই কাবুলির সঙ্গে গল্প করিয়া আমার অনেকটা ভ্রমণের কাজ হইত। দুইধারে বন্ধুর দুর্গম দগ্ধ রক্তবর্ণ উচ্চ গিরিশ্রেণী, মধ্যে সংকীর্ণ মরুপথ, বোঝাই-করা উষ্ট্রের শ্রেণি চলিয়াছে, পাগ্‌ড়ি-পরা বণিক ও পথিকেরা কেহ-বা উটের পরে, কেহ-বা পদব্রজে, কাহারো হাতে বর্শা,

কাহারো হাতে সেকেলে চক্‌মকি-ঠোকা বন্দুক; কাবুলি মেঘমন্দ্রস্বরে ভাঙা বাংলায় স্বদেশের গল্প করিত, আর এই ছবি আমার চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত।

মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের লোক। রাস্তায় একটা শব্দ শুনিলেই তাঁহার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়িটাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই পৃথিবীটা যে সর্বত্রই চোর ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিয়া শুঁয়োপোকা আর্‌শোলা এবং গোরার দ্বারা পরিপূর্ণ, এত দিন (খুব বেশিদিন নহে) পৃথিবীতে বাস করিয়াও সে বিভীষিকা তাহার মন হইতে দূর হইয়া যায় নাই।

রহমত কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছেন। আমি তাঁহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে তিনি পর্যায়ক্রমে আমাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন—"কখনো কি কাহারো ছেলে চুরি যায় না? কাবুলদেশে কি দাস-ব্যবসায় প্রচলিত নাই? একজন প্রকাণ্ড কাবুলির পক্ষে একটি ছোট ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব?"

আমাকে মানিতে হইল ব্যাপারটা যে অসম্ভব তাহা নহে, কিন্তু অবিশ্বাস্য। বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের সমান নহে, এই জন্য আমার স্ত্রীর মনে ভয় রহিয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়া বিনা দোষে রহমতকে আমাদের বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিতে পারিলাম না।

প্রতি বৎসর মাঘমাসের মাঝামাঝি রহমৎ দেশে চলিয়া যায়। এই সময়টা সমস্ত পাওনার টাকা আদায় করিবার জন্য সে বড় ব্যস্ত থাকে। বাড়ি বাড়ি ফিরিতে হয় কিন্তু তবু একবার মিনিকে দর্শন দিয়া যায়। দেখিলে বাস্তবিক মনে হয় উভয়ের মধ্যে যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সকালে যেদিন আসিতে পারে না, সেদিন দেখি সন্ধ্যার সময় আসিয়াছে; অন্ধকারে ঘরের কোণে সেই ঢিলেঢালা জামাপায়জামা-পরা সেই ঝোলা-ঝুলিওয়ালা লম্বা লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাৎ মনের ভিতরে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

কিন্তু যখন দেখি মিনি "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা" করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসে এবং দুই অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে তখন সমস্ত হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে।

একদিন সকালে আমার ছোট ঘরে বসিয়া প্রুফ্‌শিট্‌ সংশোধন করিতেছি। বিদায় লইবার পূর্বে আজ দুই তিন দিন হইতে শীতটা খুব কনকনে হইয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে একেবারে হীহীকার পড়িয়া গেছে। জানলা ভেদ করিয়া সকালের রৌদ্রটি টেবিলের নীচে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই উত্তাপটুকু বেশ মধুর বোধ হইতেছে। বেলা বোধ করি আটটা হইবে, মাথায়-গলাবন্ধ-জড়ানো উষাচরগণ প্রাতর্ভ্রমণ সমাধ্য করিয়া প্রায় সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন সময় রাস্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে—তাহার পশ্চাতে কৌতূহলী ছেলের দল চলিয়াছে। রহমতের গাত্রবস্ত্রে রক্তচিহ্ন এবং একজন পাহারাওয়ালার হাতে রক্তাক্ত ছোরা। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কী।

কিয়দংশ তাহার কাছে কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতর কাছে কিঞ্চিৎ ধারিত— মিথ্যাপূর্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমত তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানারূপ অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময় 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মুখ মুহূর্তের মধ্যে কৌতুকহাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার স্কন্ধে আজ ঝুলি ছিল না, সুতরাং ঝুলি সম্বন্ধে তাহাদের অভ্যস্ত আলোচনা হইতে পারিল না। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?"

রহমত হাসিয়া কহিল, "সিখানেই যাচ্ছে।"

দেখল উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল, "সুসুরাকে মারিতাম, কিন্তু কী করিব, হাত বাঁধা!"

সাংঘাতিক আঘাত করার অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম। আমরা যখন ঘরে বসিয়া চিরাভ্যস্তমতো নিত্য কাজের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতাম তখন একজন স্বাধীন পর্বতচারী পুরুষ কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষযাপন করিতেছে তাহা আমাদের মনেও উদয় হইত না।

আর, চঞ্চল-হৃদয়া মিনির আচরণ যে অত্যন্ত লজ্জাজনক তাহা তাহার বাপকেও স্বীকার করিতে হয়। সে স্বচ্ছন্দে তাহার পুরাতন বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া প্রথমে নবী সহিসের সহিত সখ্য স্থাপন করিল। পরে ক্রমে যত তাহার বয়স বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, ততই তাহার সখার পরিবর্তে একটি একটি করিয়া সখী জুটিতে লাগিল, এমন কি এখন তাহার বাবার লিখিবার ঘরেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি ত তাহার সহিত একপ্রকার আড়ি করিয়াছি।

কত বৎসর কাটিয়া গেল। আর একটি শরৎকাল আসিয়াছে। আমার মিনির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পূজার ছুটির মধ্যেই তাহার বিবাহ হইবে। কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে।

প্রভাতটি অতি সুন্দর হইয়া উদয় হইয়াছে। বর্ষার পরে এই শরতের নূতনধৌত রৌদ্রে যেন সোহাগায়-গলানো নির্মল সোনার মত রং ধরিয়াছে। এমনকি, কলিকাতার গলির ভিতরকার ইষ্টকজর্জর অপরিচ্ছন্ন ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িগুলার উপরেও এই রৌদ্রের আভা একটি অপরূপ লাবণ্য বিস্তার করিয়াছে।

আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে। সে বাঁশি যেন আমার বুকের পঞ্জরের হাড়ের মধ্য হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। করুণ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদ-ব্যথাকে শরতের রৌদ্রের সহিত সমস্ত বিশ্বজগৎময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

সকাল হইতে ভারি গোলমাল, লোকজনের আনাগোনা। উঠানে বাঁশ বাঁধিয়া পাল খাটানো হইতেছে; বাড়ির ঘরে ঘরে এবং বারান্দায় ঝাড় টাঙাইবার ঠুংঠাং শব্দ উঠিতেছে, হাঁকডাকের সীমা নাই।

আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই, তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্বের মত সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, "কি রে রহমত, কবে আসিলি?"

সে কহিল, "কাল সন্ধ্যাবেলায় জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।"

কথাটা শুনিয়া কেমন কানে খট করিয়া উঠিল। কোনো খুনিকে কখনো প্রত্যক্ষ দেখি নাই, ইহাকে দেখিয়া, সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।

আমি তাহাকে কহিলাম, "আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও।"—

কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না?"

তাহার মনে বুঝি বিশ্বাস ছিল, মিনি সেইভাবেই আছে। সে যেন মনে করিয়াছিল, মিনি আবার সেই পূর্বের মতো "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা" করিয়া ছুটিয়া আসিবে, তাহাদের সেই অত্যন্ত কৌতুকাবহ পুরাতন হাস্যালাপের কোনোরূপ ব্যত্যয় হইবে না। এমনকি, পূর্ববন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া সে একবাক্স আঙুর এবং কাগজের মোড়কে কিঞ্চিৎ কিস্‌মিস্ বাদাম বোধ করি কোনো স্বদেশীয় বন্ধুর নিকট চাহিয়া চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল—তাহার সে নিজের ঝুলিটি আর ছিল না।

আমি কহিলাম—"আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারো সহিত দেখা হইতে পারিবে না।"

সে যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তারপরে—"বাবু সেলাম" বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময় দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, "এই আঙুর এবং কিস্‌মিস্ বাদাম খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।"

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল,—কহিল—"আপনার বহুত দয়া আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে—আমাকে পয়সা দিবেন না।

"বাবু, তোমার যেমন একটি লড়্কী আছে, তেমনি দেশে আমারো একটি লড়্কী আছে। আমি তাহার মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি ত সওদা করিতে আসি না।—"

এই বলিয়া সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে এক টুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু যত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম কাগজের উপর একটি ছোট হাতের ছাপ। ফটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভূষা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহারি চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণ-চিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমত প্রতিবৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে—যেন সেই সুকোমল ক্ষুদ্র শিশুহস্তটুকুর স্পর্শখানি তাহার বিরাট্ বিরহীবক্ষের মধ্যে সুধাসঞ্চার করিয়া রাখে।

দেখিয়া আমার চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া আসিল। তখন, সে যে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালা, আর আমি যে একজন বাঙালি সম্ভ্রান্তবংশীয় তাহা ভুলিয়া গেলাম—তখন বুঝিতে পারিলাম সে-ও যে, আমিও সে; সে-ও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্বত-গৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারি মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি কিছুতেই কর্ণপাত করিলাম না। রাঙা চেলিপরা, কপালে চন্দন-আঁকা বধূবেশিনী মিনি সলজ্জভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথম থতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল—"খোঁখী, তোমি সসুর-বাড়ি যাবিস্?"

মিনি এখন শ্বশুর-অর্থ বোঝে, এমন আর সে পূর্বের মত উত্তর দিতে পারিল না—রহমতের প্রশ্ন শুনিয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড় হইয়াছে, তাহার সঙ্গেও আবার নূতন আলাপ করিতে হইবে—তাহাকে ঠিক পূর্বের মত তেমনটি আর পাইবে না। এ আট বৎসরে তাহার কি হইয়াছে তাই বা কে জানে। সকাল বেলায় শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রকিরণের মধ্যে সানাই বাজিতে লাগিল, রহমত কলিকাতার এক গলির ভিতরে বসিয়া আফগানিস্থানের এক মরুপর্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হৌক্।

এই টাকাটা দান করিয়া, হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের দুটো একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া দিতে

হইল। যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেক্ট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও বাদ পড়িল, অন্তঃপুরে মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল-আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

স্বর্ণমৃগ

আদ্যানাথ এবং বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী দুই শরিক। উভয়ের মধ্যে বৈদ্যনাথের অবস্থাই কিছু খারাপ। বৈদ্যনাথের বাপ মহেশচন্দ্রের বিষয়বুদ্ধি আদৌ ছিল না, তিনি দাদা শিবনাথের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতেন। শিবনাথ ভাইকে প্রচুর স্নেহবাক্য দিয়া তৎপরিবর্তে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া লন। কেবল খানকতক কোম্পানির কাগজ অবশিষ্ট থাকে। জীবনসমুদ্রে সেই কাগজ ক'খানি বৈদ্যনাথের একমাত্র অবলম্বন।

শিবনাথ বহু অনুসন্ধানে তাঁহার পুত্র আদ্যানাথের সহিত এক ধনীর একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া বিষয়বৃদ্ধির আর একটি সুযোগ করিয়া রাখিয়াছেন। মহেশচন্দ্র একটি সপ্তকন্যাভারগ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া করিয়া এক পয়সা পণ না লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যাটির সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। সাতটি কন্যাকেই যে ঘরে লন নাই তাহার কারণ, তাঁহার একটিমাত্র পুত্র এবং ব্রাহ্মণও সেরূপ অনুরোধ করে নাই। তবে, তাহাদের বিবাহের উদ্দেশ্য সাধ্যাতিরিক্ত অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বৈদ্যনাথ তাঁহার কাগজ কয়খানি লইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্টচিত্তে ছিলেন। কাজকর্মের কথা তাঁহার মনেও উদয় হইত না। কাজের মধ্যে তিনি গাছের ডাল কাটিয়া বসিয়া বসিয়া বহুযত্নে ছড়ি তৈরি করিতেন। রাজ্যের বালক এবং যুবকগণ তাঁহার নিকট ছড়ির জন্য উমেদার হইত, তিনি দান করিতেন। ইহা ছাড়া বদান্যতার উত্তেজনায় ছিপ, ঘুড়ি লাটাই নির্মাণ করিতেও তাঁহার বিস্তর সময় যাইত। যাহাতে বহুযত্নে বহুকাল ধরিয়া চাঁচাছোলার আবশ্যক, অথচ সংসারের উপকারিতা দেখিলে যাহা সে পরিমাণে পরিশ্রম ও কালব্যয়ের অযোগ্য, এমন একটা হাতের কাজ পাইলে তাঁহার উৎসাহের সীমা থাকে না।

পাড়ায় যখন দলাদলি এবং চক্রান্ত লইয়া বড় বড় পবিত্র বঙ্গীয় চণ্ডীমণ্ডপ ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে তখন বৈদ্যনাথ একটি কলম-কাটা ছুরি এবং একখণ্ড গাছের ডাল লইয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন এবং আহার ও নিদ্রার পর হইতে সায়াহ্নকাল পর্যন্ত নিজের দাওয়াটিতে একাকী অতিবাহিত করিতেছেন এমন প্রায় দেখা যাইত।

ষষ্ঠীর প্রসাদে শত্রুর মুখে যথাক্রমে ছাই দিয়া বৈদ্যনাথের দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল।

গৃহিণী মোক্ষদাসুন্দরীর অসন্তোষ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে। আদ্যানাথের ঘরে যেরূপ সমারোহ বৈদ্যনাথের ঘরে কেন সেরূপ না হয়। ও-বাড়ির বিন্ধ্যবাসিনীর যেমন গহনাপত্র, বেনারসীর শাড়ি, কথাবার্তার ভঙ্গি এবং চালচলনের গৌরব মোক্ষদার যে ঠিক তেমনটা হইয়া উঠে না, ইহা অপেক্ষা যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যাপার আর কি হইতে পারে! অথচ একই ত পরিবার! ভাইয়ের বিষয় বঞ্চনা করিয়া লইয়াই ত উহাদের এত উন্নতি! যত শোনে ততই মোক্ষদার হৃদয়ে নিজ শ্বশুরের প্রতি এবং শ্বশুরের একমাত্র পুত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা আর ধরে না! নিজগৃহের কিছুই তাঁহার ভাল লাগে না। সকলি অসুবিধা এবং মানহানিজনক।

বৈদ্যনাথ বুঝিতে পারিলেন ছড়ি চাঁচিয়া আর চলে না। একটা কিছু উপায় করা চাই। চাকরি করা অথবা ব্যাবসা করা বৈদ্যনাথের পক্ষে দুরাশা। অতএব কুবেরের ভাণ্ডারে প্রবেশ করিবার একটা সংক্ষেপ রাস্তা আবিষ্কার করা চাই।

একদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন, " হে মা জগদম্বে, স্বপ্নে যদি একটা দুঃসাধ্য রোগের পেটেন্ট ঔষধ বলিয়া দাও, কাগজে বিজ্ঞাপন লিখিবার ভার আমি লইব।"

পরদিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া একাকী বসিয়া ঘুড়ির লখ্ তৈরি করিতেছেন এমন সময় এক সন্ন্যাসী জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া দ্বারে আগত হইল। সেই মুহূর্তেই বিদ্যুতের মত বৈদ্যনাথ ভাবী ঐশ্বর্যের উজ্জ্বল মূর্তি দেখিতে পাইলেন। সন্ন্যাসীকে প্রচুর পরিমাণে আদর অভ্যর্থনা ও আহার্য জোগাইলেন। অনেক সাধ্যসাধনার পর জানিতে পারিলেন সন্ন্যাসী সোনা তৈরি করিতে পারে এবং সে বিদ্যা তাঁহাকে দান করিতে সে অসম্মত হইল না।

গৃহিণীও নাচিয়া উঠিলেন। যকৃতের বিকার উপস্থিত হইলে লোকে যেমন সমস্ত হলুদবর্ণ দেখে, তিনি সেইরূপ পৃথিবীময় সোনা দেখিতে লাগিলেন। কল্পনা-কারিকদের দ্বারা শয়নের খাট, গৃহসজ্জা এবং গৃহপ্রাচীর পর্যন্ত সোনায় মণ্ডিত করিয়া মনে মনে বিন্ধ্যবাসিনীকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সন্ন্যাসী প্রতিদিন দুই সের করিয়া দুগ্ধ এবং দেড় সের করিয়া মোহনভোগ খাইতে লাগিল এবং বৈদ্যনাথের কোম্পানির কাগজ দোহন করিয়া অজস্র রৌপ্যরস নিঃসৃত করিয়া লইল।

ছিপ ছড়ি লাটাইয়ের কাঙালরা বৈদ্যনাথের রুদ্ধদ্বারে নিষ্ফল আঘাত করিযা চলিয়া যায়। ঘরে ছেলেগুলা যথাসময়ে খাইতে পায় না, পড়িয়া গিয়া কপাল ফুলায়, কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়, কর্তা গৃহিণী কাহারো ভ্রূক্ষেপ নাই। নিস্তব্ধভাবে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া কটাহের দিকে চাহিয়া উভয়ের চোখে পল্লব নাই, মুখে কথা নাই। তৃষিত একাগ্রনেত্রে অবিশ্রান্ত অগ্নিশিখার প্রতিবিম্ব পড়িয়া চোখের মণি যেন স্পর্শমণির গুণ প্রাপ্ত হইল। দৃষ্টিপথ সায়াহ্নের সূর্যাস্তপথের মত জ্বলন্ত সুবর্ণ প্রলেপে রাঙা হইয়া উঠিল।

দুখানা কোম্পানির কাগজ এই স্বর্ণ-অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার পর একদিন সন্ন্যাসী আশ্বাস দিল, "কাল সোনার রং ধরিবে।"

সেদিন রাত্রে আর কাহারো ঘুম হইল না; স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া সুবর্ণ পুরী নির্মাণ করিতে

লাগিলেন। তৎসম্বন্ধে মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে মতভেদ এবং তর্কও উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু আনন্দ আবেগে তাহার মীমাংসা হইতে বিলম্ব হয় নাই।

পরদিন আর সন্ন্যাসীর দেখা নাই। চারিদিক হইতে সোনার রং ঘুচিয়া গিয়া সূর্যকিরণ পর্যন্ত অন্ধকার হইয়া দেখা দিল। ইহার পর হইতে শয়নের খাট গৃহসজ্জা এবং গৃহপ্রাচীর চতুর্গুণ দারিদ্র এবং জীর্ণতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

এখন হইতে গৃহকার্যে বৈদ্যনাথ কোনো একটা সামান্য মত প্রকাশ করিতে গেলে গৃহিণী তীব্রমধুরস্বরে বলেন, "বুদ্ধির পরিচয় অনেক দিয়াছ এখন কিছুদিন ক্ষান্ত থাক।" বৈদ্যনাথ একেবারে নিবিয়া যায়।

মোক্ষদা এমনি একটা শ্রেষ্ঠতার ভাব ধারণ করিয়াছে যেন এই স্বর্ণমরীচিকায় সে নিজে এক মুহূর্তের জন্যও আশ্বস্ত হয় নাই।

অপরাধী বৈদ্যনাথ স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিবিধ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন একটি চতুষ্কোণ মোড়কে গোপন উপহার লইয়া স্ত্রীর নিকট গিয়া প্রচুর হাস্যবিকাশপূর্বক সাতিশয় চতুরতার সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "কী আনিয়াছি বল দেখি!"

স্ত্রী কৌতূহল গোপন করিয়া উদাসীনভাবে কহিলেন, "কেমন করিয়া বলিব! আমি ত আর 'জান' নহি!"

বৈদ্যনাথ অনাবশ্যক কালব্যয় করিয়া প্রথমে দড়ির গাঁঠ অতি ধীরে ধীরে খুলিলেন, তার পর ফুঁ দিয়া কাগজের ধূলা ঝাড়িলেন, তাহার পর অতি সাবধানে এক এক ভাঁজ করিয়া কাগজের মোড়ক খুলিয়া আর্টষ্টু ডিয়োর রংকরা দশমহাবিদ্যার ছবি বাহির করিয়া আলোর দিকে ফিরাইয়া গৃহিণীর সম্মুখে ধরিলেন।

গৃহিণীর তৎক্ষণাৎ বিন্ধ্যবাসিনীর শয়নকক্ষের বিলাতি তেলের ছবি মনে পড়িল—অপর্যাপ্ত অবজ্ঞার স্বরে কহিলেন, "আ মরে' যাই। এ তোমার বৈঠকখানায় রাখিয়া বসিয়া বসিয়া তাকাইয়া দেখ। এ আমার কাজ নাই।" বিমর্ষ বৈদ্যনাথ বুঝিলেন অন্যান্য অনেক ক্ষমতার সহিত স্ত্রীলোকের মন জোগাইবার দুরূহ ক্ষমতা হইতেও বিধাতা তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

এদিকে দেশে যত দৈবজ্ঞ আছে মোক্ষদা সকলকে হাত দেখাইলেন, কোষ্ঠী দেখাইলেন। সকলেই বলিল, তিনি সধবাবস্থায় মরিবেন। কিন্তু সেই পরমানন্দময় পরিণামের জন্যই তিনি একান্ত ব্যগ্র ছিলেন না, অতএব ইহাতেও তাঁহার কৌতূহল নিবৃত্তি হইল না।

শুনিলেন তাঁহার সন্তানভাগ্য ভালো, পুত্রকন্যায় তাঁহার গৃহ অবিলম্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে; শুনিয়া তিনি বিশেষ প্রফুল্লতা প্রকাশ করিলেন না।

অবশেষে একজন গণিয়া বলিল, বৎসরখানেকের মধ্যে যদি বৈদ্যনাথ দৈবধন প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে গণক তাহার পাঁজি-পুঁথি সমস্তই পুড়াইয়া ফেলিবে। গণকের এইরূপ নিদারুণ পণ শুনিয়া মোক্ষদার মনে আর তিলমাত্র অবিশ্বাসের কারণ রহিল না।

গণৎকার ত প্রচুর পারিতোষিক লইয়া বিদায় হইয়াছেন, কিন্তু বৈদ্যনাথের জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিল। ধন উপার্জনের কতকগুলি সাধারণ প্রচলিত পথ আছে, যেমন চাষ, চাকরি,

ব্যবসা, চুরি এবং প্রতারণা। কিন্তু দৈবধন উপার্জনের সেরূপ নির্দিষ্ট কোনো উপায় নাই। এইজন্য মোক্ষদা বৈদ্যনাথকে যতই উৎসাহ দেন এবং ভর্ৎসনা করেন বৈদ্যনাথ ততই কোনো দিকে রাস্তা দেখিতে পান না। কোনখানে খুঁড়িতে আরম্ভ করিবেন, কোন পুকুরে ডুবারি নামাইবেন, বাড়ির কোন্ প্রাচীরটা ভাঙিতে হইবে, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন না।

মোক্ষদা নিতান্ত বিরক্ত হইয়া স্বামীকে জানাইলেন যে, পুরুষ-মানুষের মাথায় মস্তিষ্কের পরিবর্তে এতটা গোময় থাকিতে পারে তাহা তাঁহার পূর্বে ধারণা ছিল না।

বলিলেন, "একটু নড়িয়া চড়িয়া দেখ। হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি আকাশ হইতে টাকা বৃষ্টি হইবে?"

কথাটা সঙ্গত বটে, এবং বৈদ্যনাথের একান্ত ইচ্ছাও তাই, কিন্তু কোন দিকে নড়িবেন কিসের উপর চড়িবেন তাহা যে কেহ বলিয়া দেয় না! অতএব দাওয়ায় বসিয়া বৈদ্যনাথ আবার ছড়ি চাঁচিতে লাগিলেন।

এদিকে আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব নিকটবর্তী হইল। চতুর্থীর দিন হইতে নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিতে লাগিল। প্রবাসীরা দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। ঝুড়িতে মানকচু কুমড়া শুষ্ক নারিকেল, টিনের বাক্সের মধ্যে ছেলেদের জন্য জুতা ছাতা কাপড় এবং প্রেয়সীর জন্য এসেন্স সাবান নূতন গল্পের বহি এবং সুবাসিত নারিকেল তৈল।

মেঘমুক্ত আকাশে শরতের সূর্যকিরণ উৎসবের হাস্যের মত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছ, পক্কপ্রায় ধান্যক্ষেত্র থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, বর্ষাধৌত সতেজ তরুপল্লব নব শীতবায়ুতে সির্ সির্ করিয়া উঠিতেছে—এবং তসরের চায়নাকোট পরিয়া কাঁধে একটি পাকানো চাদর ঝুলাইয়া ছাতি মাথায় প্রত্যাগত পথিকেরা মাঠের পথ দিয়া ঘরের মুখে চলিয়াছে।



বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া তাই দেখে এবং তাহার হৃদয় হইতে দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। নিজের নিরানন্দ গৃহের সহিত বাংলা দেশের সহস্র গৃহের মিলনোৎসবের তুলনা করে এবং মনে মনে বলে, "বিধাতা কেন আমাকে এমন অকর্মণ্য করিয়া সৃজন করিয়াছেন।"—

ছেলেরা ভোরে উঠিয়াই প্রতিমা নির্মাণ দেখিবার জন্য আদ্যানাথের বাড়ির প্রাঙ্গণে গিয়া হাজির ছিল। খাবার বেলা হইলে দাসী তাহাদিগকে বলপূর্বক গ্রেফ্‌তার করিয়া লইয়া আসিল। তখন বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া এই বিশ্বব্যাপী উৎসবের মধ্যে নিজের জীবনের নিষ্ফলতা স্মরণ করিতেছিলেন। দাসীর হাত হইতে ছেলে দুটিতে উদ্ধার করিয়া কোলের কাছে ঘনিষ্ঠভাবে টানিয়া বড়টিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁরে অবু, এবার পূজোর সময় কি চাস্ বল দেখি।"

অবিনাশ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "একটা নৌকো দিয়ো বাবা।"

ছোটটিও মনে করিল, বড় ভাইয়ের চেয়ে কোনো বিষয়ে ন্যূন হওয়া কিছু নয়, কহিল, "আমাকেও একটা নৌকো দিয়ো বাবা।"

বাপের উপযুক্ত ছেলে! একটা অকর্মণ্য কারুকার্য পাইলে আর কিছু চাহে না। বাপ বলিলেন, "আচ্ছা।"

এদিক যথাকালে পূজার ছুটিতে কাশী হইতে মোক্ষদার এক খুড়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ব্যবসায়ে উকিল। মোক্ষদা কিছুদিন ঘন ঘন তাঁহার বাড়ি যাতায়াত করিলেন।

অবশেষে একদিন স্বামীকে আসিয়া বলিলেন, "ওগো, তোমাকে কাশী যাইতে হইতেছে!"

বৈদ্যনাথ সহসা মনে করিলেন, বুঝি তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত, গণক কোষ্ঠী হইতে আবিষ্কার করিয়াছে; সহধর্ম্মিণী সেই সন্ধান পাইয়া তাঁহার সদগতি করিবার যুক্তি করিতেছেন।

পরে শুনিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি, যে, কাশীতে একটি বাড়ি আছে সেখানে গুপ্তধন মিলিবার কথা, সেই বাড়ি কিনিয়া তাহার ধন উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে।

বৈদ্যনাথ বলিলেন—"কি সর্বনাশ। আমি কাশী যাইতে পারিব না।"

বৈদ্যনাথ কখনো ঘর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। গৃহস্থকে কি করিয়া ঘরছাড়া করিতে হয় প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ লিখিতেছেন, স্ত্রীলোকের সে সম্বন্ধে "অশিক্ষিতপটুত্ব" আছে। মোক্ষদা মুখের কথায় ঘরের মধ্যে যেন লঙ্কার ধোঁয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে হতভাগ্য বৈদ্যনাথ কেবল চোখের জলে ভাসিয়া যাইত, কাশী যাইবার নাম করিত না!

দিন দুই তিন গেল। বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া কতকগুলা কাষ্ঠখণ্ড কাটিয়া কুঁদিয়া জোড়া দিয়া দুইখানি খেলার নৌকা তৈরি করিলেন। তাহাতে মাস্তুল বসাইলেন, কাপড় কাটিয়া পাল আঁটিয়া দিলেন; লাল শালুর নিশান উড়াইলেন, হাল ও দাঁড় বসাইয়া দিলেন। একটি পুতুল কর্ণধার এবং আরোহীও ছাড়িলেন না! তাহাতে বহু যত্ন এবং আশ্চর্য নিপুণতা প্রকাশ করিলেন। সে নৌকা দেখিয়া অসহ্য চিত্তচাঞ্চল্য না জন্মে এমন সংযতচিত্ত বালক সম্প্রতি পাওয়া দুর্লভ। অতএব বৈদ্যনাথ সপ্তমীর পূর্বরাত্রে যখন নৌকা দুটি লইয়া ছেলেদের হাতে দিলেন তাহারা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। একে ত নৌকার খোলটাই যথেষ্ট, তাহাতে আবার হাল আছে, দাঁড়

আছে, মাস্তুল আছে, পাল আছে, আবার যথাস্থানে মাঝি বসিয়া, ইহাই তাহাদের সমধিক বিস্ময়ের কারণ হইল।

ছেলেদের আনন্দকলরবে আকৃষ্ট হইয়া মোক্ষদা আসিয়া দরিদ্র পিতার পূজার উপহার দেখিলেন।

দেখিয়া, রাগিয়া কাঁদিয়া কপালে করাঘাত করিয়া খেলেনা দুটো কাড়িয়া জান্‌লার বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। সোনার হার গেল, সাটিনের জামা গেল, জরির টুপি গেল, শেষে কিনা হতভাগ্য মনুষ্য দুইখানা খেলেনা দিয়া নিজের ছেলেকে প্রতারণা করিতে আসিয়াছে! তাও আবার দুই পয়সা ব্যয় নাই, নিজের হাতে নির্মাণ!

ছোট ছেলে ত উর্ধ্বশ্বাসে কাঁদিতে লাগিল। "বোকা ছেলে" বলিয়া তাহাকে মোক্ষদা ঠাস্ করিয়া চড়াইয়া দিলেন।

বড় ছেলেটি বাপের মুখের দিকে চাহিয়া নিজের দুঃখ ভুলিয়া গেল। উল্লাসের ভাণমাত্র করিয়া কহিল, "বাবা আমি কাল ভোরে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আস্‌ব।"

বৈদ্যনাথ তাহার পর দিন কাশী যাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু টাকা কোথায়! তাঁহার স্ত্রী গহনা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিলেন। বৈদ্যনাথের পিতামহীর আমলের গহনা, এমন খাঁটি সোনা এবং ভারী গহনা আজকালকার দিনে পাওয়াই যায় না।

বৈদ্যনাথের মনে হইল তিনি মরিতে যাইতেছেন। ছেলেদের কোলে করিয়া চুম্বন করিয়া সাশ্রুনয়নে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। তখন মোক্ষদাও কাঁদিতে লাগিলেন।

কাশীর বাড়িওয়ালা বৈদ্যনাথের খুড়শ্বশুরের মক্কেল। বোধ করি সেই কারণে বাড়ি খুব চড়া দামেই বিক্রয় হইল। বৈদ্যনাথ একাকী বাড়ি দখল করিয়া বসিলেন। একেবারে নদীর উপরেই বাড়ি। ভিত্তি ধৌত করিয়া নদীস্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

রাত্রে বৈদ্যনাথের গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। শূন্য গৃহে শিয়রের কাছে প্রদীপ জ্বালাইয়া চাদর মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন।

কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা হয় না। গভীর রাত্রে যখন সমস্ত কোলাহল থামিয়া গেল তখন কোথা হইতে একটা ঝন্‌ঝন্ শব্দ শুনিয়া বৈদ্যনাথ চমকিয়া উঠিলেন। শব্দ মৃদু কিন্তু পরিষ্কার। যেন পাতালে বলিরাজার ভাণ্ডারে কোষাধ্যক্ষ বসিয়া বসিয়া টাকা গণনা করিতেছে।

বৈদ্যনাথের মনে ভয় হইল, কৌতূহল হইল এবং সেই সঙ্গে দুর্জয় আশার সঞ্চার হইল। কম্পিত হস্তে প্রদীপ লইয়া ঘরে ঘরে ফিরিলেন। এঘরে গেলে মনে হয় শব্দ ওঘর হইতে আসিতেছে—ওঘরে গেলে মনে হয়, এঘর হইতে আসিতেছে। বৈদ্যনাথ সমস্ত রাত্রি কেবলই এঘর ওঘর করিলেন। দিনের বেলা সেই পাতালভেদী শব্দ অন্যান্য শব্দের সহিত মিশিয়া গেল, আর তাহাকে চিনা গেল না।

রাত্রি দুই তিন প্রহরের সময় যখন জগৎ নিদ্রিত হইল তখন আবার সেই শব্দ জাগিয়া উঠিল। বৈদ্যনাথের চিত্ত নিতান্ত অস্থির হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া কোন দিকে যাইবেন ভাবিয়া পাইলেন না। মরুভূমির মধ্যে জলের কল্লোল শোনা যাইতেছে অথচ কোন দিক হইতে

আসিতেছে নির্ণয় হইতেছে না; ভয় হইতেছে পাছে একবার ভুল পথ অবলম্বন করিলে গুপ্ত নির্ঝরিণী একেবারে আয়ত্তের অতীত হইয়া যায়। তৃষিত পথিক স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে কান খাড়া করিয়া থাকে, এদিকে তৃষ্ণা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে—বৈদ্যনাথের সেই অবস্থা হইল।

বহুদিন অনিশ্চিত অবস্থাতেই কাটিয়া গেল। কেবল অনিদ্রা এবং বৃথা আশ্বাসে তাঁহার সন্তোষস্নিগ্ধ মুখে ব্যগ্রতার তীব্রভাব রেখাঙ্কিত হইয়া উঠিল। কোটরনিবিষ্ট চকিতনেত্রে মধ্যাহ্নের মরুবালুকার মতো একটা জ্বালা প্রকাশ পাইল।

অবশেষে একদিন দ্বিপ্রহরে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরের মেঝেময় শাবল ঠুকিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন। একটি পার্শ্ববর্তী ছোট কুঠরির মেঝের মধ্য হইতে ফাঁপা আওয়াজ দিল।

রাত্রি নিষুপ্ত হইলে পর বৈদ্যনাথ একাকী বসিয়া সেই মেঝে খনন করিতে লাগিলেন। যখন রাত্রি প্রভাতপ্রায়, তখন ছিদ্রখনন সম্পূর্ণ হইল।

বৈদ্যনাথ দেখিলেন নীচে একটা ঘরের মতো আছে—কিন্তু সেই রাত্রের অন্ধকারে তাহার মধ্যে নির্বিচারে পা নামাইয়া দিতে সাহস করিলেন না। গর্তের উপর বিছানা চাপা দিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু শব্দ এমনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে ভয়ে সেখান হইতে উঠিয়া আসিলেন—অথচ গৃহ অরক্ষিত রাখিয়া দ্বার ছাড়িয়া দূরে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না। লোভ এবং ভয় দুই দিক্ হইতে দুই হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। রাত কাটিয়া গেল।

আজ দিনের বেলাও শব্দ শুনা যায়। ভৃত্যকে ঘরের মধ্যে ঢুকিতে না দিয়া বাহিরে আহারাদি করিলেন। আহারান্তে ঘরে ঢুকিয়া দ্বারে চাবি লাগাইয়া দিলেন।

দুর্গানাম উচ্চারণ করিয়া গহ্বরমুখ হইতে বিছানা সরাইয়া ফেলিলেন। জলের ছল্‌ছল্‌ এবং ধাতুদ্রব্যের ঠংঠং খুব পরিষ্কার শুনা গেল।

ভয়ে ভয়ে গর্তের কাছে আস্তে আস্তে মুখ লইয়া গিয়া দেখিলেন অনতিউচ্চ কক্ষের মধ্যে জলের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে—অন্ধকারে আর বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলেন না।

একটা বড় লাঠি নামাইয়া দেখিলেন জল এক হাঁটুর অধিক নহে। একটা দেশলাই ও বাতি লইয়া সেই অগভীর গৃহের মধ্যে অনায়াসে লাফাইয়া পড়িলেন। পাছে এক মুহূর্তে সমস্ত আশা নিবিয়া যায় এই জন্য বাতি জ্বালাইতে হাত কাঁপিতে লাগিল। অনেকগুলি দেশালাই নষ্ট করিয়া অবশেষে বাতি জ্বলিল।

দেখিলেন, একটি মোটা লোহার শিক্‌লিতে একটি বৃহৎ তামার কলসি বাঁধা রহিয়াছে, এক একবার জলের স্রোত প্রবল হয় এবং শিক্‌লি কলসির উপর পড়িয়া শব্দ করিতে থাকে।

বৈদ্যনাথ জলের উপর ছল্‌ছল্‌ শব্দ করিতে তাড়াতাড়ি সেই কলসির কাছে উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন কলসি শূন্য।

তথাপি নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—দুই হস্তে কলসি তুলিয়া খুব করিয়া ঝাঁকানি দিলেন। ভিতরে কিছু নাই। উপুড় করিয়া ধরিলেন। কিছুই পড়িল না। দেখিলেন কলসির গলা ভাঙা। যেন এককালে এই কলসির মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল, কে ভাঙিয়া ফেলিয়াছে।

তখন বৈদ্যনাথ জলের মধ্যে দুই হস্ত দিয়া পাগলের মতো হাতড়াইতে লাগিলেন। কর্দমস্তরের মধ্যে হাতে কি একটা ঠেকিল, তুলিয়া দেখিলেন মড়ার মাথা—সেটাও একবার কানের কাছে লইয়া ঝাঁকাইলেন—ভিতরে কিছুই নাই। ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। অনেক খুঁজিয়া নরকঙ্কালের অস্থি ছাড়া আর কিছুই পাইলেন না।

দেখিলেন, নদীর দিকে দেওয়ালের এক জায়গা ভাঙা; সেইখান দিয়া জল প্রবেশ করিতেছে, এবং তাঁহার পূর্ববর্তী যে ব্যক্তির কোষ্ঠীতে দৈবধন লাভ লেখা ছিল, সে-ও সম্ভবত এই ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল।

অবশেষে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া "মা" বলিয়া মস্ত একটা মর্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন—প্রতিধ্বনি যেন অতীতকালের আরো অনেক হতাশ্বাস ব্যক্তির নিশ্বাস একত্রিত করিয়া ভীষণ গাম্ভীর্যের সহিত পাতাল হইতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সর্বাঙ্গে জলকাদা মাখিয়া বৈদ্যনাথ উপরে উঠিলেন।

জনপূর্ণ কোলাহলময় পৃথিবী তাঁহার নিকটে আদ্যোপান্ত মিথ্যা এবং সেই শৃঙ্খলবদ্ধ ভগ্নঘটের মতো শূন্য বোধ হইল।

আবার যে জিনিসপত্র বাঁধিতে হইবে, টিকিট কিনিতে হইবে, গাড়ি চড়িতে হইবে, বাড়িতে ফিরিতে হইবে, স্ত্রীর সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিতে হইবে, জীবন প্রতিদিন বহন করিতে হইবে; সে তাঁহার অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। ইচ্ছা হইল নদীর জীর্ণ পাড়ের মত ঝুপ করিয়া ভাঙিয়া জলে পড়িয়া যান।

কিন্তু তবু সেই জিনিসপত্র বাঁধিলেন, টিকিট কিনিলেন, এবং গাড়িও চড়িলেন।

একদিন শীতের সায়াহ্নে বাড়ির দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্বিন মাসে শরতের প্রাতঃকালে দ্বারের কাছে বসিয়া বৈদ্যনাথ অনেক প্রবাসীকে বাড়ি ফিরিতে দেখিয়াছেন, এবং দীর্ঘশ্বাসের সহিত মনে মনে এই বিদেশ হইতে দেশে ফিরিবার সুখের জন্য লালায়িত হইয়াছেন—তখন আজিকার সন্ধ্যা স্বপ্নেরও অগম্য ছিল।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গণের কাষ্ঠাসনে নির্বোধের মতো বসিয়া রহিলেন, অন্তঃপুরে গেলেন না। সর্বপ্রথমে ঝি তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দ-কোলাহল বাধাইয়া দিল, ছেলেরা ছুটিয়া আসিল, গৃহিণী ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বৈদ্যনাথের যেন একটা ঘোব ভাঙিয়া গেল, আবার যেন তাঁহার সেই পূর্বসংসারে জাগিয়া উঠিলেন।

শুষ্কমুখে ম্লানহাস্য লইয়া একটা ছেলেকে কোলে করিয়া একটা ছেলের হাত ধরিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

তখন ঘরে প্রদীপ জ্বালানো হইয়াছে এবং যদিও রাত্রি হয় নাই তথাপি শীতের সন্ধ্যা রাত্রির মতো নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে।

বৈদ্যনাথ খানিকক্ষণ কিছু বলিলেন না, তারপর মৃদুস্বরে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ?"

স্ত্রী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইল?"

বৈদ্যনাথ নিরুত্তরে কপালে আঘাত করিলেন। মোক্ষদার মুখ ভারি শক্ত হইয়া উঠিল।

ছেলেরা প্রকাণ্ড একটা অকল্যাণের ছায়া দেখিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। ঝির কাছে গিয়া বলিল, "সেই নাপিতের গল্প বল্।" বলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

রাত হইতে লাগিল কিন্তু দুজনের মুখে একটি কথা নাই। বাড়ির মধ্যে কি একটা যেন ছম্ ছম্ করিতে লাগিল এবং মোক্ষদার ঠোঁট দুটি ক্রমশই বজ্রের মতো আঁটিয়া আসিল।

অনেকক্ষণ পরে মোক্ষদা কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

বৈদ্যনাথ চুপ করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চৌকিদার প্রহর হাঁকিয়া গেল। শ্রান্ত পৃথিবী অকাতরে নিদ্রায় মগ্ন হইয়া রহিল। আপনার আত্মীয় হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত কেহই এই লাঞ্ছিত ভগ্ননিদ্র বৈদ্যনাথকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

অনেক রাত্রে, বোধ করি কোনো স্বপ্ন হইতে জাগিয়া বৈদ্যনাথের বড় ছেলেটি শয্যা ছাড়িয়া আস্তে আস্তে বারান্দায় আসিয়া ডাকিল, "বাবা!"

তখন তাহার বাবা সেখানে নাই। অপেক্ষাকৃত ঊর্ধ্বকণ্ঠে রুদ্ধদ্বারের বাহির হইতে ডাকিল, "বাবা!" কিন্তু কোনো উত্তর পাইল না।

আবার ভয়ে ভয়ে বিছানায় গিয়া শয়ন করিল।

পূর্বপ্রথানুসারে ঝি সকালবেলায় তামাক সাজিয়া তাঁহাকে খুঁজিল, কোথাও দেখিতে পাইল না। বেলা হইলে প্রতিবেশিগণ গৃহপ্রত্যাগত বান্ধবের খোঁজ লইতে আসিল, কিন্তু বৈদ্যনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

দান প্রতিদান

বড় গিন্নি যে কথাগুলো বলিয়া গেলেন, তাহার ধার যেমন তাহার বিষও তেমনি। যে হতভাগিনীর উপর প্রয়োগ করিয়া গেলেন, তাহার চিত্তপুত্তলী একেবারে জ্বলিয়া জ্বলিয়া লুটিতে লাগিল।

বিশেষত কথাগুলো তাহার স্বামীর উপর লক্ষ্য করিয়া বলা—এবং স্বামী রাধামুকুন্দ তখন রাত্রের আহার সমাপন করিয়া অনতিদূরে বসিয়া তাম্বুলের সহিত তাম্রকূটধূমসংযোগ করিয়া খাদ্য-পরিপাকে প্রবৃত্ত ছিলেন। কথাগুলো শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিপাকের যে



বিশেষ ব্যাঘাত করিল এমন বোধ হইল না। অবিচলিত গাম্ভীর্যের সহিত তাম্রকূট নিঃশেষ করিয়া অভ্যাসমতো যথাকালে তিনি শয়ন করিতে গেলেন।

রাসমণি যখন আসিয়া ক্রন্দনাবেগে শয্যাতল কম্পান্বিত করিয়া তুলিলেন তখন রাধামুকুন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে?"

রাসমণি উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিলেন, "শোন নাই কি?"

রাধামুকুন্দ। শুনিয়াছি। কিন্তু বৌঠাক্‌রুন একটা কথাও ত মিথ্যা বলেন নাই। আমি কি দাদার অন্নেই প্রতিপালিত নহি? তোমার এই কাপড়চোপড় গহনাপত্র এ-সমস্ত আমি কি আমার বাপের কড়ি হইতে আনিয়া দিয়াছি? যে খাইতে পরিতে দেয় সে যদি দুটো কথা বলে, তাহাও খাওয়াপরার সামিল করিয়া লইতে হয়।

"এমন খাওয়াপরায় কাজ কী?"

"বাঁচিতে ত হইবে"

"মরণ হইলেই ভালো হয়।"

"যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ একটু ঘুমাইবার চেষ্টা কর, আরাম বোধ করিবে।"

বলিয়া রাধামুকুন্দ উপদেশ ও দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাধামুকুন্দ ও শশিভূষণ সহোদর ভাই নহে, নিতান্ত নিকটসম্পর্কও নয়; প্রায় গ্রাম-সম্পর্ক বলিলেই হয়। কিন্তু প্রীতিবন্ধন সহোদর ভাইয়ের চেয়ে কিছু কম নহে। বড় গিন্নি ব্রজসুন্দরীর সেটা কিছু অসহ্য বোধ হইত। বিশেষত শশিভূষণ দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে ছোট বৌয়ের অপেক্ষা নিজ স্ত্রীর প্রতি অধিক পক্ষপাত করিতেন না। বরঞ্চ যে জিনিসটা নিতান্ত একজোড়া না মিলিত, সেটা গৃহিণীকে বঞ্চিত করিয়া বৌকেই দিতেন। তাহা ছাড়া অনেক সময়ে তিনি স্ত্রীর অনুরোধ অপেক্ষা রাধামুকুন্দের পরামর্শের প্রতি বেশি নির্ভর করিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শশিভূষণ লোকটা নিতান্ত ঢিলাঢালা রকমের, তাই ঘরের কাজ এবং বিষয়কর্মের সমস্ত ভার রাধামুকুন্দের উপরেই ছিল। বড় গিন্নির সর্বদাই সন্দেহ রাধামুকুন্দ তলে তলে তাঁহার স্বামীকে বঞ্চনা করিবার আয়োজন করিতেছে—তাহার যতই প্রমাণ পাওয়া যাইত না, রাধার প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ততই বাড়িয়া উঠিত। মনে করিতেন, প্রমাণগুলোও অন্যায় করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে এইজন্য তিনি আবার প্রমাণের উপর রাগ করিয়া তাহাদের প্রতি নিরতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশপূর্বক নিজের সন্দেহকে ঘরে বসিয়া দ্বিগুণ দৃঢ় করিতেন। তাঁহার এই বহুযত্নপোষিত মানসিক আগুন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় ভূমিকম্পসহকারে প্রায় মাঝে মাঝে উষ্ণভাষায় উচ্ছ্বসিত হইত।

রাত্রে রাধামুকুন্দের ঘুমের ব্যাঘাত হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না—কিন্তু পরদিন সকালে উঠিয়া তিনি বিরস মুখে শশিভূষণের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। শশিভূষণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাধু, তোমায় এমন দেখিতেছি কেন? অসুখ হয় নাই ত!"

রাধামুকুন্দ মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "দাদা, আর ত আমার এখানে থাকা হয় না।" এই বলিয়া গত সন্ধ্যাকালে বড় গৃহিণীর আক্রমণবৃত্তান্ত সংক্ষেপে এবং শান্তভাবে বর্ণনা করিয়া গেলেন।

শশিভূষণ হাসিয়া কহিলেন, "এই! এ ত নূতন কথা নহে। ও ত পরের ঘরের মেয়ে, সুযোগ পাইলেই দুটো কথা বলিবে, তাই বলিয়া কি ঘরের লোককে ছাড়িয়া যাইতে হইবে! কথা আমাকেও ত মাঝে মাঝে শুনিতে হয়, তাই বলিয়া ত সংসার ত্যাগ করিতে পারি না।"

রাধা কহিলেন, "মেয়েমানুষের কথা কি আর সহিতে পারি না, তবে পুরুষ হইয়া জন্মিলাম কী করিতে! কেবল ভয় হয়, তোমার সংসারে পাছে অশান্তি ঘটে।"

শশিভূষণ কহিলেন, "তুমি গেলে আমার কিসের শান্তি।"

আর অধিক কথা হইল না। রাধামুকুন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার হৃদয়ভাব সমান রহিল।

এদিকে বড় গৃহিণীর আক্রোশ ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছে। সহস্র উপলক্ষ্যে যখন-তখন তিনি

রাধাকে খোঁটা দিতে পারিলে ছাড়েন না; মুহুর্মুহু বাক্যবাণে রাসমণির অন্তরাত্মাকে এক প্রকার শরশয্যাশায়ী করিয়া তুলিলেন। রাধা যদিও চুপচাপ করিয়া তামাক টানেন এবং স্ত্রীকে ক্রন্দনোন্মুখী দেখিবামাত্র চোখ বুজিয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করেন, তবু ভাবে বোধ হয় তাঁহারও অসহ্য হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু শশিভূষণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ত আজিকার নহে—দুই ভাই যখন প্রাতঃকালে পান্তাভাত খাইয়া পাততাড়ি-কক্ষে একসঙ্গে পাঠশালায় যাইত, উভয়ে যখন একসঙ্গে পরামর্শ করিয়া গুরুমহাশয়কে ফাঁকি দিয়া পাঠশালা হইতে পলাইয়া রাখাল-ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া নানাবিধ খেলা ফাঁদিত, এক বিছানায় শুইয়া স্তিমিত আলোকে মাসির নিকট গল্প শুনিত, ঘরের লোককে লুকাইয়া রাত্রে দূর পল্লীতে যাত্রা শুনিতে যাইত এবং প্রাতঃকালে ধরা পড়িয়া অপরাধ এবং শাস্তি উভয়ে সমান ভাগ করিয়া লইত—তখন কোথায় ছিল ব্রজসুন্দরী, কোথায় ছিল রাসমণি। জীবনের এতগুলা দিনকে কি একদিনে বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাওয়া যায়? কিন্তু এই বন্ধন যে স্বার্থপরতার বন্ধন, এই প্রগাঢ় প্রীতি যে পরান্ন-প্রত্যাশার সুচতুর ছদ্মবেশ, এরূপ সন্দেহ এরূপ আভাসমাত্র তাঁহার নিকট বিষতুল্য বোধ হইত, অতএব আর কিছুদিন এরূপ চলিলে কি হইত বলা যায় না। কিন্তু এমন সময়ে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটিল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি সে আজ চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার কথা। তখন নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের মধ্যে গবর্মেন্টের খাজনা শোধ না করিলে জমিদারী-সম্পত্তি নিলাম হইয়া যাইত।

একদিন খবর আসিল, শশিভূষণের একমাত্র জমিদারি পরগনা এনাৎসাহী লাটের খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া গেছে।

রাধামুকুন্দ তাঁহার স্বাভাবিক মৃদু প্রশান্তভাবে কহিলেন, "আমারই দোষ!" শশিভূষণ কহিলেন, "তোমার কিসের দোষ! তুমি ত খাজনা চালান দিয়াছিলে, পথে যদি ডাকাতে পড়িয়া লুটিয়া লয়, তুমি তাহার কী করিতে পার?"

দোষ কাহার এক্ষণে তাহা স্থির করিতে বসিয়া কোনো ফল নাই—এখন সংসার চালাইতে হইবে। শশিভূষণ হঠাৎ যে কোনো কাজকর্মে হাত দিবেন সেরূপ তাঁহার স্বভাব ও শিক্ষা নহে। তিনি যেন ঘাটের বাঁধা সোপান হইতে পিছলিয়া এক মুহূর্তে ডুব জলে গিয়া পড়িলেন।

প্রথমেই তিনি স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিতে উদ্যত হইলেন। রাধামুকুন্দ এক থলে টাকা সম্মুখে ফেলিয়া তাহাতে বাধা দিলেন। তিনি পূর্বেই নিজ স্ত্রীর গহনা বন্ধক রাখিয়া যথোপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সংসারে একটা মহৎ পরিবর্তন দেখা গেল, সম্পৎকালে গৃহিণী যাহাকে দূর করিবার সহস্র চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিপৎকালে তাহাকে ব্যাকুলভাবে অবলম্বন করিয়া ধরিলেন। এই সময়ে দুই ভ্রাতার মধ্যে কাহার উপরে অধিক নির্ভর করা যাইতে পারে তাহা বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কখনো যে রাধামুকুন্দের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ভাব ছিল এখন আর তাহা প্রকাশ পায় না।

রাধামুকুন্দ পূর্ব হইতেই স্বাধীন উপার্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। নিকটবর্তী শহরে সে মোক্তারি আরম্ভ করিয়া দিল। তখন মোক্তারি-ব্যবসায়ে আয়ের পথ এখনকার অপেক্ষা বিস্তৃত ছিল এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাবধানি রাধামুকুন্দ প্রথম হইতেই পসার জমাইয়া তুলিল। ক্রমে সে জিলার অধিকাংশ বড় বড় জমিদারের কার্যভার গ্রহণ করিল।

এক্ষণে রাসমণির অবস্থা পূর্বের ঠিক বিপরীত। এখন রাসমণির স্বামীর অন্নেই শশিভূষণ ও ব্রজসুন্দরী প্রতিপালিত। সে-কথা লইয়া সে স্পষ্ট কোনো গর্ব করিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু কোনো একদিন বোধ করি আভাসে ইঙ্গিতে ব্যবহারে সেই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিল; বোধ করি দেমাকের সহিত পা ফেলিয়া এবং হাত দুলাইয়া কোনো একটা বিষয়ে বড় গিন্নির ইচ্ছার প্রতিকূলে নিজের মনোমতো কাজ করিয়াছিল—কিন্তু সে কেবল একটি দিনমাত্র—তাহার পরদিন হইতে সে যেন পূর্বের অপেক্ষাও নম্র হইয়া গেল। কারণ, কথাটা তাহার স্বামীর কানে গিয়াছিল এবং রাত্রে রাধামুকুন্দ কী কী যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল ঠিক বলিতে পারি না, পরদিন হইতে তাহার মুখে আর রা রহিল না, বড় গিন্নির দাসীর মতো হইয়া রহিল। —শুনা যায়, রাধামুকুন্দ সেই রাত্রেই স্ত্রীকে তাহার পিতৃভবনে পাঠাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল এবং সপ্তাহকাল তাহার মুখদর্শন করে নাই—অবশেষে ব্রজসুন্দরী ঠাকুরপোর হাতে হাতে ধরিয়া অনেক মিনতি করিয়া দম্পতির মিলনসাধন করিয়া দেন; এবং বলেন, "ছোটবৌ ত সেদিন আসিয়াছে, আর আমি কত কাল হইতে তোমাদের ঘরে আছি ভাই! তোমাতে আমাতে যে চিরকালের প্রিয়সম্পর্ক তাহার মর্যাদা ও কি বুঝিতে শিখিয়াছে? ও ছেলেমানুষ, উহাকে মাপ কর।"

রাধামুকুন্দ সংসারখরচের সমস্ত টাকা ব্রজসুন্দরীর হাতে আনিয়া দিতেন। রাসমণি নিজের আবশ্যক ব্যয় নিয়ম অনুসারে অথবা প্রার্থনা করিয়া ব্রজসুন্দরীর নিকট হইতে পাইতেন। গৃহমধ্যে বড় গিন্নির অবস্থা পূর্বাপেক্ষা ভালো বই মন্দ নহে, কারণ পূর্বেই বলিয়াছি শশিভূষণ স্নেহবশে এবং নানা বিবেচনায় রাসমণিকে বরঞ্চ অনেক সময় অধিক পক্ষপাত দেখাইতেন।

শশিভূষণের মুখে যদিও তাঁহার সহজ প্রফুল্ল হাস্যের বিরাম ছিল না কিন্তু গোপন অসুখে তিনি প্রতিদিন কৃশ হইয়া যাইতেছিলেন। আর কেহ ততটা লক্ষ্য করে নাই, কেবল দাদার মুখ দেখিয়া রাধার চক্ষে নিদ্রা ছিল না। অনেক সময়ে গভীর রাত্রে রাসমণি জাগ্রত হইয়া দেখিত, গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অশান্তভাবে রাধা এপাশ ওপাশ করিতেছে।

রাধামুকুন্দ অনেক সময় শশিভূষণকে গিয়া আশ্বাস দিত—"তোমার কোনো ভাবনা নাই দাদা! তোমার পৈতৃক বিষয় আমি ফিরাইয়া আনিব—কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না। বেশি দিন দেরিও নাই।"

বাস্তবিক বেশিদিন দেরিও হইল না। শশিভূষণের সম্পত্তি যে ব্যক্তি নিলামে খরিদ করিয়াছিল, সে ব্যবসায়ী লোক, জমিদারীর কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সম্মানের প্রত্যাশায় কিনিয়াছিল, কিন্তু ঘর হইতে সদর খাজনা দিতে হইত—এক পয়সা মুনাফা পাইত না। রাধামুকুন্দ বৎসরের মধ্যে দুই একবার লাঠিয়াল লইয়া লুটপাট করিয়া আদায় করিয়া আনিত। প্রজারাও তাহার বাধ্য ছিল। ব্যবসাজীবী জমিদারকে তাহারা মনে মনে ঘৃণা করিত এবং রাধামুকুন্দের পরামর্শে ও

সাহায্যে সর্বপ্রকারেই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল।

অবশেষে সে বেচারা বিস্তর মকদ্দমা মামলা করিয়া বরাবর অকৃতকার্য হইয়া এই ঝঞ্ঝাট হাত হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। সামান্য মূল্যে রাধামুকুন্দ সেই পূর্ব সম্পত্তি পুনর্বার কিনিয়া লইলেন।

লেখায় যত অল্পদিন মনে হইল আসলে ততটা নয়। ইতিমধ্যে প্রায় দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দশ বৎসর পূর্বে শশিভূষণ যৌবনের সর্বপ্রান্তে প্রৌঢ় বয়সের আরম্ভভাগে ছিলেন কিন্তু এই আট দশ বৎসরের মধ্যেই তিনি যেন অন্তররুদ্ধ মানসিক উত্তাপের বাষ্পযানে চড়িয়া একেবারে সবেগে বার্ধক্যের মাঝখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পৈতৃক সম্পত্তি যখন ফিরিয়া পাইলেন, তখন কি জানি কেন আর তেমন প্রফুল্ল হইতে পারিলেন না। বহুদিন অব্যবহারে হৃদয়ের বীণাযন্ত্র বোধ করি বিকল হইয়া গিয়াছে, এখন সহস্রবার তার টানিয়া বাঁধিলেও ঢিলা হইয়া নামিয়া যায়—সে সুর আর কিছুতেই বাহির হয় না।

গ্রামের লোকেরা বিস্তর আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহারা একটা ভোজের জন্য শশিভূষণকে গিয়া ধরিল। শশিভূষণ রাধামুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল ভাই?"

রাধামুকুন্দ বলিলেন, "অবশ্য, শুভদিনে আনন্দ করিতে হইবে বৈ কি!" গ্রামে এমন ভোজ বহুকাল হয় নাই। গ্রামের ছোট বড় সকলেই খাইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা এবং দুঃখী-কাঙাল পয়সা ও কাপড় পাইয়া আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেল।

শীতের আরম্ভে গ্রামে তখন সময়টা খারাপ ছিল; তাহার উপরে শশিভূষণ পরিবেশনাদি বিবিধ কার্যে তিন চারিদিন বিস্তর পরিশ্রম এবং অনিয়ম করিয়াছিলেন, তাঁহার ভগ্ন শরীরে আর সহিল না—তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য দুরূহ উপসর্গের সহিত কম্প দিয়া জ্বর আসিল—বৈদ্য মাথা নাড়িয়া কহিল, "বড় শক্ত ব্যাধি।"

রাত্রি দুই তিন প্রহরের সময় রোগীর ঘর হইতে সকলকে বাহির করিয়া দিয়া রাধামুকুন্দ কহিলেন, "দাদা, তোমার অবর্তমানে বিষয়ের অংশ কাহাকে কিরূপ দিব সেই উপদেশ দিয়া যাও।"

শশিভূষণ কহিলেন, "ভাই, আমার কি আছে যে কাহাকে দিব।"

রাধামুকুন্দ কহিলেন, "সবই ত তোমার।"

শশিভূষণ উত্তর দিলেন, "এককালে আমার ছিল, এখন আমার নহে।"

রাধামুকুন্দ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া শয্যার এক অংশের চাদর দুই হাত দিয়া বারবার সমান করিয়া দিতে লাগিল। শশিভূষণের শ্বাসক্রিয়া কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল।

রাধামুকুন্দ তখন শয্যাপ্রান্তে উঠিয়া বসিয়া রোগীর পা দুটি ধরিয়া কহিল, "দাদা, আমি যে মহাপাতকের কাজ করিয়াছি, তাহা তোমাকে বলি, আর ত সময় নাই।"

শশিভূষণ কোনো উত্তর করিলেন না—রাধামুকুন্দ বলিয়া গেলেন—সেই স্বাভাবিক শান্তভাব এবং ধীরে ধীরে কথা, কেবল মাঝে মাঝে এক একটা দীর্ঘনিশ্বাস উঠিতে লাগিল। "দাদা,

আমার ভালো করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। মনের যথার্থ যে ভাব সে অন্তর্যামী জানেন, আর পৃথিবীতে যদি কেহ বুঝিতে পারে ত, হয়ত, তুমি পারিবে। বালককাল হইতে তোমাতে আমাতে অন্তরে প্রভেদ ছিল না, কেবল বাহিরে প্রভেদ। কেবল এক প্রভেদ ছিল, তুমি ধনী আমি দরিদ্র। যখন দেখিলাম সেই স্নামান্য সূত্রে তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ক্রমশই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে, তখন আমিই সে প্রভেদ লোপ করিয়াছিলাম। আমিই সদর খাজনা লুট করাইয়া তোমার সম্পত্তি নিলাম করাইয়াছিলাম।"

শশিভূষণ তিলমাত্র বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে রুদ্ধ উচ্চারণে কহিলেন, "ভাই, ভালোই করিয়াছিলে। কিন্তু যেজন্য এত করিলে তাহা কি সিদ্ধ হইল? কাছে কি রাখিতে পারিলে? দয়াময় হরি।" —বলিয়া প্রশান্ত মৃদু হাস্যের উপরে দুই চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

রাধামুকুন্দ তাঁহার দুই পায়ের নীচে মাথা রাখিয়া কহিল, "দাদা, আমাকে মাপ করিলে ত।"

শশিভূষণ কাছে ডাকিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "ভাই, তবে শোন। একথা আমি প্রথম হইতেই জানিতাম। তুমি যাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে তাহারাই আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। আমি তখন হইতে তোমাকে মাপ করিয়াছি।"

রাধামুকুন্দ দুই করতলে লজ্জিত মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে কহিল—"দাদা মাপ যদি করিয়াছ তবে তোমার সম্পত্তি তুমি গ্রহণ কর। রাগ করিয়া ফিরাইয়া দিয়ো না।"

শশিভূষণ উত্তর দিতে পারিলেন না—তখন তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়াছে—রাধামুকুন্দের মুখের দিকে অনিমেষ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া একবার দক্ষিণ হাত তুলিলেন। তাহাতে কি বুঝাইল বলিতে পারি না। বোধ করি রাধামুকুন্দ বুঝিয়া থাকিবে।

অনধিকার প্রবেশ

একদা প্রাতঃকালে পথের ধারে দাঁড়াইয়া এক বালক আর এক বালকের সহিত একটি অসমসাহসিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বাজি রাখিয়াছিল। ঠাকুরবাড়ির মাধবী-বিতান হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে পারিবে কি না ইহাই লইয়া তর্ক। একটি বালক বলিল, "পারিব," আর একটি বালক বলিল, "কখনই পারিবে না।"

কাজটি শুনিতে সহজ অথচ করিতে কেন সহজ নহে তাহার বৃত্তান্ত আর একটু বিস্তারিত করিয়া বলা আবশ্যক।

পরলোকগত মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির বিধবা স্ত্রী জয়কালী দেবী এই রাধানাথ জীউর মন্দিরের অধিকারিণী।

জয়কালী দীর্ঘাকার, দৃঢ়শরীর, তীক্ষ্ণনাসা, প্রখরবুদ্ধি স্ত্রীলোক। তাঁহার স্বামী বর্তমানে তাঁহাদের দেবত্র সম্পত্তি নষ্ট হইবার জো হইয়াছিল। বিধবা তাহার সমস্ত বাকি বকেয়া আদায়, সীমা সরহদ্দ স্থির এবং বহুকালের বেদখল উদ্ধার করিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাপ্য হইতে কেহ তাঁহাকে এক কড়ি বঞ্চিত করিতে পারিত না।

এই স্ত্রীলোকটির প্রকৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পৌরুষের অংশ থাকাতে তাঁহার যথার্থ সঙ্গী কেহ ছিল না। স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে ভয় করিত। পরনিন্দা, ছোট কথা বা নাকীকান্না তাঁহার অসহ্য ছিল। পুরুষেরাও তাঁহাকে ভয় করিত; কারণ, পল্লীবাসী ভদ্রপুরুষদের চণ্ডীমণ্ডপগত অগাধ আলস্যকে তিনি এক প্রকার নীরব ঘৃণাপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষের দ্বারা ধিক্কার করিয়া যাইতে পারিতেন যাহা তাহাদের স্থূল জড়ত্ব ভেদ করিয়াও অন্তরে প্রবেশ করিত।

প্রবলরূপে ঘৃণা করিবার এবং সে ঘৃণা প্রবলরূপে প্রকাশ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা এই প্রৌঢ়া বিধবাটির ছিল। বিচারে যাহাকে অপরাধী করিতেন তাহাকে তিনি কথায় এবং বিনা কথায়, ভাবে এবং ভঙ্গীতে একেবারে দগ্ধ করিয়া যাইতে পারিতেন।

পল্লীর সমস্ত ক্রিয়াকর্মে বিপদে সম্পদে তাঁহার নিরলস হস্ত ছিল। সর্বত্রই তিনি নিজের একটি গৌরবের স্থান বিনা চেষ্টায় অতি সহজেই অধিকার করিয়া লইতেন। যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন সেখানে তিনিই যে, সকলের প্রধানপদে, সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অথবা উপস্থিত কোনো ব্যক্তির মনে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিত না।

রোগীর সেবায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কিন্তু রোগী তাঁহাকে যমের মত ভয় করিত। পথ্য বা নিয়মের লেশমাত্র লঙঘন হইলে তাঁহার ক্রোধানল রোগের তাপ অপেক্ষা রোগীকে অধিক উত্তপ্ত করিয়া তুলিত।

এই দীর্ঘাকার কঠিন বিধবাটি বিধাতার কঠোর নিয়মদণ্ডের ন্যায় পল্লীর মস্তকের উপর উদ্যত ছিলেন; কেহ তাঁহাকে ভালবাসিতে অথবা অবহেলা করিতে সাহস করিত না। পল্লীর সকলের সঙ্গেই তাঁহার যোগ ছিল অথচ তাঁহার মত অত্যন্ত একাকিনী কেহ ছিল না।

বিধবা নিঃসন্তান ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার গৃহে মানুষ হইত। পুরুষ অভিভাবক অভাবে তাহাদের যে কোনো প্রকার শাসন ছিল না এবং স্নেহান্ধ পিসিমার আদরে তাহারা যে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল এমন কথা কেহ বলিতে পারিত না। তাহাদের মধ্যে বড়টির বয়স আঠারো হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহার বিবাহের প্রস্তাবও আসিত এবং পরিণয়বন্ধন সম্বন্ধে বালকটির চিত্তও উদাসীন ছিল না। কিন্তু পিসিমা তাহার সেই সুখবাসনায় একদিনের জন্যও প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি কঠিন ভাবে বলিতেন, পুলিন আগে উপার্জন করিতে আরম্ভ করুক্ তার পরে বধূ ঘরে আনিবে। পিসিমার মুখের সেই কঠোর বাক্যে প্রতিবেশিনীদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

ঠাকুরবাড়িটি জয়কালীর সর্বাপেক্ষা যত্নের ধন ছিল। ঠাকুরের শয়ন বসন স্নানাহারের

তিলমাত্র ত্রুটি হইতে পারিত না। পূজক ব্রাহ্মণ দুটি দেবতার অপেক্ষা এই একটি মানবীকে অনেক বেশি ভয় করিত। পূর্বে এক সময় ছিল যখন দেবতার বরাদ্দ দেবতা পুরা পাইতেন না। কিন্তু আজকাল জয়কালীর শাসনে পূজার যোল আনা অংশই ঠাকুরের ভোগে আসিতেছে।

বিধবার যত্নে ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার তক্‌তক্ করিতেছে—কোথাও একটি তৃণমাত্র নাই। একপার্শ্বে মঞ্চ অবলম্বন করিয়া মাধবীলতা উঠিয়াছে, তাহার শুষ্কপত্র পড়িবামাত্র জয়কালী তাহা তুলিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দেন। ঠাকুরবাড়িতে পারিপাট্য পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইলে বিধবা তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। পাড়ার ছেলেরা পূর্বে লুকোচুরি খেলা উপলক্ষে এই প্রাঙ্গণের প্রান্তে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং মধ্যে মধ্যে পাড়ার ছাগশিশু আসিয়া মাধবীলতার বল্কলাংশ কিছু কিছু ভক্ষণ করিয়া যাইত। এখন আর সে সুযোগ নাই। পর্বকাল ব্যতীত অন্য দিনে ছেলেরা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না এবং ক্ষুধাতুর ছাগশিশুকে দণ্ডাঘাত খাইয়াই দ্বারের নিকট হইতে তারস্বরে আপন অজ-জননীকে আহ্বান করিতে করিতে ফিরিতে হইত।

অনাচারী ব্যক্তি পরমাত্মীয় হইলেও দেবালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না। জয়কালীর একটি যবনকরপক্ক-কুক্কুটমাংসলোলুপ ভগিনীপতি আত্মীয়সন্দর্শন উপলক্ষে গ্রামে উপস্থিত



হইয়া মন্দির-অঙ্গনে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, জয়কালী তাহাতে ত্বরিত ও তীব্র আপত্তি প্রকাশ করাতে সহোদরা ভগিনীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। এই দেবালয় সম্বন্ধে বিধবার এতই অতিরিক্ত অনাবশ্যক সতর্কতা ছিল যে, সাধারণের নিকট তাহা অনেকটা বাতুলতারূপে প্রতীয়মান হইত।

জয়কালী আর সর্বত্রই কঠিন উন্নত স্বতন্ত্র, কেবল এই মন্দিরের সম্মুখে তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহটির নিকট তিনি একান্তরূপে জননী, পত্নী, দাসী; ইহার কাছে তিনি সতর্ক, সুকোমল, সুন্দর এবং সম্পূর্ণ অবনম্র। এই প্রস্তরের মন্দির এবং প্রস্তরের মূর্তিটি তাঁহার নিগূঢ় নারীস্বভাবের একমাত্র চরিতার্থতার বিষয় ছিল। ইহাই তাঁহার স্বামী পুত্র, তাঁহার সমস্ত সংসার।

ইহা হইতেই পাঠকেরা বুঝিবেন যে, যে বালকটি মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে মাধবীমঞ্জরী আহরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহার সাহসের সীমা ছিল না। সে জয়কালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নলিন। সে তাহার পিসিমাকে ভালো করিয়াই জানিত তথাপি তাহার দুর্দান্ত প্রকৃতি শাসনের বশ হয় নাই। যেখানে বিপদ সেইখানেই তাহার একটা আকর্ষণ ছিল, এবং যেখানে শাসন সেখানেই লঙঘন করিবার জন্য তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকিত। জনশ্রুতি আছে বাল্যকালে তাহার পিসিমার স্বভাবটিও এইরূপ ছিল।

জয়কালী তখন মাতৃস্নেহমিশ্রিত ভক্তির সহিত ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দালানে বসিয়া একমনে মালা জপিতেছিলেন।

বালকটি নিঃশব্দপদে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মাধবীতলায় দাঁড়াইল। দেখিল, নিম্নশাখার ফুলগুলি পূজার জন্য নিঃশেষিত হইয়াছে। তখন অতি ধীরে ধীরে সাবধানে মঞ্চে আরোহণ করিল। উচ্চশাখায় দুটি একটি বিকচোন্মুখ কুঁড়ি দেখিয়া যেমন সে শরীর এবং বাহু প্রসারিত করিয়া তুলিতে যাইবে অমনি সেই প্রবল চেষ্টায় মঞ্চ সশব্দে ভাঙিয়া পড়িল। আশ্রিত লতা এবং বালক একত্রে ভূমিসাৎ হইল।

জয়কালী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রটির কীর্তি দেখিলেন। সবলে বাহু ধরিয়া তাহাকে মাটি হইতে তুলিলেন। আঘাত তাহার যথেষ্ট লাগিয়াছিল—কিন্তু সে আঘাতকে শাস্তি বলা যায় না, কারণ, তাহা অজ্ঞান জড়ের আঘাত। সেই জন্য পতিত বালকের ব্যথিত দেহে জয়কালীর সজ্ঞান শাস্তি মুহুর্মুহু সবলে বর্ষিত হইতে লাগিল। বালক একবিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া নীরবে সহ্য করিল। তখন তাহার পিসিমা তাহাকে টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রুদ্ধ করিলেন। তাহার সেদিনকার বৈকালিক আহার নিষিদ্ধ হইল।

আহার বন্ধ হইল শুনিয়া দাসী মোক্ষদা কাতরকণ্ঠে ছলছলনেত্রে বালককে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিল। জয়কালীর হৃদয় গলিল না। ঠাকুরানির অজ্ঞাতসারে গোপনে ক্ষুধিত বালককে যে কেহ খাদ্য দিবে বাড়িতে এমন দুঃসাহসিক কেহ ছিল না।

বিধবা মঞ্চসংস্কারের জন্য লোক ডাকিতে পাঠাইয়া পুনর্বার মালাহস্তে দালানে আসিয়া

বসিলেন। মোক্ষদা কিছুক্ষণ পরে সভয়ে নিকটে আসিয়া কহিল, "ঠাকুরমা, কাকাবাবু ক্ষুধায় কাঁদিতেছেন তাঁহাকে কিছু দুধ আনিয়া দিব কি?"

জয়কালী অবিচলিত মুখে কহিলেন, "না।" মোক্ষদা ফিরিয়া গেল। অদূরবর্তী কুটীরের গৃহ হইতে নলিনের করুণ ক্রন্দন ক্রমে ক্রোধের গর্জ্জনে পরিণত হইয়া উঠিল—অবশেষে অনেকক্ষণ পরে তাহার কাতরতার শ্রান্ত উচ্ছ্বাস থাকিয়া থাকিয়া জপ-নিরতা পিসিমার কানে আসিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল।

নলিনের আর্তকণ্ঠ যখন পরিশ্রান্ত ও মৌনপ্রায় হইয়া আসিয়াছে এমন সময় আর একটি জীবের ভীত কাতরস্বর নিকটে ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে ধাবমান মনুষ্যের দূরবর্তী চীৎকারশব্দ মিশ্রিত হইয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ পথে একটা তুমুল কলরব উত্থিত হইল।

সহসা প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা পদশব্দ শোনা গেল। জয়কালী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন ভূপর্যস্ত মাধবীলতা আন্দোলিত হইতেছে।

সরোষকণ্ঠে ডাকিলেন, "নলিন!"

কেহ উত্তর দিল না। বুঝিলেন অবাধ্য নলিন বন্দিশালা হইতে কোনোক্রমে পলায়ন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে রাগাইতে আসিয়াছে!

তখন অত্যন্ত কঠিনভাবে অধরের উপরে ওষ্ঠ চাপিয়া বিধবা প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন।

লতাকুঞ্জের নিকট পুনরায় ডাকিলেন—নলিন!

উত্তর পাইলেন না। শাখা তুলিয়া দেখিলেন, একটা অত্যন্ত মলিন শূকর প্রাণভয়ে ঘন পল্লবের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।

যে লতাবিতান এই ইষ্টক প্রাচীরের মধ্যে বৃন্দাবিপিনের সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ; যাহার বিকশিত কুসুমমঞ্জরীর সৌরভ গোপবৃন্দের সুগন্ধি নিশ্বাস স্মরণ করাইয়া দেয় এবং কালিন্দীতীরবর্তী সুখবিহারের সৌন্দর্য-স্বপ্ন জাগ্রত করিয়া তোলে—বিধবার সেই প্রাণাধিক যত্নের সুপবিত্র নন্দনভূমিতে অকস্মাৎ এই বীভৎস ব্যাপার ঘটিল।

পূজারি ব্রাহ্মণ লাঠিহস্তে তাড়া করিয়া আসিল।

জয়কালী তৎক্ষণাৎ নামিয়া আসিয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন এবং দ্রুতবেগে ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অনতিকাল পরেই সুরাপানে উন্মত্ত ডোমে দল মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বলির পশুর জন্য চীৎকার করিতে লাগিল।

জয়কালী রুদ্ধদ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, যা বেটারা ফিরে যা। আমার মন্দির অপবিত্র করিস্‌নে।

ডোমের দল ফিরিয়া গেল। জয়কালী ঠাকুরাণী যে তাঁহার রাধানাথ জীউর মন্দিরের মধ্যে অশুচি জন্তুকে আশ্রয় দিবেন ইহা তাহারা প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না।

গুপ্তধন

১

অমাবস্যার নিশীথ রাত্রি। মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিক মতে তাহাদের বহুকালের গৃহদেবতা জয়কালীর পূজায় বসিয়াছে। পূজা সমাধা করিয়া যখন উঠিল, তখন নিকটস্থ আমবাগান হইতে প্রত্যূষের প্রথম কাক ডাকিল।

মৃত্যুঞ্জয় পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। তখন সে একবার দেবীর চরণতলে মস্তক ঠেকাইয়া তাঁহার আসন সরাইয়া দিল। সেই আসনের নীচে হইতে একটি কাঁঠাল কাঠের বাক্স বাহির করিল। পৈতায় চাবি বাঁধা ছিল। সেই চাবি লাগাইয়া মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি খুলিল। খুলিবামাত্রেই চমকিয়া উঠিয়া মাথায় করাঘাত করিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের অন্দরের বাগান প্রাচীর দিয়া ঘেরা। সেই বাগানের এক প্রান্তে বড় বড় গাছের ছায়ায় অন্ধকারে এই ছোট মন্দিরটি। মন্দিরে জয়কালীর মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নাই; তাহার প্রবেশদ্বার একটিমাত্র। মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল। মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি খুলিবার পূর্বে তাহা বন্ধই ছিল—কেহ তাহা ভাঙে নাই। মৃত্যুঞ্জয় দশ বার করিয়া প্রতিমার চারিদিকে ঘুরিয়া হাতড়াইয়া দেখিল—কিছুই পাইল না। পাগলের মত হইয়া মন্দিরের দ্বার খুলিয়া ফেলিল—তখন ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিতেছে। মন্দিরের চারিদিকে মৃত্যুঞ্জয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৃথা আশ্বাসে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সকালবেলায় আলোক যখন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, তখন সে বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রার পর ক্লান্ত শরীরে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে এমন সময়ে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিল, জয় হোক্ বাবা।

সম্মুখে প্রাঙ্গণে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। মৃত্যুঞ্জয় ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন—"বাবা, তুমি মনের মধ্যে বৃথা শোক করিতেছ।"

শুনিয়া মৃত্যুঞ্জয় আশ্চর্য হইয়া উঠিল—কহিল,—"আপনি অন্তর্যামী, নহিলে আমার শোক কেমন করিয়া বুঝিলেন? আমি ত কাহাকেও কিছু বলি নাই।"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"বৎস, আমি বলিতেছি, তোমার যাহা হারাইয়াছে সেজন্য তুমি আনন্দ কর, শোক করিয়ো না।"

মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"আপনি তবে ত সমস্তই জানিয়াছেন—কেমন করিয়া হারাইয়াছে, কোথায় গেলে ফিরিয়া পাইব তাহা না বলিলে আমি আপনার চরণ ছাড়িব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন,—"আমি যদি তোমার অমঙ্গল কামনা করিতাম তবে বলিতাম। কিন্তু ভগবতী দয়া করিয়া যাহা হরণ করিয়াছেন সেজন্য শোক করিয়ো না।"

মৃত্যুঞ্জয় সন্ন্যাসীকে প্রসন্ন করিবার জন্য সমস্ত দিন বিবিধ উপচারে তাঁহার সেবা করিল। পর দিন প্রত্যুষে নিজের গোহাল হইতে লোটা ভরিয়া সফেন দুগ্ধ দুহিয়া লইয়া আসিয়া দেখিল সন্ন্যাসী নাই।

২

মৃত্যুঞ্জয় যখন শিশু ছিল, যখন তাহার পিতামহ হরিহর একদিন এই চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, তখন এমনি করিয়াই একটি সন্ন্যাসী "জয় হোক্ বাবা" বলিয়া এই প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। হরিহর সেই সন্ন্যাসীকে কয়েকদিন বাড়িতে রাখিয়া বিধিমত সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করিল।

বিদায়কালে সন্ন্যাসী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কী চাও"—হরিহর কহিল, বাবা যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে 'আমার অবস্থাটা একবার শুনুন। এককালে এই গ্রামে আমরা সকলের চেয়ে বর্ধিষ্ণু ছিলাম। আমার প্রপিতামহ দূর হইতে কুলীন আনাইয়া তাঁহার এক কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দৌহিত্রবংশ আমাদিগকেই ফাঁকি দিয়া আজকাল এই গ্রামে বড়লোক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এখন অবস্থা ভালো নয়, কাজেই ইহাদের অহংকার সহ্য করিয়া থাকি। কিন্তু আর সহ্য হয় না। কী করিলে আবার আমাদের বংশ বড় হইয়া উঠিবে সেই উপায় বলিয়া দিন, সেই আশীর্বাদ করুন।"

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বাবা, ছোট হইয়া সুখে থাক। বড় হইবার চেষ্টায় শ্রেয় দেখি না।"

কিন্তু হরিহর তবু ছাড়িল না, বংশ বড় করিবার জন্য সে সমস্ত স্বীকার করিতে রাজি আছে।

তখন সন্ন্যাসী তাঁহার ঝুলি হইতে কাপড়ে-মোড়া একটি তুলট কাগজের লেখন বাহির করিলেন। কাগজখানি দীর্ঘ, কোষ্ঠীপত্রের মতো গুটানো। সন্ন্যাসী সেটি মেজের উপরে খুলিয়া ধরিলেন। হরিহর দেখিল, তাহাতে নানাপ্রকার চক্রে নানা সাঙ্কেতিক চিহ্ন আঁকা, আর সকলের নিম্নে একটি প্রকাণ্ড ছড়া লেখা আছে তাহার আরম্ভটা এইরূপ :—

পায়ে ধরে সাধা,
রা নাহি দেয় রাধা।।
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড় পা।।
তেঁতুল বটের কোলে,

দক্ষিণে যাও চলে।।
ঈশানকোণে ঈশানী
কহে দিলাম নিশানী।। ইত্যাদি।

হরিহর কহিল, "বাবা, কিছুই ত বুঝিলাম না!"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"কাছে রাখিয়া দাও, দেবীর পূজা কর। তাঁহার প্রসাদে তোমার বংশে কেহ না কেহ এই লিখন অনুসারে ঐশ্বর্য পাইবে জগতে যাহার তুলনা নাই।"

হরিহর মিনতি করিয়া কহিল, "বাবা, কি বুঝাইয়া দিবেন না?"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"না। সাধনা দ্বারা বুঝিতে হইবে।"

এমন সময় হরিহরের ছোট ভাই শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া হরিহর তাড়াতাড়ি লিখনটি লইবার চেষ্টা করিল। সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, "বড় হইবার পথের দুঃখ এখন হইতেই শুরু হইল। কিন্তু গোপন করিবার দরকার নাই। কারণ, ইহার রহস্য কেবল একজন মাত্রই ভেদ করিতে পারিবে, হাজার চেষ্টা করিলেও আর কেহ তাহা পারিবে না। তোমাদের মধ্যে সেই লোকটি যে কে তাহা কেহ জানে না। অতএব ইহা সকলের সম্মুখেই নির্ভয়ে খুলিয়া রাখিতে পার।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। কিন্তু হরিহর এ কাগজটি লুকাইয়া না রাখিয়া থাকিতে পারিল না। পাছে আর কেহ ইহা হইতে লাভবান হয়, পাছে তাহার ছোট ভাই শঙ্কর ইহার ফলভোগ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় হরিহর এই কাগজটি কাঁঠালকাঠের বাক্সে বন্ধ করিয়া তাহাদের গৃহদেবতা জয়কালীর আসনতলে লুকাইয়া রাখিল। প্রত্যেক অমাবস্যায় নিশীথরাত্রে দেবীর পূজা সারিয়া সে একবার করিয়া সেই কাগজটি খুলিয়া দেখিত, যদি দেবী প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অর্থ বুঝিবার শক্তি দেন।

শঙ্কর কিছুদিন হইতে হরিহরকে মিনতি করিতে লাগিল, "দাদা, আমাকে সেই কাগজটা একবার ভালো করিয়া দেখিতে দাও না!"

হরিহর কহিল, "দূর পাগল! সে কাগজ কি আছে! বেটা ভণ্ডসন্ন্যাসী কাগজে কতকগুলা হিজিবিজি কাটিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল—আমি সে পুড়াইয়া ফেলিয়াছি।"

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ একদিন শঙ্করকে ঘরে দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার পর হইতে সে নিরুদ্দেশ।

হরিহরের অন্য সমস্ত কাজকর্ম নষ্ট হইল—গুপ্ত ঐশ্বর্যের ধ্যান এক মুহূর্তে সে ছাড়িতে পারিল না।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে তাহার বড় ছেলে শ্যামাপদকে এই সন্ন্যাসিদত্ত কাগজখানি দিয়া গেল।

এই কাগজ পাইয়া শ্যামাপদ চাকরি ছাড়িয়া দিল। জয়কালীর পূজায়, আর একান্ত মনে এই

লিখন পাঠের চর্চায় তাহার জীবনটা যে কোনদিক দিয়া কাটিয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিল না।

মৃত্যুঞ্জয় শ্যামাপদর বড় ছেলে। পিতার মৃত্যুর পরে সে এই সন্ন্যাসিদত্ত গুপ্তলিখনের অধিকারী হইয়াছে। তাহার অবস্থা উত্তরোত্তর যতই হীন হইয়া আসিতে লাগিল, ততই অধিকতর আগ্রহের সহিত ঐ কাগজখানির প্রতি তাহার সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট হইল। এমন সময় গত অমাবস্যারাত্রে পূজার পর লিখনখানি আর দেখিতে পাইল না—সন্ন্যাসীও কোথায় অন্তর্ধান করিল।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "এই সন্ন্যাসীকে ছাড়া হইবে না। সমস্ত সন্ধান ইহার কাছ হইতেই মিলিবে।"

এই বলিয়া সে ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসীকে খুঁজিতে বাহির হইল। এক বৎসর পথে পথে কাটিয়া গেল।

৩

গ্রামের নাম ধারাগোল। সেখানে মৃত্যুঞ্জয় মুদির দোকানে বসিয়া তামাক খাইতেছিল আর অন্যমনস্ক হইয়া নানা কথা ভাবিতেছিল। কিছু দূরে মাঠের ধার দিয়া একজন সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। প্রথমটা মৃত্যুঞ্জয়ের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না। একটু পরে হঠাৎ তাহার মনে হইল, যে লোকটা চলিয়া গেল এই ত সেই সন্ন্যাসী! তাড়াতাড়ি হুঁকাটি রাখিয়া মুদিকে সচকিত করিয়া এক দৌড়ে সে দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু সে সন্ন্যাসীকে দেখা গেল না।

তখন সন্ধ্যা অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। অপরিচিত স্থানে কোথায় যে সন্ন্যাসীর সন্ধান করিতে যাইবে তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না। দোকানে ফিরিয়া আসিয়া মুদিকে জিজ্ঞাসা করিল, ঐ যে মস্ত বন দেখা যাইতেছে ওখানে কী আছে?

মুদি কহিল, এককালে ঐ বন শহর ছিল কিন্তু অগস্ত্য মুনির শাপে ওখানকার রাজা প্রজা সমস্তই মড়কে মরিয়াছে। লোকে বলে ওখানে অনেক ধনরত্ন আজও খুঁজিলে পাওয়া যায় কিন্তু দিনদুপুরেও ঐ বনে সাহস করিয়া কেহ যাইতে পারে না। যে গেছে সে আর ফেরে নাই।

মৃত্যুঞ্জয়ের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি মুদির দোকানে মাদুরের উপর পড়িয়া মশার জ্বালায় সর্বাঙ্গ চাপ্‌ড়াইতে লাগিল আর ঐ বনের কথা, সন্ন্যাসীর কথা, সেই হারানো লিখনের কথা ভাবিতে থাকিল। বার বার পড়িয়া সেই লিখনটি মৃত্যুঞ্জয়ের প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল—তাই এই অনিদ্রাবস্থায় কেবলি তাহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল—

পায়ে ধরে সাধা
রা নাহি দেয় রাধা।।
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড় পা।

মাথা গরম হইয়া উঠিল—কোনোমতেই এই ক'টা ছত্র সে মন হইতে দূর করিতে পারিল না। অবশেষে ভোরের বেলায় যখন তাহার তন্দ্রা আসিল, তখন স্বপ্নে এই চারি ছত্রের অর্থ অতি সহজে তাহার নিকট প্রকাশ পাইল। "রা নাহি দেয় রাধা" অতএব "রাধা'র "রা" নাহি থাকিলে "ধা" রহিল—"শেষে দিল রা' অতএব হইল "ধারা"—"পাগোল ছাড় পা"—"পাগোলে"র "পা" ছাড়িলে "গোল" বাকি রহিল—অতএব সমস্তটা মিলিয়া হইল "ধারাগোল"—এই জায়গাটার নাম ত "ধারাগোল"ই বটে।

স্বপ্ন ভাঙিয়া মৃত্যুঞ্জয় লাফাইয়া উঠিল।

৪

সমস্ত দিন বনের মধ্যে ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলায় বহুকষ্টে পথ খুঁজিয়া অনাহারে মৃতপ্রায় অবস্থায় মৃত্যুঞ্জয় গ্রামে ফিরিল।

পরদিন চাদরে চিঁড়া বাঁধিয়া পুনর্বার সে বনের মধ্যে যাত্রা করিল। অপরাহ্নে একটি দিঘির ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিঘির মাঝখানটা পরিষ্কার জল আর পাড়ের গায়ে গায়ে চারিদিকে পথ আর কুমুদের বন। পাথরে-বাঁধানো ঘাট ভাঙিয়া চুরিয়া পড়িয়াছে। সেইখানে জলে চিঁড়া ভিজাইয়া খাইয়া দিঘির চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

দিঘির পশ্চিম পাড়ের প্রান্তে হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয় থমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল একটা তেঁতুল গাছকে বেষ্টন করিয়া প্রকাণ্ড বটগাছ উঠিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহার মনে পড়িল—

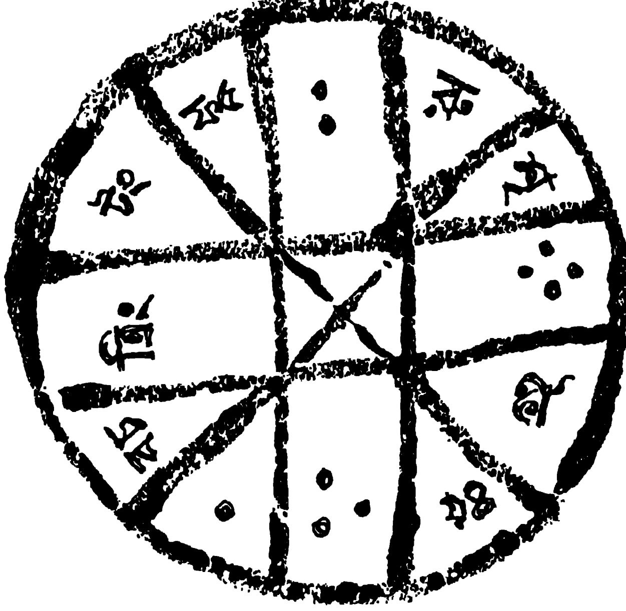
তেঁতুল বটের কোলে,
দক্ষিণে যাও চলে'।।

দক্ষিণে কিছু দূর যাইতেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়িল। সেখানে সে বেতঝাড় ভেদ করিয়া চলা একেবারে অসাধ্য। যাহা হৌক মৃত্যুঞ্জয় ঠিক করিল এই গাছটাকে কোনোমতে হারাইলে চলিবে না।

এই গাছের কাছে ফিরিয়া আসিবার সময় গাছের অন্তরাল দিয়া অনতিদূরে একটা মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। সেই দিকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মৃত্যুঞ্জয় এক ভাঙা মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, নিকটে একটা চুল্লি, পোড়াকাঠ আর ছাই পড়িয়া আছে। অতিসাবধানে মৃত্যুঞ্জয় ভগ্নদ্বার মন্দিরের মধ্যে উঁকি মারিল। সেখানে কোনো লোক নাই, প্রতিমা নাই, কেবল একটি কম্বল, কমণ্ডলু আর গেরুয়া উত্তরীয় পড়িয়া আছে।

তখন সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, গ্রাম বহু দূরে; অন্ধকারে বনের মধ্যে পথ সন্ধান করিয়া যাইতে পারিবে কি না সন্দেহ তাই এই মন্দিরে মনুষ্যবসতির লক্ষণ দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় খুশি হইল। মন্দির হইতে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভাঙিয়া দ্বারের কাছে পড়িয়া ছিল; সেই পাথরের উপরে বসিয়া নতশিরে ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুঞ্জয় হঠাৎ পাথরের গায়ে কী যেন

লেখা দেখিতে পাইল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল, একটি চক্র আঁকা, তাহার মধ্যে কতক স্পষ্ট কতক লুপ্তপ্রায় ভাবে নিম্নলিখিত সাঙ্কেতিক অক্ষর লেখা আছে :—



এই চক্রটি মৃত্যুঞ্জয়ের সুপরিচিত। কত অমাবস্যা রাত্রে পূজাগৃহে সুগন্ধ ধূমের ধূমে ঘৃতদীপালোকে তুলট কাগজে অঙ্কিত এই চক্রচিহ্নের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া রহস্যভেদ করিবার জন্য একাগ্রমনে সে দেবীর প্রসাদ যাচ্‌ঞা করিয়াছে। আজ অভীষ্ট সিদ্ধির অত্যন্ত সন্নিকটে আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গ যেন কাঁপিতে লাগিল। পাছে তীরে আসিয়া তরি ডোবে, পাছে সামান্য একটা ভুলে তাহার সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়, পাছে সেই সন্ন্যাসী পূর্বে আসিয়া সমস্ত উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়া থাকে এই আশঙ্কায় তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। এখন যে তাহার কী কর্তব্য তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। তাহার মনে হইল সে হয় ত তাহার ঐশ্বর্যভাণ্ডারের ঠিক উপরেই বসিয়া আছে অথচ কিছুই জানিতে পাইতেছে না!

বসিয়া বসিয়া সে কালীনাম জপ করিতে লাগিল, সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল; ঝিল্লির ধ্বনিতে বনভূমি মুখর হইয়া উঠিল।

এমন সময় কিছু দূর ঘনবনের মধ্যে অগ্নির দীপ্তি দেখা গেল। মৃত্যুঞ্জয় তাহার প্রস্তরাসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল আর সেই শিক্ষা লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

বহুকষ্টে কিছুদূর গিয়া একটা অশ্বত্থগাছের গুঁড়ির অন্তরাল হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইল তাহার সেই পরিচিত সন্ন্যাসী অগ্নির আলোকে সেই তুলটের লিখন মেলিয়া একটা কাঠি দিয়া ছাইয়ের উপর এক মনে অঙ্ক কষিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরের সেই পৈতৃক তুলটের লিখন! আরে ভণ্ড, চোর! এই জন্যই সে মৃত্যুঞ্জয়কে শোক করিতে নিষেধ করিয়াছিল বটে!

সন্ন্যাসী একবার করিয়া অঙ্ক কষিতেছে, আর একটা মাপকাঠি লইয়া জমি মাপিতেছে,—কিয়দ্দুর মাপিয়া হতাশ হইয়া ঘাড় নাড়িয়া পুনর্বার আসিয়া অঙ্ক কষিতে প্রবৃত্ত হইতেছে।

এমন করিয়া রাত্রি যখন অবসানপ্রায়—যখন নিশান্তের শীতবায়ুতে বনস্পতির অগ্রশাখার পল্লবগুলি মর্মরিত হইয়া উঠিল, তখন সন্ন্যাসী সেই লিখনপত্র গুটাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। ইহা সে নিশ্চয় বুঝিতে পারিল যে, সন্ন্যাসীর সাহায্য ব্যতীত এই লিখনের রহস্যভেদ করা তাহার সাধ্য হইবে না। লুব্ধ সন্ন্যাসী যে মৃত্যুঞ্জয়কে সাহায্য করিবে না তাহাও নিশ্চিত। অতএব গোপনে সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি রাখা ছাড়া অন্য উপায় নাই, কিন্তু দিনের বেলায় গ্রামে না গেলে তাহার আহার মিলিবে না; অতএব অন্তত কাল সকালে একবার গ্রামে যাওয়া আবশ্যক।

ভোরের দিকে অন্ধকার একটু ফিকা হইবামাত্র সে গাছ হইতে নামিয়া পড়িল। যেখানে সন্ন্যাসী ছাইয়ের মধ্যে আঁক কষিতেছিল সেখানে ভালো করিয়া দেখিল, অন্য বনখণ্ডের সঙ্গে কোনো প্রভেদ নাই।

বনতলের অন্ধকার ক্রমে যখন ক্ষীণ হইয়া আসিল তখন মৃত্যুঞ্জয় অতি সাবধানে চারিদিক দেখিতে দেখিতে গ্রামের উদ্দেশে চলিল। তাহার ভয় ছিল পাছে সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিতে পায়।

যে দোকানে মৃত্যুঞ্জয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহার নিকটে একটি কায়স্থগৃহিণী ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া সেদিন ব্রাহ্মণভোজন করাইতে প্রবৃত্ত ছিল। সেইখানে আজ মৃত্যুঞ্জয়ের আহার জুটিয়া গেল। কয়দিন আহারের কষ্টের পর আজ তাহার ভোজনটি গুরুতর হইয়া উঠিল। সেই গুরুভোজনের পর যেমন তামাকটি খাইয়া দোকানের মাদুরটিতে একবার গড়াইয়া লইবার ইচ্ছা করিল, অমনি গত রাত্রির অনিদ্রাকাতর মৃত্যুঞ্জয় ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় স্থির করিয়াছিল, আজ সকাল সকাল আহারাদি করিয়া যথেষ্ট বেলা থাকিতে বাহির হইবে। ঠিক তাহার উল্টো হইল। যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে। তবু মৃত্যুঞ্জয় দমিল না। অন্ধকারেই বনের মধ্যে সে প্রবেশ করিল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি ঘনীভূত হইয়া আসিল। গাছের ছায়ার মধ্যে দৃষ্টি আর চলে না, জঙ্গলের মধ্যে পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয় যে কোন্‌দিকে কোথায় যাইতেছে তাহা কিছুই ঠাহর পাইল না। যখন রাত্রি অবসান হইল তখন দেখিল সমস্ত রাত্রি সে বনের প্রান্তে একই জায়গায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।

কাকের দল কা কা শব্দে গ্রামের দিকে উড়িল। এই শব্দ মৃত্যুঞ্জয়ের কানে ব্যঙ্গপূর্ণ ধিক্কারবাক্যের মতো শুনাইল।

৬

গণনায় বারবার ভুল আর সেই ভুল সংশোধন করিতে করিতে অবশেষে সন্ন্যাসী সুড়ঙ্গের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। সুড়ঙ্গের মধ্যে মশাল লইয়া তিনি প্রবেশ করিলেন। বাঁধানো ভিত্তির গায়ে স্যাঁৎলা পড়িয়াছে—মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় জল চুইয়া পড়িতেছে। স্থানে স্থানে কতকগুলা ভেক গায়ে গায়ে স্তূপাকার হইয়া নিদ্রা দিতেছে। এই পিছল পথ দিয়া কিছুদূর যাইতেই সন্ন্যাসী দেখিলেন, সম্মুখে দেওয়াল উঠিয়াছে, পথ অবরুদ্ধ। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দেওয়ালের সর্বত্র লৌহদণ্ড দিয়া সবলে আঘাত করিয়া দেখিলেন কোথাও ফাঁকা আওয়াজ দিতেছে—কোথাও রন্ধ্র নাই—এই পথটার যে এইখানেই শেষ তাহা নিঃসন্দেহ।

আবার সেই কাগজ খুলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সে রাত্রি এমনি করিয়া কাটিয়া গেল।

পরদিন পুনর্বার গণনা সারিয়া সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলেন। সেদিন গুপ্ত সঙ্কেত অনুসরণপূর্বক একটি বিশেষ স্থান হইতে পাথর খসাইয়া এক শাখাপথ আবিষ্কার করিলেন। সেই পথে চলিতে চলিতে আবার পথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

অবশেষে পঞ্চম রাত্রে সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন—"আজ আমি পথ পাইয়াছি, আজ আর আমার কোনোমতেই ভুল হইবে না।"

পথ অত্যন্ত জটিল; তাহার শাখা প্রশাখার অন্ত নাই—কোথাও এত সঙ্কীর্ণ যে গুঁড়ি মারিয়া যাইতে হয়। বহুযত্নে মশাল ধরিয়া চলিতে চলিতে সন্ন্যাসী একটা গোলাকার ঘরের মত জায়গায় আসিয়া পৌঁছিলেন। সেই ঘরের মাঝখানে একটা বৃহৎ ইদারা। মশালের আলোকে সন্ন্যাসী তাহার তল দেখিতে পাইলেন না। ঘরের ছাদ হইতে একটা মোটা প্রকাণ্ড লৌহশৃঙ্খল ইদারার মধ্যে নামিয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসী প্রাণপণ বলে ঠেলিয়া এই শৃঙ্খলটাকে অল্প একটুখানি নাড়াইবামাত্র ঠং করিয়া একটা শব্দ ইঁদারার গহ্বর হইতে উত্থিত হইয়া ঘরময় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পাইয়াছি!"

যেমন বলা অমনি সেই ঘরের ভাঙা ভিত্তি হইতে একটা পাথর গড়াইয়া পড়িল আর সেই সঙ্গে আর একটি কি সচেতন পদার্থ ধপ্ করিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী এই অকস্মাৎ শব্দে চমকিয়া উঠিতেই তাঁহার হাত হইতে মশাল পড়িয়া নিবিয়া গেল।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" কোনো উত্তর পাইলেন না। তখন অন্ধকারে হাতড়াইতে গিয়া তাঁহার হাতে একটা মানুষের দেহ ঠেকিল। তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-"কে তুমি?"

কোনো উত্তর পাইলেন না। লোকটা অচেতন হইয়া গেছে।

তখন চক্‌মকি ঠুকিয়া ঠুকিয়া সন্ন্যাসী অনেক কষ্টে মশাল ধরাইলেন। ইতিমধ্যে সেই

লোকটা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল আর উঠিবার চেষ্টা করিয়া বেদনায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "এ কি মৃত্যুঞ্জয় যে! তোমার এ মতি হইল কেন?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "বাবা, মাপ কর। ভগবান আমাকে শাস্তি দিয়াছেন। তোমাকে পাথর ছুঁড়িয়া মারিতে গিয়া সাম্‌লাইতে পারি নাই—পিছলে পাথর সুদ্ধ-আমি পড়িয়া গেছি। পা'টা নিশ্চয় ভাঙিয়া গেছে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমাকে মারিয়া তোমার কি লাভ হইত!"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—"লাভের কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ! তুমি কিসের লোভে আমার পূজাঘর হইতে লিখনখানি চুরি করিয়া এই সুড়ঙ্গের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ! তুমি চোর, তুমি ভণ্ড! আমার পিতামহকে যে সন্ন্যাসী ঐ লিখনখানি দিয়াছিলেন তিনি বলিয়াছিলেন আমাদেরই বংশের কেহ এই লিখনের সংকেত বুঝিতে পারিবে। এই গুপ্ত ঐশ্বর্য্য আমাদেরই বংশের প্রাপ্য। তাই আমি এই কয়দিন না খাইয়া না ঘুমাইয়া ছায়ার মত তোমার পশ্চাতে ফিরিতেছি। আর তুমি যখন বলিয়া উঠিলে "পাইয়াছি" তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি তোমার পশ্চাতে আসিয়া ভিতের ঐ গর্ত্তটার ভিতরে লুকাইয়া বসিয়াছিলাম। ওখান হইতে পাথর খসাইয়া তোমাকে মারিতে গেলাম কিন্তু শরীর দুর্বল, জায়গাটাও অত্যন্ত পিছল—তাই পড়িয়া গেছি—এখন তুমি আমাকে মারিয়া ফেল সে-ও ভালো—আমি যক্ষ হইয়া এই ধন আগ্‌লাইব—কিন্তু তুমি ইহা লইতে পারিবে না—কোনোমতেই না। যদি লইতে চেষ্টা কর, আমি ব্রাহ্মণ তোমাকে অভিশাপ দিয়া এই কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। এ ধন তোমার ব্রহ্মরক্ত গোরক্ততুল্য হইবে—এ ধন তুমি কোনো দিন সুখে ভোগ করিতে পারিবে না। আমাদের পিতা পিতামহ এই ধনের উপর সমস্ত মন রাখিয়া মরিয়াছেন—এই ধনের ধ্যান করিতে করিতে আমরা দরিদ্র হইয়াছি—এই ধনের সন্ধানে আমি বাড়িতে স্ত্রী ও শিশুসন্তান ফেলিয়া আহার নিদ্রা ছাড়িয়া লক্ষ্মীছাড়া পাগলের মতো মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—এ ধন তুমি আমার চোখের সম্মুখে কখনো লইতে পারিবে না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"মৃত্যুঞ্জয়, তবে শোন! সমস্ত কথা তোমাকে বলি।"

"তুমি জান, তোমার পিতামহের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাহার নাম ছিল শঙ্কর।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—"হাঁ, তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন।"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"আমি সেই শঙ্কর।"—মৃত্যুঞ্জয় হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এতক্ষণ এই গুপ্তধনের উপর তাহার যে একমাত্র দাবি সে সাব্যস্ত করিয়া বসিয়াছিল তাহারই বংশের আত্মীয় আসিয়া সে দাবি নষ্ট করিয়া দিল।

শঙ্কর কহিলেন—"দাদা সন্ন্যাসীর নিকট হইতে লিখন পাইয়া অবধি আমার কাছে তাহা বিধিমতে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু তিনি যতই গোপন করিতে লাগিলেন, আমার

ঔৎসুক্য ততই বাড়িয়া উঠিল। তিনি দেবীর আসনের নীচে বাক্সের মধ্যে ঐ লিখনখানি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন আমি তাহার সন্ধান পাইলাম আর দ্বিতীয় চাবি বানাইয়া প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া সমস্ত কাগজখানা নকল করিতে লাগিলাম। যেদিন নকল শেষ হইল সেই দিনই আমি এই ধনের সন্ধানে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। আমারও ঘরে অনাথা স্ত্রী এবং একটি শিশুসন্তান ছিল। আজ তাহারা কেহ বাঁচিয়া নাই।

"কত দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়াছি তাহা বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নাই। সন্ন্যাসিদত্ত এই লিখন নিশ্চয় কোনো সন্ন্যাসীকে আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন এই মনে করিয়া অনেক সন্ন্যাসীর আমি সেবা করিয়াছি। অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী আমার ঐ কাগজের সন্ধান পাইয়া তাহা হরণ করিবারও চেষ্টা করিয়াছে। এইরূপে কত বৎসরের পর বৎসর কাটিয়াছে, আমার মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুখ ছিল না, শান্তি ছিল না।

"অবশেষে পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যের বলে কুমায়ুন পর্বতে বাবা স্বরূপানন্দ স্বামীর সঙ্গ পাইলাম। তিনি আমাকে কহিলেন, 'বাবা, তৃষ্ণা দূর কর তাহা হইলেই বিশ্বব্যাপী অক্ষয় সম্পদ আপনি তোমাকে ধরা দিবে!'

"তিনি আমার মনের দাহ জুড়াইয়া দিলেন। তাঁহার প্রসাদে আকাশের আলোক আর ধরণীর শ্যামলতা আমার কাছে রাজসম্পদ হইয়া উঠিল। একদিন পর্বতের শিলাতলে শীতের সায়াহ্নে পরমহংস বাবার ধুনীতে আগুন জ্বলিতেছিল—সেই আগুনে আমার কাগজখানা সমর্পণ করিলাম। বাবা ঈষৎ একটু হাসিলেন। সে হাসির অর্থ তখন বুঝি নাই আজ বুঝিয়াছি। তিনি নিশ্চয় মনে মনে বলিয়াছিলেন, কাগজখানা ছাই করিয়া ফেলা সহজ কিন্তু বাসনা এত সহজে ভস্মসাৎ হয় না।

"কাগজখানার যখন কোনো চিহ্ন রহিল না তখন আমার মনের চারিদিক হইতে একটা নাগপাশ বন্ধন যেন সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া গেল। মুক্তির অপূর্ব আনন্দে আমার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম এখন হইতে আমার আর কোনো ভয় নাই—আমি জগতে কিছুই চাহি না।

ইহার অনতিকাল পরে পরমহংস বাবার সঙ্গ হইতে চ্যুত হইলাম। তাঁহাকে অনেক খুঁজিলাম, কোথাও তাঁহার দেখা পাইলাম না।

"আমি তখন সন্ন্যাসী হইয়া নিরাসক্তচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অনেক বৎসর কাটিয়া গেল—সেই লিখনের কথা প্রায় ভুলিয়াই গেলাম।

"এমন সময় একদিন এই ধারাগোলের বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি ভাঙা মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় লইলাম। দুই এক দিন থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, মন্দিরের ভিতে স্থানে স্থানে নানা প্রকার চিহ্ন আঁকা আছে। এই চিহ্নগুলি আমার পূর্বপরিচিত।

"এককালে বহুদিন যাহার সন্ধানে ফিরিয়াছিলাম তাহার যে নাগাল পাওয়া যাইতেছে তাহাতে আমার সন্দেহ রহিল না। আমি কহিলাম, এখানে আর থাকা হইবে না, এ বন ছাড়িয়া চলিলাম।

"কিন্তু ছাড়িয়া যাওয়া ঘটিল না। মনে হইল, দেখাই যাক না, কী আছে! কৌতূহল একেবারে নিবৃত্ত করিয়া যাওয়া ভালো। চিহ্নগুলা লইয়া অনেক আলোচনা করিলাম, কোনো ফল হইল না। বারবার মনে হইতে লাগিল কেন সে কাগজখানা পুড়াইয়া ফেলিলাম! সেখানা রাখিলেই বা কী ক্ষতি ছিল!

"তখন আবার আমার সেই জন্মগ্রামে গেলাম। আমাদের পৈতৃক ভিটার নিতান্ত দুরবস্থা দেখিয়া মনে করিলাম, আমি সন্ন্যাসী, আমার ধনরত্নে কোনো প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই গরীবরা ত গৃহী, সেই গুপ্তসম্পদ ইহাদের জন্য উদ্ধার করিয়া দিলে তাহাতে দোষ নাই।

"সেই লিখন কোথায় আছে জানিতাম, তাহা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইল না।

"তাহার পরে একটি বৎসর ধরিয়া এই কাগজখানা লইয়া এই নির্জন বনের মধ্যে গণনা করিয়াছি আর সন্ধান করিয়াছি। মনে আর কোনো চিন্তা ছিল না। যত বারম্বার বাধা পাইতে লাগিলাম ততই উত্তরোত্তর আগ্রহ বাড়িয়া চলিল—উন্মত্তের মতো অহোরাত্র এই এক অধ্যবসায়ে নিবিষ্ট রহিলাম।

"ইতিমধ্যে কখন তুমি আমার অনুসরণ করিতেছ তাহা জানিতে পারি নাই। আমি সহজ অবস্থায় থাকিলে তুমি কখনই নিজেকে আমার কাছে গোপন রাখিতে পারিতে না কিন্তু আমি তন্ময় হইয়া ছিলাম, বাহিরের ঘটনা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না।

"তাহার পরে, যাহা খুঁজিতেছিলাম আজ এইমাত্র তাহা আবিষ্কার করিয়াছি। এখানে যাহা আছে পৃথিবীতে কোনো রাজরাজেশ্বরের ভাণ্ডারেও এত ধন নাই। আর একটিমাত্র সংকেত ভেদ করিলেই সেই ধন পাওয়া যাইবে।

"এই সংকেতটিই সর্বাপেক্ষা দুরূহ। কিন্তু এই সংকেতও আমি মনে মনে ভেদ করিয়াছি। সেইজন্যই 'পাইয়াছি' বলিয়া মনের উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। যদি ইচ্ছা করি তবে আর এক দণ্ডের মধ্যে সেই স্বর্ণমাণিক্যের ভাণ্ডারের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতে পারি।"

মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "তুমি সন্ন্যাসী তোমার ত ধনের কোনো প্রয়োজন নাই—আমাকে সেই ভাণ্ডারের মধ্যে লইয়া যাও। আমাকে বঞ্চিত করিয়ো না।"

শঙ্কর কহিলেন—"আজ আমার শেষবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। তুমি ঐ যে পাথর ফেলিয়া আমাকে মারিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলে তাহার আঘাত আমার শরীর লাগে নাই কিন্তু তাহা আমার মোহাবরণকে ভেদ করিয়াছে। তৃষ্ণার করালমূর্তি আজ আমি দেখিলাম! আমার গুরু পরমহংসদেবের নিগূঢ় প্রশান্ত হাস্য এতদিন পরে আমার অন্তরের কল্যাণদীপে অনির্বাণ আলোকশিখা জ্বালাইয়া তুলিল।"

মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করের পা ধরিয়া পুনরায় কাতরস্বরে কহিল,—"তুমি মুক্ত পুরুষ, আমি মুক্ত নহি, আমি মুক্তি চাহি না, আমাকে এই ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন,—"বৎস, তবে তুমি তোমার এই লিখনটি লও! যদি ধন খুঁজিয়া লইতে পার তবে লইয়ো।"

এই বলিয়া তাঁহার যষ্টি ও লিখনপত্র মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে রাখিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আমাকে দয়া কর, আমাকে ফেলিয়ো যাইয়ো না—আমাকে দেখাইয়া দাও!"

কোনো উত্তর পাইল না।

তখন মৃত্যুঞ্জয় যষ্টির উপর ভয় করিয়া হাতড়াইয়া সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পথ অত্যন্ত জটিল, গোলকধাঁধার মতো বারবার বাধা পাইতে লাগিল। অবশেষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া এক জায়গায় শুইয়া পড়িল এবং নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না।

ঘুম হইতে যখন জাগিল তখন রাত্রি, কি দিন, কি কত বেলা তাহা জানিবার কোনো উপায় ছিল না। অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইলে মৃত্যুঞ্জয় চাদরের প্রান্ত হইতে চিঁড়া খুলিয়া লইয়া খাইল। তাহার পর আর একবার হাতড়াইয়া সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। নানাস্থানে বাধা পাইয়া বসিয়া পড়িল। তখন চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ওগো সন্ন্যাসী, তুমি কোথায়!"

তাহার সেই ডাক সুড়ঙ্গের সমস্ত শাখা-প্রশাখা হইতে বারম্বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনতিদূর হইতে উত্তর আসিল, "আমি তোমার নিকটেই আছি—কী চাও বল!"

মৃত্যুঞ্জয় কাতরস্বরে কহিল,—"কোথায় ধন আছে আমাকে দয়া করিয়া দেখাইয়া দাও!"

তখন আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। মৃত্যুঞ্জয় বারম্বার ডাকিল, কোনো সাড়া পাইল না।

দণ্ডপ্রহরের দ্বারা অবিভক্ত এই ভূতলগত চিররাত্রির মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় আর একবার ঘুমাইয়া লইল। ঘুম হইতে আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া ডাকিল—"ওগো আছ কি?"

নিকট হইতে উত্তর পাইল—"এইখানেই আছি। কী চাও?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আমি আর কিছু চাই না—আমাকে এই সুড়ঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও।"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি ধন চাও না?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—"না, চাহি না।"

তখন চক্‌মকি ঠোকার শব্দ উঠিল এবং কিছুক্ষণ পরে আলো জ্বলিল। সন্ন্যাসী কহিলেন,—"তবে এস মৃত্যুঞ্জয়, এই সুড়ঙ্গ হইতে বাহিরে যাই।"

মৃত্যুঞ্জয় কাতর স্বরে কহিল,—"বাবা, নিতান্তই কি সমস্ত ব্যর্থ হইবে? এত কষ্টের পরেও ধন কি পাইব না?

তৎক্ষণাৎ মশাল নিবিয়া গেল। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "কি নিষ্ঠুর!"—বলিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। সময়ের কোনো পরিমাণ নাই, অন্ধকারের কোনো অন্ত নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল তাহার সমস্ত শরীর-মনের বলে এই অন্ধকারটাকে ভাঙিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলে। আলোক, আকাশ আর বিশ্বচ্ছবির বৈচিত্র্যের জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল—কহিল, "ওগো সন্ন্যাসী, ওগো নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী, আমি ধন চাই না, আমাকে উদ্ধার কর।"

সন্ন্যাসী কহিলেন,—"ধন চাও না? তবে আমার হাত ধর। আমার সঙ্গে চল।"

এবারে আর আলো জ্বলিল না। এক হাতে যষ্টি ও এক হাতে সন্ন্যাসীর উত্তরীয় ধরিয়া মৃত্যুঞ্জয় ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া অনেক আঁকাবাঁকা পথ দিয়া অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া এক জায়গায় আসিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন,—"দাঁড়াও।"

মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইল। তাহার পরে একটা মরিচা-পড়া লোহার দ্বার খোলার উৎকট শব্দ শোনা গেল। সন্ন্যাসী মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া কহিলেন,—"এস।"

মৃত্যুঞ্জয় অগ্রসর হইয়া যেন একটা ঘরে প্রবেশ করিল। তখন আবার চক্‌মকি ঠোকার শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে যখন মশাল জ্বলিয়া উঠিল তখন একি আশ্চর্য দৃশ্য! চারিদিকে দেয়ালের গায়ে মোটা মোটা সোনার পাত ভূগর্ভরুদ্ধ কঠিন সূর্যালোকপুঞ্জের মতো স্তরে স্তরে সজ্জিত। মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ দুটা জ্বলিতে লাগিল। সে পাগলের মতো বলিয়া উঠিল—"এ সোনা আমার—এ আমি কোনো মতেই ফেলিয়া যাইতে পারিব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আচ্ছা ফেলিয়া যাইয়ো না; এই মশাল রহিল—আর এই ছাতু, চিঁড়া আর বড় এক ঘটি জল রাখিয়া গেলাম।"

দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসী বাহির হইয়া আসিলেন আর এই স্বর্ণভাণ্ডারের লৌহদ্বারে কপাট পড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় বার বার করিয়া এই স্বর্ণপুঞ্জ স্পর্শ করিয়া ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছোট ছোট স্বর্ণখণ্ড টানিয়া মেজের উপরে ফেলিতে লাগিল, কোলের উপর তুলিতে লাগিল, একটার উপরে আর একটা আঘাত করিয়া শব্দ করিতে লাগিল, সর্বাঙ্গের উপর বুলাইয়া তাহার স্পর্শ লইতে লাগিল। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া সোনার পাত বিছাইয়া তাহার উপরে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, চারিদিকে সোনা ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। সোনা ছাড়া আর কিছুই নাই। মৃত্যুঞ্জয় ভাবিতে লাগিল—পৃথিবীর উপরে হয় ত এতক্ষণে প্রভাত হইয়াছে—সমস্ত জীবজন্তু আনন্দে জাগিয়া উঠিয়াছে। —তাহাদের বাড়িতে পুকুরের ধারের বাগান হইতে প্রভাতে যে একটি স্নিগ্ধগন্ধ উঠিত তাহাই কল্পনায় তাহার নাসিকায় যেন প্রবেশ করিতে লাগিল। সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, পাতি হাঁসগুলি দুলিতে দুলিতে কলরব করিতে করিতে সকাল বেলায় পুকুরের জলের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে, আর বাড়ির ঝি বামা কোমরে কাপড় জড়াইয়া ঊর্ধ্বোত্থিত দক্ষিণ হস্তের উপর এক রাশি পিতল কাঁসার থালা বাটি লইয়া ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয় দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল—"ওগো সন্ন্যাসী ঠাকুর, আছ কি?"

দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী কহিলেন—"কী চাও?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—"আমি বাহিরে যাইতে চাই—কিন্তু সঙ্গে এই সোনার দুটো একটা পাতও কি লইয়া যাইতে পারিব না?"

সন্ন্যাসী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া নূতন মশাল জ্বালাইলেন—পূর্ণ কমণ্ডলু একটি

রাখিলেন আর উত্তরীয় হইতে কয়েক মুষ্টি চিঁড়া মেজের উপর রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। দ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় পাত্‌লা একটা সোনার পাত লইয়া তাহা দোম্‌ড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। সেই খণ্ড সোনাগুলাকে লইয়া ঘরের চারিদিকে লৌষ্ট্রখণ্ডের ন্যায় ছড়াইতে লাগিল। কখনো বা দাঁত দিয়া দংশন করিয়া সোনার পাতের উপর দাগ করিয়া দিল। কখনো বা একটা সোনার পাত মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপরে বারম্বার পদাঘাত করিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, পৃথিবীতে এমন সম্রাট্ কয়জন আছে যাহারা সোনা লইয়া এমন করিয়া ফেলাছড়া করিতে পারে! মৃত্যুঞ্জয়ের যেন একটা প্রলয়ের রোখ চাপিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই রাশীকৃত সোনাকে চূর্ণ করিয়া ধূলির মত সে ঝাঁটা দিয়া উড়াইয়া ফেলে—আর এইরূপে পৃথিবীর সমস্ত সুবর্ণলুব্ধ রাজা মহারাজকে সে অবজ্ঞা করিতে পারে!

এম্‌নি করিয়া যতক্ষণ পারিল মৃত্যুঞ্জয় সোনাগুলাকে লইয়া টানাটানি করিয়া শ্রান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম হইতে উঠিয়া সে আবার তাহার চারিদিকে সেই সোনার স্তূপ দেখিতে লাগিল; সে তখন দ্বারে আঘাত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"ওগো সন্ন্যাসী, আমি এ সোনা চাই না—সোনা চাই না!"

কিন্তু দ্বার খুলিল না। ডাকিতে ডাকিতে মৃত্যুঞ্জয়ের গলা ভাঙিয়া গেল কিন্তু দ্বার খুলিল না—এক একটা সোনার পিণ্ড লইয়া দ্বারের উপর ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল, কোনো ফল হইল না। মৃত্যুঞ্জয়ের বুক দমিয়া গেল—তবে আর কি সন্ন্যাসী আসিবে না! এই স্বর্ণকারাগারের মধ্যে তিলে তিলে পলে পলে শুকাইয়া মরিতে হইবে।

তখন সোনাগুলাকে দেখিয়া তাহার আতঙ্ক হইতে লাগিল। বিভীষিকার নিঃশব্দ কঠিন হাস্যের মত ঐ সোনার স্তূপ চারিদিকে স্থির হইয়া রহিয়াছে—তাহার মধ্যে স্পন্দন নাই, পরিবর্তন নাই—মৃত্যুঞ্জয়ের যে হৃদয় এখন কাঁপিতেছে, ব্যাকুল হইতেছে, তাহার সঙ্গে উহাদের কোনো সম্পর্ক নাই, বেদনার কোনো সম্বন্ধ নাই। এই সোনার পিণ্ডগুলা আলোক চায় না, বাতাস চায় না, প্রাণ চায় না, মুক্তি চায় না। ইহারা এই চির অন্ধকারের মধ্যে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া কঠিন হইয়া রহিয়াছে!

পৃথিবীতে এখন কি গোধূলি আসিয়াছে? আহা, সেই গোধূলির স্বর্ণ! যে স্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্য চোখ জুড়াইয়া অন্ধকারের প্রান্তে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া যায়! তাহার পরে কুটীরের প্রাঙ্গণতলে সন্ধ্যাতারা একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। গোয়ালে প্রদীপ জ্বালাইয়া বধূ ঘরের কোণে সন্ধ্যাদীপ স্থাপন করে। মন্দিরে আরতির ঘন্টা বাজিয়া উঠে।

গ্রামের, ঘরের অতি ক্ষুদ্রতম, তুচ্ছতম ব্যাপার আজ মৃত্যুঞ্জয়ের কল্পনাদৃষ্টির কাছে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের সেই যে ভোলা কুকুরটা ল্যাজে মাথায় এক হইয়া উঠানের প্রান্তে সন্ধ্যার পর ঘুমাইতে থাকিত সে কল্পনাও তাহাকে যেন ব্যথিত করিতে লাগিল। ধারাগোল গ্রামে কয়দিন সে যে মুদির দোকানে আশ্রয় লইয়াছিল, সেই মুদি এতক্ষণ রাত্রে প্রদীপ

নিবাইয়া দোকানে ঝাঁপ বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে গ্রামে বাড়িমুখে আহার করিতে চলিয়াছে, এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল মুদি কি সুখেই আছে! আজ কি বার কে জানে! যদি রবিবার হয় তবে এতক্ষণে হাটের লোক যে-যার আপন আপন বাড়ি ফিরিতেছে, সঙ্গচ্যুত সাথীকে ঊর্ধ্বস্বরে ডাক পাড়িতেছে, দল বাঁধিয়া খেয়া নৌকায় পার হইতেছে; মেঠো রাস্তা ধরিয়া, শস্যক্ষেত্রের আল বাহিয়া, পল্লির শুষ্ক বংশপত্রখচিত অঙ্গন-পার্শ্ব দিয়া চাষিলোক হাতে দুটো একটা মাছ ঝুলাইয়া মাথায় একটা চুপ্‌ড়ি লইয়া অন্ধকারে আকাশভরা তারার ক্ষীণালোকে গ্রামে গ্রামান্তরে চলিয়াছে।

ধরণীর উপরিতলে এই বিচিত্র বৃহৎ চিরচঞ্চল জীবনযাত্রার মধ্যে তুচ্ছতম দীনতম হইয়া নিজের জীবন মিশাইবার জন্য শত স্তর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া তাহার কাছে লোকালয়ের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সেই জীবন, সেই আকাশ, সেই আলোক, পৃথিবীর সমস্ত মণিমাণিক্যের চেয়ে তাহার কাছে দুর্মূল্য বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল কেবল ক্ষণকালের জন্য একবার যদি আমার সেই শ্যামা জননী ধরিত্রীর ধূলিক্রোড়ে, সেই উন্মুক্ত আলোকিত নীলাম্বরের তলে, সেই তৃণপত্রের গন্ধবাসিত বাতাস বুক ভরিয়া একটি মাত্র শেষ নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া মরিতে পারি তাহা হইলেও জীবন সার্থক হয়।

এমন সময় দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—"মৃত্যুঞ্জয়, কী চাও!"

সে বলিয়া উঠিল, "আমি আর কিছুই চাই না—আমি এই সুড়ঙ্গ হইতে, অন্ধকার হইতে, গোলকধাঁধা হইতে, এই সোনার গারদ হইতে বাহির হইতে চাই! আমি আলোক চাই, আকাশ চাই, মুক্তি চাই!"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"এই সোনার ভাণ্ডারের চেয়ে মূল্যবান রত্নভাণ্ডার এখানে আছে। একবার যাইবে না?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—"না, যাইব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"একবার দেখিয়া আসিবার কৌতূহলও নাই?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—"না, আমি দেখিতেও চাই না। আমাকে যদি কৌপীন পরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয় তবু আমি এখানে এক মুহূর্তও কাটাইতে ইচ্ছা করি না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"আচ্ছা তবে এস।"

মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে সেই গভীর কূপের সম্মুখে লইয়া গেলেন। তাহার হাতে সেই লিখনপত্র দিয়া কহিলেন—"এখানি লইয়া তুমি কী করিবে?"

মৃত্যুঞ্জয় সে পত্রখানি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

মাস্টার মশায়

১

অধর মজুমদারের বাপ সামান্য শিপ-সরকারি হইতে আরম্ভ করিয়া একটা বড় হৌসের মুচ্ছুদ্দিগিরি পর্যন্ত উঠিয়াছিলেন। অধর বাবু বাপের উপার্জিত নগদ টাকা সুদে খাটাইতেছেন, তাঁহাকে আর খাটিতে হয় না। বাপ মাথায় সাদা ফেটা বাঁধিয়া পাল্কিতে করিয়া আপিসে যাইতেন, এদিকে তাঁহার ক্রিয়াকর্ম দান-ধ্যান যথেষ্ট ছিল। বিপদে আপদে অভাবে অনটনে সকল শ্রেণির লোকেই যে তাঁহাকে আসিয়া ধরিয়া পড়িত ইহাই তিনি গর্বের বিষয় মনে করিতেন।

অধরবাবু বড় বাড়ি ও গাড়ি জুড়ি করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে আর তাঁহার সম্পর্ক নাই; কেবল টাকা ধারের দালাল আসিয়া তাঁহার বাঁধানো হুঁকায় তামাক টানিয়া যায় এবং অ্যাটর্নি আপিসের বাবুদের সঙ্গে স্ট্যাম্প দেওয়া দলিলের শর্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। তাঁহার সংসারে খরচপত্র সম্বন্ধে হিসাবের এমনি কষাকষি যে পাড়ার ফুটবল ক্লাবের নাছোড়বান্দা ছেলেরাও বহু চেষ্টায় তাঁহার তহবিলে দন্তস্ফুট করিতে পারে নাই।

এমন সময় তাঁহার ঘরকন্নার মধ্যে একটি অতিথির আগমন হইল। ছেলে হ'ল না, ছেলে হ'ল না করিতে করিতে অনেকদিন পরে তাঁহার একটি ছেলে জন্মিল। ছেলেটির চেহারা তাহার মাতার ধরনের। বড় বড় চোখ, টিকলো নাক, রং রজনীগন্ধার পাপ্‌ড়ির মতো,— যে দেখিল সেই বলিল, "আহা ছেলে ত নয় যেন কার্তিক।" অধর বাবুর অনুগত অনুচর রতিকান্ত বলিল, "বড় ঘরের ছেলের যেমনটি হওয়া উচিত তেমনিই হইয়াছে।"

ছেলেটির নাম হইল বেণুগোপাল। ইতিপূর্বে অধরবাবুর স্ত্রী ননীবালা সংসারখরচ লইয়া স্বামীর বিরুদ্ধে নিজের মত তেমন জোর করিয়া কোনো দিন খাটান নাই। দুটো একটা শখের ব্যাপার অথবা লৌকিকতার অত্যাবশ্যক আয়োজন লইয়া মাঝে মাঝে বচসা হইয়াছে বটে কিন্তু শেষকালে স্বামীর কৃপণতার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া নিঃশব্দে হার মানিয়াছেন।

এবার ননীবালাকে অধরলাল আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না; —বেণুগোপাল সম্বন্ধে তাঁহার হিসাব এক এক পা করিয়া হঠিতে লাগিল। তাহার পায়ের মল, হাতের বালা, গলার হার, মাথার টুপি, তাহার দিশি বিলাতি নানা রকমের নানা রঙের সাজ সজ্জা সম্বন্ধে ননীবালা যাহা কিছু দাবি উত্থাপিত করিলেন সব ক'টাই তিনি কখনো নীরব অশ্রুপাতে কখনো সরব বাক্যবর্ষণে জিতিয়া লইলেন। বেণুগোপালের জন্য যাহা দরকার এবং যাহা দরকার নয় তাহা চাইই চাই—সেখানে শূন্য তহবিলের ওজর বা ভবিষ্যতের ফাঁকা আশ্বাস একদিনও খাটিল না।

২

বেণুগোপাল বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বেণুর জন্য খরচ করাটা অধরলালের অভ্যাস হইয়া আসিল। তাহার জন্য বেশি মাহিনা দিয়া অনেক পাস করা এক বুড়ো মাষ্টার রাখিলেন। এই মাষ্টার বেণুকে মিষ্টভাষায় ও শিষ্টাচারে বশ করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন—কিন্তু তিনি নাকি বরাবর ছাত্রদিগকে কড়া শাসনে চালাইয়া আজ পর্যন্ত মাস্টারমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিয়াছেন সেইজন্য তাঁহার ভাষার মিষ্টতা ও আচারের শিষ্টতায় কেবলি বেসুর লাগিল—সেই শুষ্ক সাধনায় ছেলে ভুলিল না। ননীবালা অধরলালকে কহিলেন—"ও তোমার কেমন মাস্টার! ওকে দেখিলেই যে ছেলে অস্থির হইয়া উঠে। ওকে ছাড়াইয়া দাও।"

বুড়ো মাস্টার বিদায় হইল। সেকালে মেয়ে যেমন স্বয়ম্বরা হইত তেমনি ননীবালার ছেলে স্বয়ং মাস্টার বরণ করিতে বসিল—সে যাহাকে না বলিয়া লইবে তাহার সকল পাস ও সকল সার্টিফিকেট বৃথা।

এমনি সময়টিতে গায়ে একখানি ময়লা চাদর ও পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতা পরিয়া মাস্টারির উমেদারিতে হরলাল আসিয়া জুটিল। তাহার বিধবা মা পরের বাড়িতে রাঁধিয়া ও ধান ভানিয়া তাহাকে মফস্বলের এণ্ট্রেন্স স্কুলে কোনো মতে এণ্ট্রেন্স পাস করাইয়াছে। এখন হরলাল কলিকাতায় কলেজে পড়িবে বলিয়া প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছে। অনাহারে তাহার মুখের নিম্ন অংশ শুকাইয়া ভারতবর্ষের কন্যাকুমারীর মতো সরু হইয়া আসিয়াছে, কেবল মস্ত কপালটা হিমালয়ের মতো প্রশস্ত হইয়া অত্যন্ত চোখে পড়িতেছে। মরুভূমির বালু হইতে সূর্যের আলো যেমন ঠিকরিয়া পড়ে তেমনি তাহার দুই চক্ষু হইতে দৈন্যের একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি বাহির হইতেছে।

দরোয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কী চাও? কাহাকে চাও?—" হরলাল ভয়ে ভয়ে বলিল—"বাড়ির বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চাই।—" দরোয়ান কহিল—"দেখা হইবে না।" তাহার উত্তরে হরলাল কী বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ইতস্তত করিতেছিল এমন সময় সাত বছরের ছেলে বেণুগোপাল বাগানে খেলা সারিয়া দেউড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দরোয়ান হরলালকে দ্বিধা করিতে দেখিয়া আবার কহিল—"বাবু চলা যাও।"

বেণুর হঠাৎ জিদ্ চড়িল— সে কহিল, "নেহি জায়গা!" বলিয়া সে হরলালের হাত ধরিয়া তাহাকে দোতলার বারান্দায় তাহার বাপের কাছে লইয়া হাজির করিল।

বাবু তখন দিবানিদ্রা সারিয়া জড়ালসভাবে বারান্দায় বেতের কেদারায় চুপচাপ বসিয়া পা দোলাইতেছিলেন ও বৃদ্ধ রতিকান্ত একটা কাঠের চৌকিতে আসন লইয়া বসিয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতেছিল। সেদিন এই সময়ে এই অবস্থায় দৈবক্রমে হরলালের মাস্টারি বাহাল হইয়া গেল।

রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল—"আপনারা পড়া কী পর্যন্ত?"

হরলাল একটুখানি মুখ নীচু করিয়া কহিল—"এণ্ট্রেন্স পাস করিয়াছি।"

রতিকান্ত ভ্রূ তুলিয়া কহিল—"শুধু এণ্ট্রেন্স পাস? আমি বলি কলেজে পড়িয়াছেন।

আপনার বয়সও ত নেহাৎ কম দেখি না।"

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। আশ্রিত ও আশ্রয়প্রত্যাশীদিগকে সকল রকমে পীড়ন করাই রতিকান্তের প্রধান আনন্দ ছিল।

রতিকান্ত আদর করিয়া বেণুকে কোলের কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কহিল—"কত এম-এ বি-এ আসিল ও গেল—কাহাকেও পছন্দ হইল না—আর শেষকালে কি সোনাবাবু এণ্ট্রেন্স-পাস-করা মাস্টারের কাছে পড়িবেন?"

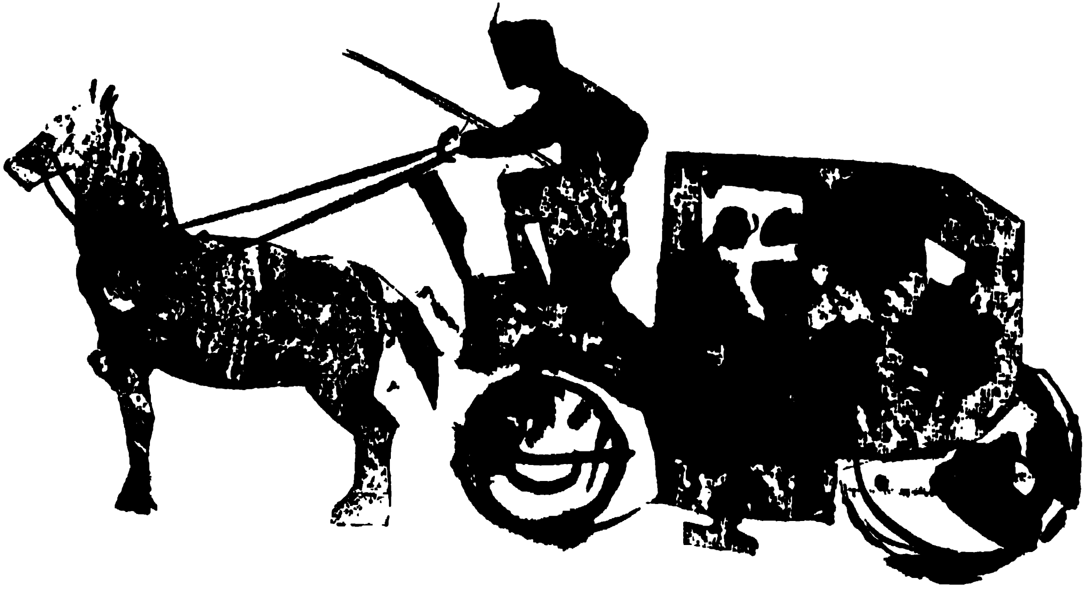
বেণু রতিকান্তের আদরের আকর্ষণ জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া কহিল—"যাও!" রতিকান্তকে বেণু কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না, কিন্তু রতিও বেণুর এই অসহিষ্ণুতাকে তাহার বাল্যমাধুর্যের একটা লক্ষণ বলিয়া ইহাতে খুব আমোদ পাইবার চেষ্টা করিত, এবং তাহাকে সোনাবাবু চাঁদবাবু বলিয়া ক্ষ্যাপাইয়া আগুন করিয়া তুলিত।

হরলালের উমেদারি সফল হওয়া শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল;—সে মনে মনে ভাবিতেছিল এইবার কোনো সুযোগে চৌকি হইতে উঠিয়া বাহির হইতে পারিলে বাঁচা যায়। এমন সময়ে অধরলালের সহসা মনে হইল, এই ছোকরাটিকে নিতান্ত সামান্য মাহিনা দিলেই পাওয়া যাইবে। শেষকালে স্থির হইল হরলাল বাড়িতে থাকিবে, খাইবে ও পাঁচ টাকা করিয়া বেতন পাইবে। বাড়িতে রাখিয়া যেটুকু অতিরিক্ত দাক্ষিণ্য প্রকাশ করা হইবে তাহার বদলে অতিরিক্ত কাজ আদায় করিয়া লইলেই এটুকু সার্থক হইতে পারিবে।

৩

এবারে মাস্টার টিকিয়া গেল। প্রথম হইতেই হরলালের সঙ্গে বেণুর এমনি জমিয়া গেল যেন তাহারা দুই ভাই। কলিকাতায় হরলালের আত্মীয় বন্ধু কেহই ছিল না—এই সুন্দর ছোট ছেলেটি তাহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিল। অভাগা হরলালের এমন করিয়া কোনো মানুষকে ভালবাসিবার সুযোগ ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নাই। কী করিলে তাহার অবস্থা ভালো হইবে এই আশায় সে বহুকষ্টে বই জোগাড় করিয়া কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় দিনরাত শুধু পড়া করিয়াছে। মাকে পরাধীন থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া ছেলের শিশু বয়স কেবল সঙ্কোচেই কাটিয়াছে—নিষেধের গণ্ডী পার হইয়া দুষ্টামির দ্বারা নিজের বাল্যপ্রতাপকে জয়শালী করিবার সুখ সে কোনোদিন পায় নাই। সে কাহারো দলে ছিল না, সে আপনার ছেঁড়া বই ও ভাঙা শ্লেটের মাঝখানে একলাই ছিল। জগতে জন্মিয়া যে ছেলেকে শিশুকালেই নিস্তব্ধ ভালোমানুষ হইতে হয়, তখন হইতেই মাতার দুঃখ ও নিজের অবস্থা যাহাকে সাবধানে বুঝিয়া চলিতে হয়, সম্পূর্ণ অবিবেচক হইবার স্বাধীনতা যাহার ভাগ্যে কোনোদিন জোটে না, আমোদ করিয়া চঞ্চলতা করা বা দুঃখ পাইয়া কাঁদা, এ দুটোই যাহাকে অন্য লোকের অসুবিধা ও বিরক্তির ভয়ে সমস্ত শিশুশক্তি প্রয়োগ করিয়া চাপিয়া যাইতে হয় তাহার মতো করুণার পাত্র অথচ করুণা হইতে বঞ্চিত জগতে কে আছে!

সেই পৃথিবীর সকল মানুষের নীচে চাপা পড়া হরলাল নিজেও জানিত না তাহার মনের



মধ্যে এত স্নেহের রস অবসরের অপেক্ষায় এমন করিয়া জমা হইয়া ছিল। বেণুর সঙ্গে খেলা করিয়া, তাহাকে পড়াইয়া, অসুখের সময় তাহার সেবা করিয়া হরলাল স্পষ্ট বুঝিতে পারিল নিজের অবস্থায় উন্নতি করার চেয়েও মানুষের আর একটা জিনিষ আছে—সে যখন পাইয়া বসে তখন তাহার কাছে আর কিছুই লাগে না।

বেণুও হরলালকে পাইয়া বাঁচিল। কারণ ঘরে সে একমাত্র ছেলে; —একটি অতি ছোট ও আর একটি তিন বছরের বোন আছে।—বেণু তাহাদিগকে সঙ্গদানের যোগ্যই মনে করে না। পাড়ার সমবয়সি ছেলের অভাব নাই—কিন্তু অধরলাল নিজের ঘরকে অত্যন্ত বড় ঘর বলিয়া নিজের মনে নিশ্চয়ই স্থির করিয়া রাখাতে মেলামেশা করিবার উপযুক্ত ছেলে বেণুর ভাগ্যে জুটিল না। কাজেই হরলাল তাহার একমাত্র সঙ্গী হইয়া উঠিল। অনুকূল অবস্থায় বেণুর যে সকল দৌরাত্ম্য দশজনের মধ্যে ভাগ হইয়া একরকম সহনযোগ্য হইতে পারিত তাহা সমস্তই একা হরলালকে বহিতে হইত। এই সমস্ত উপদ্রব সহ্য করিতে করিতে হরলালের স্নেহ আরও দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। রতিকান্ত বলিতে লাগিল—আমাদের সোনাবাবুকে মাস্টার মশায় মাটি করিতে বসিয়াছেন। অধরলালেরও মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল মাস্টারের সঙ্গে ছাত্রের সম্বন্ধটি ঠিক যেন যথোচিত হইতেছে না। কিন্তু হরলালকে বেণুর কাছ হইতে তফাৎ করে এমন সাধ্য এখন কাহার আছে!

৪

বেণুর বয়স এখন এগার। হরলাল এফ্ এ পাস করিয়া জলপানি পাইয়া তৃতীয় বার্ষিকে পড়িতেছে। ইতিমধ্যে কলেজে তাহার দুটি একটি বন্ধু যে জোটে নাই তাহা নহে কিন্তু ঐ

এগার বছরের ছেলেটিই তাহার সকল বন্ধুর সেরা। কলেজ হইতে ফিরিয়া বেণুকে লইয়া সে গোলদিঘি এবং কোনো দিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইত। তাহাকে গ্রীস ইতিহাসের বীরপুরুষদের কাহিনি বলিত, তাহাকে স্কট্ ও ভিক্টর হ্যুগোর গল্প একটু একটু করিয়া বাংলায় শুনাইত—উচ্চৈঃস্বরে তাহার কাছে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহা তর্জমা করিয়া ব্যাখ্যা করিত, তাহার কাছে শেক্স্‌পিয়ারের জুলিয়াস্ সিজার মানে করিয়া পড়িয়া তাহা হইতে অ্যান্টনির বক্তৃতা মুখস্থ করাইবার চেষ্টা করিত। ঐ একটুখানি বালক হরলালের হৃদয়-উদ্বোধনের পক্ষে যেন সোনার কাঠির মতো হইয়া উঠিল। একলা বসিয়া যখন পড়া মুখস্থ করিত, তখন ইংরেজি সাহিত্য সে এমন করিয়া মনের মধ্যে গ্রহণ করে নাই, এখন সে ইতিহাস বিজ্ঞান সাহিত্য যাহা কিছু পড়ে তাহার মধ্যে কিছু রস পাইলেই সেটা আগে বেণুকে দিবার জন্য আগ্রহ বোধ করে এবং বেণুর মনে সেই আনন্দ সঞ্চার করিবার চেষ্টাতেই তাহার নিজের বুঝিবার শক্তি ও আনন্দের অধিকার যেন দুইগুণ বাড়িয়া যায়।

বেণু স্কুল হইতে আসিয়া কোনো মতে তাড়াতাড়ি জলপান সারিয়াই হরলালের কাছে যাইবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হইয়া উঠিত, তাহার মা তাহাকে কোন ছুতায় কোন প্রলোভনে অন্তঃপুরে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। ননীবালার ইহা ভালো লাগে নাই। তাহার মনে হইত, হরলাল নিজের চাকরি বজায় রাখিবার জন্যই ছেলেকে এত করিয়া বশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে একদিন হরলালকে ডাকিয়া পর্দার আড়াল হইতে বলিল—"তুমি মাস্টার, ছেলেকে কেবল সকালে এক ঘন্টা বিকালে এক ঘন্টা পড়াইবে—দিন রাত্রি উহার সঙ্গে লাগিয়া থাক কেন? আজ ও যে মা বাপ কাহাকেও মানে না। ও কেমন শিক্ষা পাইতেছে! আগে যে ছেলে মা বলিতে একেবারে নাচিয়া উঠিত আজ যে তাহাকে ডাকিয়া পাওয়া যায় না! বেণু আমার বড় ঘরের ছেলে, উহার সঙ্গে তোমার অত মাখামাখি কিসের জন্য।"

সেদিন রতিকান্ত অধরবাবুর কাছে গল্প করিতেছিল যে, তাহার জানা তিন চার জন লোক, বড়মানুষের ছেলের মাস্টারি করিতে আসিয়া ছেলের মন এমন করিয়া বশ করিয়া লইয়াছে যে, ছেলে বিষয়ের অধিকারী হইলে তাহারাই সর্বেসর্বা হইয়া ছেলেকে স্বেচ্ছামতো চালাইয়াছে। হরলালের প্রতিই ইশারা করিয়া যে এ-সকল কথা বলা হইতেছিল তাহা হললালের বুঝিতে বাকি ছিল না। তবু সে চুপ করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ বেণুর মার কথা শুনিয়া তাহার বুক ভাঙিয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল বড় মানুষের ঘরে মাস্টারের পদবীটা কী। গোয়াল ঘরে ছেলেকে দুধ জোগাইবার যেমন গোরু আছে তেমনি তাহাকে বিদ্যা জোগাইবার একটা মাস্টারও রাখা হইয়াছে—ছাত্রের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন এত বড় স্পর্ধা যে, বাড়ির চাকর হইতে গৃহিণী পর্যন্ত কেহই তাহা সহ্য করিতে পারে না, এবং সকলেই সেটাকে স্বার্থসাধনের একটা চাতুরী বলিয়াই জানে।

হরলাল কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মা, বেণুকে আমি কেবল পড়াইব, তাহার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক থাকিবে না।"

সেদিন বিকালে বেণুর সঙ্গে তাহার খেলিবার সময়ে হরলাল কলেজ হইতে ফিরিলই না।

কেমন করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া সে সময় কাটাইল তাহা সে-ই জানে। সন্ধ্যা হইলে যখন সে পড়াইতে আসিল তখন বেণু মুখভার করিয়া রহিল। হরলাল তাহার অনুপস্থিতির কোনো জবাবদিহি না করিয়া পড়াইয়া গেল—সেদিন পড়া সুবিধামতো হইলই না।

হরলাল প্রতিদিন রাত্রি থাকতে উঠিয়া তাহার ঘরে বসিয়া পড়া করিত। বেণু সকালে উঠিয়াই মুখ ধুইয়া তাহার কাছে ছুটিয়া যাইত। বাগানে বাঁধানো চৌবাচ্চায় মাছ ছিল তাহাদিগকে মুড়ি খাওয়ানো ইহাদের এক কাজ ছিল। বাগানের এক কোণে কতকগুলা পাথর সাজাইয়া, ছোট ছোট রাস্তা ও ছোট ছোট ও বেড়া তৈরি করিয়া বেণু বালখিল্য ঋষির আশ্রমের উপযুক্ত একটি অতি ছোট বাগান বসাইয়াছিল। সে বাগানে মালীর কোনো অধিকার ছিল না। সকালে এই বাগানের চর্চা করা তাহাদের দ্বিতীয় কাজ। তাহার পরে রৌদ্র বেশি হইলে বাড়ি ফিরিয়া বেণু হরলালের কাছে পড়িতে বসিত। কাল সায়াহ্নে যে গল্পের অংশ শোনা হয় নাই সেইটে শুনিবার জন্য আজ বেণু যথাসাধ্য ভোরে উঠিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল সকালে ওঠায় সে আজ মাস্টার মশায়কে বুঝি জিতিয়াছে। ঘরে আসিয়া দেখিল মাস্টার মশায় নাই; দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল মাস্টার মশায় বাহির হইয়া গিয়াছেন।

সেদিনও সকালে পড়ার সময় বেণু ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর বেদনা লইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল। সকালবেলায় হরলাল কেন যে বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসাও করিল না। হরলাল বেণুর মুখের দিকে না চাহিয়া বইয়ের পাতার উপর চোখ রাখিয়া পড়াইয়া গেল। বেণু বাড়ির ভিতরে তাহার মার কাছে যখন খাইতে বসিল, তখন তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাল বিকাল হইতে তোর কী হইয়াছে বল্ দেখি। মুখ হাঁড়ি করিয়া আছিস্ কেন—ভালো করিয়া খাইতেছিস্ না—ব্যাপারখানা কী!"

বেণু কোনো উত্তর করিল না। আহারের পর মা তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক আদর করিয়া যখন তাহাকে বারবার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন তখন সে আর থাকিতে পারিল না—ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল—"মাস্টার মশায়—"

মা কহিলেন—"মাস্টার মশায় কী?"

বেণু বলিতে পারিল না মাস্টার মশায় কী করিয়াছেন। কী যে অভিযোগ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন।

ননীবালা কহিলেন—"মাস্টার মশায় বুঝি তোর মার নামে তোর কাছে লাগাইয়াছেন!"

সে-কথার কোনো অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বেণু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

৫

ইতিমধ্যে বাড়িতে অধরবাবুর কতকগুলা কাপড়-চোপড় চুরি হইয়া গেল। পুলিশকে খবর দেওয়া হইল। পুলিশ খানাতল্লাসিতে হরলালেরও বাক্স সন্ধান করিতে ছাড়িল না। রতিকান্ত

নিতান্তই নিরীহভাবে বলিল, "যে লোক লইয়াছে সে কি আর মাল বাক্সর মধ্যে রাখিয়াছে?"

মালের কোনো কিনারা হইল না। এরূপ লোকসান অধরলালের পক্ষে অসহ্য। তিনি পৃথিবীসুদ্ধ লোকের উপর চটিয়া উঠিলেন। রতিকান্ত কহিল, "বাড়িতে অনেক লোক রহিয়াছে, কাহাকেই বা দোষ দিবেন, কাহাকেই বা সন্দেহ করিবেন? যাহার যখন খুশি আসিতেছে যাইতেছে।"

অধরলাল মাস্টারকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ হরলাল, তোমাদের কাহাকেও বাড়িতে রাখা আমার পক্ষে সুবিধা হইবে না। এখন হইতে তুমি আলাদা বাসায় থাকিয়া বেণুকে ঠিক সময়মতো পড়াইয়া যাইবে এই হইলেই ভালো হয়—না হয় আমি তোমার দুইটাকা মাইনে বৃদ্ধি করিয়া দিতে রাজি আছি।'

রতিকান্ত তামাক টানিতে টানিতে বলিল—"এ ত অতি ভালো কথা—উভয়পক্ষেই ভালো।"

হরলাল মুখ নীচু করিয়া শুনিল। তখন কিছু বলিতে পারিল না। ঘরে আসিয়া অধরবাবুকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল, নানা কারণে বেণুকে পড়ানো তাহার পক্ষে সুবিধা হইবে না—অতএব আজই সে বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

সেদিন বেণু স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল মাস্টার মশায়ের ঘর শূন্য। তাঁহার সেই ভগ্নপ্রায় টিনের প্যাঁট্‌রাটিও নাই। দড়ির উপর তাঁহার চাদর ও গামছা ঝুলিত সে দড়িটা আছে কিন্তু চাদর ও গামছা নাই। টেবিলের উপর খাতাপত্র ও বই এলোমেলো ছড়ানো থাকিত তাহার বদলে সেখানে একটা বড় বোতলের মধ্যে সোনালি মাছ ঝক্‌ঝক্‌ করিতে করিতে ওঠানামা করিতেছে। বোতলের গায়ের উপর মাস্টার মশায়ের হস্তাক্ষরে বেণুর নামলেখা একটা কাগজ আঁটা। আর একটি নূতন ভালো বাঁধাই করা ইংরেজি ছবির বই; তাহার ভিতরকার পাতায় একপ্রান্তে বেণুর নাম ও তাহার নীচে আজকের তারিখ মাস ও সন দেওয়া আছে।

বেণু ছুটিয়া তাহার বাপের কাছে গিয়া কহিল, "বাবা, মাস্টার মশায় কোথায় গেছেন?" বাপ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "তিনি কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেছেন।"

বেণু বাপের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাশের ঘরে বিছানার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অধরবাবু ব্যাকুল হইয়া কী করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় হরলাল একটা মেসের ঘরে তক্তপোষের উপর উন্মনা হইয়া বসিয়া কলেজে যাইবে কিনা ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ দেখিল প্রথমে অধরবাবুদের দরোয়ান ঘরে প্রবেশ করিল এবং তাহার পিছনে বেণু ঘরে ঢুকিয়াই হরলালের গলা জড়াইয়া ধরিল। হরলালের গলার স্বর আট্‌কাইয়া গেল;—কথা কহিতে গেলেই তাহার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িবে এই ভয়ে সে কোনো কথাই কহিতে পারিল না। বেণু কহিল—"মাস্টার মশায়, আমাদের বাড়ি চল।"

বেণু তাহাদের বৃদ্ধ দরোয়ান চন্দ্রভানকে ধরিয়া পড়িয়াছিল যেমন করিয়া হৌক্ মাস্টার

মশায়ের বাড়িতে তাহাকে লইয়া যাইতে হইবে। পাড়ার যে মুটে হরলালের প্যাট্‌রা বহিয়া আনিয়াছিল তাহার কাছ হইতে সন্ধান লইয়া আজ স্কুলে যাইবার গাড়িতে চন্দ্রভান বেণুকে হরলালের মেসে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

কেন যে হরলালের পক্ষে বেণুদের বাড়ি যাওয়া একেবারেই অসম্ভব তাহা সে বলিতেও পারিল না অথচ তাহাদের বাড়িতেও যাইতে পারিল না। বেণু যে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বলিয়াছিল আমাদের বাড়ি চল—এই স্পর্শ ও এই কথাটার স্মৃতি কত দিনে কত রাত্রে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া যেন তাহার নিশ্বাস রোধ করিয়াছে—কিন্তু ক্রমে এমনও দিন আসিল যখন দুই পক্ষেই সমস্ত চুকিয়া গেল—বক্ষের শিরা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বেদনা-নিশাচর বাদুড়ের মতো আর ঝুলিয়া রহিল না।

৬

হরলাল অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়াতে আর তেমন করিয়া মনোযোগ করিতে পারিল না। সে কোনোমতেই স্থির হইয়া পড়িতে বসিতে পারিত না। সে খানিকটা পড়িবার চেষ্টা করিয়া ধাঁ করিয়া বই বন্ধ করিয়া ফেলিত এবং অকারণে দ্রুতপদে রাস্তায় ঘুরিয়া আসিত। কলেজে লেক্‌চারের নোটের মাঝে মাঝে খুব বড় বড় ফাঁক পড়িত এবং মাঝে মাঝে যে সমস্ত আঁকজোক পড়িত তাহার সঙ্গে প্রাচীন ঈজিপ্টের চিত্রলিপি ছাড়া আর কোনো বর্ণমালার সাদৃশ্য ছিল না।

হরলাল বুঝিল, এ-সমস্ত ভালো লক্ষণ নয়। পরীক্ষায় সে যদি বা পাস হয় বৃত্তি পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। বৃত্তি না পাইলে কলিকাতায় তাহার একদিনও চলিবে না। ওদিকে মাকেও দু'চার টাকা পাঠানো চাই। নানা চিন্তা করিয়া চাকরির চেষ্টায় বাহির হইল। চাকরি পাওয়া কঠিন, কিন্তু না পাওয়া তাহার পক্ষে আরও কঠিন; এই জন্য আশা ছাড়িয়াও আশা ছাড়িতে পারিল না।

হরলাল সৌভাগ্যক্রমে একটি বড় ইংরেজ সদাগরের আপিসে উমেদারী করিতে গিয়া হঠাৎ বড় সাহেবের নজরে পড়িল। সাহেবের বিশ্বাস ছিল তিনি মুখ দেখিয়া লোক চিনিতে পারেন। হরলালকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে দু'চার কথা কহিয়াই তিনি মনে মনে বলিলেন,—"এ লোকটা চলিবে।" জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাজ জানা আছে?" হরলাল কহিল,—"না।" "কোনো বড়লোকের কাছ হইতে সার্টিফিকেট্ আনিতে পার?" কোনো বড়লোককেই সে জানে না।

শুনিয়া সাহেব আরও খুশি হইয়া কহিলেন,—"আচ্ছা বেশ, পঁচিশ টাকা বেতনে কাজ আরম্ভ কর, কাজ শিখিলে উন্নতি হইবে!—" তার পরে সাহেব তাহার বেশভূষার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,—'পনেরো টাকা আগাম দিতেছি—আপিসের উপযুক্ত কাপড় তৈয়ারি করিয়া লইবে।"

কাপড় তৈরি হইলে, হরলাল আপিসেও বাহির হইতে আরম্ভ করিল। বড় সাহেব তাহাকে

ভূতের মতো খাটাইতে লাগিলেন। অন্য কেরানিরা বাড়ি গেলেও হরলালের ছুটি ছিল না। এক একদিন সাহেবের বাড়ি গিয়াও তাঁহাকে কাজ বুঝাইয়া দিয়া আসিতে হইত।

এমন করিয়া কাজ শিখিয়া লইতে হরলালের বিলম্ব হইল না। তাহার সহযোগী কেরানিরা তাহাকে ঠকাইবার অনেক চেষ্টা করিল, তাহার বিরুদ্ধে উপরওয়ালাদের কাছে লাগালাগিও করিল, কিন্তু এই নিঃশব্দ নিরীহ সামান্য হরলালের কোনো অপকার করিতে পারিল না।

যখন তাহার চল্লিশ টাকা মাহিনা হইল, তখন হরলাল দেশ হইতে মাকে আনিয়া একটি ছোটখাটো গলির মধ্যে ছোটখাটো বাড়িতে বাসা করিল। এতদিন পরে তাহার মার দুঃখ ঘুচিল। মা বলিলেন,—"বাবা, এইবার বউ ঘরে আনিব।" হরলাল মাতার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, "মা, ঐটে মাপ করিতে হইবে।"

মাতার আর একটি অনুরোধ ছিল। তিনি বলিতেন,—তুই যে দিনরাত্র তোর ছাত্র বেণুগোপালের গল্প করিস্ তাহাকে একবার নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়া। তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা করে।

হরলাল কহিল, "মা, এ বাসায় তাহাকে কোথায় বসাইব? রোস, একটা বড় বাসা করি, তাহার পর তাহাকে নিমন্ত্রণ করিব।"

৭

হরলালের বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে ছোট গলি হইতে বড় গলি ও ছোট বাড়ি হইতে বড় বাড়িতে তাহার বাসা পরিবর্তন হইল। তবু সে কি মনে করিয়া, অধরলালের বাড়ি যাইতে বা বেণুকে নিজের বাসায় ডাকিয়া আনিতে কোনোমতে মনস্থির করিতে পারিল না।

হয় ত কোনো দিনই তাহার সঙ্কোচ ঘুচিত না। এমন সময়ে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল বেণুর মা মারা গিয়াছেন। শুনিয়া মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া সে অধরলালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

এই দুই অসমবয়সী বন্ধুতে অনেক দিন পরে আবার একবার মিলন হইল। বেণুর অশৌচের সময় পার হইয়া গেল—তবু এ বাড়িতে হরলালের যাতায়াত চলিতে লাগিল। কিন্তু ঠিক তেমনটি আর কিছুই নাই। বেণু এখন বড় হইয়া উঠিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীযোগে তাহার নূতন গোঁফের রেখার সাধ্যসাধনা করিতেছে। চালচলনে বাবুয়ানা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন তাহার উপযুক্ত বন্ধুবান্ধবেরও অভাব নাই। ফোনোগ্রাফে থিয়েটারের নটীদের ইতর গান বাজাইয়া সে বন্ধুমহলকে আমোদে রাখে। পড়িবার ঘরে সেই সাবেক ভাঙা চৌকি ও দাগী টেবিল কোথায় গেল। আয়নাতে, ছবিতে, আসবাবে ঘর যেন ছাতি ফুলাইয়া রহিয়াছে। বেণু এখন কলেজে যায় কিন্তু দ্বিতীয় বার্ষিকের সীমানা পার হইবার জন্য তাহার কোনো তাগিদ দেখা যায় না। বাপ স্থির করিয়া আছেন, দুই একটা পাস করাইয়া লইয়া বিবাহের হাটে ছেলের বাজার দর বাড়াইয়া তুলিবেন। কিন্তু ছেলের মা জানিতেন ও স্পষ্ট করিয়া

বলিতেন, আমার বেণুকে সামান্য লোকের ছেলের মতো গৌরব প্রমাণ করিবার জন্য পাসের হিসাব দিতে হইবে না—লোহার সিন্ধুকে কোম্পানির কাগজ অক্ষয় হইয়া থাক্! ছেলেও মাতার এ-কথাটা বেশ করিয়া মনে মনে বুঝিয়া লইয়াছিল।

যাহা হৌক্, বেণুর পক্ষে সে যে আজ নিতান্তই অনাবশ্যক তাহা হরলাল স্পষ্টই বুঝিতে পারিল এবং কেবলই থাকিয়া থাকিয়া সেই দিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন বেণু হঠাৎ সকাল বেলায় তাহার মেসের বাসায় গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, 'মাস্টার মশায় আমাদের বাড়ি চল।' সে বেণু নাই, সে বাড়ি নাই, এখন মাস্টার মশায়কে কে-ই বা ডাকিবে!

হরলাল মনে করিয়াছিল এইবার বেণুকে তাহাদের বাসায় মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিবে। কিন্তু তাহাকে আহ্বান করিবার জোর পাইল না। একবার ভাবিল, উহাকে আসিতে বলিব, তাহার পরে ভাবিল, লাভ কি—বেণু হয় ত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে কিন্তু থাক্।

হরলালের মা ছাড়িবেন না। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, তিনি নিজের হাতে রাঁধিয়া তাহাকে খাওয়াইবেন—আহা বাছার মা মারা গেছে।

অবশেষে হরলাল একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। কহিল, "অধরবাবুর কাছ হইতে অনুমতি লইয়া আসি।" বেণু কহিল, "অনুমতি লইতে হইবে না, আপনি কি মনে করেন আমি এখনো সেই খোকাবাবু আছি?"

হরলালের বাসায় বেণু খাইতে আসিল। মা এই কার্তিকের মতো ছেলেটিকে তাঁহার দুই স্নিগ্ধচক্ষুর আশীর্বাদে অভিষিক্ত করিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। তাঁহার কেবলি মনে হইতে লাগিল আহা এই বয়সের এমন ছেলেকে ফেলিয়া ইহার মা যখন মরিল তখন তাহার প্রাণ না জানি কেমন করিতেছিল।

আহার সারিয়াই বেণু কহিল—"মাস্টার মশায়, আমাকে আজ একটু সকাল সকাল যাইতে হইবে। আমার দুই একজন বন্ধুর আসিবার কথা আছে।"

বলিয়া পকেট হইতে সোনার ঘড়ি খুলিয়া একবার সময় দেখিয়া লইল। তাহার পরে সংক্ষেপে বিদায় লইয়া জুড়ি গাড়িতে চড়িয়া বসিল। হরলাল তাহার বাসার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ি সমস্ত গলিকে কাঁপাইয়া দিয়া মুহূর্তের মধ্যেই চোখের বাহির হইয়া গেল।

মা কহিলেন, "হরলাল, উহাকে মাঝে মাঝে ডাকিয়া আনিস্। এই বয়সে উহার মা মারা গেছে মনে করিলে আমার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে।"

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। এই মাতৃহীন ছেলেটিকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সে কোনো প্রয়োজন বোধ করিল না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল,—"বাস্, এই পর্যন্ত! আর কখনো ডাকিব না! একদিন পাঁচ টাকা মাইনের মাস্টারি করিয়াছিলাম বটে—কিন্তু আমি সামান্য হরলাল মাত্র।"

একদিন সন্ধ্যার পর হরলাল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল তাহার একতালার

ঘরে অন্ধকারে কে একজন বসিয়া আছে। সেখানে যে কোনো লোক আছে তাহা লক্ষ না করিয়াই সে বোধ হয় উপরে উঠিয়া যাইত কিন্তু দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল এসেন্সের গন্ধে আকাশ পূর্ণ। ঘরে প্রবেশ করিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কে মশায়?" বেণু বলিয়া উঠিল—"মাস্টার মশায়, আমি।"

হরলাল কহিল—"এ কি ব্যাপার? কখন আসিয়াছ?"

বেণু কহিল—"অনেকক্ষণ আসিয়াছি। আপনি এত যে দেরি করিয়া আপিস হইতে ফেরেন তাহা ত আমি জানিতাম না।"

বহুকাল হইল সেই যে নিমন্ত্রণ খাইয়া গেছে তাহার পরে আর একবারও বেণু এ বাসায় আসে নাই। বলা নাই কহা নাই আজ হঠাৎ এমন করিয়া সে যে সন্ধ্যার সময় এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে ইহাতে হরলালের মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

উপরের ঘরে গিয়া বাতি জ্বালিয়া দুই জনে বসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিল—"সব ভালো ত? কিছু বিশেষ খবর আছে?"

বেণু কহিল, পড়াশুনা ক্রমে তাহার পক্ষে বড়ই একঘেয়ে হইয়া আসিয়াছে। কাহাতক সে বৎসরের পর বৎসর ঐ সেকেন্ড-ইয়ারেই আট্‌কা পড়িয়া থাকে। তাহার চেয়ে অনেক বয়সে ছোট ছেলের সঙ্গে তাহাকে এক সঙ্গে পড়িতে হয়—তাহার বড় লজ্জা করে কিন্তু বাবা কিছুতেই বোঝেন না।

হরলাল জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কী ইচ্ছা?"

বেণু কহিল, তাহার ইচ্ছা সে বিলাত যায়, ব্যারিস্টার হইয়া আসে। তাহারই সঙ্গে এক সঙ্গে পড়িত, এমন কি, তাহার চেয়ে পড়াশুনায় অনেক কাঁচা একটি ছেলে বিলাতে যাইবে স্থির হইয়া গেছে।

হরলাল কহিল,—" তোমার বাবাকে তোমার ইচ্ছা জানাইয়াছ?"

বেণু কহিল—"জানাইয়াছি। বাবা বলেন পাস না করিলে বিলাতে যাইবার প্রস্তাব তিনি কানে আনিবেন না। কিন্তু আমার মন খারাপ হইয়া গেছে—এখানে থাকিলে আমি কিছুতেই পাস করিতে পারিব না।"

হরলাল চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বেণু কহিল—"আজ এই কথা লইয়া বাবা আমাকে যাহা মুখে আসিয়াছে তাহাই বলিয়াছেন। তাই আমি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। মা থাকিলে এমন কখনোই হইতে পারিত না।"—বলিতে বলিতে সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল।

হরলাল কহিল—"চল আমিসুদ্ধ তোমার বাবার কাছে যাই, পরামর্শ করিয়া যাহা ভালো হয় স্থির করা যাইবে।"

বেণু কহিল—"না, আমি সেখানে যাইব না।"

বাপের সঙ্গে রাগারাগি করিয়া হরলালের বাড়িতে আসিয়া বেণু থাকিবে এ-কথাটা হরলালের মোটেই ভালো লাগিল না। অথচ আমার বাড়ি থাকিতে পারিবে না এ-কথা বলাও

বড় শক্ত। হরলাল ভাবিল, আর একটু বাদে মনটা একটু ঠাণ্ডা হইলেই ইহাকে ভুলাইয়া বাড়ি লইয়া যাইব। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি খাইয়া আসিয়াছ?"

বেণু কহিল—"না, আমার ক্ষুধা নাই—আমি আজ খাইব না।"

হরলাল কহিল—"সে কি হয়?" তাড়াতাড়ি মাকে গিয়া কহিল, —"মা, বেণু আসিয়াছে, তাহার জন্য কিছু খাবার চাই।"

শুনিয়া মা ভারি খুশি হইয়া খাবার তৈরি করিতে গেলেন। হরলাল আপিসের কাপড় ছাড়িয়া মুখ হাত ধুইয়া বেণুর কাছে আসিয়া বসিলেন। একটুখানি কাশিয়া একটুখানি ইতস্তত করিয়া তিনি বেণুর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কহিলেন—"বেণু, কাজটা ভালো হইতেছে না। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ি হইতে চলিয়া আসা, এটা তোমার উপযুক্ত নয়।"

শুনিয়া তখনি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বেণু কহিল, "আপনার এখানে যদি সুবিধা না হয় আমি সতীশের বাড়ি যাইব।" বলিয়া সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। হরলাল তাহার হাত ধরিয়া কহিল—"রোস, কিছু খাইয়া যাও।"

বেণু রাগ করিয়া কহিল—"না, আমি খাইতে পারিব না।" বলিয়া হাত ছাড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

এমন সময়, হরলালের জন্য যে জলখাবার প্রস্তুত ছিল তাহাই বেণুর জন্য থালায় গুছাইয়া মা তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, "কোথায় যাও বাছা!"

বেণু কহিল,—"আমার কাজ আছে আমি চলিলাম।"

মা কহিলেন,—"সে কি হয় বাছা, কিছু না খাইয়া যাইতে পারিবে না।" এই বলিয়া সেই বারান্দায় পাত পাড়িয়া তাহাকে হাত ধরিয়া খাওয়াইতে বসাইলেন।

বেণু রাগ করিয়া কিছুই খাইতেছে না—খাবার লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিতেছে মাত্র—এমন সময়ে দরজার কাছে একটা গাড়ি আসিয়া থামিল। প্রথমে একটা দরোয়ান ও তাহার পশ্চাতে স্বয়ং অধরবাবু মচ্‌মচ্‌ শব্দে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া উপস্থিত। বেণুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

মা ঘরের মধ্যে সরিয়া গেলেন। অধর ছেলের সম্মুখে আসিয়া ক্রোধে কম্পিতকণ্ঠে হরলালের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"এই বুঝি! রতিকান্ত আমাকে তখনি বলিয়াছিল কিন্তু তোমার পেটে যে এত মতলব ছিল তাহা আমি বিশ্বাস করি নাই। তুমি মনে করিয়াছ বেণুকে বশ করিয়া উহার ঘাড় ভাঙিয়া খাইবে। কিন্তু সে হইতে দিব না। ছেলে চুরি করিবে! তোমার নামে পুলিস কেস করিব—তোমাকে জেলে ঠেলিব তবে ছাড়িব।"—এই বলিয়া বেণুর দিকে চাহিয়া কহিলেন—"চল্‌। ওঠ্‌!" বেণু কোনো কথাটি না কহিয়া তাহার বাপের পিছনে পিছনে চলিয়া গেল।

সেদিন কেবল হরলালের মুখেই খাবার উঠিল না।

৯

এবারে হরলালের সদাগর আপিস কি জানি কী কারণে মফঃস্বল হইতে প্রচুর পরিমাণে চাল ডাল খরিদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সাত আট হাজার টাকা লইয়া মফঃস্বলে যাইতে হইত। পাইকেড়দিগকে হাতে হাতে দাম চুকাইয়া দিবার জন্য মফঃস্বলের একটা বিশেষ কেন্দ্রে তাহার যে আপিস আছে সেইখানে দশ ও পাঁচ টাকার নোট ও নগদ টাকা লইয়া সে যাইত, সেখানে রসিদ ও খাতা দেখিয়া গত সপ্তাহের মোটা হিসাব মিলাইয়া, বর্তমান সপ্তাহের কাজ চালাইবার জন্য টাকা রাখিয়া আসিত। সঙ্গে আপিসের দুইজন দরোয়ান যাইত। হরলালের জামিন নাই বলিয়া আপিসে একটা একটা কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু বড় সাহেব নিজের উপর সমস্ত ঝুঁকি লইয়া বলিয়াছিলেন, "হরলালের জামিনের প্রয়োজন নাই।"

মাঘমাস হইতে এইভাবে কাজ চলিতেছে—চৈত্র পর্যন্ত চলিবে এমন সম্ভাবনা আছে। এই ব্যাপার লইয়া হরলাল বিশেষ ব্যস্ত ছিল। প্রায়ই তাহাকে অনেক রাত্রে আপিস হইতে ফিরিতে হইত।

একদিন এইরূপ রাত্রে ফিরিয়া শুনিল, বেণু আসিয়াছিল, মা তাহাকে খাওয়াইয়া যত্ন করিয়া বসাইয়াছিলেন—সেদিন তাহার সঙ্গে কথাবার্তা গল্প করিয়া তাহার প্রতি তাঁহার মন আরো স্নেহে আকৃষ্ট হইয়াছে।

এমন আরো দুই একদিন হইতে লাগিল। মা বলিলেন,—"বাড়িতে মা নাই নাকি, সেই জন্য সেখানে তাহার মন টেকে না। আমি বেণুকে তোর ছোট ভাইয়ের মতো, আপন ছেলের মতোই দেখি। সেই স্নেহ পাইয়া আমাকে কেবল মা বলিয়া ডাকিবার জন্য এখানে আসে।"—এই বলিয়া আঁচলের প্রান্ত দিয়া তিনি চোখ মুছিলেন।

হরলালের একদিন বেণুর সঙ্গে দেখা হইল। সেদিন সে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল। অনেক রাত পর্যন্ত কথাবার্তা হইল। বেণু বলিল, "বাবা আজকাল এমন হইয়া উঠিয়াছেন যে আমি কিছুতেই বাড়িতে টিকিতে পারিতেছি না। বিশেষত শুনিতে পাইতেছি তিনি বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রতিবাবু সম্বন্ধ লইয়া আসিতেছেন—তাঁহার সঙ্গে কেবলি পরামর্শ চলিতেছে। পূর্বে আমি কোথাও গিয়া দেরি করিলে বাবা অস্থির হইয়া উঠিতেন, এমন যদি আমি দুই চার দিন বাড়িতে না ফিরি তাহা হইলে তিনি আরাম বোধ করেন। আমি বাড়ি থাকিলে বিবাহের আলোচনা সাবধানে করিতে হয় বলিয়া আমি না থাকিলে তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। এ বিবাহ যদি হয় তবে আমি বাড়িতে থাকিতে পারিব না। আমাকে আপনি উদ্ধারের একটা পথ দেখাইয়া দিন—আমি স্বতন্ত্র হইতে চাই।"

স্নেহে ও বেদনায় হরলালের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সঙ্কটের সময় আর সকলকে ফেলিয়া বেণু যে তাহার সেই মাস্টার মশায়ের কাছে আসিয়াছে ইহাতে কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আনন্দ হইল। কিন্তু মাস্টার মশায়ের কতটুকুই বা সাধ্য আছে।

বেণু কহিল—"যেমন করিয়া হৌক বিলাতে গিয়া বারিষ্টার হইয়া আসিলে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাই।"

হরলাল কহিল—"অধরবাবু কি যাইতে দিবেন?"

বেণু কহিল—"আমি চলিয়া গেলে তিনি বাঁচেন। কিন্তু টাকার উপরে যে রকম মায়া, বিলাতের খরচ তাঁহার কাছ হইতে সহজে আদায় হইবে না। একটু কৌশল করিতে হইবে।"

হরলাল বেণুর বিজ্ঞতা দেখিয়া আসিয়া কহিল—"কী কৌশল?"

বেণু কহিল—"আমি হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার করিব। পাওনাদার আমার নামে নালিশ করিলে বাবা তখন দায়ে পড়িয়া শোধ করিবেন। সেই টাকায় পলাইয়া বিলাত যাইব। সেখানে গেলে তিনি খরচ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না।"

হরলাল কহিল—"তোমাকে টাকা ধার দিবে কে?"

বেণু কহিল—"আপনি পারেন না?"

হরলাল আশ্চর্য হইয়া কহিল—"আমি!"—তাহার মুখে আর কোনো কথা বাহির হইল না।

বেণু কহিল—"কেন আপনার দারোয়ান ত তোড়ায় করিয়া অনেক টাকা ঘরে আনিল।"

হরলাল হাসিয়া কহিল—"সে দারোয়ানও যেমন আমার, টাকাও তেমনি।"

বলিয়া আপিসের টাকার ব্যবহারটা কি তাহা বেণুকে বুঝাইয়া দিল। এই টাকা কেবল একটি রাত্রের জন্য দরিদ্রের ঘরে আশ্রয় লয়, প্রভাত হইলে দশদিকেতে গমন।

বেণু কহিল—"আপনাদের সাহেব আমাকে ধার দিতে পারেন না? না হয় আমি সুদ বেশি করিয়া দিব।"

হরলাল কহিল—"তোমার বাপ যদি সিকিউরিটি দেন তাহা হইলে আমার অনুরোধে হয় ত দিতেও পারেন।"

বেণু কহিল—"বাবা যদি সিকিউরিটি দিবেন ত টাকা দিবেন না কেন?"

তর্কটা এইখানেই মিটিয়া গেল। হরলাল মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আমার যদি কিছু থাকিত তবে বাড়িঘর জমিজমা সমস্ত বেচিয়া কিনিয়া টাকা দিতাম। কিন্তু একটি মাত্র অসুবিধা এই যে বাড়িঘর জমিজমা কিছুই নাই।

১০

একদিন শুক্রবার রাত্রে হরলালের বাসার সম্মুখে জুড়িগাড়ি দাঁড়াইল। বেণু গাড়ি হইতে নামিবামাত্র হরলালের আপিসের দরোয়ান তাহাকে মস্ত একটা সেলাম করিয়া উপরে বাবুকে শশব্যস্ত হইয়া সংবাদ দিতে গেল। হরলাল তখন তাহার শোবার ঘরের মেজের উপর বসিয়া টাকা মিলাইয়া লইতেছিল। বেণু সেই ঘরেই প্রবেশ করিল। আজ তাহার বেশ কিছু নূতন ধরনের। শৌখিন ধুতি চাদরের বদলে নধর শরীরে পার্শিকোট ও প্যাণ্টালুন আঁটিয়া মাথায় ক্যাপ পরিয়া আসিয়াছে। তাহার দুই হাতের আঙুলে মণিমুক্তার আংটি ঝকমক্ করিতেছে। গলা হইতে লম্বিত মোটা সোনার চেনে আবদ্ধ ঘড়ি বুকের পকেটে নিবিষ্ট। কোটের

আস্তিনের ভিতর হইতে জামার হাতায় হিরার বোতাম দেখা যাইতেছে।

হরলাল টাকা গোনা বন্ধ করিয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল,—"এ কী ব্যাপার? এত রাত্রে এ বেশে যে?"

বেণু কহিল—"পরশু বাবার বিবাহ। তিনি আমার কাছে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন কিন্তু আমি খবর পাইয়াছি। বাবাকে বলিলাম, "আমি কিছুদিনের জন্য আমাদের বারাকপুরের বাগানে যাইব।' শুনিয়া তিনি খুশি হইয়া রাজি হইয়াছেন। তাই বাগানে চলিয়াছি; ইচ্ছা হইতেছে আর ফিরিব না। যদি সাহস থাকিত তবে গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিতাম।"

বলিতে বলিতে বেণু কাঁদিয়া ফেলিল। হরলালের বুকে যেন ছুরি বিঁধিতে লাগিল। একজন অপরিচিত স্ত্রীলোক আসিয়া মার ঘর, মার খাট, মার স্থান অধিকার করিয়া লইলে বেণুর স্নেহস্মৃতিজড়িত বাড়ি যে বেণুর পক্ষে কিরকম কণ্টকময় হইয়া উঠিবে তাহা হরলাল সমস্ত হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারিল। মনে মনে ভাবিল পৃথিবীতে গরিব হইয়া না জন্মিলেও দুঃখের এবং অপমানের অন্ত নাই। বেণুকে কী বলিয়া যে সে সান্ত্বনা দিবে তাহা কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া বেণুর হাতখানা নিজের হাতে লইল। লইবামাত্র একটা তর্ক তাহার মনে উদয় হইল। সে ভাবিল এমন একটা বেদনার সময় বেণু কি করিয়া এত সাজ করিতে পারিল।

হরলাল তাহার আংটির দিকে চোখ রাখিয়াছে দেখিয়া বেণু যেন তাহার মনের প্রশ্নটা আঁচিয়া লইল। সে বলিল—"এই আংটিগুলি আমার মায়ের।"

শুনিয়া হরলাল বহুকষ্টে চোখের জল সামলাইয়া লইল। কিছুক্ষণ পরে কহিল,—"বেণু, খাইয়া আসিয়াছ?"

বেণু কহিল,—"হ্যাঁ,—আপনার খাওয়া হয় নাই?"

হরলাল কহিল, 'টাকাগুলি গণিয়া আয়রণ চেস্টে না তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পারিব না।"

বেণু কহিল,—"আপনি খাইয়া আসুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আমি ঘরে রহিলাম, মা আপনার খাবার লইয়া বসিয়া আছেন।"

হরলাল একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "আমি চট্ করিয়া খাইয়া আসিতেছি।"

হরলাল তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া মাকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বেণু তাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনি বেণুর চিবুকের স্পর্শ লইয়া চুম্বন করিলেন। হরলালের কাছে সমস্ত খবর পাইয়া তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। নিজের সমস্ত স্নেহ দিয়াও বেণুর অভাব তিনি পূরণ করিতে পারিবেন না এই তাঁহার দুঃখ।

চারিদিকে ছড়ানো টাকার মধ্যে তিনজনে বসিয়া বেণুর ছেলেবেলাকার গল্প হইতে লাগিল। মাস্টার মশায়ের জীবনের সঙ্গে জড়িত তাহার কতদিনের কত ঘটনা। তাহার মাঝে মাঝে সেই অসংযত স্নেহশালিনী মার কথাও আসিয়া পড়িতে লাগিল।

এমনি করিয়া রাত অনেক হইয়া গেল। হঠাৎ এক সময় ঘড়ি খুলিয়া বেণু কহিল,—

"আর নয় দেরি করিলে গাড়ি ফেল করিব।"

হরলালের মা কহিলেন—"বাবা, আজ রাত্রে এখানেই থাক না, কাল সকালে হরলালের সঙ্গে এক সঙ্গেই বাহির হইবে।"

বেণু মিনতি করিয়া কহিল—"না মা, এ অনুরোধ করিবেন না, আজ রাত্রে যে করিয়া হৌক আমাকে যাইতেই হইবে।"

হরলালকে কহিল—"মাস্টার মশায়, এই আংটি ঘড়িগুলা বাগানে লইয়া যাওয়া নিরাপদ নয়। আপনার কাছেই রাখিয়া যাই, ফিরিয়া আসিয়া লইয়া যাইব। আপনার দরোয়ানকে বলিয়া দিন আমার গাড়ি হইতে চামড়ার হ্যাণ্ডব্যাগটা আনিয়া দিক্। সেইটের মধ্যে এগুলা রাখিয়া দিই।"

আফিসের দরোয়ান গাড়ি হইতে ব্যাগ লইয়া আসিল। বেণু তাহার চেন ঘড়ি আংটি বোতাম সমস্ত খুলিয়া ব্যাগের মধ্যে পূরিয়া দিল। সতর্ক হরলাল সেই ব্যাগটি লইয়া তখনি আয়রন সেফের মধ্যে রাখিল।

বেণু হরলালের মার পায়ের ধূলা লইল। তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে আশীর্বাদ করিলেন,—"মা জগদম্বা তোমার মা হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন।"

তাহার পরে বেণু হরলালের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। আর কোনোদিন সে হরলালকে এমন করিয়া প্রণাম করে নাই। হরলাল কোনো কথা না বলিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিল। গাড়ির লণ্ঠনে আলো জ্বলিল, ঘোড়া দুটা অধীর হইয়া উঠিল। কলিকাতার গ্যাসালোকখচিত নিশীথের মধ্যে বেণুকে লইয়া গাড়ি অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরলাল তাহার ঘরে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া টাকা গণিতে গণিতে ভাগ করিয়া এই একটা থলিতে ভর্তি করিতে লাগিল। নোটগুলা পূর্বেই গণা হইয়া থলিবন্দি হইয়া লোহার সিন্ধুকে উঠিয়াছিল।

১১

লোহার সিন্ধুকের চাবি মাথার বালিশের নীচে রাখিয়া সেই টাকার ঘরেই হরলাল অনেক রাত্রে শয়ন করিল। ভালো ঘুম হইল না। স্বপ্ন দেখিল—বেণুর মা পর্দার আড়াল হইতে তাহাকে উচ্চস্বরে তিরস্কার করিতেছেন; কথা কিছুই স্পষ্ট শুনা যাইতেছে না, কেবল সেই অনির্দিষ্ট কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গে বেণুর মার চুনী পান্না হীরার অলংকার হইতে লাল সবুজ শুভ্র রশ্মির সূচিগুলি কালো পর্দাটাকে ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আন্দোলিত হইতেছে। হরলাল প্রাণপণে বেণুকে ডাকিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তাহার গলা দিয়া কিছুতেই স্বর বাহির হইতেছে না। এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে কী একটা ভাঙিয়া পর্দা ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল,—চমকিয়া চোখ মেলিয়া হরলাল দেখিল একটা স্তূপাকার অন্ধকার। হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়া

উঠিয়া সশব্দে জানলায় ঠেলা দিয়া আলো নিবাইয়া দিয়াছে। হরলালের সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া উঠিয়া দেশালাই দিয়া আলো জ্বালিল। ঘড়িতে দেখিল চারটে বাজিয়াছে; আর ঘুমাইবার সময় নাই—টাকা লইয়া মফঃস্বলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

হরলাল মুখ ধুইয়া ফিরিবার সময় মা তাঁহার ঘর হইতে কহিলেন,—"কী বাবা উঠিয়াছিস্?"

হরলাল প্রভাতে প্রথমে মাতার মঙ্গল মুখ দেখিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল। মা তাহার প্রণাম লইয়া মনে মনে তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন—"বাবা, আমি এইমাত্র স্বপ্ন দেখিতেছিলাম তুই যেন বউ আনিতে চলিয়াছিস্। ভোরের স্বপ্ন কি মিথ্যা হইবে?"

হরলাল হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। টাকা ও নোটের থলেগুলো লোহার সিন্ধুক হইতে বাহির করিয়া প্যাকবাক্সয় বন্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার বুকের ভিতর ধড়াস করিয়া উঠিল—দুই তিনটা নোটের থলি শূন্য! মনে হইল স্বপ্ন দেখিতেছি। থলেগুলা লইয়া সিন্ধুকের গায়ে জোরে আছাড় দিল—তাহাতে শূন্য থলের শূন্যতা অপ্রমাণ হইল না। তবু বৃথা আশায় থলের বন্ধনগুলা খুলিয়া খুব করিয়া ঝাড়া দিল, একটি থলের ভিতর হইতে দুইখানি চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। বেণুর হাতের লেখা—একটি চিঠি তাহার বাপের নামে, আর একটি হরলালের।

তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িতে গেল। চোখে যেন দেখিতে পাইল না। মনে হইল যেন আলো যথেষ্ট নাই। কেবলি বাতি উস্কাইয়া দিতে লাগিল। যাহা পড়ে তাহা ভালো বোঝে না, বাংলা ভাষা যেন ভুলিয়া গেছে।

কথাটা এই যে, বেণু তিন হাজার টাকার পরিমাণ দশটাকাওয়ালা নোট লইয়া বিলাতে যাত্রা করিয়াছে, আজ ভোরেই জাহাজ ছাড়িবার কথা। হরলাল যে সময় খাইতে গিয়াছিল, সেই সময় বেণু এই কাণ্ড করিয়াছে। লিখিয়াছে যে,—"বাবাকে চিঠি দিলাম, তিনি আমার এই ঋণ শোধ করিয়া দিবেন! তা ছাড়া ব্যাগ খুলিয়া দেখিবেন তাহার মধ্যে মায়ের যে গহনা আছে তাহার দাম কত ঠিক জানি না, বোধ হয় তিন হাজার টাকার বেশি হইবে। মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে বাবা আমাকে বিলাতে যাইবার টাকা না দিলেও এই গহনা দিয়াই নিশ্চয় মা আমার খরচ জোগাড় করিয়া দিতেন। আমার মায়ের গহনা বাবা যে আর কাহাকেও দিবেন তাহা আমি সহ্য করিতে পারি নাই। সেইজন্য যেমন করিয়া পারি আমিই তাহা লইয়াছি। বাবা যদি টাকা দিতে দেরি করেন তবে আপনি অনায়াসে এই গহনা বেচিয়া বা বন্ধক দিয়া টাকা লইতে পারিবেন। এ আমার মায়ের জিনিস—এ আমারই জিনিস।" এ ছাড়া আরো অনেক কথা—সে কোনো কাজের কথা নহে।

হরলাল ঘরে তালা দিয়া তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি লইয়া গঙ্গার ঘাটে ছুটিল। কোন জাহাজে বেণু যাত্রা করিয়াছে তাহার নামও সে জানে না। মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত ছুটিয়া হরলাল খবর পাইল দুইখানা জাহাজ ভোরে রওনা হইয়া গেছে। দু'খানাই ইংলণ্ডে যাইবে, কোন

জাহাজে বেণু আছে তাহাও তাহার অনুমানের অতীত এবং সে জাহাজ ধরিবার যে কী উপায় তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না।

মেটিয়াবুরুজ হইতে তাহার বাসার দিকে যখন গাড়ি ফিরিল তখন সকালের রৌদ্রে কলিকাতার শহর জাগিয়া উঠিয়াছে। হরলালের চোখে কিছুই পড়িল না। তাহার সমস্ত হতবুদ্ধি অন্তঃকরণ একটা কলেবরহীন নিদারুণ প্রতিকূলতাকে যেন কেবলি প্রাণপণে ঠেলা মারিতেছিল—কিন্তু কোথাও এক তিলও তাহাকে টলাইতে পারিতেছিল না। যে বাসায় তাহার মা থাকেন, এতদিন যে বাসায় পা দিবামাত্র কর্মক্ষেত্রের সমস্ত ক্লান্তি ও সংঘাতের বেদনা মুহূর্তের মধ্যেই তাহার দূর হইয়াছে—সেই বাসার সম্মুখে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল—গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সেই বাসার মধ্যে সে অপরিমেয় নৈরাশ্য ও ভয় লইয়া প্রবেশ করিল।

মা উদ্বিগ্ন হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, —"বাবা, কোথায় গিয়াছিলে?"

হরলাল বলিয়া উঠিল—"মা, তোমার জন্য বউ আনিতে গিয়াছিলাম।" —বলিয়া শুষ্ককণ্ঠে হাসিতে হাসিতে সেইখানেই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

"ওমা, কি হলো গো" বলিয়া মা তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাহার তাহার মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে হরলাল চোখ খুলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া উঠিয়া বসিল। হরলাল কহিল—"মা, তোমরা ব্যস্ত হইয়ো না। আমাকে একটু এক্‌লা থাকিতে দাও।" বলিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মা দরজার বাহিরে মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন,—ফাল্গুনের রৌদ্র তাঁহার সর্বাঙ্গে আসিয়া পড়িল। তিনি রুদ্ধ দরজার উপর মাথা রাখিয়া থাকিয়া থাকিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন,—"হরলাল, বাবা হরলাল।"

হরলাল কহিল,—"মা, একটু পরেই আমি বাহির হইব, এখন তুমি যাও!"

মা রৌদ্রে সেইখানেই বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন।

আপিসের দরোয়ান আসিয়া দরজায় ঘা দিয়া কহিল—"বাবু, এখনি না বাহির হইলে আর গাড়ি পাওয়া যাইবে না।"

হরলাল ভিতর হইতে কহিল—"আজ সাতটার গাড়িতে যাওয়া হইবে না।"

দরোয়ান কহিল—"তবে কখন যাইবেন?"

হরলাল কহিল—"সে আমি তোমাকে পরে বলিব।"

দরোয়ান মাথা নাড়িয়া হাত উল্টাইয়া নীচে চলিয়া গেল।

হরলাল ভাবিতে লাগিল—এ কথা বলি কাহাকে? এ যে চুরি! বেণুকে কি জেলে দিব?

হঠাৎ সেই গহনার কথা মনে পড়িল। সে কথাটা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। মনে হইল যেন কিনারা পাওয়া গেল। ব্যাগ খুলিয়া দেখে তাহার মধ্যে শুধু আংটি, ঘড়ি, বোতাম, হার

নহে—ব্রেসলেট, চিক, সিঁথি, মুক্তার মালা প্রভৃতি আরো অনেক দামি গহনা আছে। তাহার দাম তিন হাজার টাকার অনেক বেশি। কিন্তু এও ত চুরি! এও ত বেণুর নয়। এ ব্যাগ যতক্ষণ তাহার ঘরে থাকে ততক্ষণ তাহার বিপদ।

তখন আর দেরি না করিয়া অধরলালের সেই চিঠি ও ব্যাগ লইয়া হরলাল ঘর হইতে বাহির হইল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় যাও বাবা।"

হরলাল কহিল—"অধরবাবুর বাড়িতে।"

মার বুক হইতে হঠাৎ অনির্দিষ্ট ভয়ের একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন ঐ যে হরলাল কাল শুনিয়াছে বেণুর বাপের বিয়ে তাই শুনিয়া অবধি বাছার মনে শান্তি নাই। আহা, বেণুকে কত ভালইবাসে!

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ তবে তোমার আর মফঃস্বলে যাওয়া হইবে না?"

হরলাল কহিল—"না।" বলিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

অধরবাবুর বাড়ি পৌঁছিবার পূর্বেই দূর হইতে শোনা গেল, রসনচৌকি আলেয়া রাগিণীতে করুণস্বরে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু হরলাল দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল, বিবাহবাড়ির উৎসবের সঙ্গে একটা যেন অশান্তির লক্ষণ মিশিয়াছে। দরোয়ানের পাহারা কড়াক্কড়, বাড়ি হইতে চাকরবাকর কেহ বাহির হইতে পারিতেছে না—সকলেরই মুখে ভয় ও চিন্তার ভাব। হরলাল খবর পাইল কাল রাত্রে বাড়িতে অনেক টাকার গহনা চুরি হইয়া গেছে। দুই তিনজন চাকরকে বিশেষভাবে সন্দেহ করিয়া পুলিশের হাতে সমর্পণ করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

হরলাল দোতলায় বারান্দায় গিয়া দেখিল—অধরবাবু আগুন হইয়া বসিয়া আছেন—ও রতিকান্ত তামাক খাইতেছে। হরলাল কহিল—"আপনার সঙ্গে গোপনে আমার একটু কথা আছে।"

অধরবাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তোমার সঙ্গে গোপনে আলাপ করিবার এখন আমার সময় নয়—যাহা কথা থাকে এইখানেই বলিয়া ফেল।"

তিনি ভাবিলেন, হরলাল বুঝি এই সময়ে তাঁহার কাছে সাহায্য বা ধার চাহিতে আসিয়াছে। রতিকান্ত কহিল—"আমার সাম্‌নে বাবুকে কিছু জানাইতে যদি লজ্জা করেন, আমি না হয় উঠি।"

অধর বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"আঃ বোস না!"

হরলাল কহিল—"কাল রাত্রে বেণু আমার বাড়িতে এই ব্যাগ রাখিয়া গেছে।"

অধর। ব্যাগে কী আছে?

হরলাল ব্যাগ খুলিয়া অধরবাবুর হাতে দিল।

অধর। মাস্টারে ছাত্রে মিলিয়া বেশ কারবার খুলিয়াছ ত? জানিতে এ চোরাই মাল বিক্রি করিলে ধরা পড়িবে—তাই আনিয়া দিয়াছ—মনে করিতেছ সাধুতার জন্য বক্‌শিস পাইবে?

তখন হরলাল অধরের পত্রখানা তাঁহার হাতে দিল। পড়িয়া তিনি আগুন হইয়া উঠিলেন।

বলিলেন,—"আমি পুলিশে খবর দিব। আমার ছেলে এখনো সাবালক হয় নাই—তুমি তাহাকে চুরি করিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছ। হয়ত পাঁচশো টাকা ধার দিয়া তিন হাজার টাকা লিখাইয়া লইয়াছ। এ ধার আমি শুধিব না!"

হরলাল কহিল—"আমি ধার দিই নাই।"

অধর কহিলেন—"তবে সে টাকা পাইল কোথা হইতে! তোমার বাক্স ভাঙিয়া চুরি করিয়াছে?"

হরলাল সে প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। রতিকান্ত টিপিয়া টিপিয়া কহিল—"ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন না, তিন হাজার টাকা কেন, পাঁচশো টাকাও উনি কি কখনো চক্ষে দেখিয়াছেন?"

যাহা হউক গহনা চুরির মীমাংসা হওয়ার পরেই বেণুর বিলাত পালানো লইয়া বাড়িতে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। হরলাল সমস্ত অপরাধের ভার মাথায় করিয়া লইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তায় যখন বাহির হইল তখন তাহার মন যেন অসাড় হইয়া গেছে। ভয় করিবার এবং ভাবনা করিবারও শক্তি তখন ছিল না। এই ব্যাপারের পরিণাম যে কী হইতে পারে মন তাহা চিন্তা করিতেও চাহিল না।

গলিতে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার বাড়ির সমুখে একটা গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ আশা হইল বেণু ফিরিয়া আসিয়াছে। নিশ্চয়ই বেণু! তাহার বিপদ যে সম্পূর্ণ নিরুপায়রূপে চূড়ান্ত হইয়া উঠিবে এ কথা সে কোনো মতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল—গাড়ির ভিতরে তাহাদের আপিসের একজন সাহেব বসিয়া আছে। সাহেব হরলালকে দেখিয়াই গাড়ি হইতে নামিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আজ মফঃস্বলে গেলে না কেন?"

আপিসের দরোয়ান সন্দেহ করিয়া বড় সাহেবকে গিয়া জানাইয়াছে, —তিনি ইহাকে পাঠাইয়াছেন।

হরলাল কহিল—"তিন হাজার টাকার নোট পাওয়া যাইতেছে না।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় গেল?"

হরলাল—জানি না—এমন উত্তরও দিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব কহিল—"টাকা কোথায় আছে দেখিব চল।"

হরলাল তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গেল। সাহেব সমস্ত গণিয়া চারিদিক খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিল। বাড়ির সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া মা আর থাকিতে পারিলেন না—তিনি সাহেবের সাম্‌নেই বাহির হইয়া ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওরে হরলাল, কি হইল রে?"

হরলাল কহিল—"মা, টাকা চুরি গেছে।"

মা কহিলেন—"চুরি কেমন করিয়া যাইবে? হরলাল, এমন সর্বনাশ কে করিল!

হরলাল কহিল—"মা, চুপ কর।"

সন্ধান শেষ করিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিল—"এ ঘরে রাত্রে কে ছিল?"

হরলাল কহিল—"দ্বার বন্ধ করিয়া আমি একলা শুইয়াছিলাম—আর কেহ ছিল না।"

সাহেব টাকাগুলা গাড়িতে তুলিয়া হরলালকে কহিল—"আচ্ছা বড় সাহেবের কাছে চল।"

হরলালকে সাহেবের সঙ্গে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মা তাহাদের পথ রোধ করিয়া কহিল—"সাহেব, আমার ছেলেকে কোথায় লইয়া যাইবে? আমি না খাইয়া এ ছেলে মানুষ করিয়াছি—আমার ছেলে কখনই পরের টাকায় হাত দিবে না!"

সাহেব বাংলা কথা কিছু না বুঝিয়া কহিল—"আচ্ছা, আচ্ছা!"

হরলাল কহিল,—"মা তুমি কেন ব্যস্ত হইতেছ? বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া আমি এখনি আসিতেছি!"

মা উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন—"তুই যে সকাল থেকে কিছুই খাস্ নাই।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া হরলাল গাড়িতে উঠিয়া চলিয়া গেল। মা মেঝের উপরে লুটাইয়া পড়িয়া রহিলেন।

বড় সাহেব হরলালকে কহিলেন,—"সত্য করিয়া বল ব্যাপারখানা কী?"

হরলাল কহিল—"আমি টাকা লই নাই।"

বড় সাহেব। সে কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জান কে লইয়াছে?

হরলাল কোনো উত্তর না দিয়া মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

সাহেব। তোমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইয়াছে?

হরলাল কহিল,—"আমার প্রাণ থাকিতে আমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইতে পারিত না।"

বড় সাহেব কহিলেন—"দেখ হরলাল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়া কোনো জামিন না লইয়া এই দায়িত্বের কাজ দিয়াছিলাম। আপিসের সকলেই বিরোধী ছিল। তিন হাজার টাকা কিছুই বেশি নয়। কিন্তু তুমি আমাকে বড় লজ্জাতেই ফেলিবে। আজ সমস্ত দিন তোমাকে সময় দিলাম—যেমন করিয়া পার টাকা সংগ্রহ করিয়া আন—তাহা হইলে এ লইয়া কোনো কথা তুলিব না, তুমি যেমন কাজ করিতেছ তেমনি করিবে।"

এই বলিয়া সাহেব উঠিয়া গেলেন। তখন বেলা এগারটা হইয়া গেছে। হরলাল যখন মাথা নীচু করিয়া বাহির হইয়া গেল তখন আপিসের বাবুরা অত্যন্ত খুশি হইয়া হরলালের পতন লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

হরলাল একদিন সময় পাইল। আরও একটা দীর্ঘদিন নৈরাশ্যের শেষতলের পঙ্ক আলোড়ন করিয়া তুলিবার মেয়াদ বাড়িল।

উপায় কী, উপায় কী—এই ভাবিতে ভাবিতে সেই রৌদ্রে হরলাল রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। শেষে উপায় আছে কি না সে ভাবনা বন্ধ হইয়া গেল কিন্তু বিনা কারণে পথে

ঘুরিয়া বেড়ানো থামিল না। যে কলিকাতা হাজার হাজার লোকের আশ্রয়স্থান তাহাই এক মুহূর্তে হরলালের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড ফাঁস-কলের মতো হইয়া উঠিল। ইহার কোনো দিকে বাহির হইবার কোনো পথ নাই। সমস্ত জনসমাজ এই অতি ক্ষুদ্র হরলালকে চারিদিকে আটক করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ তাহাকে জানেও না, এবং তাহার প্রতি কাহারো মনে কোনো বিদ্বেষও নাই, কিন্তু প্রত্যেক লোকেই তাহার শত্রু। অথচ রাস্তার লোক তাহার গা ঘেঁসিয়া তাহার পাশ দিয়া চলিয়াছে। আপিসের বাবুরা বাহিরে আসিয়া ঠোঙায় করিয়া জল খাইতেছেন, তাহার দিকে কেহ তাকাইতেছেন না; ময়দানের ধারে অলস পথিক মাথার নীচে হাত রাখিয়া একটা পায়ের উপর আর একটা পা তুলিয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে; স্যাক্‌রাগাড়ি ভর্তি করিয়া হিন্দুস্থানী মেয়েরা কালীঘাটে চলিয়াছে; একজন চাপরাশি একখানা চাপরাশি একখানা চিঠি লইয়া হরলালের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "বাবু, ঠিকানা পড়িয়া দাও,"—যেন তাহার সঙ্গে অন্য পথিকের কোনো প্রভেদ নাই, সে-ও ঠিকানা পড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল। ক্রমে আপিস বন্ধ হইবার সময় আসিল। বাড়িমুখো গাড়িগুলো আপিসমহলের নানা রাস্তা দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আপিসের বাবুরা ট্রাম ভর্তি করিয়া থিয়েটারের বিজ্ঞাপন পড়িতে পড়িতে বাসায় ফিরিয়া চলিল। আজ হইতে হরলালের আপিস নাই, আপিসের ছুটি নাই, বাসায় ফিরিয়া যাইবার জন্য ট্রাম ধরিবার কোনো তাড়া নাই। শহরের সমস্ত কাজকর্ম, বাড়িঘর, গাড়িজুড়ি, আনাগোনা হরলালের কাছে কখনো বা অত্যন্ত উৎকট সত্যের মতো দাঁত মেলিয়া উঠিতেছে, কখনো বা একবারে বস্তুহীন স্বপ্নের মতো ছায়া হইয়া আসিতেছে। আহার নাই, বিশ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, কেমন করিয়া যে হরলালের দিন কাটিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলিল—যেন একটা সতর্ক অন্ধকার দিকে দিকে তাহার সহস্র ক্রূর চক্ষু মেলিয়া শিকারলুব্ধ দানবের মতো চুপ করিয়া রহিল। রাত্রি কত হইল সে কথা হরলাল চিন্তাও করিল না। তাহার কপালের শিরা দব্ দব্ করিতেছে, মাথা যেন ফাটিয়া যাইতেছে; সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলিতেছে; পা আর চলে না। সমস্ত দিন পর্যায়ক্রমে বেদনার উত্তেজনা ও অবসাদের অসাড়তার মধ্যে মার কথা কেবল মনের মধ্যে যাতায়াত করিয়াছে—কলিকাতার অসংখ্য জনশ্রেণির মধ্যে কেবল ঐ একটি মাত্র নামই শুষ্ককণ্ঠ ভেদ করিয়া মুখে উঠিয়াছে—মা, মা, মা। আর কাহাকেও ডাকিবার নাই। মনে করিল রাত্রি যখন নিবিড় হইয়া আসিবে, কোনো লোকই যখন এই অতি সামান্য হরলালকে বিনা অপরাধে অপমান করিবার জন্য জাগিয়া থাকিবে না, তখন সে চুপ করিয়া তাহার মায়ের কোলের কাছে গিয়া শুইয়া পড়িবে—তাহার পরে ঘুম যেন আর না ভাঙে! পাছে তার মার সম্মুখে পুলিশের লোক বা আর কেহ তাহাকে অপমান করিতে আসে এই ভয়ে সে বাসায় যাইতে পারিতেছিল না। শরীরের ভার যখন আর বহিতে পারে না এমন সময় হরলাল একটা ভাড়াটে গাড়ি দেখিয়া তাহাকে ডাকিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় যাইবে?"

হরলাল কহিল "কোথাও না। এই ময়দানের রাস্তায় খানিকক্ষণ হাওয়া খাইয়া বেড়াইব

গাড়োয়ান সন্দেহ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই হরলাল তাহার হাতে আগাম ভাড়া একটা টাকা দিল। সে গাড়ি তখন হরলালকে লইয়া ময়দানের রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তখন শ্রান্ত হরলাল তাহার তপ্ত মাথা খোলা জানলার উপর রাখিয়া চোখ বুজিল। একটু একটু করিয়া তাহার সমস্ত বেদনা যেন দূর হইয়া আসিল। শরীর শীতল হইল। মনের মধ্যে একটি সুগভীর সুনিবিড় আনন্দপূর্ণ শান্তি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। একটা যেন পরম পরিত্রাণ তাহাকে চারিদিক হইতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। সে যে সমস্ত দিন মনে করিয়াছিল কোথাও তাহার কোনো পথ নাই, সহায় নাই, নিষ্কৃতি নাই, তাহার অপমানের শেষ নাই, দুঃখের অবধি নাই, সে কথাটা যেন এক মুহূর্তেই মিথ্যা হইয়া গেল। এখন মনে হইল, সে ত একটা ভয় মাত্র, সে ত সত্য নয়। যাহা তাহার জীবনকে লোহার মুঠিতে আঁটিয়া পিষিয়া ধরিয়াছিল, হরলাল তাহাকে আর কিছুমাত্র স্বীকার করিল না;—মুক্তি অনন্ত আকাশ পূর্ণ করিয়া আছে, শান্তির কোথাও সীমা নাই। এই অতি সামান্য হরলালকে বেদনার মধ্যে, অপমানের মধ্যে অন্যায়ের মধ্যে বন্দি করিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো রাজা মহারাজারও নাই। যে আতঙ্কে সে আপনাকে আপনি বাঁধিয়াছিল তাহা সমস্তই খুলিয়া গেল। তখন হরলাল আপনার বন্ধনমুক্ত হৃদয়ের চারিদিকে অনন্ত আকাশের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাহার সেই দরিদ্র মা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে বাড়িতে বিরাটরূপে সমস্ত অন্ধকার জুড়িয়া বসিতেছেন। তাঁহাকে কোথাও ধরিতেছে না। কলিকাতার রাস্তা-ঘাট বাড়ি-ঘর দোকান-বাজার একটু একটু করিয়া তাঁহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইতেছে—বাতাস ভরিয়া গেল, আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নক্ষত্র তাঁহার মধ্যে মিলাইয়া গেল,—হরলালের শরীর-মনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা তাঁহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল,—ঐ গেল, তপ্ত বাষ্পের বুদ্বুদ একেবারে ফাটিয়া গেল—এখন আর অন্ধকারও নাই, আলোকও নাই, রহিল কেবল একটা প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।

গির্জার ঘড়িতে একটা বাজিল। গাড়োয়ান অন্ধকার ময়দানের মধ্যে গাড়ি লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বিরক্ত হইয়া কহিল—বাবু, ঘোড়া ত আর চলিতে পারে না—কোথায় যাইতে হইবে বল।

কোনো উত্তর পাইল না। কোচ্ বাক্স হইতে নামিয়া হরলালকে নাড়া দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর নাই। তখন ভয় পাইয়া গাড়োয়ান পরীক্ষা করিয়া দেখিল হরলালের শরীর আড়ষ্ট, তাহার নিশ্বাস বহিতেছে না।

“কোথায় যাইতে হইবে” হরলালের কাছ হইতে এই প্রশ্নের আর উত্তর পাওয়া গেল না।



বিদ্যাসাগর চরিত

বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ, যে গুণে তিনি পল্লীআচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালিজীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগপ্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া— হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে— করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আমি যদি অদ্য তাঁহার সেই গুণকীর্তন করিতে বিরত হই তবে আমার কর্তব্য একেবারেই অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। কারণ, বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারংবার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙালি বড়োলোক ছিলেন তাহা ন'হে, তিনি রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে— তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাঁহার সেই পর্বতপ্রমাণ চরিত্রমাহাত্ম্যে তাঁহারই কৃতকীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখনো সাহিত্যসম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীরূপে মানবসভ্যতার ধাত্রীগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়— যদি এই ভাষা পৃথিবীর শোকদুঃখের মধ্যে এক নূতন সান্ত্বনাস্থল, সংসারের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে এক মহত্ত্বের আদর্শলোক, দৈনন্দিন মানবজীবনের অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্যের এক নিভৃত নিকুঞ্জবন রচনা করিতে পারে, তবেই তাঁহার এই কীর্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে।

বাংলাভাষার বিকাশে বিদ্যাসাগরের প্রভাব কিরূপ কার্য করিয়াছে এখানে তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা আবশ্যক।

বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্যসমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া, ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে এ কাজটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজবন্ধন যেমন মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক তেমনি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে; জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত প্রতিহত করিতে থাকে,

তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাংলাগদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন— কিন্তু যিনি এই সেনার রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।

বাংলাভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া, বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার-ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্বে বাংলা গদ্যের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃষ্টিক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া বিদ্যাসাগরের সম্মান নহে। বিশেষত বিদ্যাসাগর যাহার উপর আপন প্রতিভা প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা প্রবহমাণ, পরিবর্তনশীল। ভাষা নদীস্রোতের মতো— তাহার উপরে কাহারো নাম খুদিয়া রাখা যায় না। মনে হয়, যেন সে চিরকাল এবং সর্বত্র স্বভাবতই এইভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। বাস্তবিক সে যে কোন্ কোন্ নির্ঝরধারায় গঠিত ও পরিপুষ্ট তাহা নির্ণয় করিতে হইলে উজান-মুখে গিয়া পুরাবৃত্তের দুর্গম গিরিশিখরে আরোহণ করিতে হয়। বিশেষ গ্রন্থ অথবা চিত্র অথবা মূর্তি চিরকাল আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আপন রচনাকর্তাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু ভাষা ছোটো বড়ো অসংখ্য লোকের নিকট হইতে জীবনলাভ করিতে করিতে ব্যাপ্ত হইয়া পূর্ব ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া চলিয়া যায়, বিশেষরূপে কাহারো নাম ঘোষণা করে না।

কিন্তু সেজন্য আক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, বিদ্যাসাগরের গৌরব কেবলমাত্র তাঁহার প্রতিভার উপর নির্ভর করিতেছে না।

প্রতিভা মানুষের সমস্তটা নহে, তাহা মানুষের একাংশ মাত্র। প্রতিভা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মতো, আর মনুষ্যত্ব চরিত্রের দিবালোক, তাহা সর্বত্রব্যাপী ও স্থির। প্রতিভা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ, আর মনুষ্যত্ব জীবনের সকল মুহূর্তেই সকল কার্যেই আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে। প্রতিভা অনেক সময়ে বিদ্যুতের ন্যায় আপনার আংশিকতাবশতই লোকচক্ষে তীব্রতররূপে আঘাত করে, এবং চরিত্রমহত্ত্ব আপনার ব্যাপকতাগুণেই প্রতিভা অপেক্ষা ম্লানতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু চরিত্রের শ্রেষ্ঠতাই যে যথার্থ শ্রেষ্ঠতা, ভাবিয়া দেখিলে সে বিষয়ে কাহারো সংশয় থাকিতে পারে না।

ভাষা প্রস্তর অথবা চিত্রপটের দ্বারা সত্য এবং সৌন্দর্য প্রকাশ করা ক্ষমতার কার্য সন্দেহ নাই;

তাহাতে বিচিত্র বাধা অতিক্রম এবং অসামান্য নৈপুণ্য প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু নিজের সমগ্র জীবনের দ্বারা সেই সত্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ করা তদপেক্ষা আরো বেশি দুরূহ, তাহাতে পদে পদে কঠিনতর বাধা অতিক্রম করিতে হয় এবং তাহাতে স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তি ও নৈপুণ্য, সংযম ও বল অধিকতর আবশ্যক হয়।

এই চরিত্ররচনার প্রতিভা কোনো সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র মানিয়া চলে না। প্রকৃত কবির কবিত্ব যেমন অলংকারশাস্ত্রের অতীত, অথচ বিশ্বহৃদয়ের মধ্যে বিধিরচিত নিগূঢ়নিহিত এক অলিখিত অলংকারশাস্ত্রের কোনো নিয়মের সহিত তাহার স্বভাবত কোনো বিরোধ হয় না, তেমনি যাঁহারা যথার্থ মনুষ্য তাঁহাদের শাস্ত্র তাঁহাদের অন্তরের মধ্যে, অথচ বিশ্বব্যাপী মনুষ্যত্বের সমস্ত নিত্য বিধানগুলির সঙ্গে সে শাস্ত্র আপনি মিলিয়া যায়। অতএব, অন্যান্য প্রতিভায় যেমন 'ওরিজিন্যালিটি' অর্থাৎ অনন্যতন্ত্রতা প্রকাশ পায়, মহচ্চরিত্রবিকাশেও সেইরূপ অনন্যতন্ত্রতার প্রয়োজন হয়।— অনেকে বিদ্যাসাগরের অনন্যতন্ত্র প্রতিভা ছিল না বলিয়া আভাস দিয়া থাকেন; তাঁহারা জানেন, অনন্যতন্ত্রত্ব কেবল সাহিত্যে এবং শিল্পে, বিজ্ঞানে এবং দর্শনেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল; এত বিরল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে কেবল আর দুই-একজনের নাম মনে পড়ে এবং তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায় সর্বশ্রেষ্ঠ।

অনন্যতন্ত্রতা শব্দটা শুনিবামাত্র তাহাকে সংকীর্ণতা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; মনে হইতে পারে তাহা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, সাধারণের সহিত তাহার যোগ নাই। কিন্তু সে কথা যথার্থ নহে। বস্তুত আমরা নিয়মের শৃঙ্খলে, জটিল কৃত্রিমতার বন্ধনে এতই জড়িত ও আচ্ছন্ন হইয়া থাকি যে, আমরা সমাজের কল-চালিত পুত্তলের মতো হইয়া যাই; অধিকাংশ কাজই সংস্কারাধীন অন্ধভাবে সম্পন্ন করি; নিজত্ব কাহাকে বলে জানি না, জানিবার আবশ্যকতা রাখি না। আমাদের ভিতরকার আসল মানুষটি জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় সুপ্তভাবেই কাটাইয়া দেয়, তাহার স্থানে কাজ করে একটা নিয়ম-বাঁধা যন্ত্র। যাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিমাণ অধিক, চিরাগত প্রথা ও অভ্যাসের জড় আচ্ছাদনে তাঁহাদের সেই প্রবল শক্তিকে চাপা দিয়া রাখিতে পারে না। ইঁহারাই নিজের চরিত্রপুরীর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রাপ্ত হন। অন্তরস্থ মনুষ্যত্বের এই স্বাধীনতার নামই নিজত্ব। এই নিজত্ব ব্যক্তভাবে ব্যক্তিবিশেষের, কিন্তু নিগূঢ়ভাবে সমস্ত মানবের। মহৎ ব্যক্তিরা এই নিজত্বপ্রভাবে এক দিকে স্বতন্ত্র, একক, অন্য দিকে সমস্ত মানবজাতির সবর্ণ, সহোদর। আমাদের দেশে রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর উভয়ের জীবনেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এক দিকে যেমন তাঁহারা ভারতবর্ষীয়, তেমনি অপরদিকে য়ুরোপীয় প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের চরিত্রের বিস্তর নিকটসাদৃশ্য দেখিতে পাই। অথচ তাহা অনুকরণগত সাদৃশ্য নহে। বেশভূষায় আচারে-ব্যবহারে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাঙালি ছিলেন; স্বজাতির শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহাদের সমতুল্য কেহ ছিল না; স্বজাতিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মূলপত্তন তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন— অথচ নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় তাঁহারা বিশেষরূপে য়ুরোপীয়

মহাজনদের সহিত তুলনীয় ছিলেন। য়ুরোপীয়দের তুচ্ছ বাহ্য অনুকরণের প্রতি তাঁহারা যে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও তাঁহাদের য়ুরোপীয়সুলভ গভীর আত্মসম্মানবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় কেন, সরল সত্যপ্রিয় সাঁওতালেরাও যে অংশে মনুষ্যত্বে ভূষিত, সেই অংশে বিদ্যাসাগর তাঁহার স্বজাতীয় বাঙালির অপেক্ষা সাঁওতালের সহিত আপনার অন্তরের যথার্থ ঐক্য অনুভব করিতেন।

মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন। কী নিয়মে বড়োলোকের অভ্যুত্থান হয় তাহা সকল দেশেই রহস্যময়— আমাদের এই ক্ষুদ্রকর্মা ভীরুহৃদয়ের দেশে সে রহস্য দ্বিগুণতর দুর্ভেদ্য। বিদ্যাসাগরের চরিত্রসৃষ্টিও রহস্যাবৃত— কিন্তু ইহা দেখা যায় সে চরিত্রের ছাঁচ ছিল ভালো। ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষের মধ্যে মহত্ত্বের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল।

বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে প্রথমেই তাঁহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লোকটি অনন্যসাধারণ ছিলেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

মেদিনীপুর জেলায় বনমালীপুরে তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে বিষয়বিভাগ লইয়া সহোদরদের সহিত মনান্তর হওয়ায় তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বহুকাল পরে তর্কভূষণ দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী দুর্গাদেবী ভাশুর ও দেবরগণের অনাদরে প্রথমে শ্বশুরালয় হইতে বীরসিংহগ্রামে পিত্রালয়ে, পরে সেখানেও ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার লাঞ্ছনায় বৃদ্ধ পিতার সাহায্যে পিতৃভবনের অনতিদূরে এক কুটিরে বাস করিয়া, চরকা কাটিয়া, দুই পুত্র ও চারি কন্যা-সহ বহুকষ্টে দিনপাত করিতেছেন। তর্কভূষণ ভ্রাতাদের আচরণ শুনিয়া নিজের স্বত্ব ও তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া ভিন্ন গ্রামে দারিদ্র্য অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কিন্তু যাঁহার স্বভাবের মধ্যে মহত্ত্ব আছে, দারিদ্র্যে তাঁহাকে দরিদ্র করিতে পারে না। বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাঁহার পিতামহের যে চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন স্থানে স্থানে তাহা উদ্‌ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।—

> তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন; কোনও অংশে, কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনও প্রকারে, অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি, সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তন, তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকারপ্রত্যাশায়, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই।[১]

ইহা হইতেই শ্রোতৃগণ বুঝিতে পারিবেন একান্নবর্তী পরিবারে কেন এই অগ্নিখণ্ডটিকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহারা পাঁচ সহোদর ছিলেন, কিন্তু তিনি একাই নীহারিকাচক্র হইতে বিচ্ছিন্ন জ্যোতিষ্কের মতো আপন বেগে বাহিরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। একান্নবর্তী পরিবারের বহুভারাক্রান্ত যন্ত্রেও তাঁহার কঠিন চরিত্রস্বাতন্ত্র্য পেষণ করিয়া দিতে পারে নাই।—

তাঁহার শ্যালক, রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ, গ্রামের প্রধান বলিয়া পরিগণিত এবং সাতিশয় গর্ব্বিত ও

উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার ভগিনীপতি কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা বুঝিতে পারিলে তিনি, সেরূপ মনে করিতে পারিতেন না। রামজয় রামসুন্দরের অনুগত হইয়া না চলিলে, রামসুন্দর নানাপ্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, অনেকে তাঁহাকে এই ভয় দেখাইয়া ছিলেন। কিন্তু রামজয়, কোনও কারণে, ভয় পাইবার লোক ছিলেন না; তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিতেন, বরং বাসত্যাগ করিব, তথাপি শালার অনুগত হইয়া চলিতে পারিব না। শ্যালকের আক্রোশে, তাঁহাকে সময়ে সময়ে, প্রকৃতপ্রস্তাবে, একঘরিয়া হইয়া থাকিতে ও নানাপ্রকার অত্যাচার উপদ্রব সহ্য করিতে হইত, তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত হইতেন না।[১]

তাঁহার তেজস্বিতার উদাহরণস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জমিদার যখন তাঁহাদের বীরসিংহগ্রামের নূতন বাস্তুবাটী নিষ্করব্রহ্মোত্তর করিয়া দিবেন মানস করিয়াছিলেন, তখন রামজয় দানগ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। গ্রামের অনেকেই বসতবাটী নাখেরাজ করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু তিনি কাহারো অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। এমন লোকের পক্ষে দারিদ্র্যও মহৈশ্বর্য, ইহাতে তাঁহার স্বাভাবিক সম্পদ্ জাজ্বল্যমান করিয়া তোলে।[২]

কিন্তু তর্কভূষণ যে আপন স্বাতন্ত্র্যগর্বে সর্বসাধারণকে অবজ্ঞা করিয়া দূরে থাকিতেন তাহা নহে। বিদ্যাসাগর বলেন—

তর্কভূষণ মহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন; কি ছোট, কি বড়, সর্ব্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপটবাচী মনে করিতেন, তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহারও ভয়ে, বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি, কখনও কোনও বিষয়ে অযথা নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাঁহাদিগকেই ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য করিতেন; আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান্, ধনবান্ ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও, তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।[১]

এ দিকে তর্কভূষণমহাশয়ের বল এবং সাহসও আশ্চর্য ছিল। সর্বদাই তাঁহার হস্তে একখানি লৌহদণ্ড থাকিত। তখন দস্যুভয়ে অনেকে একত্র না হইয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিত না, কিন্তু তিনি একা এই লৌহদণ্ডহস্তে অকুতোভয়ে সর্বত্র যাতায়াত করিতেন; এমন কি, দুইচারিবার আক্রান্ত হইয়া দস্যুদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। একুশ বৎসর বয়সে একবার তিনি এক ভালুকের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন—

ভালুক নখরপ্রহারে তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহযষ্ঠি প্রহার করিতে লাগিলেন। ভালুক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তিনি, তদীয় উদরে উপর্য্যুপরি পদাঘাত করিয়া, তাহার প্রাণসংহার করিলেন।[১]

অবশেষে শোণিতস্রুত বিক্ষতদেহে চারি ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মেদিনীপুরে এক আত্মীয়ের গৃহে শয্যা আশ্রয় করেন; দুই মাস পরে সুস্থ হইয়া বাড়ি ফিরিতে পারেন।

আর একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলে তর্কভূষণের চরিত্রচিত্র সম্পূর্ণ হইবে।

১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবারে বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অদূরে কোমরগঞ্জে মধ্যাহ্নে হাট করিতে গিয়াছিলেন। রামজয় তর্কভূষণ তাঁহাকে ঘরের একটি শুভসংবাদ দিতে বাহির হইয়াছিলেন। পথের মধ্যে পুত্রের সহিত দেখা হইলে বলিলেন, "একটি এঁড়ে বাছুর হয়েছে।" শুনিয়া ঠাকুরদাস ঘরে আসিয়া গোয়ালের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন; তর্কভূষণ হাসিয়া কহিলেন, "ও দিকে নয়, এ দিকে এসো।" বলিয়া সূতিকাগৃহে লইয়া নবপ্রসূত শিশু ঈশ্বরচন্দ্রকে নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

এই কৌতুকহাস্যরশ্মিপাতে রামজয়ের বলিষ্ঠ উন্নতচরিত্র আমাদের নিকট প্রভাতের গিরিশিখরের ন্যায় রমণীয় বোধ হইতেছে। এ হাস্যময় তেজোময় নির্ভীক ঋজুস্বভাব পুরুষের মতো আদর্শ বাংলাদেশে অত্যন্ত বিরল না হইলে বাঙালির মধ্যে পৌরুষের অভাব হইত না। আমরা তাঁহার চরিত্রবর্ণনা বিস্তারিতরূপে উদ্‌ধৃত করিলাম, তাহার কারণ, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোনো সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয়সম্পদের উত্তরাধিকারবণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্রমাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠপৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাধারণ লোক ছিলেন না। যখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ-পনেরো বৎসর, এবং যখন তাঁহার মাতা দুর্গাদেবী চরকায় সুতা কাটিয়া একাকিনী তাঁহার দুই পুত্র এবং চারি কন্যার ভরণপোষণে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন ঠাকুরদাস উপার্জনের চেষ্টায় কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি তাঁহার আত্মীয় জগন্মোহন তর্কালংকারদের বাড়িতে উঠিলেন। ইংরাজি শিখিলে সওদাগর সাহেবদের হৌসে কাজ জুটিতে পারিবে জানিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় এক শিপ্‌-সরকারের বাড়ি ইংরাজি শিখিতে যাইতেন। যখন বাড়ি ফিরিতেন তখন তর্কালংকারের বাড়িতে উপরিলোকের আহারের কাণ্ড শেষ হইয়া যাইত, সুতরাং তাঁহাকে রাত্রে অনাহারে থাকিতে হইত। অবশেষে তিনি তাঁহার শিক্ষকের এক আত্মীয়ের বাড়ি আশ্রয় লইলেন। আশ্রয়দাতার দারিদ্র্যনিবন্ধন এক-একদিন তাঁহাকে সমস্ত দিন উপবাসী থাকিতে হইত। একদিন ক্ষুধার জ্বালায় তাঁহার যথাসর্বস্ব একখানি পিতলের থালা ও একটি ছোটো ঘটি কাঁসারির দোকানে বেচিতে গিয়াছিলেন। কাঁসারিরা তাহার পাঁচসিকা দর স্থির করিয়াছিল, কিন্তু কিনিতে সম্মত হইল না; বলিল— অজানিত লোকের নিকট হইতে পুরানো বাসন কিনিয়া মাঝে মাঝে বড়ো ফেসাদে পড়িতে হয়।[২]

আর একদিন ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলিবার অভিপ্রায়ে মধ্যাহ্নে ঠাকুরদাস বাসা হইতে বাহির হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন—

> বড়বাজার হইতে ঠনঠনিয়া পর্য্যন্ত গিয়া, এত ক্লান্ত ও ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় এত অভিভূত হইলেন, যে, আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চৎ পরেই, তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিলেন, এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি মুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছ কেন।

ঠাকুরদাস, তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া, পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদর ও সস্নেহ বাক্যে, ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন, এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া, কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস যেরূপ ব্যগ্র হইয়া, মুড়কিগুলি খাইলেন, তাহা এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই। তিনি বলিলেন, না, মা, আজ আমি, এখন পর্য্যন্ত, কিছুই খাই নাই।। তখন, সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর, জল খাইও না, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া নিকটবর্ত্তী গোয়ালার দোকান হইতে, সত্বর, দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন; পরে, তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যেদিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।[১]

এইরূপ কষ্টে কিছু ইংরাজি শিখিয়া ঠাকুরদাস প্রথমে মাসিক দুই টাকা ও তাহার দুই-তিন বৎসর পরে মাসিক পাঁচ টাকা বেতন উপার্জন করিতে লাগিলেন। অবশেষে জননী দুর্গাদেবী যখন শুনিলেন তাঁহার ঠাকুরদাসের মাসিক আট টাকা মহিয়ানা হইয়াছে তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না এবং ঠাকুরদাসের সেই তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়সে গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতীদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন।

বঙ্গদেশের সৌভাগ্যক্রমে এই ভগবতীদেবী এক অসামান্যা রমণী ছিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত বিদ্যাসাগর-গ্রন্থে লিথোগ্রাফ-পটে এই দেবীমূর্তি প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশ প্রতিমূর্তিই অধিকক্ষণ দেখিবার দরকার হয় না, তাহা যেন মুহূর্তকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাহা নিপুণ হইতে পারে, সুন্দর হইতে পারে, তথাপি তাহার মধ্যে চিত্তনিবেশের যথোচিত স্থান পাওয়া যায় না, চিত্রপটের উপরিতলেই দৃষ্টির প্রসর পর্যবসিত হইয়া যায়। কিন্তু ভগবতী দেবীর এই পবিত্র মুখশ্রীর গভীরতা এবং উদারতা বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও শেষ করিতে পারা যায় না। উন্নত ললাটে তাঁহার বুদ্ধির প্রসার, সুদূরদর্শী স্নেহবর্ষী আয়ত নেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক, এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুসংযত সৌন্দর্য দর্শকের হৃদয়কে বহু দূরে এবং বহু ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়— এবং ইহাও বুঝিতে পারি ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধনের জন্য কেন বিদ্যাসাগরকে এই মাতৃদেবী ব্যতীত কোনো পৌরাণিক দেবীপ্রতিমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় নাই।

ভগবতীদেবীর অকুণ্ঠিত দয়া তাঁহার গ্রাম, পল্লী, প্রতিবেশকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিত। রোগার্তের সেবা, ক্ষুধার্তকে অন্নদান এবং শোকাতুরের দুঃখে শোক প্রকাশ করা তাঁহার নিত্যনিয়মিত কার্য ছিল। অগ্নিদাহে বীরসিংহগ্রামের বাসস্থান ভস্মীভূত হইয়া গেলে বিদ্যাসাগর যখন তাঁহার জননীদেবীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন, তিনি বলিলেন, "যেসকল দরিদ্র লোকের সন্তানগণ এখানে ভোজন করিয়া বীরসিংহ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে তাহারা কী খাইয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিবে?"[১২]

দয়াবৃত্তি আরো অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু ভগবতীদেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোনোপ্রকার সংকীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না। সাধারণ লোকের দয়া

দিয়াশলাই-শলাকার মতো কেবল বিশেষরূপ সংঘর্ষেই জ্বলিয়া উঠে এবং তাহা অভ্যাস ও লোকাচারের ক্ষুদ্র বাক্সের মধ্যেই বন্ধ। কিন্তু ভগবতীদেবীর হৃদয় সূর্যের ন্যায় আপনার বুদ্ধি-উজ্জ্বল দয়ারশ্মি স্বভাবতই চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিয়া দিত, শাস্ত্র বা প্রথা-সংঘর্ষের অপেক্ষা করিত না। বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার ভ্রাতার জীবন-চরিতে লিখিয়াছেন যে, একবার বিদ্যাসাগর তাঁহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বৎসরের মধ্যে একদিন পূজা করিয়া ছয়-সাত শত টাকা বৃথা ব্যয় করা ভালো, কি গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদিগকে ঐ টাকা অবস্থানুসারে মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করা ভালো?" ইহা শুনিয়া জননীদেবী উত্তর করেন, "গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রত্যহ খেতে পাইলে পূজা করিবার আবশ্যক নাই।" এ কথাটি সহজ কথা নহে। তাঁহার নির্মল বুদ্ধি এবং উজ্জ্বল দয়া প্রাচীন সংস্কারের মোহাবরণ যে এমন অনায়াসে বর্জন করিতে পারে, ইহা আমার নিকট বড়ো বিস্ময়কর বোধ হয়। লৌকিক প্রথার বন্ধন রমণীর কাছে যেমন দৃঢ়, এমন আর কার কাছে? অথচ কী আশ্চর্য, স্বাভাবিক চিত্তশক্তির দ্বারা তিনি জড়তাময় প্রথাভিত্তি ভেদ করিয়া নিত্যজ্যোতির্ময় অনন্ত বিশ্বধর্মাকাশের মধ্যে উত্তীর্ণ হইলেন। এ কথা তাঁহার কাছে এত সহজ বোধ হইল কী করিয়া যে, মনুষ্যের সেবাই যথার্থ দেবতার পূজা। তাহার কারণ, সকল সংহিতা অপেক্ষা প্রাচীনতম সংহিতা তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল।

সিবিলিয়ান হ্যারিসন সাহেব যখন কার্যোপলক্ষে মেদিনীপুর জেলায় গমন করেন তখন ভগবতীদেবী তাঁহাকে স্বনামে পত্র পাঠাইয়া বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন; তৎসম্বন্ধে তাঁহার তৃতীয় পুত্র শম্ভুচন্দ্র নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন—

> জননীদেবী সাহেবের ভোজন-সময়ে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাহাতে সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন যে, অতি বৃদ্ধা হিন্দু স্ত্রীলোক সাহেবের ভোজনের সময় চিয়ারে উপবিষ্টা হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন।.....সাহেব হিন্দুর মত জননীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃভাবে অভিবাদন করেন। তদনন্তর নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইল। জননীদেবী প্রবীণা হিন্দু স্ত্রীলোক তথাপি তাঁহার স্বভাব অতি উদার, মন অতিশয় উন্নত এবং মনে কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই। কি ধনশালী কি দরিদ্র কি বিদ্বান্ কি মূর্খ কি উচ্চজাতীয় কি নীচজাতীয় কি পুরুষ কি স্ত্রী কি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী কি অন্যধর্ম্মাবলম্বী, সকলেরই প্রতি সমদৃষ্টি।[২]

শম্ভুচন্দ্র অন্যত্র লিখিতেছেন—

> ১২৬৬ সাল হইতে ৭২ সাল পর্যন্ত ক্রমিক বিস্তর বিধবা কামিনীর বিবাহকার্য্য সমাধা হয়। ঐ সকল বিবাহিত লোককে বিপদ হইতে রক্ষার জন্য অগ্রজ মহাশয় বিশেষরূপ যত্নবান্ ছিলেন। উহাদিগকে মধ্যে মধ্যে আপনার দেশস্থ ভবনে আনাইতেন। বিবাহিতা ঐ সকল স্ত্রীলোককে যদি কেহ ঘৃণা করে একারণ জননীদেবী ঐ সকল বিবাহিতা ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীলোকের সহিত একত্র এক পাত্রে ভোজন করিতেন।[২]

অথচ তখন বিধবাবিবাহের আন্দোলনে দেশের পুরুষেরা বিদ্যাসাগরের প্রাণসংহারের জন্য গোপনে আয়োজন করিতেছিল, এবং দেশের পণ্ডিতবর্গ শাস্ত্র মন্থন করিয়া কুযুক্তি এবং ভাষা মন্থন করিয়া কটূক্তি বিদ্যাসাগরের মস্তকের উপর বর্ষণ করিতেছিলেন; আর এই রমণীকে কোনো

শাস্ত্রের কোনো শ্লোক খুঁজিতে হয় নাই; বিধাতার স্বহস্তলিখিত শাস্ত্র তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে রাত্রিদিন উদ্‌ঘাটিত ছিল। অভিমন্যু জননীজঠরে থাকিতে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও বিধিলিখিত সেই মহাশাস্ত্র মাতৃগর্ভবাসকালেই অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছিলেন।

আশঙ্কা করিতেছি সমালোচক মহাশয়েরা মনে করিতে পারেন যে, বিদ্যাসাগরসম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার জননী সম্বন্ধে এতখানি আলোচনা কিছু পরিমাণবহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এ কথা তাঁহারা স্থির জানিবেন এখানে জননীর চরিতে এবং পুত্রের চরিতে বিশেষ প্রভেদ নাই, তাঁহারা যেন পরস্পরের পুনরাবৃত্তি। তাহা ছাড়া, মহাপুরুষের ইতিহাস বাহিরের নানা কার্যে এবং জীবনবৃত্তান্তে স্থায়ী হয়, আর মহৎনারীর ইতিহাস তাঁহার পুত্রের চরিত্রে তাঁহার স্বামীর কার্যে রচিত হইতে থাকে এবং সে লেখায় তাঁহার নামোল্লেখ থাকে না। অতএব, বিদ্যাসাগরের জীবনে তাঁহার মাতার জীবনচরিত কেমন করিয়া লিখিত হইয়াছে তাহা ভালোরূপ আলোচনা না করিলে উভয়েরই জীবনী অসম্পূর্ণ থাকে। আর আমরা যে মহাত্মার স্মৃতিপ্রতিমাপূজার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি যদি তিনি কোনোরূপ সূক্ষ্ম চিন্ময় দেহে অদ্য এই সভায় আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং যদি এই অযোগ্য ভক্ত-কর্তৃক তাঁহার চরিতকীর্তন তাঁহার শ্রুতিগোচর হয়, তবে এই রচনার যে অংশে তাঁহার জীবনী অবলম্বন করিয়া তাঁহার মাতৃদেবীর মাহাত্ম্য মহীয়ান হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার দিব্যনেত্র হইতে প্রভূততম পুণ্যাশ্রুবর্ষণ হইতে থাকিবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে গোপাল-নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপ-মায়ে যাহা বলে সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন তখন গোপালের অপেক্ষা কোনো কোনো অংশে রাখালের সঙ্গেই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক্, পিতা যাহা বলিতেন তিনি ঠিক তাহার উল্‌টা করিয়া বসিতেন। শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছেন—

> পিতা তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন। যে দিন শাদা বস্ত্র না থাকিত, সে দিন বলিতেন, আজ ভাল কাপড় পরিয়া কালেজে যাইতে হইবে, তিনি হঠাৎ বলিতেন, না, আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব। যে দিন বলিতেন, আজ স্নান করিতে হইবে, শ্রবণমাত্র দাদা বলিতেন যে, আজ স্নান করিব না; পিতা প্রহার করিয়াও স্নান করাইতে পারিতেন না। সঙ্গে করিয়া টাকশালের ঘাটে নাবাইয়া দিলেও দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা চড় চাপড় মারিয়া জোর করিয়া স্নান করাইতেন।[২]

পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সের সময় যখন গ্রামের পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন তখন প্রতিবেশী মথুর মণ্ডলের স্ত্রীকে রাগাইয়া দিবার জন্য যে প্রকার সভ্যবিগর্হিত উপদ্রব তিনি করিতেন, বর্ণপরিচয়ের সর্বজননিন্দিত রাখাল বেচারাও বোধ করি এমন কাজ কখনো করে নাই।

নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এ ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালিজাতির শীর্ণচরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাস্ করিয়া ভালো চাকরি-বাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে

স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। বহুকাল পূর্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু একটা বিষয়ে রাখালের সহিত তাহার জীবনচরিতলেখকের সাদৃশ্য ছিল না। রাখাল পড়িতে যাইবার সময় পথে খেলা করে, মিছামিছি দেরি করিয়া সকলের শেষে পাঠশালায় যায়। কিন্তু পড়াশুনায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। যে প্রবল জিদের সহিত তিনি পিতার আদেশ ও নিষেধের বিপরীত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সেই দুর্দম জিদের সহিত তিনি পড়িতে যাইতেন। সেও তাঁহার প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে নিজের জিদ রক্ষা। ক্ষুদ্র একগুঁয়ে ছেলেটি মাথায় এক মস্ত ছাতা তুলিয়া তাঁহাদের বড়োবাজারের বাসা হইতে পটলডাঙায় সংস্কৃতকালেজে যাত্রা করিতেন, লোকে মনে করিত একটা ছাতা চলিয়া যাইতেছে। এই দুর্জয় বালকের শরীরটি খর্ব, শীর্ণ, মাথাটা প্রকাণ্ড— স্কুলের ছেলেরা সেইজন্য তাঁহাকে যশুরে কৈ ও তাহার অপভ্রংশে কসুরে জৈ বলিয়া খেপাইত; তিনি তখন তোৎলা ছিলেন, রাগিয়া কথা কহিতে পারিতেন না।[২]

এই বালক রাত্রি দশটার সময় শুইতে যাইতেন। পিতাকে বলিয়া যাইতেন— রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহাকে জাগাইয়া দিতে। পিতা আর্মানিগির্জার ঘড়িতে বারোটা বাজিলেই ঈশ্বরচন্দ্রকে জাগাইতেন, বালক অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়া পড়া করিতেন। ইহাও একগুঁয়ে ছেলের নিজের শরীরের প্রতি জিদ। শরীরও তাহার প্রতিশোধ তুলিতে ছাড়িত না। মাঝে মাঝে কঠিন সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল, কিন্তু পীড়ার শাসনে তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই।

ইহার উপরে গৃহকর্মও অনেক ছিল। বাসায় তাঁহার পিতা ও মধ্যমভ্রাতা ছিলেন। দাসদাসী ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র দুইবেলা সকলের রন্ধনাদি কার্য করিতেন। সহোদর শম্ভুচন্দ্র তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ঈশ্বরচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ পুস্তক আবৃত্তি করিয়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া কাশীনাথবাবুর বাজারে বাটামাছ ও আলু-পটল-তরকারি ক্রয় করিয়া আনিতেন। বাটনা বাটিয়া উনান ধরাইয়া রন্ধন করিতেন। বাসায় তাঁহারা চারিজন খাইতেন। আহারের পর উচ্ছিষ্ঠ মুক্ত ও বাসন ধৌত করিয়া তবে পড়িতে যাইবার অবসর পাইতেন। পাক করিতে করিতে ও স্কুলে যাইবার সময় পথে চলিতে চলিতে পাঠানুশীলন করিতেন।

এই তো অবস্থা। এ দিকে ছুটির সময় যখন জল খাইতে যাইতেন তখন স্কুলের ছাত্র যাহারা উপস্থিত থাকিত, তাহাদিগকে মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন। স্কুল হইতে মাসিক যে বৃত্তি পাইতেন, ইহাতেই তাহা ব্যয় হইত। আবার, দরোয়ানের নিকট ধার করিয়া দরিদ্র ছাত্রদিগকে নূতন বস্ত্র কিনিয়া দিতেন। পূজার ছুটির পর দেশে গিয়া—

> দেশস্থ যে সকল লোকের দিনপাত হওয়া দুষ্কর দেখিতেন, তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। অন্যান্য লোকের পরিধেয় বস্ত্র না থাকিলে, গামছা পরিধান করিয়া নিজের বস্ত্রগুলি তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন।[২]

যে অবস্থায় মানুষ নিজের নিকট নিজে প্রধান দয়ার পাত্র, সে অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র অন্যকে দয়া করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে প্রথম হইতে ইহাই দেখা যায় যে তাঁহার চরিত্র সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার

বিরুদ্ধে ক্রমাগতই যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছে। তাঁহার মতো অবস্থাপন্ন ছাত্রের পক্ষে বিদ্যালাভ করা পরম দুঃসাধ্য, কিন্তু এই গ্রাম্যবালক শীর্ণ খর্ব দেহ এবং প্রকাণ্ড মাথা লইয়া আশ্চর্য অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যাসাগর-উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার মতো দরিদ্রাবস্থার লোকের পক্ষে দান করা, দয়া করা বড়ো কঠিন; কিন্তু তিনি যখন যে অবস্থাতেই পড়িয়াছেন, নিজের কোনোপ্রকার অসচ্ছলতায় তাঁহাকে পরের উপকার হইতে বিরত করিতে পারে নাই, এবং অনেক মহৈশ্বর্যশালী রাজা রায়বাহাদুর প্রচুর ক্ষমতা লইয়া যে উপাধি লাভ করিতে পারে নাই, এই দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান সেই 'দয়ার সাগর' নামে বঙ্গদেশে চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিলেন।

কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর প্রথমে ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত ও পরে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন। এই কার্যোপলক্ষে তিনি যে-সকল ইংরাজ প্রধান কর্মচারীদের সংস্রবে আসিয়াছিলেন, সকলেরই পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে প্রায় অনেকেই নিজের এবং স্বদেশের মর্যাদা নষ্ট করিয়া ইংরাজের অনুগ্রহ লাভ করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সাহেবের হস্ত হইতে শিরোপা লইবার জন্য কখনো মাথা নত করেন নাই; তিনি আমাদের দেশের ইংরাজপ্রসাদগর্বিত সাহেবানুজীবীদের মতো আত্মাবমাননার মূল্যে বিক্রীত সম্মান ক্রয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। একটা উদাহরণে তাহার প্রমাণ হইবে।— একবার তিনি কার্যোপলক্ষে হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপল্ কারসাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সভ্যতাভিমানী সাহেব তাঁহার বুট-বেষ্টিত দুই পা টেবিলের উপরে ঊর্ধ্বগামী করিয়া দিয়া, বাঙালি ভদ্রলোকের সহিত ভদ্রতারক্ষা করা বাহুল্য বোধ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ঐ কার-সাহেব কার্যবশত সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে আসিলে বিদ্যাসাগর চটিজুতা-সমেত তাঁহার সর্বজনবন্দনীয় চরণযুগল টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া এই অহংকৃত ইংরাজ অভ্যাগতের সহিত আলাপ করিলেন। বোধ করি শুনিয়া কেহ বিস্মিত হইবেন না, সাহেব নিজের এই অবিকল অনুকরণ দেখিয়া সন্তোষলাভ করেন নাই।

ইতিমধ্যে কলেজের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কর্তৃপক্ষের মতান্তর হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র কর্মত্যাগ করিলেন। সম্পাদক রসময় দত্ত এবং শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ ময়েট-সাহেব অনেক উপরোধ-অনুরোধ করিয়াও কিছুতেই তাঁহার পণভঙ্গ করিতে পারিলেন না। আত্মীয়-বান্ধবেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চলিবে কী করিয়া। তিনি বলিলেন, "আলুপটল বেচিয়া, মুদির দোকান করিয়া দিন চালাইব।" তখন বাসায় প্রায় কুড়িটি বালককে তিনি অন্নবস্ত্র দিয়া অধ্যয়ন করাইতেছিলেন— তাহাদের কাহাকেও বিদায় করিলেন না। তাঁহার পিতা পূর্বে চাকরি করিতেন— বিদ্যাসাগরের সবিশেষ অনুরোধে কার্যত্যাগ করিয়া বাড়ি বসিয়া সংসার-খরচের টাকা পাইতেছিলেন। বিদ্যাসাগর কাজ ছাড়িয়া দিয়া প্রতিমাসে ধার করিয়া পঞ্চাশ টাকা বাড়ি পাঠাইতে লাগিলেন। এই সময় ময়েট-সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর ক্যাপ্টেন ব্যাঙ্ক্-নামক একজন ইংরাজকে কয়েক মাস বাংলা ও হিন্দি শিখাইতেন। সাহেব যখন মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে বেতন দিতে গেলেন, তিনি বলিলেন, "আপনি ময়েট-সাহেবের বন্ধু এবং ময়েট-সাহেব আমার বন্ধু—আপনার কাছে আমি বেতন লইতে পারি না।"

১৮৫০ খৃস্টাব্দে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক ও ১৮৫১ খৃস্টাব্দে উক্ত কলেজের প্রিন্সিপল্‌-পদে নিযুক্ত হন। আট-বৎসর দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া শিক্ষাবিভাগের নবীন কর্তা এক তরুণ সিবিলিয়ানের সহিত মনান্তর হইতে থাকায় ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে তিনি কর্মত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর স্বভাবতই সম্পূর্ণ স্বাধীনতন্ত্রের লোক ছিলেন। অব্যাহতভাবে আপন ইচ্ছা চালনা করিতে পাইলে তবে তিনি কাজ করিতে পারিতেন। উপরিতন কর্তৃপক্ষের মতের দ্বারা কোনোরূপ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে আপন সংকল্পের প্রবাহ তিলমাত্র পরিবর্তন করিতে পারিতেন না। কর্মনীতির নিয়মে ইহা তাঁহার পক্ষে প্রশংসনীয় ছিল না। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে একাধিপত্য করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, অধীনে কাজ চালাইবার গুণগুলি তাঁহাকে দেন নাই। উপযুক্ত অধীনস্থ কর্মচারী বাংলাদেশে যথেষ্ট আছে, বিদ্যাসাগরকে দিয়া তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা বিধাতা অনাবশ্যক ও অসংগত বোধ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত তখন কলেজের কাজকর্মের মধ্যে থাকিয়াও এক প্রচণ্ড সমাজসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদিন বীরসিংহবাটীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার পিতার সহিত বীরসিংহস্কুল সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার মাতা রোদন করিতে করিতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া একটি বালিকার বৈধব্যসংঘটনের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুই এতদিন এত শাস্ত্র পড়িলি, তাহাতে বিধবার কি কোনো উপায় নাই?"[২] মাতার পুত্র উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহ অথচ ভক্তি ছিল। ইহাও তাঁহার সুমহৎ পৌরুষের একটি প্রধান লক্ষণ। সাধারণত আমরা স্ত্রীজাতির প্রতি ঈর্ষাবিশিষ্ট; অবলা স্ত্রীলোকের সুখ স্বাস্থ্য স্বচ্ছন্দতা আমাদের নিকট পরম পরিহাসের বিষয়, প্রহসনের উপকরণ। আমাদের ক্ষুদ্রতা ও কাপুরুষতার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ইহাও একটি।

বিদ্যাসাগর শৈশবে জগদ্দুর্লভবাবুর বাসায় আশ্রয় পাইয়াছিলেন। জগর্দ্দুলভের কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত জীবনবৃত্তান্তে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এ স্থলে উদ্‌ধৃত করা যাইতে পারে।—

> রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন, আমি কস্মিন্‌ কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে, আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ফলকথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্‌বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এপর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্ত্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্ত্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে, তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা

হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।

স্ত্রীজাতির স্নেহ দয়া সৌজন্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, আমাদের মধ্যে এমন হতভাগ্য কয়জন আছে। কিন্তু ক্ষুদ্রহৃদয়ের স্বভাব এই যে, সে যে পরিমাণে অযাচিত উপকার প্রাপ্ত হয় সেই পরিমাণে অকৃতজ্ঞ হইয়া উঠে। যাহা-কিছু সহজেই পায় তাহাই আপনার প্রাপ্য বলিয়া জানে; নিজের দিক হইতে যে কিছুমাত্র দেয় আছে তাহা সহজেই ভুলিয়া যায়। আমরাও সংসারে মাঝে মাঝে রাইমণিকে দেখিতে পাই; এবং তিনি যখন সেবা করিতে আসেন তখন তাঁহার সমস্ত যত্ন এবং প্রীতি অবহেলাভরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পরম অনুগ্রহ করিয়া থাকি; তিনি যখন চরণপূজা করিতে আসেন তখন আপন পঙ্ককলঙ্কিত পদযুগল অসংকোচে প্রসারিত করিয়া দিয়া অত্যন্ত নির্লজ্জ স্পর্ধাভরে সত্যসত্যই আপনাদিগকে নরদেবতারূপে নারীসম্প্রদায়ের পূজাগ্রহণের অধিকারী বলিয়া জ্ঞান করি। কিন্তু এই-সকল সেবক-পূজক অবলাগণের দুঃখমোচন এবং সুখস্বাস্থ্যবিধানে আমাদের মতো মর্তদেবগণের সুমহৎ ঔদাসীন্য কিছুতেই দূর হয় না; তাহার কারণ, নারীদের কৃত সেবা কেবল আমরা আমাদের সাংসারিক স্বার্থসুখের সহিত জড়িত করিয়া দেখি, তাহা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কৃতজ্ঞতা উদ্রেক করিবার অবকাশ পায় না।

বিদ্যাসাগর প্রথমত বেথুন-সাহেবের সহায়তা করিয়া বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা ও বিস্তার করিয়া দেন। অবশেষে যখন তিনি বালবিধবাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিধবাবিবাহ-প্রচলনের চেষ্টা করেন তখন দেশের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা গালিমিশ্রিত এক তুমুল কলকোলাহল উত্থিত হইল। সেই মুষলধারে শাস্ত্র ও গালি-বর্ষণের মধ্যে এই ব্রাহ্মণবীর বিজয়ী হইয়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করিলেন এবং তাহা রাজবিধিসম্মত করিয়া লইলেন।

বিদ্যাসাগর এই সময়ে আরো একটি ক্ষুদ্র সামাজিক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহারও সংক্ষেপে উল্লেখ আবশ্যক। তখন সংস্কৃতকলেজে কেবল ব্রাহ্মণদেরই প্রবেশ ছিল, সেখানে শূদ্রেরা সংস্কৃত পড়িতে পাইত না। বিদ্যাসাগর সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শূদ্রদিগকে সংস্কৃতকলেজে বিদ্যাশিক্ষার অধিকার দান করেন।

সংস্কৃতকলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধানকীর্তি মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিটুশ্যন। বাঙালির নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরাজিশিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি দরিদ্র ছিলেন, তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন; যিনি লোকাচাররক্ষক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন, এবং সংস্কৃতবিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না, তিনিই ইংরাজিবিদ্যাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁহার জীবনের অবশিষ্টকাল এই স্কুল ও কলেজটিকে একাগ্রচিত্তে প্রাণাধিক যত্নে পালন করিয়া, দীনদরিদ্র রোগীর সেবা করিয়া, অকৃতজ্ঞদিগকে মার্জনা করিয়া, বন্ধু বান্ধবদিগকে অপরিমেয় স্নেহে অভিষিক্ত করিয়া, আপন পুষ্পকোমল এবং বজ্রকঠিন বক্ষে দুঃসহ বেদনাশল্য বহন করিয়া, আপন আত্মনির্ভরপর উন্নত বলিষ্ঠ চরিত্রের মহান্ আদর্শ বাঙালিজাতির মনে

চিরাঙ্কিত করিয়া দিয়া, ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত। কারণ, দয়াবৃত্তি আমাদের অশ্রুপাতপ্রবণ বাঙালিহৃদয়কে যত শীঘ্র প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙালিজনসুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, তাহাতে বাঙালিদুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়া কেবল একটা প্রবৃত্তির ক্ষণিক উত্তেজনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচলকর্তৃত্ব সর্বদাই বিরাজ করিত বলিয়াই তাহা এমন মহিমশালিনী। এ দয়া অন্যের কষ্টলাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহূর্তকালের জন্য কুণ্ঠিত হইত না। সংস্কৃতকলেজে কাজ করিবার সময় ব্যাকরণঅধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে বিদ্যাসাগর তারানাথ তর্কবাচস্পতির জন্য মার্শাল-সাহেবকে অনুরোধ করেন। সাহেব বলিলেন তাঁহার চাকরি লইবার ইচ্ছা আছে কি না অগ্রে জানা আবশ্যক। শুনিয়া বিদ্যাসাগর সেইদিনই ত্রিশ ক্রোশ পথ দূরে কালনায় তর্কবাচস্পতির চতুষ্পাঠী-অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। পরদিনে তর্কবাচস্পতির সম্মতি ও তাঁহার প্রশংসাপত্রগুলি লইয়া পুনরায় পদব্রজে যথাসময়ে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন।[২] পরের উপকারকার্যে তিনি আপনার সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করিতেন। ইহার মধ্যেও তাঁহার আজন্মকালের একটা জিদ প্রকাশ পাইত। সাধারণত আমাদের দয়ার মধ্যে এই জিদ না থাকাতে তাহা সংকীর্ণ ও স্বল্পফলপ্রসূ হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা পৌরুষমহত্ত্ব লাভ করে না।

কারণ, দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের নহে; প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম। দয়ার বিধান পূর্ণরূপে পালন করিতে হইলে দৃঢ় বীর্য এবং কঠিন অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাতে অনেক সময় সুদূরব্যাপী সুদীর্ঘ কর্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়; তাহা কেবল ক্ষণকালের আত্মত্যাগের দ্বারা প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসনিবৃত্তি এবং হৃদয়ের ভারলাঘব করা নহে; তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা উপায়ে নানা বাধা অতিক্রম করিয়া দুরূহ উদ্দেশ্যসিদ্ধির অপেক্ষা রাখে।

একবার গবর্মেণ্টের কোনো অত্যুৎসাহী ভৃত্য জাহানাবাদ-মহকুমায় ইন্‌কম্‌ট্যাক্স্‌ ধার্যের জন্য উপস্থিত হন। আয়ের স্বল্পতাপ্রযুক্ত যে-সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ইন্‌কম্‌ট্যাক্সের অধীনে না আসিতে পারে, গবর্মেন্টে এই সুচতুর শিকারী তাহাদের দুই-তিন জনের নাম একত্র করিয়া ট্যাক্সের জালে বদ্ধ করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ খড়ার গ্রামে অ্যাসেসর-বাবুর নিকট আসিয়া আপত্তি প্রকাশ করেন। বাবুটি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া অভিযোগকারীদিগকে ধমক দিয়া বাধ্য করিলেন। বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় আসিয়া লেফ্‌টেনেন্ট্‌ গবর্নরের নিকট বাদী হইলেন। লেফ্‌টেনেন্ট্‌ গবর্নর বর্ধমানের কালেক্টর হ্যারিসন-সাহেবকে তদন্ত-জন্য প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগর হ্যারিসনের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ব্যবসায়ীদের খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে দুইমাসকাল অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া তিনি এই অন্যায়নিবারণে কৃতকার্য হইয়াছিলেন।[২]

বিদ্যাসাগরের জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত আরো অনেক দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বাংলায় অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করা দুষ্কর। আমাদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল বলিয়া আমরা প্রচার করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা কোনো ঝঞ্ঝাটে যাইতে চাহি না। এই অলসশান্তিপ্রিয়তা আমাদিগকে

অনেক সময়েই স্বার্থপর নিষ্ঠুরতায় অবতীর্ণ করে। একজন জাহাজী গোরা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া মজ্জমান ব্যক্তির পশ্চাতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে; কিন্তু একখানা নৌকা যেখানে বিপন্ন, অন্য নৌকাগুলি তাহার কিছুমাত্র সাহায্য-চেষ্টা না করিয়া চলিয়া যায়, এরূপ ঘটনা আমাদের দেশে সর্বদাই শুনিতে পাই। দয়ার সহিত বীর্যের সম্মিলন না হইলে সে দয়া অনেক স্থলেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে।

কেবল যে সংকট এবং অধ্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমাদের অন্তঃপুরচারিণী দয়া প্রবেশ করিতে চাহে না তাহা নহে। সামাজিক কৃত্রিম শুচিতা রক্ষার নিয়ম-লঙঘনও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। আমি জানি, কোনো-এক গ্রাম্য মেলায় এক বিদেশী ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে ঘৃণা করিয়া কেহই তাহার অন্ত্যেষ্টিসৎকারের ব্যবস্থা করে নাই, অবশেষে তাহার অনুপস্থিত আত্মীয়-পরিজনের অন্তরে চিরশোকশল্য নিহিত করিয়া ডোমের দ্বারা মৃতদেহ শ্মশানে শৃগালকুক্কুরের মুখে ফেলিয়া আসা হয়। আমরা অতি সহজে 'আহা উহু' এবং অশ্রুপাত করিতে পারি, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে পরোপকারের পথে আমরা সহস্র স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম বাধার দ্বারা পদে পদে প্রতিহত। বিদ্যাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ— পুরুষোচিত। এইজন্য তাহা সরল এবং নির্বিকার; তাহা কোথাও সূক্ষ্ম তর্ক তুলিত না, নাসিকাকুঞ্চন করিত না, বসন তুলিয়া ধরিত না; একেবারে দ্রুতপদে, ঋজুরেখায়, নিঃশঙ্কে, নিঃসংকোচে আপন কার্যে গিয়া প্রবৃত্ত হইত। রোগের বীভৎস মলিনতা তাঁহাকে কখনো রোগীর নিকট হইতে দূরে রাখে নাই। এমন-কি, (চণ্ডীচরণবাবুর গ্রন্থে লিখিত আছে) কার্মাটাড়ে এক মেথরজাতীয়া স্ত্রীলোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাহার কুটিরে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে তাহার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বর্ধমানবাসকালে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমানগণকে আত্মীয়নির্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার সহোদরের জীবনচরিতে লিখিতেছেন—

> অন্নছত্রে ভোজনকারিণী স্ত্রীলোকদের মস্তকের কেশগুলি তৈলাভাবে বিরূপ দেখাইত। অগ্রজ মহাশয় তাহা অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইয়া তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, প্রত্যেককে দুই পলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত। যাহারা তৈলবিতরণ করিত, তাহারা পাছে মুচি, হাড়ী, ডোম প্রভৃতি অপকৃষ্টজাতীয় স্ত্রীলোক স্পর্শ করে এই আশঙ্কায় তফাৎ হইতে তৈল দিত, ইহা দেখিয়া অগ্রজ মহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য জাতীয় স্ত্রীলোকের মস্তকে তৈল মাখাইয়া দিতেন।

এই ঘটনাশ্রবণে আমাদের হৃদয়ে যে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহা বিদ্যাসাগরের দয়া অনুভব করিয়া নহে। কিন্তু তাঁহার দয়ার মধ্য হইতে যে-একটি নিঃসংকোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে তাহা দেখিয়া, আমাদের এই নীচজাতির প্রতি চিরাভ্যস্ত ঘৃণাপ্রবণ মনও আপন নিগূঢ় মানবধর্মবশত ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

তাঁহার কারুণ্যের মধ্যে যে পৌরুষের লক্ষণ ছিল তাহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। আমাদের দেশে আমরা যাঁহাদিগকে ভালোমানুষ অমায়িকপ্রকৃতি বলিয়া প্রশংসা করি, সাধারণত তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা বেশি। অর্থাৎ, কর্তব্যস্থলে তাঁহারা কাহাকেও বেদনা দিতে পারেন না। বিদ্যাসাগরের দয়ায় সেই কাপুরুষতা ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন তাঁহাদের বেদান্ত-

অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির সহিত তাঁহার বিশেষ প্রীতিবন্ধন ছিল। বাচস্পতিমহাশয় বৃদ্ধবয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার প্রিয়তম ছাত্রের মত জিজ্ঞাসা করিলে ঈশ্বরচন্দ্র প্রবল আপত্তিপ্রকাশ করিলেন। গুরু বারংবার কাকুতিমিনতি করা সত্ত্বেও তিনি মত পরিবর্তন করিলেন না। তখন বাচস্পতিমহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া এক সুন্দরী বালিকাকে বিবাহপূর্বক তাহাকে আশু বৈধব্যের তটদেশে আনয়ন করিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বিদ্যাসাগর গ্রন্থে এই ব্যাপারের যে পরিণাম বর্ণন করিয়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্‌ধৃত করি।—

> বাচস্পতি মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিলেন, তোমার মাকে দেখিয়া যাও।' এই বলিয়া দাসীকে নববধূর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে বলিলেন। তখন বাচস্পতি মহাশয়ের নববিবাহিতা পত্নীকে দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। সেই জননীস্থানীয়া বালিকাকে দর্শন করিয়া ও এই বালিকার পরিণাম চিন্তা করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বাচস্পতি মহাশয় 'অকল্যাণ করিস না রে' বলিয়া তাঁহাকে লইয়া বাহিরবাটীতে আসিলেন এবং নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় উপদেশের দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্রের মনের উত্তেজনা ও হৃদয়ের আবেগ রোধ করিতে ও তাঁহাকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এইরূপ বহুবিধ প্রবোধবাক্যে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া শেষে ঈশ্বরচন্দ্রকে কিঞ্চিৎ জল খাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পাষাণতুল্য কঠিন প্রতিজ্ঞাপরায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র জলযোগ করিতে সম্পূর্ণরূপে অসম্মত হইয়া বলিলেন, 'এ ভিটায় আর কখনও জলস্পর্শ করিব না।'

বিদ্যাসাগরের হৃদয়বৃত্তির মধ্যে যে বলিষ্ঠতা দেখা যায়, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যেও তাহার পরিপূর্ণ প্রভাব প্রকাশ পায়। বাঙালির বুদ্ধি সহজেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাহার দ্বারা চুল চেরা যায়, কিন্তু বড়ো বড়ো গ্রন্থি ছেদন করা যায় না। তাহা সুনিপুণ, কিন্তু সবল নহে। আমাদের বুদ্ধি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো, অতি সূক্ষ্ম তর্কের বাহাদুরিতে ছোটে ভালো, কিন্তু কর্মের পথে গাড়ি লইয়া চলে না। বিদ্যাসাগর যদিচ ব্রাহ্মণ, এবং ন্যায়শাস্ত্রও যথোচিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি যাহাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান সেটা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। এই কাণ্ডজ্ঞানটি যদি না থাকিত, তবে যিনি একসময় ছোলা ও বাতাসা জলপান করিয়া পাঠশিক্ষা করিয়াছিলেন তিনি অকুতোভয়ে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীনজীবিকা অবলম্বন করিয়া জীবনের মধ্যপথে সচ্ছলস্বচ্ছন্দাবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দয়ার অনুরোধে যিনি ভূরি ভূরি স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, যিনি স্বার্থের অনুরোধে আপন মহোচ্চ আত্মসম্মানকে মুহূর্তের জন্য তিলমাত্র অবনত হইতে দেন নাই, যিনি আপনার ন্যায়সংকল্পের ঋজুরেখা হইতে কোনো মন্ত্রণায়, কোনো প্রলোভনে, দক্ষিণে বামে কেশাগ্রপরিমাণ হেলিতে চাহেন নাই, তিনি কিরূপ প্রশস্তবুদ্ধি এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বলে সংগতিসম্পন্ন হইয়া সহস্রের আশ্রয়দাতা হইয়াছিলেন। গিরিশৃঙ্গের দেবদারুদ্রুম যেমন শুষ্ক শিলাস্তরের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া, প্রাণঘাতক হিমানীবৃষ্টি শিরোধার্য করিয়া, নিজের আভ্যন্তরীণ কঠিনশক্তির দ্বারা আপনাকে প্রচুর সরস-শাখাপল্লব-সম্পন্ন সরলমহিমায় অভ্রভেদী করিয়া তুলে— তেমনি এই ব্রাহ্মণতনয় জন্মদারিদ্র্য এবং সর্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও কেবল নিজের মজ্জাগত অপর্যাপ্ত বলবুদ্ধির দ্বারা নিজেকে যেন অনায়াসেই এমন সরল, এমন প্রবল, এমন সমুন্নত, এমন

সর্বসম্পৎশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

মেট্রোপলিটন-বিদ্যালয়কে তিনি যে একাকী সর্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে সগৌরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন, ইহাতে বিদ্যাসাগরের কেবল লোকহিতৈষা ও অধ্যবসায় নহে, তাঁহার সজাগ ও সহজ কর্মবুদ্ধি প্রকাশ পায়। এই বুদ্ধিই যথার্থ পুরুষের বুদ্ধি, এই বুদ্ধি সুদূরসম্ভবপর কাল্পনিক বাধাবিঘ্ন ও ফলাফলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারজালের দ্বারা আপনাকে নিরুপায় অকর্মণ্যতার মধ্যে জড়ীভূত করিয়া বসে না; এই বুদ্ধি, কেবল সূক্ষ্মভাবে নহে, প্রত্যুত প্রশস্তভাবে, সমগ্রভাবে কর্ম ও কর্মক্ষেত্রের আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইয়া, দ্বিধা বিসর্জন দিয়া, মুহূর্তের মধ্যে উপস্থিত বাধার মর্মস্থল আক্রমণ করিয়া, বীরের মতো কাজ করিয়া যায়। এই সবল কর্মবুদ্ধি বাঙালির মধ্যে বিরল।

যেমন কর্মবুদ্ধি তেমনি ধর্মবুদ্ধির মধ্যেও একটা সবল কাণ্ডজ্ঞান থাকিলে তাহার দ্বারা যথার্থ কাজ পাওয়া যায়। কবি বলিয়াছেন— ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ। ধর্মের গতি সূক্ষ্ম হইতে পারে কিন্তু ধর্মের নীতি সরল ও প্রশস্ত। কারণ, তাহা বিশ্বসাধারণের এবং নিত্যকালের; তাহা পণ্ডিতের এবং তার্কিকের নহে। কিন্তু মনুষ্যের দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষ আপন সংস্রবের সকল জিনিসকেই অলক্ষিতভাবে কৃত্রিম ও জটিল করিয়া তুলে। যাহা সরল, যাহা স্বাভাবিক, যাহা উন্মুক্ত উদার, যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না, বিধাতা যাহা আলোক ওবায়ুর ন্যায় মনুষ্যসাধারণকে অযাচিত দান করিয়াছেন, মানুষ আপনি তাহাকে দুর্মূল্য-দুর্গম করিয়া দেয়। সেইজন্য সহজ কথা ও সরল ভাব-প্রচারের জন্য লোকোত্তর মহত্ত্বের অপেক্ষা করিতে হয়।

বিদ্যাসাগর বালবিধবাবিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাও অত্যন্ত সহজ, তাহার মধ্যে কোনো নূতনত্বের অসামান্য নৈপুণ্য নাই। তিনি প্রত্যক্ষ ব্যাপারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এক অমূলক কল্পনালোক সৃজন করিতে আপন শক্তির অপব্যয় করেন নাই। তিনি তাঁহার বিধবাবিবাহ গ্রন্থে আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উদ্‌ধৃত করিলেই আমার কথাটি পরিষ্কার হইবে।—

> হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! .....অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থাদর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ; তাহারা, দুর্নিবার রিপুবশীভূত হইয়া, ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ; ধর্ম্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল লোকলজ্জাভয়ে, তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া, স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু, কী আশ্চর্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক, তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ্ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর

পাষাণময় হইয়া যায়; দুর্জ্জয় আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছে। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ।

রমণীর দেবীত্ব ও বালিকার ব্রহ্মচর্যমাহাত্ম্যের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর আকাশগামী ভাবুকতার ভূরিপরিমাণ সজল বাষ্প সৃষ্টি করিতে বসেন নাই; তিনি তাঁহার পরিষ্কার সবল বুদ্ধি ও সরল সহৃদয়তা লইয়া সমাজের যথার্থ অবস্থা ও প্রকৃত বেদনায় সকরুণ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কেবলমাত্র মধুর বাক্যরসে চিঁড়াকে সরস করিতে সে'ই চায় যাহার দধি নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দধির অভাব না থাকাতে বাক্‌পটুতার প্রয়োজন হয় নাই। দয়া আপনি দুঃখের স্থানে গিয়া আকৃষ্ট হয়। বিদ্যাসাগর স্পষ্ট দেখিতেছেন যে, প্রকৃত সংসারে বিধবা হইবামাত্র বালিকা হঠাৎ দেবী হইয়া উঠে না, এবং আমরাও তাহার চতুর্দিকে নিষ্কলঙ্ক দেবলোক সৃষ্টি করিয়া বসিয়া নাই; এমন অবস্থায় সে'ও দুঃখ পায়, সমাজেরও রাশি রাশি অমঙ্গল ঘটে, ইহা প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ সত্য। সেই দুঃখ, সেই অকল্যাণ নিবারণের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন না করিয়া বিদ্যাসাগর থাকিতে পারেন না, আমরা সে স্থলে সুনিপুণ কাব্যকলা প্রয়োগ-পূর্বক একটা স্বকপোলকল্পিত জগতের আদর্শ-বৈধব্য কল্পনা করিয়া তৃপ্তি লাভ করি। কারণ, তাঁহার সরল ধর্মবুদ্ধিতে তিনি সহজেই যে বেদনা বোধ করিয়াছেন, আমরা সেই বেদনা যথার্থরূপে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি না। সেইজন্য এ সম্বন্ধে আমাদের রচনায় নৈপুণ্য প্রকাশ পায়, সরলতা প্রকাশ পায় না। যথার্থ সবলতার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সুবৃহৎ সরলতা থাকে।

এই সরলতা, কেবল মতামতে নহে, লোকব্যবহারেও প্রকাশ পায়। বিদ্যাসাগর পিতৃদর্শনে কাশীতে গমন করিলে সেখানকার অর্থলোলুপ কতকগুলি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে টাকার জন্য ধরিয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাহাদের অবস্থা ও স্বভাব দৃষ্টে তাহাদিগকে দয়া অথবা ভক্তির পাত্র বলিয়া জ্ঞান করেন নাই, সেইজন্য তৎক্ষণাৎ অকপটচিত্তে উত্তর দিলেন, "এখানে আছেন বলিয়া আপনাদিগকে যদি আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিয়া মান্য করি, তাহা হইলে আমার মতো নরাধম আর নাই।"....ইহা শুনিয়া কাশীর ব্রাহ্মণেরা ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন, "তবে আপনি কী মানেন?"

বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন, "আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান।"[২]

যে বিদ্যাসাগর হীনতমশ্রেণীর লোকেরও দুঃখমোচনে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনি কৃত্রিম কপটভক্তি দেখাইয়া কাশীর ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। ইহাই বলিষ্ঠ সরলতা, ইহাই যথার্থ পৌরুষ।

নিজের অশনবসনেও বিদ্যাসাগরের একটি অটল সরলতা ছিল। এবং সেই সরলতার মধ্যেও দৃঢ় বলের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বেই দৃষ্টান্ত দেখানো গিয়াছে, নিজের তিলমাত্র সম্মানরক্ষার প্রতিও তাঁহার লেশমাত্র শৈথিল্য ছিল না। আমরা সাধারণত প্রবল সাহেবি অথবা প্রচুর নবাবি

দেখাইয়া সম্মান লাভের চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আড়ম্বরের চাপল্য বিদ্যাসাগরের উন্নত-কঠোর আত্মসম্মানকে কখনো স্পর্শ করিতে পারিত না। ভূষণহীন সারল্যই তাঁহার রাজভূষণ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেন তখন তাঁহার দরিদ্রা "জননীদেবী চরকাসুতা কাটিয়া পুত্রদ্বয়ের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন।"[২] সেই মোটা কাপড়, সেই মাতৃস্নেহমণ্ডিত দারিদ্র্য তিনি চিরকাল সগৌরবে সর্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বান্ধব তদানীন্তন লেফ্‌টেনেন্ট্‌ গবর্নর হ্যালিডে সাহেব তাঁহাকে রাজ-সাক্ষাতের উপযুক্ত সাজ করিয়া আসিতে অনুরোধ করেন। বন্ধুর অনুরোধে বিদ্যাসাগর কেবল দুই-একদিন চোগা-চাপকান পরিয়া সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সে লজ্জা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "আমাকে যদি এই বেশে আসিতে হয় তবে এখানে আর আমি আসিতে পারিব না।" হ্যালিডে তাঁহাকে তাঁহার অভ্যস্তবেশে আসিতে অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত যে চটিজুতা ও মোটা ধুতিচাদর পরিয়া সর্বত্র সম্মান লাভ করেন, বিদ্যাসাগর রাজদ্বারেও তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তাঁহার নিজের সমাজে যখন ইহাই ভদ্রবেশ, তখন তিনি অন্য সমাজে অন্য বেশ পরিয়া আপন সমাজের ও সেইসঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই। সাদা ধুতিও সাদা চাদরকে ঈশ্বরচন্দ্র যে গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদের বর্তমান রাজাদের ছদ্মবেশ পরিয়া আমরা আপনাদিগকে সে গৌরব দিতে পারি না; বরঞ্চ এই কৃষ্ণচর্মের উপর দ্বিগুণতর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি। আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায়— মানব-ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।

সেইজন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি সোদর কেহ ছিল না। এ দেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন, চারি দিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই। তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন— আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না, আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স্‌, এবং নিজের বাক্‌চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন। বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক

তুলিয়া উঠে, বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফলদান করিতেন; কিন্তু আমাদের শতসহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লিঝংকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত পীড়িত অনাথ অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্তমান নাই, কিন্তু তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালিজাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিস্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া, সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া, সরল সবল অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব। আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি; এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মতো দুর্গমবিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য বীর্য মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিত ভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব, এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয়জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২

১ স্বরচিত বিদ্যাসাগরচরিত

২ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন-প্রণীত বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম

প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ

'হে সৌম্য মানবকগণ— অনেক কাল পূর্বে আমাদের এই দেশ, এই ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে যথার্থ বড়ো ছিল— তখন এখানকার লোকেরা বীর ছিলেন। তাঁরাই আমাদের পূর্বপুরুষ।

যথার্থ বড়ো কাহাকে বলে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কী হলে আপনাদের বড়ো মনে করতেন? আজকাল আমাদের মনে তাঁদের সেই বড়ো ভাবটি নেই বলেই ধনকেই আমরা বড়ো হবার উপায় মনে করি। ধনীকেই আমরা বলি বড়োমানুষ। তাঁরা তা বলতেন না। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে যাঁরা বড়ো ছিলেন সেই ব্রাহ্মণরা ধনকে তুচ্ছ করতেন। তাঁদের বেশভূষা বিলাসিতা কিছুই ছিল না। অথচ বড়ো বড়ো রাজারা এসে তাঁদের কাছে মাথা নত করতেন।

যে মানুষ কাপড়চোপড় জুতোছাতা নিয়ে নিজেকে বড়ো মনে করে, ভেবে দেখো দেখি সে কত ছোটো। জুতো কি মানুষকে বড়ো করতে পারে। দামি জুতো দামি কাপড় কি আমাদের গুণের পরিচয় দেয়। আমাদের প্রাচীনকালে যে-সব ঋষিদের পায়ে জুতো ছিল না, গায়ে পোশাক ছিল না, তাঁরা কি সাহেবের বাড়ির জুতো এবং বিলাতি দোকানের কাপড় পরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন না। আজ যদি আমাদের সেই যাজ্ঞবল্ক্য, সেই বশিষ্ঠ ঋষি খালি গায়ে খালি পায়ে তাঁদের সেই জ্যোতির্ময় দৃষ্টি, তাঁদের সেই পিঙ্গল জটাভাব নিয়ে আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ান, তা হলে সমস্ত দেশের মধ্যে এমন কোন্ রাজা এমন কত বড়ো সাহেব আছেন যিনি তাঁর জুতো ফেলে দিয়ে মাথার তাজ নামিয়ে, সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলা নিয়ে নিজেকে কৃতার্থ না মনে করেন। আজ এমন কে আছে যে তার গাড়ি জুড়ি অট্টালিকা এবং সোনার চেন নিয়ে তাঁদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

তাঁরাই আমাদের পিতামহ ছিলেন, সেই পূজ্য ব্রাহ্মণদের আমরা নমস্কার করি। কেবল মাথা নত করে নমস্কার করা নয়— তাঁরা যে শিক্ষা দিয়েছেন তাই গ্রহণ করি, তাঁরা যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তার অনুসরণ করি। তাঁদের মতো হবার চেষ্টা করাই হচ্ছে তাঁদের প্রতি ভক্তি করা।

তাঁরা বড়ো হয়েছিলেন কী গুণে। তাঁরা সত্যকে সকলের চেয়ে বড়ো বলে জানতেন— মিথ্যার কাছে তাঁরা মাথা নিচু করেন নি। সত্য কী তাই জানবার জন্যে সমস্ত জীবন তাঁরা কঠিন তপস্যা করতেন— কেবল আমোদপ্রমোদ করেই জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া তাঁদের লক্ষ্য ছিল না।

যাতে সত্য জানবার কিছুমাত্র ব্যাঘাত করত তাকে তাঁরা অনায়াসে পরিত্যাগ করতেন। মনে সত্য জানবার অবিশ্রাম চেষ্টা করতেন, মুখে সত্য বলতেন, এবং সত্য বলে যা জানতেন কাজেও তাই পালন করতেন, সেজন্যে কাউকে ভয় করতেন না। আমরা টাকাকড়ি জুতোছাতা পাবার জন্যে যেরকম প্রাণপণ খেটে মরি, তাঁরা সত্যকে পাবার জন্যে তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট স্বীকার করতেন। সেইজন্যে তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বড়ো ছিলেন।

তাঁরা অভয় ছিলেন, ধর্ম ছাড়া আর-কিছুকেই ভয় করতেন না। তাঁদের মনের মধ্যে এমন একটি তেজ ছিল, সর্বদাই এমন একটি আনন্দ ছিল যে, তাঁরা কোনো রাজামহারাজার অন্যায় শাসনকে গ্রাহ্য করতেন না, এমন-কি, মৃত্যুকেও তাঁরা ভয় করতেন না। তাঁরা এটা বেশ জানতেন যে, তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেবার তো কিছু নেই— বেশভূষা ধনসম্পদ গেলে তো তাঁদের কোনো ক্ষতিই হয় না। তাঁদের যা-কিছু আছে সব মনের মধ্যে। তাঁরা যে সত্য জানতেন তা তো দস্যু কিংবা রাজা হরণ করতে পারত না। তাঁরা নিশ্চয় জানতেন মৃত্যু ভয়ের বিষয় নয়। মৃত্যুতে এই শরীরটা মাত্র যায়, কিন্তু অন্তরের জিনিস যায় না।

তাঁরা সকলের মঙ্গলের জন্যে ভালোর জন্যে চিন্তা করতেন, কিসে সকলের ভালো হবে সেইটে তাঁরা ধ্যান করতেন এবং যাতে ভালো হয় সেইটে তাঁরা ব্যবস্থা করতেন। কার কী করা উচিত সেইটে সকলে তাঁদের কাছে জানতে আসত। কিসে ঘরের লোকের মঙ্গল হয় তাই জানবার জন্য গৃহস্থ লোকেরা তাঁদের কাছে আসত— কিসে প্রজাদের ভালো হয় তাই পরামর্শ নেবার জন্যে রাজারা তাঁদের কাছে আসত। পৃথিবীর সকলের ভালোর জন্য তাঁরা সমস্ত আমোদপ্রমোদ সমস্ত বিলাসিতা ত্যাগ করে চিন্তা করতেন।

কিন্তু তখন কি কেবল ব্রাহ্মণ-ঋষিরাই ছিলেন। তা নয়। রাজারাও ছিলেন, রাজার সৈন্যসামন্ত ছিল। রাজ্যের প্রয়োজনে তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহ করতে হত। কিন্তু যুদ্ধের সময়েও তাঁরা ধর্ম ভুলতেন না। যে-লোকের হাতে অস্ত্র নেই তাকে মারতেন না, শরণাপন্নকে বধ করতেন না, রথের উপর চড়ে নীচের লোকদের উপর অস্ত্র চালাতেন না। সৈন্যে-সৈন্যেই যুদ্ধ চলত, কিন্তু শত্রুপক্ষের দেশের নিরীহ প্রজাদের ঘরদুয়ার জালিয়ে দিতেন না। রাজার ছেলের যখন বড়ো বয়স হত তখন রাজা আপনার সমস্ত টাকাকড়ি রাজত্ব ছেলের হাতে দিয়ে সত্য জানবার জন্য, ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত মন দেবার জন্যে বনে চলে যেতেন। তখন আর তাঁদের হীরা-মুক্তো ছাতাজুতো লোকজন কিছুই থাকত না। রাজ্যেশ্বর রাজা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দীনহীনের মতো সমস্ত ছেড়ে যেতেন। তাঁরা জানতেন রাজ্য টাকাকড়ি বাইরের জিনিস, তাতেই যে মানুষ বড়ো হয় তা নয়, বড়ো হবার জিনিস ভিতরে। তবে ধর্মনিয়মমতে রাজত্ব করা রাজার কর্তব্য, সুতরাং সেজন্যে প্রাণ দেওয়া দরকার হলে তাও দিতেন— কিন্তু যুবরাজ বড়ো হয়ে উঠলে যখন সে কর্তব্যের শেষ হয় তখন আর তাঁরা রাজত্ব আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতেন না।

গৃহস্থদেরও ওইরকম নিয়ম ছিল। যখন জ্যেষ্ঠ পুত্র বড়ো হয়ে উঠত তখন তারই হাতে সমস্ত সংসার দিয়ে তাঁরা দরিদ্র বেশে তপস্যা করতে চলে যেতেন। যতদিন সংসারে থাকতে হত ততদিন প্রাণপণে তাঁরা সংসারের কাজ করতেন। আত্মীয়জন প্রতিবেশী অতিথি অভ্যাগত দরিদ্র

অনাথ কাউকেই ভুলতেন না— প্রাণপণে নিজের সুখ নিজের স্বার্থ দূরে রেখে তাদেরই সেবা করতেন— তার পরে সময় উত্তীর্ণ হলেই আর ধনসম্পদ ঘরদুয়ারের প্রতি তাকাতেন না।

তখন যাঁরা বাণিজ্য করতেন তাঁদেরও ধর্মপথে সত্যপথে চলতে হত। কাউকে ঠকানো, অন্যায় সুদ নেওয়া, কৃপণের মতো সমস্ত ধন কেবল নিজের জন্যেই জড়ো করে রাখা, এ তাঁদের দ্বারা হত না।

যাঁরা রাজত্ব করতেন, যাঁরা বাণিজ্য করতেন, যাঁরা কর্ম করতেন, তাঁদের সকলের জন্যই ব্রাহ্মণেরা চিন্তা করেতন। যাতে সমাজে ধর্ম থাকে, সত্য থাকে, শৃঙ্খলা থাকে, যাতে ভালো হয়, এই তাঁদের একান্ত লক্ষ্য ছিল। সেইজন্য তাঁদের আদর্শে তাঁদের উপদেশে তখনকার সকল লোকেই ভালো হয়ে চলতে পারত। সমস্ত সমাজের মধ্যে সেইজন্যে এত উন্নতি এত শ্রী ছিল।

সেই তখনকার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা যে-শিক্ষা যে-ব্রত অবলম্বন করে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন, বীর হয়ে উঠেছিলেন, সেই শিক্ষা সেই ব্রত গ্রহণ করবার জন্যেই তোমাদের এই নির্জন আশ্রমের মধ্যে আমি আহ্বান করেছি। তোমরা আমার কাছে এসেছ— আমি সেই প্রাচীন ঋষিদের সত্যবাক্য তাঁদের উজ্জ্বল চরিত মনের মধ্যে সর্বদা ধারণ করে রেখে তোমাদের সেই মহাপুরুষদের পথে চালনা করতে চেষ্টা করব— আমাদের ব্রতপতি ঈশ্বর আমাকে সেই বল সেই ক্ষমতা দান করুন। যদি আমাদের চেষ্টা সফল হয় তবে তোমরা প্রত্যেকে বীরপুরুষ হয়ে উঠবে— তোমরা ভয়ে কাতর হবে না, দুঃখে বিচলিত হবে না, ক্ষতিতে ম্রিয়মাণ হবে না, ধনের গর্বে স্ফীত হবে না; মৃত্যুকে গ্রাহ্য করবে না, সত্যকে জানতে চাইবে, মিথ্যাকে মন থেকে কথা থেকে কাজ থেকে দূর করে দেবে, সর্বদা জগতের সকল স্থানেই মনে এবং বাইরে এক ঈশ্বর আছেন এইটে নিশ্চয় জেনে আনন্দমনে সকল দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকবে। কর্তব্যকর্ম প্রাণপণে করবে, সংসারের উন্নতি ধর্মপথে থেকে করবে, অথচ যখন কর্তব্যবোধে ধনসম্পদ ও সংসার ত্যাগ করতে হবে তখন কিছুমাত্র ব্যাকুল হবে না। তা হলে তোমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে— তোমরা যেখানে থাকবে সেইখানেই মঙ্গল হবে, তোমরা সকলের ভালো করবে এবং তোমাদের দেখে সকলে ভালো হবে।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিরূপ শিক্ষা ও ব্রত অবলম্বন করতেন? তাঁরা বাল্যকালে গৃহ ছেড়ে নির্জনে গুরুর বাড়িতে যেতেন। সেখানে খুব কঠিন নিয়মে নিজেকে সংযত করে থাকতে হত। গুরুকে একান্তমনে ভক্তি করতেন, গুরুর সমস্ত কাজ করে দিতেন। গুরুর জন্যে কাঠ কাটা, জল তুলে আনা, তাঁর গোরু চরানো, তাঁর জন্যে গ্রাম থেকে ভিক্ষে করে আনা, এই-সমস্ত তাঁদের কাজ ছিল, তা তাঁরা যত বড়ো ধনীরই পুত্র হোন-না! শরীর-মনকে একেবারে পবিত্র রাখতে হবে, তাঁদের শরীরে ও মনে কোনোরকম দোষ একেবারে স্পর্শ করত না। গেরুয়া বস্ত্র পরতেন, কঠিন বিছানায় শুতেন, পায়ে জুতা নেই, মাথায় ছাতা নেই, সাজসজ্জা বড়োমানুষি কিছুমাত্র নেই। সমস্ত মনের সমস্ত চেষ্টা কেবল শিক্ষালাভে, কেবল সত্যের সন্ধানে, কেবল নিজের দুষ্প্রবৃত্তি-দমনে, নিজের ভালো গুণকে ফুটিয়ে তুলতে নিযুক্ত থাকত।

তোমাদের সেইরকম কষ্ট স্বীকার করে সেই কঠিন নিয়মে, সকলপ্রকার বড়োমানুষিকে তুচ্ছ

করে দিয়ে এখানে গুরুগৃহে বাস করতে হবে। গুরুকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা করবে, মনে বাক্যে কাজে তাঁকে লেশমাত্র অবজ্ঞা করবে না। শরীরকে পবিত্র করে রাখবে— কোনো দোষ যেন স্পর্শ না করে। মনকে গুরু-উপদেশের সম্পূর্ণ অধীন করে রাখবে।

আজ থেকে তোমরা সত্যব্রত গ্রহণ করলে। মিথ্যাকে কায়মনোবাক্যে দূরে রাখবে। প্রথমত সত্য জানবার জন্য সবিনয়ে সমস্ত মন বুদ্ধি ও চেষ্টা দান করবে, তার পরে যা সত্য বলে জানবে তা নির্ভয়ে সতেজে পালন ও ঘোষণ করবে।

আজ থেকে তোমাদের অভয়ব্রত। ধর্মকে ছাড়া জগতে তোমাদের ভয় করবার আর কিছুই নেই। বিপদ না, মৃত্যু না, কষ্ট না— কিছুই তোমাদের ভয়ের বিষয় নয়। সর্বদা দিবারাত্রি প্রফুল্লচিত্তে প্রসন্নমুখে শ্রদ্ধার সঙ্গে সত্য-লাভে ধর্ম-লাভে নিযুক্ত থাকবে।

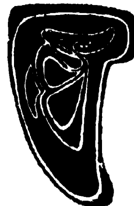
আজ থেকে তোমাদের পুণ্যব্রত। যা-কিছু অপবিত্র কলুষিত, যা-কিছু প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ হয়, তা সর্বপ্রযত্নে প্রাণপণে শরীর-মন থেকে দূর করে প্রভাতের শিশির- সিক্ত ফুলের মতো পুণ্যে ধর্মে বিকশিত হয়ে থাকবে।

আজ থেকে তোমাদের মঙ্গলব্রত। যাতে পরস্পরের ভালো হয় তাই তোমাদের কর্তব্য। সেজন্যে নিজের সুখ নিজের স্বার্থ বিসর্জন।

এক কথায় আজ থেকে তোমাদের ব্রহ্মব্রত। এক ব্রহ্ম তোমাদের অন্তরে বাহিরে সর্বদা সকল স্থানেই আছেন। তাঁর কাছ থেকে কিছুই লুকোবার জো নেই। তিনি তোমাদের মনের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দেখছেন। যখন যেখানে থাক, শয়ন কর, উপবেশন কর, তাঁর মধ্যেই আছ, তাঁর মধ্যেই সঞ্চরণ করছ। তোমার সর্বাঙ্গে তাঁর স্পর্শ রয়েছে— তোমার সমস্ত ভাবনা তাঁরই গোচরে রয়েছে। তিনিই তোমাদের একমাত্র ভয়, তিনিই তোমাদের একমাত্র অভয়।

প্রত্যহ অন্তত একবার তাঁকে চিন্তা করবে। তাঁকে চিন্তা করবার মন্ত্র আমাদের বেদে আছে। এই মন্ত্র আমাদের ঋষিরা দ্বিজেরা প্রত্যহ উচ্চারণ করে জগদীশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হতেন। সেই মন্ত্র, হে সৌম্য,.তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে একবার উচ্চারণ করো:

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।



লেখা-পরিচিতি

নদী

'নদী' প্রকাশিত হয় ২২শে মাঘ ১৩০২ : ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬ তারিখে। উৎসর্গ-পত্রে আছে "পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তে তাঁহার শুভ পরিণয় দিনে এই গ্রন্থখানি উপহৃত হইল।" বইয়ের 'বিজ্ঞাপন'-এ লেখা হয়েছে, "এই কাব্যগ্রন্থখানি বালকবালিকাদিগের পাঠের জন্য রচিত হইয়াছে। পরীক্ষার দ্বারা জানিয়াছি ইহার ছন্দ শিশুরা সহজেই আবৃত্তি করিতে পারে। বয়স্ক পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য, যে প্রত্যেক ছত্রের আরম্ভের শব্দটির পরে যেখানে ফাঁক দেওয়া হইয়াছে সেখানে স্বল্পমাত্র কাল থামিতে হইবে। ২২শে মাঘ ১৩০২।"

'বালক' পত্রিকার এক যুগ পর রবীন্দ্রনাথ বাল্যগ্রন্থাবলী প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। গ্রন্থাবলীর প্রথম বই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শকুন্তলা', দ্বিতীয় এই তিন শত ছাত্রের কাব্যপুস্তিকা এই 'নদী'। রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন থেকে বাংলা ছড়া সংগ্রহে নিযুক্ত হয়েছিলেন, সেই সূত্রে লেখা এক প্রবন্ধে তিনি শিশুপাঠ্য লেখার বিষয়েও তাঁর ভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন, লেখেন, "শিশুদের কল্যাণ যাঁহারা কামনা করেন তাঁহারা যেন কেবলমাত্র প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ভাগক্রমে বিশুদ্ধ সাধুভাষায় জ্ঞানশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা প্রচার না করিয়া চিত্রবিচিত্র কাল্পনিক কথা ও রূপকথা সংগ্রহ ও সৃজনপূর্বক শিশুদের হৃদয় সরস ও তাহাদের শিক্ষার পথ সুন্দর এবং তাহাদের জীবনারম্ভকাল নবীন উষারাগে রঞ্জিত ও ছায়ান্বিত করিয়া তোলেন।" সম্ভবত এই ভাবনা থেকেই পৃথক্‌ভাবে বাল্যগ্রন্থাবলী রচনা করার পরিকল্পনা। 'নদী'তে নদীর উৎসমুখ থেকে পরিণাম পর্যন্ত যাত্রার দুধারের দৃশ্য ও জনপদের ছবি বর্নিত হয়েছে।

এই বই পড়ে 'দাসী' পত্রিকায় তার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লেখেন, "আমরা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে শিশুদের বন্ধুত্ব-নিপ্সু দেখিয়া অতিশয় প্রীত ও আশান্বিত হইলাম। তাঁহার 'নদী'র সঙ্গে অনেক শিশু কল্পনার রথে চড়িয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিবে। শিশুরা পড়িয়া পড়িয়া ইহার সুন্দর কাগজ ও ছাপা শ্রীহীন করিয়া দিলে আমরা সুখী হইব।"

শিশু

মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের নয় ভাগ 'কাব্যগ্রন্থে'র সপ্তম ভাগ হিসেবে 'শিশু' প্রকাশিত হয় মজুমদার লাইব্রেরি। ২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা থেকে ২ আশ্বিন ১৩১০, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৩ এ। ২১ শে নভেম্বর ১৯০২ মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়া কন্যার মৃত্যু হয় ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৩। অন্তবর্তী সময়ে, প্রধানত অসুস্থ রেণুকাকে নিয়ে বায়ুপরিবর্তনের

জন্য আলমোড়ায় থাকার কালে 'শিশু'র অধিকার কবিতা লেখা হয়। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন "আলমোড়াতে যখন তাকে চেঞ্জে নিয়ে যাই। তখন তার অসুখ খুব বেশি। তাকে খুশি রাখবার জন্যে রোজ রোজ কবিতা লিখে বিছানার পাশে বসে শোনাতুম। যাতে কিছুক্ষণও অন্তত রোগের যন্ত্রণা ভুলে থাকে। এমনি করে আমার 'শিশু' বইখানা লেখা হয়েছে।" 'শিশু'র প্রবেশক কবিতা "জগৎ-পারাবারের তীরে ছেলেরা করে মেলা" লেখার সময়ে মোহিতচন্দ্রকে আলমোড়া থেকে লিখেছেন "ছেলেবেলায় আমার মনটা আকাশে পাতালে তেতলার ছাদে একতলার অন্ধকার ঘরে সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় ছড়িয়ে ছিল। ...একটা কিছু অত্যাশ্চর্যের জন্যে মনের ভিতর থেকে প্রতীক্ষা কিছুতেই ঘুচত না..."। তার আগেই, 'শিশু' কবিতা লেখার মাঝখানেই লিখেছেন, "আমি আজকাল শিশুদের মনের ভিতর বাসা করে আছি। তেতালার ছাদের উপর আমার নিজের শৈশব মনে পড়চে..."। নিজের শৈশবের স্মৃতিই ওই সব কবিতার মূল অবলম্বন।

'শিশু' কাব্যের মধ্যে এই মূল কবিতাগুলির পরে পুরাতন কবিতাও কয়েকটি গৃহীত হয়। পুরাতন কবিতা পূর্বপ্রকাশিত কাব্য, অনেক ক্ষেত্রে সমকালীন সাময়িক পত্র থেকে নেওয়া। পূর্বপ্রকাশিত 'নদী' কারও 'শিশু'র মধ্যে গ্রহণ করা হয়। পরে বিশ্বভারতী রচনাবলীতে 'শিশু' মুদ্রণের কালে 'প্রভাতসঙ্গীত', 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল' 'সোনার তরী' ও 'ক্ষণিকা' থেকে নেওয়া কবিতাগুলি এবং 'নদী' কাব্য বাদ দিয়ে 'শিশু'র মূল্য কাব্যের পাঠ গৃহীত হয়।

কথা ও কাহিনী

চব্বিশটি আখ্যানকবিতা নিয়ে 'কবিতা' কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল ১ মাঘ ১৩০৬, ১৪ জানুয়ারি ১৯০০তে, 'কাহিনী' প্রকাশিত হয় পাঁচটি নাট্যকবিতা ও দুটি কবিতার সহযোগে ২৪ ফাল্গুন ১৩০৬, ৭ মার্চ ১৯০০য়। 'কথা ও কাহিনী'র প্রকাশ ২৫ ভাদ্র ১৩১৫, ১০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের পক্ষে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। 'কাহিনী' কাব্যের কবিতা বা নাট্যকবিতাগুলি এখানে নেই। মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'কাব্য-গ্রন্থে'র পঞ্চম ভাগে 'কাহিনী' এবং 'কথা'র দুই অংশ ছিল, দুই অংশেরই জন্য দুটি প্রবেশক কবিতা কবি লিখে দেন। ওই দুটি প্রবেশক কবিতা 'কথা ও কাহিনী' কাব্যে দুই অংশের প্রবেশক রূপে গৃহীত হয় বিশ্বভারতীর ১৩৩২এর পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ থেকে। 'কথা'র উৎসর্গ লিপিটিই 'কথা ও কাহিনী'র উৎসর্গলিপি হিসেবে গৃহীত হয় : "সুহৃদবর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানচার্য করকমালষু : সত্য রত্ন তুমি দিলে পরিবর্তে তার/কথা ও কল্পনামও দিন উপহার। শিলাইদহ অগ্রহায়ণ ১৩০৬।

নেপালী বৌদ্ধসাহিত্য সম্বন্ধী ইংরেজি গ্রন্থ থেকে, টডের রাজস্থান কাহিনী বা অপর ইংরাজি শিখ ইতিহাস থেকে বা তক্তমাল থেকে গৃহীত কাহিনীগুলি 'কথা ও কাহিনী'র কথা অংশে। এবং 'কাহিনী' অংশে মৌলিক কাহিনীগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে।

বাল্মীকি প্রতিভা

'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্য ফাল্গুন ১২৮৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। বইয়ের আখ্যাপত্রে লেখা ছিল "বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে রচিত ও অভিনীত।" রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন :

> বাল্মীকি প্রতিভার অনেকগুলি গান বৈঠকি-গান-ভাঙা। অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গানের সুরে বসানো এবং গুটিতিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া। ...বিলাতি সুরের মধ্যে দুইটিকে ডাকাতদের মত্ততার গানে লাগানো হইয়াছে এবং আইরিশ সুর বনদেবীর বিলাসগানে বসাইয়াছি। বস্তুত বাল্মীকি প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা। ...
>
> আমার বিলাত যাইবার আগে হইতে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে 'বিদ্বজ্জনসমাগম' নামে সাহিত্যিকদের সম্মিলন হইত। সেই সম্মিলনে গীতবাদ্য কবিতা-আবৃত্তি ও আহারের আয়োজন থাকিত। আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর একবার এই সম্মিলনী আহূত হইয়াছিল। ইহাই শেষবার। এই সম্মিলনী উপলক্ষেই বাল্মীকি প্রতিভা রচিত হয়। আমি বাল্মীকি সাজিয়াছিলাম এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা সরস্বতী সাজিয়াছিল। বাল্মীকি প্রতিভা নামে মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে।

বস্তুত জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাট্যগীতির অভিনয় হয় ১৬ই ফাল্গুন ১২৮৭ শনিবার সন্ধ্যায়, এবং সমাগম এই শেষবার নয়।

কালমৃগয়া

'কালমৃগয়া' গীতিনাট্য প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ ১২৮৯ বঙ্গাব্দে। এটিও "বিদ্বজন সমাগম উপলক্ষে অভিনয়ার্থ রচিত" হয়েছিল। ২৩ শে ডিসেম্বর ১৮৮২ শনিবার রাত্রে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এই গীতিনাট্যের অভিনয় হয়েছিল। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> বাল্মীকিপ্রতিভার গান সম্বন্ধে...নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরও একটি গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমৃগয়া। দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ তাহার নাট্যবিষয়। তেতলার ছাদে স্টেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিল; ইহার করুণরসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন।

"অভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথের রবীন্দ্রনাথ অন্ধমুনির। হেমেন্দ্রনাথের পুত্র ঋতেন্দ্রনাথ ও কন্যা অভিজ্ঞা দেবী যথাক্রমে অন্ধমুনির পুত্র-কন্যার এবং পরিবারস্থ বালিকাগণ বনদেবীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।" রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "পরে, এই গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকি প্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।" 'কালমৃগয়া' স্থান পেয়েছে রবীন্দ্ররচনাবলীর প্রচলিত সংগ্রহের মধ্যে।

বিসর্জন

'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রথমাংশ থেকে নাট্যাকারে রচিত হয় 'বিসর্জন', জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ বা মে ১৮৯০ বইয়ের প্রকাশকাল।

'রাজর্ষির প্রথম আঠারো পরিচ্ছেদ এবং পরের ৩২, ৩৩, ৩৬, ৩৭ পরিচ্ছেদের গল্পভাগ নাটকে আছে। শান্তিনিকেতনে 'বিসর্জন' গড়বার কালে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা সূত্রে বলেছিলেন :

> 'বিসর্জন' এই নাটকের নামকরণ কোন্ ভাবকে অবলম্বন করে রয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে নাটকের শেষে রঘুপতি প্রতিমা বিসর্জন দিলেন। এই বাইরের ঘটনা ঘটল। কিন্তু এই নাটকে এর চেয়েও মহত্তর আরেক বিসর্জন হয়েছে। জয়সিংহ তার প্রাণ বিসর্জন দিয়ে রঘুপতির মনে চেতনার সঞ্চার করে দিয়েছিল।
>
> সুতরাং প্রতিমা-বিসর্জন এই নাটকের শেষ কথা নয় কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা হল জয়সিংহের আত্মত্যাগ—কারণ তখনই রঘুপতি সুস্পষ্টভাবে এই সত্যকে অনুভব করতে পারল যে প্রেম হিংসার পথে চলে না। বিশ্বমাতার পূজা প্রেমের দ্বারাই হয়।

'বিসর্জনে'র বহু অভিনয় হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যৌবনে রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। আবার প্রৌঢ়বয়সে জয়সিংহের ভূমিকায়। নানা সংস্করণে নাটক মধ্যে বহু পরিবর্তনও করেছিলেন।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের দ্বারা সহজে ও স্বল্প সময়ে অভিনয়ের সুবিধার জন্য ১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রনাথ নাটকের অনেক অংশ ও নারীচরিত্র বাদ দিয়ে চারটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ তার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রস্তুত করেন। বিশ্বভারতী রচনাবলী অষ্টাবিংশ খণ্ডের সেই পাঠ আমরা এই বইয়ে ব্যবহার করেছি।

হাস্যকৌতুক

'হাস্যকৌতুক' গদ্য গ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ ভাগ হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ ১৩১৪, ইংরেজি ডিসেম্বর ১৯০৭ এ। বইয়ের আরম্ভে লেখা হয়, ''এই ক্ষুদ্র কৌতুকনাট্যগুলি হেঁয়ালি নাট্য নাম ধরিয়া 'বালক' ও 'ভারতী'তে বাহির হইয়াছিল। য়ুরোপে চারাড় (Charade) -নামক একপ্রকার নাট্যলেখা প্রচলিত আছে। কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়। ইহার মধ্যে হেঁয়ালি রক্ষা করিতে গিয়া লেখা সংকুচিত করিতে হইয়াছিল—আশা করি সেই হেঁয়ালির সন্ধান করিতে পাঠকগণ অনাবশ্যক কষ্ট স্বীকার করিবেন না। এই হেঁয়ালিনাট্যের কয়েকটি বিশেষভাবে বালকদিগকে আমোদ দিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল।''

'বালক' পত্রিকার ১২৯২ দ্বিতীয় জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে হেঁয়ালিনাট্যের সূত্রপাত হয়। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রোগের চিকিৎসা' রচনার আগে পত্রিকায় শাবাড়-প্রকরণটি ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন লেখক :

ইংরেজদের শারাড্-নামক একপ্রকার খেলা আছে। আমরা বাংলায় তাহাকে হেঁয়ালি-নাট্য বলিলাম। তাহার মর্মটা বলিয়া দিই। দুই-তিনজন লোকে ষড়যন্ত্র করিয়া এমন একটা কথা বাহির করিতে হইবে যাহা দুই-তিন ভাগে ভাঙিয়া ফেলা যাইতে পারে। প্রত্যেক ভাগের একটা অর্থ থাকা চাই। মনে করো 'পাগোল' শব্দ। এই শব্দকে পা এবং গোল এই দুই ভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগের একটা অর্থ পাওয়া যায়। তারপর উপস্থিতমতো মুখে মুখে একটা নাটক বানাইয়া লইতে হইবে; সেই নাটকের মধ্যে কোনো স্থানে কথায় কথায় পা শব্দ এবং গোল শব্দ, এবং পাগোল শব্দের সমস্তটা ব্যবহার করিতে হইবে। পরে শ্রোতারা আন্দাজ করিয়া বলিয়া দিবেন কোন্ শব্দ অবলম্বন করিয়া এই নাট্যাভিনয় করা হইল। না বলিতে পারিলে তাঁহাদের হার হইল।

আমরা নিম্নে হেঁয়ালি-নাট্যের একটা উদাহরণ দিতেছি। পাঁচজন কিংবা চারজন মিলিয়া এই হেঁয়ালি-নাট্য অভিনয় করিবেন, এবং বাকি সকলকে এই নাট্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন শব্দটা বাহির করিয়া দিতে হইবে।

অতঃপর 'রোগের চিকিৎসা' নাটকটি মুদ্রিত হয়। 'রোগের চিকিৎসা'র উদ্দিষ্ট শব্দটি হাঁসপাতাল। পত্রিকায় লেখা প্রকাশের পরের সংখ্যায় উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম ছেপে দেওয়া হত।

মুকুট

'বালক' পত্রিকায় প্রথম দুই সংখ্যায় 'মুকুট' গল্প বা উপন্যাস প্রকাশিত হবার অন্যূন ষোলো বছর পর রবীন্দ্রনাথ তার নাট্যকরণ করেন। ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে 'মুকুট' নাটক প্রকাশিত হয় পৌষ ১৩১৫, ডিসেম্বর ১৯০৮-এ। বইয়ের সূচনায় লেখা ছিল : "বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের দ্বারা অভিনীত হইবার উদ্দেশে 'বালক' পত্রে প্রকাশিত 'মুকুট' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস হইতে নাট্যীকৃত।"

'মুকুট' নাটক প্রথম অভিনীত হয় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। অল্পদিনের মধ্যেই ১৯০৯ জানুয়ারিতে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের দ্বারা 'মুকুট' অভিনীত হয়।

শারদোৎসব

'শারদোৎসব' ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক আশ্বিন ১৩১৫, সেপ্টেম্বর ১৯০৮এ প্রকাশিত হয়। বইয়ের 'বিজ্ঞাপনে' ছিল : "এই নাটিকাটি বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শারদোৎসব উপলক্ষে ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হইবার জন্ম রচিত হয়।" 'শারদোৎসব' শান্তিনিকেতনে প্রথম অভিনীত হয় পূজার ছুটির ঠিক আগে মহালয়ার আগের দিন ৮ আশ্বিন ১৩১৫। রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে লিখেছিলেন। "ছুটির ঠিক আগেই শারদোৎসব উপলক্ষ্যে ছেলেদের নিয়ে একটা নাটক অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছে..."।

'শারদোৎসব' ঋতু উৎসবের নাটক। ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন, "প্রত্যেকটি ঋতুকে উৎসবের দ্বারা অভিনন্দিত করিবার চিন্তা রবীন্দ্রনাথের ছিল। ...আশ্রমগুরু সর্বপ্রথম আয়োজন করিয়াছিলেন বর্ষা উৎসবের। কিন্তু সে অনুষ্ঠানের সময় তিনি নিজেই আশ্রমে উপস্থিত থাকিতে পারিলেন না। সেইদিক দিয়া দেখিলে শারদোৎসব নাটকই আশ্রমের আদিতম ঋতু-উৎসবের পুস্তক এবং উৎসবও। ...শরৎকালের কয়েকটি গানের সূত্রে শারদোৎসব নাটকটি তৈয়ারি হইয়াছে।"

অন্যত্র 'শারদোৎসবে'র ব্যাখ্যা সূত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "সমস্ত নাটককে ব্যাপ্ত করিয়া যে ভাবটা আছে সেটা আমাদের আশ্রমের বালকদের পক্ষে সহজ। বিশেষ বিশেষ ফুলে-ফলে হাওয়ায়-আলোকে আকাশে-পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ ঋতুর উৎসব চলিতেছে। সেই উৎসব মানুষ যদি অন্যমনস্ক হইয়া অন্তরের মধ্যে গ্রহণ না করে তবে সে পার্থিব জীবনের একটি বিশুদ্ধ এবং মহৎ আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়।...

"নব ঋতুর অভ্যুদয়ে যখন সমস্ত জগৎ নূতন রঙের উত্তরীয় পরিয়া চারিদিক হইতে সাড়া দিতে থাকে তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহ্বান করে—সেই হৃদয়ে যদি কোনো রঙ না লাগে, কোনো গান না জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে মানুষ সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

"সেই বিচ্ছেদ দূর করিবার জন্য আমাদের আশ্রমে আমরা প্রকৃতির ঋতু-উৎসবগুলিকে নিজেদের মধ্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। শারদোৎসব সেই ঋতু-উৎসবেরই নাটকের পালা।"

ত্রিপুরা রাজবংশের একটি কাহিনী নিয়ে লেখা ছোটো উপন্যাস 'মুকুট' 'বালক' পত্রিকার বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ এই প্রথম দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, পরে ছাত্রনাট্য পুস্তক 'ছুটির পড়া'য় সংকলিত হয়। রবীন্দ্ররচনাবলী চতুর্দশ খণ্ডে ও তারপর 'গল্পগুচ্ছ' চতুর্থ খণ্ডে গৃহীত হয়।

রাজর্ষি

ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বনে লেখা 'রাজর্ষি' উপন্যাস ১২৯৩ সাল। ইংরেজি ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭-তে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসে ৪৪ পরিচ্ছেদ এবং একটি উপসংহার, তার প্রথম ২৬টি পরিচ্ছেদ 'বালক' পত্রিকার আষাঢ় থেকে মাঘ ১২৯২ সত সংখ্যায় ধারাবাহিত হয়েছিল। আশ্বিন-কার্তিক ছিল যুগ্ম সংখ্যা। প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্টে 'মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যস্য চরিত্রম্। নামে সংস্কৃতে লেখা গোবিন্দমাণিক্যের ইতিহাস সংকলিত ছিল

'রাজর্ষি'র গল্পবীজ রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন স্বপ্নে। দেওঘরে রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন :

কলিকাতায় ফিরিবার সময় রাত্রের গাড়িতে ভিড় ছিল, ভালো করিয়া ঘুম হইতেছি না—ঠিক চোখের উপর আলো জ্বলিতেছিল। মনে করিলাম, ঘুম যখনই হইবেই না তখন এই সুযোগে বালকের জন্য একটা ভাবিয়া রাখি। গল্প ভাবিবার ব্যর্থ চেষ্টার টানে গল্প আসিল

না, ঘুম আসিয়া পড়িল। স্বপ্ন দেখিলাম, কোন্ এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলিয়া রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বাবা, একী! এ যে রক্ত!" বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া। অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনোমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে। —জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে-পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরও আছে। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া রাজর্ষি গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালকে বাহির করিতে লাগিলাম।

জীবনস্মৃতি, বালক অধ্যায়।

আটটি গল্প

রবীন্দ্রনাথের তখনও পর্যন্ত প্রকাশিত ৭১টি গল্পের মধ্য থেকে বালকবালিকাদের পাঠোপযোগী আটটি গল্প বাছাই ক'রে 'আটটি গল্প' নামে প্রকাশিত হয় ৪ অগ্রহায়ণ ১৩১৮ বা ২০ নভেম্বর ১৯১১-য়। প্রকাশক শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা। বইয়ের 'নিবেদন' স্থানে বলা হয়েছে, "ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকরূপে গল্পের বইয়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে ইহা আমরা অনুভব করিয়াছি। সেইজন্যই 'গল্পগুচ্ছ' হইতে বালকবালিকাদিগের পাঠোপযোগী আটটি গল্প নির্বাচন করিয়া লইয়া এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন করা হইল।" গল্পগুলি নির্বাচনের পরে কিছু কিছু সম্পাদনাও করা হয়েছিল।

'খোকাবাবু', 'সাক্ষী', 'কাবুলিওয়ালা', 'স্বর্ণমৃগ', 'দানপ্রতিদান', 'অনধিকার প্রবেশ'। 'গুপ্তধন' ও 'মাষ্টারমশায়' এই আটটি গল্প। ওখানে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' 'খোকাবাবু' নামে এবং 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' 'সাক্ষী' নামে গৃহীত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর চরিত

'বিদ্যাসাগর চরিত' ও 'বিদ্যাসাগর' নামে দুটি প্রবন্ধ নিয়ে 'বিদ্যাসাগরচরিত' পুস্তিকা আনুমানিক ১৯০৯ সালে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস দ্বারা প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রবন্ধটি ১৩ই শ্রাবণ ১৩০২ তারিখে এমারেল্ড থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে বিদ্যাসাগরের স্মরণসভায় গঠিত, 'সাধনা' পত্রিকার ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় গ্রন্থটি শিবনাথ শাস্ত্রীর 'প্রদীপ' আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধের অনুক্রম হিসেবে লেখা, 'ভারতী' ১৩০৫ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

'বিদ্যাসাগরচরিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা' এবং 'বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন।"

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম

১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে আশ্রমবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠাদিবসে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করেন এবং আচার্যের উপদেশ দান করেন। আচার্যের উপদেশ-নিবন্ধটি এই লেখা, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মাঘ ১৩০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দীক্ষিত ছাত্রদের আচার্য মিথ্যাকে কায়মনোবাক্যে দূরে রাখার। ধর্ম ছাড়া আর কিছুকে ভয় না করার, যা-কিছু অপবিত্র, শরীর-মন থেকে তা দূর করার, সবার মঙ্গলের চেষ্টা করার। এবং ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে প্রত্যহ একবার অন্তত স্মরণ করার, এবং তদনুযায়ী সত্যব্রত, অভয়ব্রত, পুণ্যব্রত, মঙ্গলব্রত ও ব্রহ্মব্রতে সমন্বিত হবার উপদেশ দেন।